বাংলা ছোটগল্প

১৮৭৩—১৯২৩

শিশিরকুমার দাশ

নলেজ হোম ॥ ঢাকা

প্রথম সংস্করণ : অক্টোবর, ১৯৬৩

প্রকাশক
এ. এম. খান মজলিশ
নলেজ হোম
১৪৬ গভর্নমেন্ট নিউমার্কেট
ঢাকা ৫

মুদ্রক
বাংলা একাডেমীর মুদ্রণ শাখা
ঢাকা ২

প্রচ্ছদ
কাইয়ুম চৌধুরী
[স্ব] সায়রা সৈয়দ

॥ ভূমিকা ॥

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের আবির্ভাব নিতান্ত আধুনিক কালের ঘটনা। ছোট-গল্প পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে সন্ধান করলে অতি প্রাচীনকাল থেকেই পাওয়া যেতে পারে কিন্তু সচেতনভাবে 'ছোটগল্প' নামক একটি বিশিষ্ট রূপ সৃষ্টি শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীতে। ইংলণ্ডের অতি জনপ্রিয় ছোটগল্পকার সমারসেট মম এ সম্পর্কে বলেছেন যে, 'গল্পবলা মানুষের স্বভাব। আমি কল্পনা করতে পারি যে কোন এক রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর মদে বুঁদ হয়ে এক শিকারী তার সংগী-সাথীদের আনন্দ দেবার জন্য তার শোনা এক অদ্ভুত আশ্চর্য ঘটনা জমিয়ে বলছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলব যে উনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত ছোটগল্প একটি প্রধান সাহিত্যিক রূপ পায় নি।'১ এই কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। উনবিংশ শতাব্দীতে যে সমস্ত কারণে ছোটগল্পের রূপ ত্বরান্বিত হল তার অন্যতম কারণ হল অসংখ্য পত্রিকার উদ্ভব। সম্ভবত জার্মানীতে এই ধরণের পত্রিকার উদ্ভব ঘটে সর্বপ্রথম—অনেকটা আমাদের পূজাবার্ষিকীর মত। ক্রমে ক্রমে সমগ্র ইউরোপেও বার্ষিকী জাতীয় পত্রিকা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। আমেরিকাতেও বড় লেখকদের বই ছাপার অবাধ সুযোগ থাকায় ছোট ও নূতন লেখকদের বাধ্য হয়ে পত্রিকার আশ্রয় নিতে হয়। পত্রিকাগুলিই ছোটগল্প রচনার উৎসাহদাতা। জনচিত্তের আকাঙ্ক্ষাকে মেটাবার স্বাভাবিক ইচ্ছে লেখকদের থাকেই—জনচিত্তের আকাঙ্ক্ষা বা দাবী অনু-সারেই যে বিশেষ বিশেষ রচনার জোয়ার-ভাঁটা—একথা নির্মম হলেও সত্য। বাংলা দেশেও তার অন্যথা ঘটেনি। পত্রিকার বুকেই ছোটগল্পের জন্ম ও প্রতিষ্ঠা। হিতবাদী পত্রিকাতেই বাংলাদেশের সর্বপ্রধান ছোটগল্পকারের আবির্ভাব।

বাংলা ছোটগল্পের বয়স আজও একশ' হয় নি। হয়ত সেই কারণেই বাংলা ছোটগল্পের আলোচনা নিতান্তই কম—মুষ্টিমেয় বললেও বেশী বলা হয়। অথচ ইউরোপ ও আমেরিকাতে ছোটগল্পের বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও আলোচনার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ছোটগল্পের তালিকা প্রণয়নে লেখকদের উৎসাহ প্রচুর।২ এ ছাড়া

১। Maugham, W. S., *Points of View (The Short Story)*, p. 147

২। দ্রষ্টব্যঃ Cook, Dorothy, E., and Monro, Isabel, S., *Short Story Index*, New York, H. W. Wilson Co., 1953
Cook, Dorothy, E. & Fidell, Estelle A., *Short Story Index*, Supplement, 1950-1954, New York, 1956
Fidell, Estelle, A., *Short Story Index, Supplement, 1955-1960* New York, 1960

অসংখ্য গ্রন্থ রচনা হয়েছে।১ ইউরোপ ও আমেরিকায় ছোটগল্প রচনা শিক্ষা দেবার জন্য এক ধরণের স্কুল আছে। সেই প্রয়োজনেও বই লেখা হয়েছে অনেক। যেমন *J. T. Frederich*-এর *A Handbook of Short Story Writing; L. W. Smith*-এর *Writing of Short Story, Blanche C. William*-এর *Handbook on Story Writing* ইত্যাদি।
O'Fiolin-এর চমৎকার বই *The Short Story*-ও মূলত এই প্রয়োজনেই লেখা। সে তুলনায় বাংলায় ছোটগল্প সংক্রান্ত কোন আলোচনা নেই।

দ্বিতীয়ত, পরিমাণগত দিক থেকে দেখলে, বাংলায় এই কয়েক বছরে রাশি রাশি ছোটগল্প লেখা হয়েছে। সাহিত্য, মানসী ও মর্মবাণী, ভারতী, প্রদীপ, প্রবাহ, ভারতবর্ষ, প্রবাসী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত গল্প-তালিকা সংরক্ষণ করা হলে এক বিস্ময়কর সংখ্যা পাওয়া যাবে। তাছাড়া বাংলাদেশের সব বড় লেখকই (বঙ্কিম-চন্দ্র বাদে) সকলেই ছোটগল্প লিখেছেন। অনেক লেখকের সম্মান সম্ভবত তাঁদের ছোটগল্পের জন্যই—যেমন প্রভাতকুমার। অনেকে ছোটগল্প ছাড়া আর কিছুই লিখেন নি- যেমন পরশুরাম। বাংলাদেশের সমালোচকবর্গ প্রায় একমত যে ছোট-গল্পে বাঙালীর স্বাভাবিক স্ফূর্তি। উপন্যাসের চেয়ে বাঙালী লেখক ছোটগল্পেই তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন অনেক বেশী।

তৃতীয়ত, সম্ভবত বাঙালী সাহিত্যিকদের ছোটগল্পে স্বাভাবিক স্ফূর্তি হওয়ার ফলেই, বাংলা ছোটগল্পের স্থান গুণগত বিচারে উঁচুতে। বিশ্বসাহিত্যের কথা জানি না (সম্ভবত কেউ স্পষ্ট জানেন না) কিন্তু ইংরাজি ভাষায় যেসব মহৎ ছোট-গল্পকারদের সংকলন প্রকাশিত হয়েছে—সেই সব গল্পের পাশে যে বাংলা গল্পের স্থান হতে পারে—একথা নিরপেক্ষ বিচারেও গ্রাহ্য। কিছু কিছু বিদেশী সংকলনে বাংলা গল্প স্থান পেয়েছে। বিদেশীরা বাংলা জানলে ক্রমশ আরো পাবে সন্দেহ নেই। বাংলা গল্প তার প্রাচুর্য ও গভীরতার জন্যই ভারতীয় অন্যান্য বহু ভাষাতেও বিশেষ প্রভাব সঞ্চার করেছে। হিন্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটগল্পকার যে রবীন্দ্রনাথের গল্প থেকে প্রেরণা লাভ করেছেন—একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। অসমীয়া বা ওড়িয়ার মত বাংলার পার্শ্ববর্তী ভাষাই শুধু নয়—অন্যান্য ভাষাতেও বাংলা গল্প জনপ্রিয়তা এবং লেখকপ্রিয়তা লাভ করেছে।

কাজেই বাংলা ছোটগল্প নিয়ে আলোচনার সুযোগ অনেক, প্রয়োজনও অনেক। এবং সেই কারণেই বর্তমান গ্রন্থের জন্ম।

১। দ্রষ্টব্যঃ Wright. A. M., *The American Short Story in the Twenties*, The university of Chicago Press, 1961—গ্রন্থের বিশাল গ্রন্থপঞ্জী

॥ ২ ॥

বাংলা ছোটগল্প সম্পর্কে প্রথম আলোচনার সূত্রপাত হয় পত্রিকাতেই। যতদূর মনে হয় এই আলোচনার সূত্রপাত করেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। সাহিত্য পত্রিকায় ছোট গল্প সংক্রান্ত আলোচনা মধ্যে মধ্যে হয়। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি ছোট গল্পের তত্ত্ব, আকৃতি, ইতিহাস এবং বিদেশী ছোটগল্পের পরিচয় দিতে শুরু করেন। দ্বিতীয় মূল্যবান আলোচনা করেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।১ এই লেখার মধ্যেও তিনি ছোটগল্পের তত্ত্ব ও ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং এই লেখাতেই সর্বপ্রথম বাংলা ছোটগল্পের উদ্ভব ও প্রকৃতি সম্পর্কে দু-চার কথা বলা হয় এবং রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরী দুজনেই ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে কখনও কখনও ছোটগল্প সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন।২ সুধীরচন্দ্র সরকার সম্পাদিত কথাগুচ্ছের ভূমিকা লেখেন প্রমথ চৌধুরী। এই ভূমিকায় প্রমথ চৌধুরী ছোটগল্প সম্পর্কে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেন।

সমালোচনা সৃষ্টিকে নির্ভর না করে গড়ে উঠতে পারে না, শুধু তত্ত্বের আলোচনাই যথেষ্ট নয় - তত্ত্বের প্রয়োগ দরকার। তাই রবীন্দ্রনাথ, প্রভাতকুমার প্রভৃতি লেখকদের গল্প নির্ভর করে সমালোচনা শুরু হয়। প্রথম যুগে সমালোচনা হত একটি-আধটি গল্প নিয়ে- তার মধ্য দিয়ে কোন তত্ত্ব গড়ে উঠতে পারে নি। ক্রমশ তা ব্যাপক রূপ ধারণ করল। উপন্যাসে যেমন বঙ্কিমের উপন্যাস নিয়ে বিভিন্ন সমালোচনার ধারা গড়ে উঠেছিল, তেমনই ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি সেই পথ উন্মুক্ত করল। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প নিয়ে অনেক আলোচনাই পত্র-পত্রিকায় হয়েছে। মোহিতলাল মজুমদার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতি অনেক লেখকই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। হরপ্রসাদ মিত্রের 'গল্পগুচ্ছে'র রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি এই ধারার বিশিষ্ট সংযোজন।৩ রবীন্দ্রনাথের গল্পের বিরুদ্ধে যখন বস্তুশিথিলতা, গঠনশিথিলতা ও ভাবালুতার অভিযোগ কোন কোন মহলে ধ্বনিত হয়েছিল তখন এই প্রবন্ধটি গল্পবিচারের একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করতে চেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের এবং শরৎচন্দ্রের গল্পের আলোচনা করেন ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' এবং 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থ। এই আলোচনা বস্তুমুখী, নিরপেক্ষ ও রসগ্রাহী। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করলেন প্রমথনাথ বিশী। এই সুরচিত গ্রন্থটি রবীন্দ্র ছোটগল্প আলোচনার অপরিহার্য অংশ—

১। দ্রষ্টব্য: পৃঃ ৬৬-৬৭
২। দ্রষ্টব্য: পৃঃ ৬৮-৬৯, ১২৪-১২৬
৩। সাহিত্য-পরিক্রমা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৪৬, পৃঃ ১০৩-১১৪

শুধু প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ বলে নয়, লেখকের সুগভীর রবীন্দ্রপ্রীতির সঙ্গে ছোট-গল্পের গঠনশিল্প সম্পর্কে তীক্ষ্ণ বোধের সমন্বয়ের জন্য।

বাংলা ছোটগল্পের রেখাচিত্র প্রথম দেবার চেষ্টা করেন ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য়, ৩য় খণ্ডে। ৪র্থ খণ্ডেও সেই ইতিহাসের ধারা অনুসৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের জন্য একটি অধ্যায় ব্যবহৃত হয়েছে। এই গ্রন্থাবলী বাংলা সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে আকর গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এর মধ্যে ছোটগল্পের ইতিহাসের উপাদানও অসংখ্য। ছোটগল্পের কোন স্বতন্ত্র আলোচনা এই গ্রন্থে না থাকা সত্ত্বেও বহু উপাদানের পরিচয়ের ফলে এই তথ্যনিষ্ঠ গ্রন্থাবলী ছোটগল্পের ছাত্রের পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয়। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারায় ছোটগল্পের স্থান অপেক্ষাকৃত বেশী। এই মূল্যবান গ্রন্থটি শুধু বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারাই নয় - কথাসাহিত্যের ধারাকেও ব্যক্ত করেছে। এই মনোজ্ঞ, অন্তর্দৃষ্টিময় আলোচনার এক-একটি ইঙ্গিত এই বিষয়ের পরবর্তী ছাত্র-দের কাছে অপরিসীম শ্রদ্ধার সঙ্গে গণ্য হবে। কিন্তু এই গ্রন্থে ছোটগল্প একাংশ মাত্র। বৃহৎ বনস্পতির পত্রপুষ্পপল্লবাচ্ছন্ন আলো-আঁধারের শোভায় ও বিচারে তিনি আত্মস্থ, তবুও মধ্যে মধ্যে অতুলনীয় ছোট ছোট ফুলের, ছোট ছোট শিশিরবিন্দুর আহ্বানকে তিনি অস্বীকার করতে পারে নি। এই ধরণের খণ্ড খণ্ড আলোচনার পরিচয় সমাপ্ত করার আগে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। বেঙ্গল পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ গল্পমালার ভূমিকাগুলি তিনি লিখেছেন। এই ভূমিকাগুলি পরবর্তী আলোচকদের কাছে অতি মূল্যবান।

শুধু ছোটগল্প -তার ইতিহাস ও পরিচয় নিয়ে বাংলায় প্রথম গ্রন্থ লেখেন শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।১ যে-কোন বিষয়েই প্রথম গ্রন্থ লেখার একটি বিশেষ গৌরব আছে। সেই গৌরব তাঁর প্রাপ্য। প্রথম যে কোন গ্রন্থ লেখার অনেক কষ্ট আছে যে কষ্টের দ্বারা লেখক পরবর্তীর পথ তৈরী করে যান তাঁরা ধন্যবাদার্হ। নরেন্দ্রনাথ চক্র-বর্তী বিশেষ ধন্যবাদের যোগ্য। তাঁর গ্রন্থ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। প্রাক্‌রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প থেকে অতি আধুনিক কাল পর্যন্ত (প্রায় ১৯৫০) গল্পের আলোচনা করেছেন। এই ক্ষুদ্রকায় গ্রন্থে এই অতি দীর্ঘ বিষয় আলোচনার ফলে অব্যাপ্তি দোষে গ্রন্থটি পরিপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, তারিখ-সালের ভুল অনেক, তথ্যের ভ্রান্তিও যথেষ্ট। সমস্ত বইটি এক কথায় খণ্ডচ্ছিন্ন সংক্ষিপ্ত আলোচনা মাত্র। মনে হয় যেন বইটি কোন অলিখিত উচ্চাকাঙ্ক্ষী বই-এর খসড়া মাত্র।

ছোটগল্প সম্পর্কে দ্বিতীয় গ্রন্থ লেখেন শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৫৬ খৃঃ

১। বাংলা ছোটগল্প - সংক্ষিপ্ত
(প্রারম্ভ কাল হইতে ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত), মডার্ন বুক এজেন্সি ১৩৫৭
(পৃঃ ।০ + ২২০ + ৮৶০)

অব্দে।১ ১ম সংস্করণে বইটি খুবই ছোট এবং অসম্পূর্ণ ছিল। পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থটি আমূল পরিবর্তিত হয়। বর্তমান সংস্করণে গ্রন্থটি আরো পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে।২ এই গ্রন্থটির পরিকল্পনা ব্যাপক। লেখক নিজেই বলেছেন, "আর্য জাতির সর্বপ্রাচীন গল্পসংগ্রহ জাতক থেকেই যাত্রা আরম্ভ করেছি, তারপর পঞ্চতন্ত্রের গতিপথ অনুসরণে, আরব্য উপন্যাসের সহযাত্রী হয়ে ইউরোপে পৌঁছেছি। বোক্কাচিয়ো, চসার এবং র‍্যাবলে—এই মহান ত্রয়ীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে ঊনিশ শতকে আধুনিক ছোটগল্পে প্রবেশ করেছি।" বলাই বাহুল্য, এই ব্যাপক প্রচেষ্টা আমাদের সমালোচনা সাহিত্যে প্রথম। কাজেই এই ব্যাপক ও বিরাট পটভূমিতে বাংলা গল্পের স্থান বিচার এক নূতন ধরণের আলোচনার সূচনা গ্রন্থ হিসেবে স্মরণীয়তা লাভ করবে।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃঃ ২৮৭-৩৮৫) 'ছোটগল্পের রূপতত্ত্ব' আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থাকারে ছোটগল্পের 'রূপতত্ত্বে'র বিস্তৃত আলোচনা এই প্রথম। এই 'রূপতত্ত্ব' আলোচনা করতে গিয়ে লেখক কতকগুলি পরিভাষার সৃষ্টি করেছেন, যেমন 'impression'-কে বলেছেন 'প্রতীতি', 'anecdote'-কে বলেছেন 'বৃত্তান্ত'। ছোটগল্পের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন নানা গল্পের উদাহরণ দিয়ে (২৮৭-৩৩০) এবং সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে ছোটগল্পের বিশ্লেষণের অন্তত একটি মূল্যবান পদ্ধতিও তিনি নির্দেশ করেছেন (৩৭৬-৩৮৫)। কাজেই ছোটগল্পের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ও রূপের পরিচয় এই যুগল সম্মিলনে এই গ্রন্থটির পরিচয়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছোটগল্প আলোচনার যে ধারাটি সৃষ্টি করলেন তার অনুসরণে দ্বিতীয় গ্রন্থ বলা যেতে পারে অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায়ের সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত 'ছোটগল্পের কথা'।৩ এই গ্রন্থখানির পরিচয় লেখক নিজেই দিয়েছেন, "প্রথম চারটি অধ্যায়ে দেশ-বিদেশের ছোটগল্পের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।...গ্রন্থটির শেষ তিনটি অধ্যায়ে ছোটগল্পের রূপ, রীতি ও কলাবিধি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।" প্রথম চারটি অধ্যায়ের মধ্যে একটি অধ্যায়ে (পৃঃ ১০৪-১২৪) বাংলা ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন শ্রীযুক্ত রায়। শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত রায় দুজনেই বাংলা ছোটগল্পের আলোচনাকে তাঁদের মূল লক্ষ্য করেন নি। শুধু মাত্র বাংলা ছোটগল্পের আলোচনাকে মূল লক্ষ্য করে যে গ্রন্থটি অতঃপর প্রকাশিত হল তা

১। সাহিত্যে ছোটগল্প, ডি, এম, লাইব্রেরী, শ্রাবণ ১৩৬৩ (পৃঃ।০+১৪২)
২। সাহিত্যে ছোটগল্প, ডি, এম, লাইব্রেরী, ৩য় সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৬৯ (পৃঃ ৸৴০+৪১১)
৩। ছোটগল্পের কথা, সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ (পৃঃ৬+২০৭)

অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরীর।১ এই সুবৃহৎ গ্রন্থে ১২৮০ সাল থেকে ১৩৪৮ সাল পর্যন্ত বাংলা গল্পধারার আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম দুটি অধ্যায়ে (১—৩২) ভারতবর্ষ ও ইউরোপের গল্পধারার পরিচয় দিয়েছেন, পরের দুটি অধ্যায়ে (৩২—৩৭) ছোটগল্পের রূপতত্ত্ব নিয়ে বিচার করেছেন এবং অবশিষ্ট অংশে (৬৭—৮২৭) বাংলা গল্পের ধারাবাহিক আলোচনায় ব্যয়িত হয়েছে। এই আলোচনা দুটি ভাগে বিভক্ত : প্রথম ভাগে (৬৭—১২৬) পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধুমতী থেকে সবুজ-পত্র গোষ্ঠি পর্যন্ত, দ্বিতীয় ভাগে (৪২৭—৮২৭) কল্লোল, শনিবারের চিঠি থেকে গল্পধারার বিচার ও পরিচয়। নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যে কাজ অসম্পূর্ণ রেখেছিলেন তা পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করল এই গ্রন্থে। বাংলা ছোটগল্পের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার অন্যতম অগ্রসূরীরূপে তাই এই গ্রন্থ বিশেষ মর্যাদা লাভ করবে।

॥ ৩ ॥

আমার গ্রন্থটির কালসীমা ১৮৭৩--১৯২৩ অর্থাৎ আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের সূচনার ইঙ্গিত দিয়েই তার পরিসমাপ্তি। এই পঞ্চাশ বৎসরের বাংলা ছোটগল্পের বিবর্তনকে দেখাতে চেয়েছি এই গ্রন্থে। যদিও ১৮৭৩ থেকে ছোটগল্পের জন্ম ধরেছি তবুও ইঙ্গিত করতে চেয়েছি অন্যান্য গল্পের রূপের মধ্যেই ছোটগল্পের জন্ম-সম্ভাবনা লুকিয়েছিল, রূপ-বিবর্তনের ধারা বেয়েই ছোটগল্প জন্ম নিয়েছে। বাংলাদেশে ছোটগল্প বিশেষভাবে জন্ম নেবার আগে যে ধরণের গল্প প্রচলিত ছিল তাকে আমি মোট চারিটি স্তরে ভাগ করতে চেয়েছি—চূর্ণক, আখ্যানক, নক্সা এবং নভেলা। এই চারটি শ্রেণী আজও বহমান—তার সঙ্গে সঙ্গে ছোটগল্পের শাখাটিও এখন গড়ে উঠেছে। মনে রাখতে হবে চূর্ণক ও আখ্যানক এই দুটি পরিভাষা আমি ব্যবহার করেছি। 'চূর্ণক' শব্দটি সংস্কৃতে আছে। সংস্কৃত গদ্য-সাহিত্যকে যে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি হল চূর্ণক।২ এখানে আমি চূর্ণককে সংস্কৃত অর্থানু-যায়ী অল্প সমাসবিশিষ্ট গদ্যরচনা বলে গ্রহণ করিনি, করেছি ছোট ছোট গল্প হিসেবে, anecdote-এর অনুকম্পা হিসেবে। আমি এর যথেষ্ট উদাহরণ দিয়েছি। 'আখ্যানক' শব্দটিকে আমি ইংরেজি Tale বা Fableএর সমার্থক ধরেছি আবার সংস্কৃতে যে

১। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৯৬২ (পৃঃ ১৶০ + ৮২৭ + ১৯)

২। বৃত্তবন্ধোজ্ঝিতং গদ্যং মুক্তকং বৃত্তগন্ধি চ।
ভবেদুৎকলিকাপ্রায়ং চূর্ণকঞ্চ চতুর্বিধম্ ॥
আদ্যং সমাসরহিতং বৃত্তভাগযুতং পরম্।
অন্যাদ্দীর্ঘ সমানাঢ্যং তুর্যঞ্চাল্প সমাসকম্ ॥ ৬/৩০৯ সাহিত্যদর্পণ

'কথা', 'আখ্যায়িকা', 'খণ্ডকথা' ইত্যাদির সূক্ষ্ম সূক্ষ্মকে ভেদ আছে।১ সে ভেদকে স্বীকার না করে 'আখ্যানক' শব্দটিকে ব্যাপক অর্থেই গ্রহণ করেছি। এর উদাহরণও গ্রন্থমধ্যে দিয়েছি। নক্সা এবং নভেলা শব্দটি সাধারণত যে অর্থে ব্যবহৃত হয় সে অর্থেই গৃহীত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বা আধুনিক কোন ছোটগল্পকারের দিকে তাকিয়ে অনেকের মনে হতে পারে এর সঙ্গে চূর্ণক, আখ্যানক, নক্সা ইত্যাদির যোগ কোথায়। মনে রাখতে হবে এ যোগ ছোটগল্পের morphologyর—বিবর্তনের ধারায় এরা এক একটি ধাপ। কিন্তু প্রাণের তফাৎ আছে বলেই ছোটগল্প একটি বিশেষ রূপ। এইখান থেকেই ছোটগল্পের বহিরঙ্গ প্রকৃতি জানা যায়। ছোট গল্পে চরিত্রসংখ্যা কম: একটি দুটি; ঘটনাও কম, একটি দুটি এবং সবশেষে একটি চরিত্র, বা একটি ঘটনা বা একটি ভাব প্রাধান্য লাভ করে। এইখানেই তার যোগ গীতিকবিতার সঙ্গে, বা তার চেয়েও বেশী যোগ একাঙ্কিকা নাটিকার।

পৃথিবীতে খ্যাত বহু ছোটগল্পে তাই চূর্ণক বা anecdote-এর ছাপ লেগে থাকে। মপাসাঁর 'হার' গল্পটিই তার প্রমাণ। সমারসেট মম নিজেই ছোটগল্পের একটি শ্রেণীকে চূর্ণক' প্রধান বলেছেন (তিনি নিজে এই শ্রেণীর গল্প লেখেন এবং পছন্দ করেন)। চূর্ণকের উজ্জ্বল উদাহরণ 'বনফুলে'র গল্প—হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে চিত্তকে ঝলমলানোই তাদের ধর্ম। 'আখ্যানকে'র প্রভাবও গল্পের ইতিহাসে অবিরল। চূর্ণক যেমন কয়েক ছত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ সেখানে যেমন গল্পের একটিমাত্র স্তর আখ্যানক তেমনই স্তরে স্তরে বিভক্ত। চূর্ণকের মত তার হঠাৎ সমাপ্তি নয়—তা স্তরে স্তরে সাজানো একটি নিঃশেষিত কাহিনী। যেমন আরব্য উপন্যাসের গল্প, কিংবা পঞ্চতন্ত্র। এগুলি সুপরিকল্পিত কাহিনী, অতর্কিতে আরম্ভ হয় না, অতর্কিতে শেষও হয় না। ঐতিহাসিক কাহিনী, পৌরাণিক কাহিনী বা হাসির কাহিনীগুলি সাধারণত এই পদ্ধতিতে গঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'পোস্টমাস্টার' বা 'একরাত্রির' সঙ্গে 'দালিয়া' বা 'ইচ্ছাপূরণ' তুলনা করলে দেখা যাবে - প্রথম দুটি গল্প খণ্ডিত, দ্বিতীয় দুটি গল্পে স্তর বিভক্ত এবং সম্পূর্ণ। অনুরূপভাবে নক্সার প্রভাবও ছোটগল্পের গঠনে আছে। যেখানে কোন একটি বিশেষ চরিত্রকেই দেখানো লেখক মূল লক্ষ্য মনে করেন সেখানে নক্সার ছায়া পড়া অস্বাভাবিক নয়—বনফুলের 'অর্জুন কাকা' এর উদাহরণ হিসেবে ধরা যেতে পারে। একটি নক্সা, ঘটনা ও চিন্তার মধ্য দিয়ে ছোটগল্পের রূপ নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'ঠাকুরদাদা' গল্পটিতে একটি চরিত্র নক্সাই মূল কাঠামো। নভেলার প্রভাব ছোটগল্পে প্রায়ই দেখা যায়,

১। সাহিত্যদর্পণ ৬/৩১০, ৬/৩১১
দণ্ডী: কাব্যাদর্শ ১/২৭, ১/২৮

তাতে অবশ্য ছোটগল্পের ক্ষতি হয়—কারণ নভেলা আসলে উপন্যাসের সগোত্র। শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ গল্পই তার প্রমাণ। তাঁর বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, ছবি, কাশীনাথ ইত্যাদি মূলত ছোটগল্প হিসেবে গঠিত হওয়া সত্ত্বেও কাহিনীর, ঘটনার ও চরিত্রের ব্যাপ্তির ফলে কেন্দ্রভ্রষ্ট হয়ে ভ্রষ্ট ছোটগল্প ও অপূর্ণাঙ্গ নভেলায় পর্যবসিত হয়েছে।

॥ ৪ ॥

এই বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করে দেখেছি বাংলা ছোটগল্প নিজস্ব রীতিতেই জন্মলাভ করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্য, নাটক, উপন্যাস বা সমালোচনা সমস্তই ইউরোপীয় প্রভাবে পুষ্ট হয়েছিল কিন্তু বাংলা ছোটগল্পে বিদেশী প্রভাব প্রায় ব্যতিক্রম। ছোটগল্পের জন্মমুহূর্তে বিদেশী প্রভাব ছিলনা বলেই আমার ধারণা। বিভিন্ন পত্রিকা ও রচনা থেকে যে প্রমাণ ও তথ্য আমি পাই তাতে জেনেছি যে বাংলা গল্প লেখকেরা বিদেশী গল্পের সঙ্গে (ইংরেজি ও আমেরিকার) ঘনিষ্ঠ-ভাবেই পরিচিত ছিলেন। ইউরোপীয় অন্যান্য গল্পধারার সঙ্গে পরিচয় প্রত্যক্ষ ছিল না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ফরাসী জানতেন এবং ফরাসী গল্পের অনুবাদ করেছেন - তৎসত্ত্বেও আমার আলোচ্য পর্বে কোন ফরাসী প্রভাব লক্ষণীয় নয়। বাংলা ছোট গল্প 'রূপতত্ত্বের' দিক থেকে যেমন বাংলা গল্পধারার বিবর্তনের ফল, তেমনই তার প্রাণের দিক থেকেও স্বতস্ফূর্ত আনন্দে আপনাতে আপনি বিকশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই ছোটগল্প বিকশিত হতে চাইছিল সেই কোরকমুক্তির যন্ত্রণা ছড়িয়ে আছে এই সময়ের পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথের হাতেই এই কুসুম প্রস্ফুট হয়ে উঠল, তিনি যখন শিলাইদহের জমিদারীতে, নদীর তীরে, লোকালয়ের মধ্যে মানুষের খণ্ড ছিন্ন ক্ষুদ্র সুখদুঃখের মধ্যে প্রবেশ করলেন। মানুষের সেই সুখদুঃখই দিল তাঁকে গল্পের উপাদান। তার জন্য ইতিহাসের অতীত অধ্যায়ে তাঁকে ছুটতে হল না, কিংবা বিদেশের সাহিত্যভাণ্ডারে ঋণী হতে হল না। নিজের জীবনের অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে তিনি খুঁজে পেলেন ছোটগল্পের অনিঃশেষ উপাদান। অপার বৈচিত্র্যে তাঁর গল্পলোক তাই ভরে উঠল। পল্লীকাহিনী, শহরের কথা, অতীত ইতিহাসের স্বপ্নলোক—বর্তমানের বেদনা, রাজারানী, সাধারণ মধ্যবিত্ত, বিচিত্র বিরো-ধিতার ঐকতান গল্পগুচ্ছে। তার মধ্যে বিদেশী প্রভাব কখনও দেখা যেতে পারে—কিন্তু এহোবাহ্য। এই গল্পরচনাব প্রেরণা স্বতস্ফূর্ত, জীবনের অন্তঃপুরে প্রবেশের বিস্ময় থেকে তাদের জন্ম।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি পরিণত রূপ নেবার আগে থেকেই অনেকে ছোট-গল্প লিখছিলেন—যেমন স্বর্ণকুমারী দেবী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। এঁরা 'রূপ' নিয়ে বেশী চিন্তিত ছিলেন না—কিন্তু বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। 'রূপ'এর

ঐতিহাসিক বিচারে এদের গল্প অপরিণত। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পও প্রাক-রবীন্দ্রনাথের গল্পধারার অনুসরণ বলা চলে, 'রূপ'এর দিক থেকে। ত্রৈলোক্যনাথে অবশ্য বৈঠকী গল্পের রীতি এবং আখ্যানকের যে গল্পশৃংখল (যেমন বত্রিশ সিংহাসন, বেতাল পঞ্চবিংশতিতে) তা অতি স্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের হাতে ছোটগল্পের 'রূপ' একটি বিশিষ্টতা অর্জন করল—তার খণ্ডিত সমাপ্তি, চরিত্র বিরলতা ও কাহিনীর একমুখিতা নিয়ে সেই বিশিষ্টতা। একেই ছোটগল্পের লক্ষণ বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের সমকাল থেকেই বহু লেখক এই নবীন শিল্পরূপটিকে পরিচর্যা করতে থাকেন। প্রভাতকুমার, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি তাঁদের অগ্রগণ্য। এছাড়া আরো বহু লেখক যাঁদের আমরা অপেক্ষাকৃত গৌণ লেখক বলতে পারি। আমাদের এই আলোচনায় কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে অবলম্বন করে (যেমন প্রভাতকুমার, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র) বিষয়বস্তু, কাহিনী, প্রকৃতি এবং গঠনভঙ্গির বিচার করা করা হয়েছে। বিষয় অর্থে, যেমন, হাসির গল্প, প্রেমের গল্প, কাহিনী প্রকৃতি, যেমন, ট্রাজেডি, কমেডি ইত্যাদি; গঠন অর্থে, যেমন, পত্রাকারে লিখিত, নাট্যাকারে লিখিত, উত্তম পুরুষে লিখিত। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে অবলম্বন করে আলোচনা না করে একটি ধারাকে অবলম্বন করেছি—যেমন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরশুরাম—এই তিনজনকে নিয়ে। এছাড়া যাঁরা অল্প শক্তিমান, যাদের নিয়ে আলাদা পরিচ্ছেদ রচনা করা যায় না, অথচ সাহিত্যের প্রবাহে যাঁরা বেগ সঞ্চারে সাহায্য করেছেন সেই সব লেখকদের বিচ্ছিন্ন এবং স্বল্পশক্তির যোগফল আমাকে কোথায় পৌঁছে দেয় তা দেখতে উৎসাহিত হয়েছি। এই অনুসন্ধানে আমি ব্যর্থ হইনি। বাংলা গল্পের বিষয়-বৈচিত্র্যে এই সব গৌণ লেখকদের দান যথেষ্ট। এক-একটি বিষয় বাংলা ছোটগল্পের এক-একটি শাখা। যেমন, ভূতের গল্প, ডিটেকটিভ্ গল্প, শিশু ও শিশুমনের গল্প, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক গল্প। যদি আমাদের সাহিত্যে এই সব বিচিত্র বিষয় নিয়ে সংকলন-গ্রন্থ বেরুত তাহলে গৌণ লেখকদের নাম অপরিচয়ে ঢাকা পড়ত না বা এতটা দূরত্বের ব্যবধান সৃষ্টি হত না। দীনেন্দ্রকুমার রায়, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, কাঞ্চনমালা দেবী, সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বা জলধর সেন—কেউই বড় লেখক নন; কিন্তু মনে রাখার মত গল্প এঁদের আছে।

বিষয়-বৈচিত্র্যের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি আন্দোলনকে গল্পধারার মধ্য দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছি। তা হল রক্ষণশীলতা ও প্রগতিশীলতার দ্বন্দ্ব। বিষয়বস্তু, মনোভঙ্গি এবং আঙ্গিক তিন দিক থেকেই এই দ্বন্দ্ব। বড় লেখকদের মধ্যে যে পরিচয় আমরা পাই তা স্পষ্ট। কিন্তু স্বল্পখ্যাত ও স্বল্পশক্তি লেখকদের মধ্যেও যখন দ্বন্দ্বের তীব্রতা লক্ষ্য করি তখন সাহিত্যিক আন্দোলনগুলির ব্যাপকতাও বুঝি। গোষ্ঠীগতভাবে যথা—'সাহিত্য' পত্রিকা ও 'ভারতী' পত্রিকা, 'সবুজপত্র' ও 'নারায়ণ', 'প্রবাসী' ও 'কল্লোল' এইভাবে

এই আন্দোলনকে দেখা চলে। মনে রাখতে হবে যে এই দ্বন্দ্ব সাহিত্যের। আর সাহিত্যের স্রষ্টা ব্যক্তি, দল নয়। তাই রক্ষণশীলগোষ্ঠি বলে যাদের চিহ্নিত করা যাবে, দেখা যাবে সেই দলের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে চিন্তার, শুধুই সূক্ষ্ম নয়, বেশ স্পষ্ট পার্থক্য। যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পাশে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে মনে হয় অনেক বেশী অগ্রসর, আর হেমেন্দ্রপ্রসাদের পাশে হয়ত সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে মনে হয় আধুনিক। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের তুলনায় মাণিক ভট্টাচার্য বা সরোজনাথ ঘোষ রক্ষণশীল। আবার কল্লোলের চোখে হেমেন্দ্রকুমার নিতান্তই প্রাচীনপন্থী। আসলে এ শুধু সামাজিক দ্বন্দ্বের সাহিত্যিক প্রতিফলন নয়—এ ব্যক্তিহৃদয়ের দ্বন্দ্বও বটে। সংগ্রাম ও সমন্বয়ের এই ইতিহাসকে বোঝার চেষ্টা করেছি। 'সাহিত্য' থেকে 'ভারতী'; 'ভারতী' থেকে 'সবুজপত্র' এবং তারপরেই 'কল্লোলে' এই সাহিত্যিক আন্দোলন রূপ থেকে রূপে সঞ্চারিত হয়ে এক নবীন আন্দোলনের সৃষ্টি করল। নব্যসাহিত্য-আন্দোলন শুধু কল্লোলেই হয়নি—এই পর্বের বিভিন্ন নবীন লেখকের আত্মার যন্ত্রণা থেকে জন্ম নিয়েছে—তারা কল্লোলের সংগে সবাই প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না। আধুনিক গল্পধারার সবচেয়ে বড় কথা প্রাচীন গল্পধারার নিশ্চিন্ত নিরাপত্তার গন্ডী ভেদ করে নিষিদ্ধ জগতে পা বাড়ানো। বিষয়-বস্তু হল নতুন, সৈনিক জীবনের অবাধ উল্লাসের কাহিনী শোনালেন কেউ, কেউ কয়লাকুঠির গল্প, কেউ নিঃসংগ তরুণ আত্মার গল্প। প্রাচীন যেখানে এসে বলেছে, আর নয়, এই শেষ। আধুনিক সেইখানে এসে বলেছে, এইত আরম্ভ। সে বলেছে

মোদের লগ্ন সপ্তমে ভাই রবির অট্টহাসি
জন্মতারকা হয়ে গেছে ধূমকেতু
নৌকা মোদের নোঙর জানে না, ভাসিয়া চলেছে সোজা
কেন যে বুঝি না, বুঝিতে চাহি না হেতু।

যে আধুনিক গল্পধারা এই সময় থেকে সূচীত হল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ, তারাশংকর, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় যার প্রধান—সেই গল্পধারার পরিচয় আমার গ্রন্থে নেই। তার আবির্ভাবেব সংকেত দিয়েই আমার অর্ধশত বৎসরের বাংলা ছোটগল্পের পরিচয়ের সমাপ্তি।

॥ ৫ ॥

এইবার ঋণস্বীকার ও কৃতজ্ঞতা নিবেদনের আনন্দময় কাজটি। ছোটগল্প নিয়ে ইতিপূর্বে যাঁরা কাজ করেছেন, বিশেষ করে যাঁদের কথা আমি উল্লেখ করেছি তাঁদের সকলের কাছেই আমি ঋণী। কারো কাছ থেকে প্রত্যক্ষ সাহায্য পেয়েছি, কারো কাছ থেকে পরোক্ষভাবে। বিশেষ কৃতজ্ঞতার সংগে স্মরণ করি অধ্যাপক

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্তকে। বর্তমান গ্রন্থটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি, ফিল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এই গ্রন্থের পরিকল্পনার সঙ্গে এর জন্মমুহূর্ত থেকে শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত পরিচিত। তিনি উৎসাহ দিয়েছেন, নির্দেশ দিয়েছেন এবং আন্তরিক আগ্রহে গ্রন্থটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়ে বিচার করেছেন। আমার প্রতি তাঁর স্নেহ এবং এই বিষয়টির প্রতি গভীর কৌতূহলের কথা মনে রেখে তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি। এই গ্রন্থ রচনাকালে আমি ছোটগল্পকার শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি পান্ডুলিপির প্রথম খসড়াটি পড়ে আমাকে দীর্ঘ চিঠি লেখেন—তাতে অজস্র তথ্যের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, বহু অনালোচিত জটিলতার প্রতি ইঙ্গিত করেন। আমার প্রতি তাঁর স্নেহের গভীরতা তাঁর সমালোচনার বস্তুমুখিতাকে ক্ষুন্ন করেনি—আজ আনন্দিত চিত্তে তাঁর প্রতি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

বিভিন্ন পত্রিকা ও পুস্তিকা দেখেছি বিভিন্ন পাঠাগারে, কলকাতায় জাতীয় পাঠাগারে; লন্ডনে, বৃটিশ মিউজিয়মে, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী এবং স্কুল অফ্ অরিএন্টাল এ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ-এর লাইব্রেরীতে। পাঠাগারের কর্মীদের তৎপরতা ও সহৃদয়তার কথা ভেবে তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নবেন্দু সেন তাঁর পিতামহ দীনেশচন্দ্র সেনের একটি গ্রন্থ আমাকে সংগ্রহ করে দেন, বিশ্ববিদ্যালয়েব সর্বজনপ্রিয় সুকুমার মিত্র নানা সময়ে নানা বই দেখতে দিয়েছেন; শ্রীযুক্ত মাণিক মহাপাত্র এবং দিল্লী কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মিহির-কুমার দাশ যথাক্রমে 'নারায়ণ' পত্রিকা এবং 'সবুজপত্র' থেকে তথ্য সংগ্রহে এবং শ্রীমান শিবিররঞ্জন দাশ আমাকে নির্ঘন্ট রচনায় সাহায্য করেছেন। এঁরা সবাই আমাকে ঋণপাশে বেঁধেছেন।

আর কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি অগ্রজপ্রতিম শুভৈষী জানকীনাথ বসুকে—যিনি এই অপরিচিত লেখকের বই প্রকাশ করতে নানা সাহায্য করেছেন। আমার প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত স্নেহপক্ষপাত যে তার একমাত্র কারণ তা আমি জানি। স্বভাবতই এত মানুষের স্নেহ ও সহৃদয়তার কথা এই মুহূর্তে স্মরণ করতে পেরে আনন্দিত বোধ করছি। এখন সাধুজনের সহৃদয়তাই একমাত্র প্রার্থনা।

আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগ
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়
দিল্লী

শিশিরকুমার দাশ

॥ সংক্ষিপ্ত রূপ ॥

ছিন্নপত্র	ছিন্নপত্রাবলী (শতবর্ষপূর্তি সংস্করণ)। শুধু ১৭৮এ পাদটীকায় উল্লেখিত ছিন্নপত্র অর্থে পুরোনো গ্রন্থটিই দ্রষ্টব্য।
বাসাই	বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস সুকুমার সেন
ভু	ভুল। *Sic* শব্দটির প্রতিশব্দ অর্থে ব্যবহৃত।
MLS	Masterpiece Library of Short stories

॥ সূচীপত্র ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ

॥ উৎসের দিকে ॥

ছোটগল্প সাহিত্যের সবচেয়ে নবীন শাখা, যদিও গল্প মানুষের সভ্যতার মতই পুরোনো। সভ্যতার শুরু থেকে, মানুষ গল্প শুনেছে, বলেছে। যুগে যুগে বিচিত্র গল্প সৃষ্টি হয়েছে, তারপর তারা ছড়িয়ে গেছে। আবার কোন অনামা শিল্পী তাদের কুড়িয়ে নিয়েছে, নতুন করে সাজিয়েছে, নতুন মানুষের কাছে সেই গল্পগুচ্ছ উপহার দিয়েছে। এমনি করে গল্পধারা আদিকাল থেকে বয়ে এসেছে। তার প্রতি মানুষের কৌতূহল চিরকালের।

কিন্তু ছোটগল্প বিশেষভাবে একালের সৃষ্টি। তাই গল্পের সংগে তার একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। এ একটি বিশেষ 'রূপসৃষ্টি'। শুধু কাহিনী বলা নয়, শুধু আখ্যান রচনা নয়, শুধু চরিত্র সৃষ্টিও নয়। এ এক বিশিষ্ট সাহিত্যরূপ।

বাংলা সাহিত্যের এই শাখা পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা। এই পূর্ণতার পেছনে আছে সুদীর্ঘ সাধনার ইতিহাস। কোন ঘটনাই পূর্বসূত্র ও উত্তর পরিণাম বিচ্ছিন্ন নয়। তাই পরিণত ফলের পেছনে আছে তরুণ ফুলের প্রস্তুতি। সর্বত্রই এক নেপথ্য-ভূমি আছে। রঙ্গালোকের দীপ্তিতে নেপথ্যালোক চিরকালই নেপথ্যে থেকে যায়।

বাংলা ছোটগল্পেরও এক নেপথ্যভূমি আছে। সেখানে প্রবেশের কষ্টটুকু স্বীকার করলে দেখা যাবে দুটি জিনিস। এক, ছোটগল্প নামে এই অভিনব শিল্পরীতি কতখানি বিশুদ্ধ শিল্প সৃষ্টির প্রেরণা থেকে জন্ম নিয়েছে আর তার পেছনে সামাজিক ও বাহ্যিক কারণ কতখানি প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। দুই, অন্যান্য শিল্প-রীতির মধ্যে থেকে তার জন্মের সম্ভাবনা ছিল কতখানি। ইতিহাসের এই উপকরণ ছড়িয়ে আছে এই নেপথ্যভূমিতে। এই অন্তরাল ভূমিতে যে কুসুম কোরকদশায় বন্দী হয়ে মুক্তি চাইছিল সেই অন্তরালভূমিকে জানলে এই বিচিত্র সাহিত্যরূপের পরিচয় পরিস্ফুট হবে।

সব মানুষের মতই বাঙালীও আদিকাল থেকে গল্প করেছে। কিন্তু সেইসব কথা-সাহিত্য লিখিতভাবে এসে পৌঁছয়নি তার উত্তরাধিকারীদের কাছে। কিন্তু মুখে মুখে নিশ্চয়ই এসেছিল। তার পরিচয় চিহ্নিত আছে রূপকথায়। রাজারাণী রাক্ষস-দৈত্য সওদাগর নিয়ে কত কাহিনীকে অতীত থেকে ভবিষ্যতে ছড়িয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের পুত্রস্নেহাতুর অন্তঃপুরচারিণীরা। আজ তাদের ভাষা থেকে বোঝার উপায় নেই তারা কত যুগের ওপার থেকে এসেছে। পিতামহী মাতামহীর স্নেহ-সজল কণ্ঠে তারা বারবার বদলে গেছে। আর চিরবিস্মিত শিশু সেই কাহিনী বার-বার বহুরাত্রে শুনেছে। মধুমালা, কাঞ্চনমালার কথায় কত শিশুর চোখ উজ্জ্বল হয়ে

উঠেছে। তেপান্তরের ধু ধু করা মাঠ, ব্যঙ্গমাব্যঙ্গমীর বন্ধুত্ব আর সোনার কাঠি রূপোর কাঠি কল্পনাকে মুক্তি দিয়েছে এক অনন্ত বিস্তারী পৃথিবীতে। কবে তাদের জন্ম, কে তাদের রচয়িতা স্পষ্ট করে বলা অসম্ভব। কিন্তু একথা নিশ্চিত যে তাদের গঠনে, তাদের চরিত্র সৃষ্টিতে, ঘটনাবিন্যাসে প্রাচীনতার ছাপ। কল্পনার আদিমতাই প্রাচীনতার লক্ষণ। সেই আদিম কল্পনার বিশালতা ও অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তিই প্রমাণ দেয় রূপকথাগুলির জন্ম হয়েছিল এক প্রাচীন যুগে। রূপকথার মধ্যে এমন বহু ঘটনা আছে, যা প্রাচীন সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত। যেমন প্রাণ ও দেহকে আলাদা করে ভাবা--একটি বহু প্রাচীন লৌকিক সংস্কার। রাক্ষসের প্রাণ থাকে ভোমরার ভেতরে—এই ঘটনাটিই এই প্রাচীন সংস্কারের পরিচায়ক। জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য রূপকথার একটি বড় অংগ। রূপার কাঠিতে জীবন লুপ্ত হয়, সোনার কাঠির ছোঁয়ায় আবার জীবন ফিরে আসে। ডালিমকুমারের গল্পে ডালিমকুমারের জীবন সন্ন্যাসী লুকিয়ে রাখল পুকুরে, বিরাট বোয়াল মাছের পেটে। মাছের পেটে কাঠের বাক্স। তার ভেতরে সোনার হার। সেই হারটিই তার প্রাণ। পৃথিবীর প্রাচীনতম কাহিনী বলা হয়েছে "আন্নানার" একটি লেখাকে।[১] এটি মিশরীয় ভাষায় লেখা। তার মধ্যেও দেখা যায় প্রাচীন মানুষের এই জন্ম মৃত্যুর রহস্য চিন্তা। দেহ ও আত্মার পরস্পর প্রায় নিরপেক্ষ অস্তিত্ব। কাহিনীর নায়ক 'আত্মা'কে একটি গাছে রেখে দিয়েছিল। আরো দেখা যায় একটি আত্মার বিভিন্ন জীবদেহে আশ্রয় নেবার ক্ষমতা। বাংলাদেশে প্রচলিত রূপকথার মধ্যেও সেইসব ইংগিত অজস্র। রূপকথা-গুলি শুধুই যে কল্পলোকের সামগ্রী তাই নয়, শুধুই যে শিশুচিত্ত বিনোদনেই তার জন্ম তাও নয়, তার মধ্যে বাস্তব প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত। বয়স্ক চেতনা যেন হঠাৎ এই জগতকে শিশুর চোখ দিয়ে দেখতে চেয়েছে। "পৃথিবীর সমস্ত পুরাতন জিনিষই এই নূতন রাজ্যের অধিবাসী। পৃথিবীর চির পরিচিত মূর্তিগুলিই একটু অতিরঞ্জনের রাগে রঞ্জিত হইয়া রূপকথার রাজ্যের অলিতে গলিতে ঘুরিয়া বেড়ায়।"[২]

কিন্তু একটি জীবন্ত জাতি শুধু রাজারানী রাজপুত্র রাজকন্যা নিয়েই গল্প করে না। চারপাশের মানুষের কথাও বলে। কাউকে সে ঘৃণা করে। কাউকে ব্যংগ করে। সেই সব ভাব নিয়েও গল্প গড়ে উঠেছে। গল্পের মধ্যে বিচিত্র চরিত্র এসে ভীড় করেছে। লালকমল নীলকমলের বীরত্ব ও রহস্য থেকে কাহিনীগুলি

---

১ আন্তর্জাতিক। নভেম্বর, ১৯৫৭। আমার অনূদিত **একটি প্রাচীন গল্প** দ্রষ্টব্য।

২ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ রূপকথা (বাংলা সাহিত্যের কথা, সরস্বতী লাইব্রেরী, কলকাতা, চৈত্র, ১৩৫৩, পৃঃ ৪)।

আরো কাছের। কোন এক বোকা তাঁতীর গল্প, কোন ধূর্ত নাপিতের কাহিনী। দরিদ্র ব্রাহ্মণ, বড় সংসার, ব্রাহ্মণীর গঞ্জনা। কাঠুরিয়ার পথ চলতে চলতে অতুল ঐশ্বর্য পেয়ে যাবার কাহিনী। চোরেরাও বাদ যায়নি। চোরদের গল্পও রচিত হয়েছে। এইভাবে গল্পধারা ছড়িয়ে গেছে। এই ধরনের গল্পগুলি প্রাণরসে আজো উচ্ছল। এগুলিতে অজস্র চেনামুখের ভীড়। ভালোমন্দ, সাধুঅসাধু নিরীহভণ্ডের ভীড়। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ঐতিহাসিকের পক্ষে, এই যে গল্পগুলিকে তার মূল রূপে পাওয়া সম্ভব নয়। যখন মানুষ কাগজে সাহিত্য সৃষ্টি আরম্ভ করেছে তখনও গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে এই গল্প চলেছে। এই ধরনের গল্পই পূর্ব-বঙ্গ গীতিকার কাঠামো। এই মহুয়া, মলুয়া, ভেলুয়া, কাজলরেখা, কমলার কাহিনী এলো কোথা থেকে? দেশের মাটিতেই কাহিনীগুলি ছড়িয়ে ছিল। এক মাটির কবি ছন্দে বেঁধে রাখলেন। এই কাহিনীগুলির মধ্যে এক অভিনবত্ব আছে। প্রায় সব কাহিনীর কথাবস্তু প্রেম, প্রেমের বেদনা, দুটি একটি কাহিনীতে অতি-প্রত্যাশিত মিলন। এই কাহিনীগুলি কোন পুরাণ, কোন ধর্মশাস্ত্রের থেকে নেওয়া নয়। হয়ত তাই এক উদ্দাম যৌবনরসে দীপ্ত এর চরিত্রগুলি। রূপকথার যে ধারা তার চেয়ে অনেক পরে এদের সৃষ্টি। রূপকথা মানুষের স্বপ্নচারণার ক্ষেত্র। কিন্তু এইসব গল্পে, যদিও কবিতায় লেখা, কারণ গদ্য সৃষ্টি হয়নি, মানুষ অনেক বেশী সাংসারিক। তাই চরিত্রগুলি বেশী আধুনিক। অলৌকিকতা, দৈবীমহিমা, এদের নেই। এমন কি পরলোকের সুখের আশায় সান্ত্বনা নেই। এক নিগূঢ় মর্তপ্রীতি কাহিনীগুলিকে এ যুগের মনের অতি কাছে এনেছে। কামনাগুলি সুস্থ ও প্রবল, আসক্তি তীব্র এবং প্রচণ্ড, বেদনা বড় নিদারুণ ও দার্শনিকবোধে নিষ্পিষ্ট নয়—অর্থাৎ মানবিকতার স্পন্দন এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রকট।

লিখিত সাহিত্যে অন্য একধরনের গল্প পাওয়া গেল। এক, রামায়ণ-মহাভারত ও চৈতন্য-জীবনীগুলিতে, দুই, আখ্যানকাব্যে বা মঙ্গলকাব্যে। রামায়ণ-মহাভারত সত্যই গল্পসাগর। বহু লৌকিক কথাও তার মধ্যে আস্তে আস্তে স্থান করে নিয়েছিল। দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকিতে পরিণতি, কিংবা দাতা কর্ণের কাহিনী। চৈতন্যজীবনীর মধ্যেও কাহিনীরস নানা পরিমাণে ছড়িয়ে আছে। বলাই বাহুল্য লেখকেরা কেউই সচেতনভাবে ছোট ছোট গল্প রচনা করতে চাননি। কিন্তু এগুলির মধ্যে জাতির ছোট ছোট কাহিনীর প্রতি স্পৃহা সূচিত হচ্ছে।

গল্প বা উপন্যাসের একটি মূল অবলম্বন চরিত্রসৃষ্টি। সেই চরিত্রসৃষ্টির প্রবণতা বিশেষভাবে দেখা গেছে মঙ্গলকাব্যে। সে চরিত্র সাধারণ মানুষের। মুরারি শীল, ভাঁড়ু দত্ত, বেহুলা, চন্দ্রধর, ফুল্লরা, লহনা,—তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কাজেই একথা স্পষ্ট যে ইংরেজপূর্ব বাংলা সাহিত্যের মধ্যেও বাঙালীমানস কাহিনী সন্ধান করেছে। সে কাহিনীর রস পিপাসার্ত। কারণ তাই চিরন্তন মানুষের ধর্ম।

১

বাংলাদেশে ইংরেজের রাজনৈতিক অধিকার অষ্টাদশ শতকের মধ্য থেকেই। কিন্তু তার সাংস্কৃতিক দিগ্বিজয় শুরু হল অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে। বাংলাদেশে এই দিগ্বিজয়ের প্রধান উপকরণ হল ছাপাখানা। ছাপাখানা বাঙালীমানস পরিবর্তনের প্রধানতম উপকরণ। জ্ঞানকে শুধুই যে সর্বজন সহজলভ্য করে তোলা হল তাই নয়, বাঙালী জনসমাজ নানা বিচিত্র পথে আত্মপ্রকাশেও উৎসুক হল। মুদ্রাযন্ত্র বাঙালীর নবজাগরণের প্রধান সহায়।

এই আত্মপ্রকাশের তাগিদে বেরিয়েছিল নানা পত্রিকা। কোন প্রতিষ্ঠান বা ধর্মসংঘকে আশ্রয় করে প্রথম দিকের পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হতে লাগল। খৃষ্ট, হিন্দু ও ব্রাহ্ম এই তিন ধর্ম নিয়ে বাদানুবাদ গত যুগের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই তিন ধর্মের পথে ও আশ্রয়ে নানা পত্রিকার জন্ম হল। পরে জন্ম হল সাহিত্য পত্রের। সংস্কৃতি পত্রের।

মুদ্রাযন্ত্র ত্বরান্বিত করল পত্রিকার জন্ম। আর পত্রিকাগুলি ত্বরান্বিত করল বাংলা গদ্যের বিকাশ। জীবনের এই নানা ব্যবহারিক কাজে অতি দ্রুত গদ্য হয়ে উঠল ভাব প্রকাশের বাহন। তর্ক যুক্তির প্রধান অস্ত্র। প্রাত্যহিকতার দূত। কাজেই মুদ্রাযন্ত্র, পত্রিকা ও গদ্য এই তিনে মিলে বাঙালীর চিত্তলোকের উন্মীলনের সহায়তা করল। আর পথ প্রস্তুত করল নবীন সাহিত্য সৃষ্টির।

উপন্যাসের জন্ম হল। মানুষের বাস্তব জীবনের কথা। এ এক নতুন স্বাদ। রূপকথায় এ স্বাদ নেই। প্রাচীন গল্প গাথায় ঠিক এর পরিচয় নেই। চেনাজানা লোকের ঘরের কথা, মানুষের হৃদয়ের প্রবল অনুভূতিগুলির প্রকাশের নূতন রীতিকে মানুষ বিস্ময়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। আর সেই সঙ্গে কামনা করেছিল প্রত্যেক সংখ্যায় যদি "ক্রমশ"র নির্দয় পরিসমাপ্তি না থাকে। যদি বহুকাল অপেক্ষা করে না থাকতে হয়। মনোবাসনা পূর্ণ হল। জন্ম নিল ছোট ছোট উপন্যাস। ইংরাজিতে যার নাম 'নভেলা'। আর একদিকে মানুষের গল্পতৃষ্ণা বাড়ছে। তারই সুযোগে এই নূতনরীতি ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়ে উঠল। সেই প্রকাশ হল প্রধানতঃ পত্রিকাগুলিকে অবলম্বন করে। মানুষের এই গল্পতৃষ্ণা মেটাবার জন্য পত্রিকাগুলি নানাভাবে সুশোভিত হত। তাদের পরিচয় গ্রহণ করা যাক।

প্রথম স্তর ॥ টুকরো টুকরো কাহিনী। এদের নাম দেওয়া যেতে পারে চূর্ণক। একটি ছোট ঘটনা, কিংবা অতি ছোট কথা হঠাৎ জ্বলে ওঠে। তারপর সঙ্গে সঙ্গেই আবার নিভে যায়। আগাগোড়া নিটোল এবং পূর্বকল্পিত। যেন শেষটা আগে ভেবে প্রথমটা তৈরি করা হয়েছে। কিছু উদাহরণ গ্রহণ করি ঃ

সমাচার দর্পণ১

১। অতি নিবিড় অন্ধকার রাত্রিতে এক ব্যক্তি অন্ধ কলসি ঘাড়ে করত মসাল লইয়া যাইতেছিল। পরে এক ব্যক্তি দৌড়িতেই তাহার নিকটস্থ হইয়া মসাল দেখিয়া আশ্চর্যবোধে কহিল যে হে অন্ধ মসালেতে তোমার কি উপকার হইতেছে তোমার নিকটে দিবা রাত্রি তুল্য।

অন্ধ কহিল যে আমি আপনার নিমিত্ত মসাল ধরি নাই কিন্তু তোমার মত পাগল ব্যক্তিরা আমাকে ধাক্কা মারিয়া কলসিটা না ভাঙে—এ নিমিত্ত।

২। একজন সেনাপতি অতি তুমুল যুদ্ধ সময়ে আপনার মুসাহেবের নিকটে একটিপ নস্য প্রার্থনা করাতে মুসাহেব যে ক্ষণে তাঁহাকে নাসদানি দিলেন সেই ক্ষণেই একটা গোলার বেগেতে তিনি কোথায় উড়িয়া গেলেন তাহাতে সেনাপতি কিছুমাত্র বিকৃত না হইয়া অন্য দিগে ফিরিয়া আর একজন মুসাহেবকে কহিলেন যে আপনার এক টিপ নস্য আমাকে দিতে হইবে। নাসদানিটা ইঁহার সঙ্গে গিয়াছে।

বিবিধার্থ সংগ্রহ২

৩। কেহ আপন সখাকে প্রাতঃকালে নিদ্রিত দেখিয়া কহিলেনঃ বন্ধো তুমি কি নিদ্রিত আছ। শয্যাস্থ ব্যক্তি কহিলেন 'কেন'। সখা প্রার্থনা করিলেন, আমার একটা টাকার প্রয়োজন হইয়াছে, যদি তুমি জাগ্রত থাক তবে উঠিয়া আমায় তাহা কর্জ দিলে ভাল হয়। সে কহিল 'তবে আমি ঘুমুচ্ছি।'

৪। জনৈক এক চক্ষুহীন আপন অবশিষ্ট নয়নের প্রশংসায় কহিতেছিল যে আমি ঐ নয়নদ্বয় দ্বারা অনেক দ্বিনেত্র ব্যক্তি হইতেও অধিক দেখিতে পাই। তৎসভাস্থ কোন দ্বিনেত্র বলগর্বিত এতদ বাক্যে অমর্ষান্বিত হইয়া কহিলেন, 'যদি তুমি একথা সপ্রমাণ করিতে পার তবে আমি তোমাকে শত-মুদ্রা দিব।' অন্ধ এই পণে স্বীকৃত হইয়া কহিলেন, 'আমার মুখের উপর তুমি কি দেখিতেছ। দ্বিনেত্র বলপূর্বক ব্যঙ্গ করত কহিল, 'তোমার এক-চক্ষু।' অন্ধ কহিলেন, 'ভালই, তবে আমি অধিক দেখিয়াছি। কারণ তোমার দুই নয়ন আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, অতএব পণের একশত টাকা আমাকে দেও।'

১। ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৩২, পৃঃ ৪৬১

যে সংখ্যা থেকে কাহিনীগুলি উদ্ধৃত হল সেখানে আরো দুইটি কাহিনী আছে। ৬ই অক্টোবর ১৮৩২র দর্পণে ছ' সাতটি কাহিনী আছে। পৃঃ ৪৭৪

২। ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, শকাব্দ ১৭৭৩ কার্তিক।

বিবিধার্থ সংগ্রহের এই ধরনের ছোট ছোট কাহিনী বেরুত। যেমন **এক হাজার টাকার পা, ভৌত বিচার।** প্রায় প্রত্যেক মাসে এ ধরনের কাহিনী থাকত।

উপদেশক পত্রিকা১

৫। কোন দিন এক রাজা অশ্বে চড়িয়া আপনার এক অশ্বারূঢ় দাসকে সঙ্গে লইয়া উদ্যানে বেড়াইতে গেলে দেখিলেন, কিঞ্চিৎ দূরে দুই মনুষ্য তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া ঝোপের মধ্যে লুকাইতে যায়। তাহাতে তিনি আপন দাসকে কহিলেন তুমি শীঘ্র গিয়া ঐ লোকদিগকে ধরিয়া আমার কাছে আন। তাহাতে সে গিয়া অবিলম্বে দুইজন ভিক্ষুককে আনিলে রাজা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কেন লুকাইতে গিয়াছিলে? তাহারা উত্তর করিল, আমরা আপনার সাক্ষাতে ভীত হইয়াছিলাম। এইরূপ উত্তর শ্রবণে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া চাবুকে ভয়ানক রূপে প্রহার করিয়া কহিলেন, আমাকে ভয় করা তোমাদের অনুচিত, প্রেম করা উচিত।

(প্রেম করাইবার বিপরীত উপায়)

৬। রাজকর আদায়কারি কোন ব্যক্তির গৃহে একদিন দশ সহস্র টাকা সঞ্চিত হইলে হঠাৎ তাঁহাকে অল্পদিনের জন্যে স্থানান্তরে যাইতে হইল। অতএব তিনি ঐ সকল মুদ্রা আপন ভার্য্যার নিকটে সমর্পণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। পরদিন সন্ধ্যাকালে আত্যন্দিক ঝড়বৃষ্টি হওয়াতে একজন পথিক আসিয়া সেই বাটিতে উপস্থিত হইয়া রাত্রিযাপন-এর অনুমতি চাহিলেন। গৃহিণীর সহিত একজন দাসী মাত্র ছিল, তথাপি তিনি ঐ পথিকের প্রার্থনাতে সম্মতা হইয়া তাঁহাকে অতিথি করিলেন। সেই পথিক একজন সেনাপতি ছিলেন। অর্ধরাত সময়ে কোন ২ লোক আসিয়া বাটির দ্বারে আঘাত করিয়া গৃহিণীর সহিত সাক্ষাত করিতে চাহিল। তাহাতে সেই স্ত্রী দ্বারের কাছে গেলে তাঁহারা তাঁহাকে কহিল, তোমার স্বামী তোমার কাছে যে দশসহস্র টাকা রাখিয়া গিয়াছে, সেই টাকা আমরা চাহি; শীঘ্র দ্বার

১। **উপদেশক পত্রিকাঃ** একই সঙ্গে ইংরেজী, বাংলা দুইই প্রকাশিত হত। **The Instructer : Christian periodical in Bengali,** এখানে প্রকাশিত ছোট ছোট কাহিনীর তালিকাঃ

১৮৫২ ঃ	ফেব্রুয়ারী ঃ	**দয়ালু বালক**	পৃঃ ২৫— ৩৪
	ঃ জুন ঃ	**এক রাখাল ও দুই মেষ** — লালচাঁদ নাথ	পৃঃ ১২১—১৩০
	ঃ সেপ্টেম্বরঃ	**প্রেম করাইবার বিপরীত উপায়**	পৃঃ ২১৪
		আতিথ্য ব্যবহারের ফল	পৃঃ ২১৪— ১৫
	ঃ ডিসেম্বর ঃ	**শত্রুর নিন্দা নিষ্ফল**	পৃঃ ২৮১— ৮২
		বড় পাগল	পৃঃ ২৮২— ৮৩
		দুই ছবি	পৃঃ ২৮৩
১৮৫৩ ঃ		**দরিদ্রের প্রতি দয়া**	পৃঃ ১৮
		আশ্চর্য প্রাণরক্ষা	পৃঃ ৪৭
		বনিয়ন সাহেবের কারারক্ষক	পৃঃ ৪৮

খুলিয়া দাও, নতুবা আমরা কপাট ভাঙিয়া আপনার ভিতরে গিয়া টাকা লইয়া তোমাকে নষ্ট করিব এবং ঘরে অগ্নি লাগাইব। ঐ স্ত্রী তাহাদিগকে কহিলেন, ভাল, আমি চাবি আনিয়া দ্বার খুলিয়া দি। ইহা বলিয়া তিনি শীঘ্র ঐ পথিককে জাগাইয়া সকলি বুঝাইয়া দিলেন। পথিক তাঁহাকে কহিলেন, এখন আমার পরামর্শ শুন। তুমি দ্বার খুলিয়া সেই লোকদিগকে দালানে বসিতে বলিয়া টাকা তাহাদের কাছে লইয়া যাও, কিন্তু টাকার থলি খুলিয়া দালানে আসিবার সময় ভূমিতে পড়িতে দেও, পরে যাহা কর্তব্য তাহা আমি করিব। ঐ স্ত্রী তাঁহার শিক্ষানুসারে এই সকল কর্ম করিলেন, বিশেষতঃ টাকার থলি হাতে করিয়া যখন দালানে প্রবেশ করিলেন, তখন অতিশয় ভীত লোকের ন্যায় কম্পবান হইয়া থলিকে ভূমিতে পড়িতে দিলেন। তাহাতে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাসকল চারিদিকে পতিত হইলে ঐ চারিজন চোর অতি ব্যগ্রতা-পূর্বক হেঁট হইয়া মুদ্রা কুড়াইতে ২ পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিল। তাহাতে ঐ পথিক উপস্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ দুইজনের মস্তকে দুইটা পিস্তল ছুড়িলেন, পরে খড়্গ দ্বারা তৃতীয়জনকে এমত ক্ষতবিক্ষত করিলেন যে সে শীঘ্র প্রাণত্যাগ করিল। চতুর্থ ব্যক্তি পলাইয়া রক্ষা পাইল। ইতিমধ্যে ঐ স্ত্রী ভয়েতে মূর্ছাপন্না হইয়াছিলেন। পরে যখন পুনরায় সচেতন হইলেন, তখন সেই সাহেবকে ঐ ধনের অর্ধেক দিতে অতি যত্নবান হইলেন। কিন্তু তিনি তাহা অস্বীকার করিয়া কহিলেন, আপনি আমাকে অতিথি করাতে যে ধার দিয়াছিলেন তাহা পরিশোধ করিলাম।

(আতিথ্য ব্যবহারের ফল)

৭। কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আপন পালিত এক পাগলকে একটি যষ্টি দিয়া কহিয়াছিলেন, যদবধি আপনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এমন আর একজন পাগলের সাক্ষাৎ না পাও তদবধি ইহা আপন হস্তে রাখ, কিন্তু তদ্রূপ একজন পাইলে তাহাকে অর্পণ করিও। ইহার দুই কিম্বা তিন বৎসর পরে যৎকালে উক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি পীড়িত হইয়া মরণাপন্নাবস্থাতে ছিলেন, তৎকালে কথিত পাগল তাঁহাকে দেখিতে গেলে তিনি তাহাকে কহিলেন, এক্ষনে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি। ইহাতে আপনি কোথায় যাইবেন? এতদ্রূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে, আমি পরলোক যাইতেছি, প্রভুর মুখে এমন শুনিয়া পাগল বলিল, তবে প্রত্যাগমন করিবেন কবে: কি একমাস পরে: তাহাতে না, তাহা নয়, তিনি ইহা কহিলে সে বলিল, তবে কি এক বৎসরে ফিরিয়া আসিবেন: তিনি বলিলেন, না, তাহাও নয়। তখন সে কহিল, তবে ফিরিয়া আসিবেন কখন: তাহা আজ্ঞা করুন। তাহাতে তিনি কহিলেন, না, না, আমি আর কখনই সে স্থান হইতে ফিরিয়া আসিতে পারিব না। ইহাতে পাগল জিজ্ঞাসা করিল, যে এমন যদি হয়, তবে চিরকাল যাহাতে সে স্থানে আপনি সুখে থাকিতে পারিতেন, এমন প্রয়োজনীয় সকল বিষয় কি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন: তিনি বলিলেন, না, তাহা আমি প্রস্তুত করি নাই এবং তদ্বিষয়ে কখন মনোযোগ করি নাই। পাগল এসব কথা শুনিয়া বলিল বটে: তবে আপনকার দত্ত এ লাটি আপনিই গ্রহণ করুন, কেন না আমি পাগল

হইলেও মহাশয়ের মত পাগল নহি, আপনি যে আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পাগল তাহা এক্ষনে জানিলাম।

(বড় পাগল)

বঙ্গমিহির[১]

৮। জনৈকা ভদ্রমহিলা দূরদেশে যাত্রাকালীন তাঁহার তিনটি পুত্র হইতে মাতৃভক্তি প্রদর্শক উপঢৌকন পাইয়াছিলেন। প্রথম পুত্র এক অতি সুন্দর শ্বেত প্রস্তর ফলকে তাঁহার নাম খোদিত করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিলেন, দ্বিতীয়টি অতি পরিপাটি একছড়া কুসুম হার দিলেন, অবশেষে তৃতীয় পুত্রটি মাতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, মাতঃ আমার প্রস্তর ফলক নাই এবং পুষ্পদামও নাই যে আপনাকে অর্পণ করি কিন্তু আমার অন্তঃ-করণে আপনার নাম খোদিত রহিয়াছে।

(উৎকৃষ্ট উপঢৌকন)

রহস্যসন্দর্ভ[২]

৯। কোন সময়ে একজন প্রধান পাদরী নিজ ধর্মাগারের কার্যবি সমাপনান্তে বায়ুসেবনার্থ নির্গত হইয়া এক খনির দ্বার সম্মুখে গমনপূর্বক দেখিলেন যে, একদল খনি-খোদক তথায় বসিয়া আছে ও তাহারদিগের সম্মুখে এক ধাতুময় পাত্র পড়িয়া রহিয়াছে। তদ্দর্শনে পাদরীবর তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাহারা বসিয়া আছে কেন? তৎশ্রবণে খনিখোদকেরা কহিল যে, তাহারা মিথ্যা বলিতেছে। পাদরী তাহাদিগকে সকল কথা ব্যক্ত করিতে অনুরোধ করাতে তাহাকে বলিল, আমরা এই পাত্র পাইয়া স্থির করিয়াছি যে ব্যক্তি সকলের অপেক্ষা মিথ্যা বলিতে পারিবে সেই পাত্র পাইবে। পাদরীবর তাহাতে দুঃখিত হইয়া মিথ্যা বলার অধর্ম জ্ঞাপনার্থ একটি বক্তৃতা করিয়া কহিলেন, "আমি যাবজ্জীবনে একটিও মিথ্যা বলি নাই।" তৎশ্রবণে খনিখোদকেরা একজন কহিয়া উঠিল, 'উঁহাকে পাত্রটি দেহ উঁহাকে পাত্রটি দেহ।'

পঞ্চানন্দ[৩]

১০। বাবু আফিস যাইবার জন্য সেজেগুজে বাহির হইতেছে, এমন সময়ে দুইজন ইয়ার মদের বোতল সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত। বাবুকে অনুরোধ,

---

১। ১২৮০ ঃ জ্যৈষ্ঠ **উৎকৃষ্ট উপঢৌকন** পৃঃ ৭৮— ৭৯
মাতৃভক্তি পৃঃ ৭৮— ৭৯
আষাঢ় **শোকার্ত্ত সৈনিক পুরুষ** পৃঃ ১১৯
শ্রাবণ **স্বামীভক্তি** পৃঃ ১৫৯
ফাল্গুন **কুসুমকুমারী** পৃঃ ৪২৩—৪৩৩

২। ১২৮০। ১ম পর্ব। ২য় খণ্ড। **কৌতুককণা**। পৃঃ ৩২

৩। ১২৮৬, ১৬ই মাঘ, **উপস্থিত বুদ্ধি**। পৃঃ ৫
এই পৃষ্ঠাতেই আরো কয়েকটি ছোট ছোট চুর্ণক ছিল, **হিসাবী লোক**, **সুক্ষ্ম বিচার, যেটা পছন্দ হয়**।

একটু বসিয়া এক গেলাস খাইয়া আফিসে যান, এখনও তত বেলা হয়নি, তাড়াতাড়ি কেন ?

বাবু। না ভাই, এখন খেয়ে গেলে মুখ দে গন্ধ বেরোবে, সকলে টের পাবে।

ইয়ার। হ্যাঁ, টেরপাবে, না ঘোড়ার ডিম হবে। নেহাত টের পায় বলবে যে আজকার নয়, কাল রাত্তিরে খেয়েছিলে তারই গন্ধ। তর্ক অকাট্য। বাবু নিরুত্তর।

অনেকগুলি ছোট ছোট কাহিনীর উদাহরণ দেওয়া হল। গত শতাব্দীর গোড়ায় ও মধ্যভাগ পর্যন্ত এগুলির চাহিদা খুবই বেড়েছিল। কাহিনীগুলি পূর্ণাঙ্গ নয়। কোনটি নির্মম পরিহাসদীপ্ত, যেমন সেনাপতির গল্পটি। আবার তীব্র ব্যঙ্গ ঝলসে উঠেছে কোন কোন কাহিনীতে, যেমন সমাচার দর্পণের প্রথম কাহিনীতে। রহস্য সন্দর্ভে যে 'যাবজ্জীবন সত্যভাষী' পাদ্রীসাহেবের গল্প প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যেও এই ব্যঙ্গ।১

বলাই বাহুল্য, এই কাহিনীগুলি ব্যক্তিবিশেষের রচিত নয়। চিরকালই সবদেশে এই ধরনের কাহিনী প্রচলিত। মুখে মুখে সঞ্চরমান। এ ধরনের লেখার উপমান স্ফুলিঙ্গ। যার পাখায় ক্ষণকালের ছন্দ; উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে যাবার মধ্যেই তার আনন্দ। ক্ষণকালের ছন্দকে এই লেখাগুলি ধরেছিল। এরই মধ্যে বাঙালীর গল্প-কুতূহল কিছুটা তৃপ্তিলাভ করেছিল সন্দেহ নেই। এই ধারা প্রাচীনকালেও ছিল। আধুনিক কালেও বয়ে চলেছে। কিন্তু এর মধ্যে ছোট ছোট কাহিনী রচনা করার ইঙ্গিত ছিল। ছোটগল্পের রূপ হঠাৎ একদিনে জন্মলাভ করেনি। গল্প-রচনার যে সকল ধারা দেশে প্রচলিত ছিল সবকটির থেকেই একটি একটি করে শাখা-ধারা এসে ছোটগল্পের জন্মকে ত্বরান্বিত করেছে। এই চূর্ণকগুলিও ছোটগল্পের জন্মভূমির একটি স্তর।

২

ছোটগল্পের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে আর এক ধরনের কাহিনী পাওয়া যায়। এদের নাম দেওয়া যায় 'আখ্যানক'। হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্র বা আরব্য রজনীতে যেমন কাহিনী পাওয়া যায়—তাকেই আখ্যানক বলা চলতে পারে। ঊনবিংশ শতকে বাংলা-

১। সৈয়দ আলীর 'পঞ্চতন্ত্র' গ্রন্থে এই গল্পেরই আধুনিক সংস্করণ দেখা যায়।

দেশে নানা ধরনের আখ্যান, উপাখ্যান, নীতিসন্দর্ভ দেশ ছেয়ে ফেলেছিল। এদের চারভাগে ভাগ করা চলে। (১) হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র জাতীয় সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে অনূদিত গল্প (২) আরব্য উপন্যাস জাতীয় রোমান্টিক গল্প (৩) খৃষ্টান মিশনারী-দের দ্বারা লিখিত বা সংকলিত নীতিগল্প (৪) মানুষের জীবন নিয়ে রচিত, অবাস্তব পটভূমিবর্জিত, গল্প।

(১) আখ্যানকের আদি উৎস ভারতীয় গল্পলোক। শুধুই পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ কিংবা বৌদ্ধজাতক নয়, গুণাঢ্য-এর বৃহৎ কথা, ক্ষেমেন্দ্র-এর বৃহৎ কথামঞ্জরী, সোমদেবের কথাসরিৎসাগর নিয়ে ভারতবর্ষের বিশাল গল্প সাম্রাজ্য।[১] এখান থেকে গল্পগুলি ছড়িয়ে গেছে দেশে দেশে।[২] কখন বিদেশী পরিব্রাজক নিয়ে গেছে এই উন্মুক্ত রত্নকোষ, কখনও ঐশ্বর্যসন্ধানী ভিন্নদেশী সওদাগরেরা ভারতবর্ষের পণ্য-সম্ভারের সঙ্গে নিয়ে গেছে এই রাশি রাশি সোনার ধানের মত গল্প। তারপর অন্য দেশে অন্য রূপে সে দেখা দিয়েছে। কেতকীর বেড়াঘেরা দশার্নগ্রামে বৃদ্ধরা যে উদয়নবাসবদত্তার গল্প বলতেন, রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছেন, সে গল্প গেল কোথায়। গুণাঢ্যের বৃহৎকথা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিচিত্র রসের আয়োজন এই গল্পলোকে। কখনও দিগ্বিজয়ী রাজার গল্প। কখনও অতি সাধারণ মানুষের গল্প। কখনও পশুপাখীর। কখনও বিক্রমাদিত্যের। তাঁর আশ্চর্য সিংহাসন ও বত্রিশটি শাপভ্রষ্ট নর্ত্তকীর মূর্তিমতী হয়ে থাকার কাহিনী। কখনও বেতালের গল্পের ভৌতিক পরিবেশ। কখনও শুকসপ্ততির সহজ সরল গল্পরস।

বহু বৎসরের বহু সাধনায় এই গল্পমালঞ্চ ভরে উঠেছে। কত তপোবনে, কত আশ্রমে, কত রাজসভায় মুনি-ঋষিরা গল্প বলেছেন। শুশ্রূষু সন্ন্যাসী, গৃহস্থ কিংবা রাজরাজন্য সেই গল্পের স্রোত থামতে দেন নি। গল্পের পর গল্প, আবার গল্প, যেন গল্পশৃঙ্খল। আজকের রামায়ণ-মহাভারত সেই গল্পশৃঙ্খল। কত সঙ্ঘা-রামে, কত বনপথে বৌদ্ধ শ্রমণরা গল্প শুনেছেন। স্বয়ং বুদ্ধদেব কত গল্প বলেছেন। জাতকের অজস্র গল্প সংগৃহীত হয়েছে। দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বৌদ্ধদের মত জৈনরাও গল্প ভালবাসতেন। হেমচন্দ্রের 'পরিশিষ্ট পর্বণ', 'কথাকোশ' প্রভৃতি এ জাতীয় নানা কাহিনী ছিল। এই কাহিনীপ্রবাহ প্রাদেশিক সাহিত্যে ধীরে ধীরে

১। Dasgupta, S.N. & De, S. K. : A History of Sanskrit Literature, Calcutta 1947, pp 420-28. Macdonell, A.A. A Hist. of Sanskrit Literature, London, 1899, pp. 368-384

২। World's thousand Best Short Stories, Vol 1. (Ed. by J. A. Hammerton, Introductory Essay, London. p. 15.

প্রবেশ করেছিল। বিদ্যাপতির 'পুরুষ-পরীক্ষা' তার উদাহরণ। জৈনদের হাতে ভোজরাজার নানা গল্প 'প্রবন্ধ চিন্তামণি' ও 'প্রবন্ধকোশ' এই দুই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

ভারতবর্ষ গল্পের আদিভূমি। বিশ্বসংস্কৃতিতে তার বহু দানের সঙ্গে গল্পের নাম চিরস্মরণীয়। কিন্তু বাংলা গল্পের সঙ্গে তার যোগ কোথায়। সম্পর্ক কি। নবীন ছোটগল্পের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ আত্মীয়তা প্রথম দৃষ্টিতে খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই গল্পগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, তা প্রাদেশিক সাহিত্যের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে অজস্র গল্প ছিল। আর ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঝাঁকে ঝাঁকে বিদেশী পাখির মত এই গল্পগুলি উড়ে গেল। এই গল্পগুলিই তখনকার বাঙালীর গল্পতৃষ্ণা মিটিয়েছে। এবং এরাই ছোটগল্পের উৎস সন্ধানে আরেকটি স্তর। ওদের মধ্যেও নবীন গল্পের 'রূপ' যে অনেক পরিমাণে লুকিয়েছিল তাতে সন্দেহ করা চলে না। পরবর্তী গল্পের ওপর 'আখ্যানক'-এর প্রভাব কিছু কম নয়।

এই আখ্যানকের প্রবাহ শুরু হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকেই। কেরী ইতিহাসমালা (১৮১২) গ্রন্থে ভারতবর্ষের নানা গল্প সংগ্রহ করেন। ১৮০১ খৃঃ অব্দে হিতোপদেশ অনুবাদ করেন গোলোকনাথ, ১৮১২ খৃঃ অব্দে মৃত্যুঞ্জয় এই গ্রন্থটির পুনরায় অনুবাদ করনে। লং-এর ক্যাটালগ থেকে জানা যায় যে এই বইগুলি অন্তত ২০০,০০০ করে ছাপা হয়েছিল। ১৮০৮ খৃঃ অব্দে ছাপা হয় 'বত্রিশ সিংহাসন' এবং হরপ্রসাদ রায় অনূদিত 'পুরুষ-পরীক্ষা'। তারপর আরো সংস্কৃত নীতিকথা ইতস্ততভাবে প্রকাশিত হয়। ১৮৪৫ খৃঃ অব্দে বিদ্যাসাগর রচিত 'বেতালপঞ্চবিংশতি' আখ্যানকের এক দিক খুলে দিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁর বেতালের গল্পের মধ্যে যেমন সুদূর অতীতের জীবনবেদনার আনন্দ ও তৃপ্তিকর গল্পের সন্ধান দিলেন, তেমনি তাঁর বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরী ইত্যাদি শিশুপাঠ্য রচনায়, এমনকি বর্ণ পরিচয়ের (দ্বিতীয় ভাগে) বেণীর গল্পের নীতির দিকে নজর দিলেন। কিন্তু গল্পের প্লট রচনা, চরিত্র রচনার সূচনা বিদ্যাসাগরের হাতে বেশ স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করা চলে।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের 'বত্রিশ সিংহাসন' ও বিদ্যাসাগরের 'বেতালপঞ্চবিংশতি' —এই দু'খানি গ্রন্থের মধ্যে বাঙালী সর্বপ্রথম পুরোপুরি কাহিনীর রস পেল। দুটি গ্রন্থই বহু গল্পের সমষ্টি কিন্তু একটিমাত্র মূলসূত্রের দ্বারা বিচ্ছিন্ন কাহিনীগুলি বেঁধে রাখা হয়েছে। এই ধরনের কাহিনী দেশে প্রচলিত ছিল। কেরীর ইতিহাসমালা এবং বৃটিশ মিউজিয়ামে প্রাপ্ত বিক্রমাদিত্যের একটি ছোট কাহিনী তারই ইঙ্গিত দেয়। বত্রিশসিংহাসনের গল্পগুলির বৈচিত্র্য কম। কারণ সব গল্পেই বিক্রমাদিত্যের মহত্ত্ব বা বীরত্ব বা মহানুভবতা প্রদর্শনেই ব্যস্ত। কিন্তু বেতাল-

পঞ্চবিংশতির কাহিনীগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য অনেক বেশী। এখানে বিভিন্ন রসের সমাবেশ ঘটেছে। চরিত্রচিত্রশালায় রাজন্যবর্গই শুধু স্থান পান নি, দরিদ্র ব্রাহ্মণ, চোর, সাধারণ গৃহস্থ, বারবনিতা কিংবা শয্যাবিলাসী ও খাদ্যবিলাসীর মত বিচিত্র চরিত্রই আসর জুড়ে বসেছেন।

মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' একটি অসাধারণ গ্রন্থ। এর মধ্যে তিনি বহু আখ্যান সংগ্রহ করেছেন। তার মধ্যে কালিদাস সম্পর্কে প্রচলিত গল্পগুলি বিশেষ আকর্ষণীয়। কালিদাস সম্পর্কিত নানা কিম্বদন্তীই ভারতবর্ষের নানাস্থানে প্রচলিত আছে। তার অনেকগুলি গল্প আবার অন্য নামে অন্যত্র প্রচলিত। মৃত্যুঞ্জয় সেইসকল আখ্যান সংগ্রহ করে উৎকৃষ্ট রচনা করেছেন। ছোটগল্পের জন্মের পূর্বে এই আখ্যানগুলিই ছোটগল্পের ভূমিকাকে প্রস্তুত করেছে।

(২) সংস্কৃত গল্পলোকের রত্নোজ্জ্বল ঐশ্বর্য যেমন আমাদের মনকে মুগ্ধ করেছিল, তেমনই আরেক রঙীন স্বপ্নলোক বাঙালীকে আকর্ষণ করেছিল। তা হল পারস্যের গল্পকোষ। আরব্য রজনীর ইন্দ্রিয়াতুর কাহিনীগুলি সারা পৃথিবীকেও গুণ করেছে। সুলতান শাহ্‌রিয়র্ নিজের স্ত্রীর চরিত্রহীনতায় এত বেদনার্ত ও হিংস্র হয়েছিলেন যে সারা পারশ্যের তরুণীদের শুধু একটি রজনীর জন্য রাণী করে পরদিন সকালে হত্যা করতেন। কিন্তু একটি নারীর গল্প-কলার কাছে তিনি হার মানলেন। সেই নারী একটি রজনীর আনন্দকে বিস্তারিত করে দিল সহস্র রজনীতে। তার অনিঃশেষিত গল্পধারা যেন মানুষের অনিঃশেষিত জীবনপ্রবাহের সুখদুঃখ কাহিনীরই প্রতীক। কখনও খেয়ালী বাদশাহ, হারেমের অপরূপা নর্তকী, কখনও মায়াবী জিন। কখনও বসরাই গোলাবের গন্ধ, কখনও রঙীন মদের ফেনিল উচ্ছলতা, কখনও রক্তিম ফলের মত নিটোল আনন্দমুহূর্ত। দূরবনগন্ধবহের মত এই রহস্যময় সহস্ররজনীর আলো-আঁধার। মায়াকাজলের যাদু আর জিনের অসম্ভব শক্তির মধ্যে মানুষের বহু অচরিতার্থ বাসনা চরিতার্থতা পেয়েছিল। 'আরব্যরজনী' শিশুপাঠ্য কাহিনী নয়, শুধু উপভোগ্য রূপকথা নয়, এ হল মানুষের অপূর্ণ কামনা, অতৃপ্ত বাসনা, অস্ফুট আকাঙ্ক্ষার বিচরণের বিশাল জগৎ, কল্পনার গরুড় পাখায় স্বর্গ-চারণের অবাধ আসর, সম্ভবের দিগন্ত ছাড়িয়ে অসম্ভবের সম্মোহিত আকাশের বিস্তার। এছাড়া এসেছে আলাদীনের মায়াদীপের কাহিনী। আলিবাবা আর চল্লিশ চোর। সিন্ধাবাদ নাবিক। হরুন-অল-রশিদের কাহিনী। লয়লা-মজনু। শিরিন-ফরহাদ।

সংস্কৃত আখ্যানকের মতই এই পারশ্য আখ্যানকের সঙ্গেও বাঙালীর পরিচয় হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকদের হাতে। চণ্ডীচরণ মুন্সী অনূদিত 'তোতা ইতিহাস' ফারসী থেকে বাংলা গল্পের জগতে এক নতুন সংকেত নিয়ে আসে।

তোতা ইতিহাসের কাহিনীগুলিও বত্রিশ সিংহাসন বা বেতাল পঞ্চবিংশতির মতই বিচ্ছিন্ন কিন্তু ঐসব গ্রন্থের মতই একটি সূত্রে গ্রথিত। খোজেস্তা সুন্দরী সদ্য-বিবাহিতা। তাঁর স্বামী প্রবাসী। এই অবকাশে তিনি অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত হন। প্রতি রাত্রে তিনি যখন তাঁর প্রেমিকের কাছে যাবার জন্য প্রস্তুত হতেন তখন তাঁর স্বামী ময়মুনের পোষা তোতা পাখিটি একটি করে গল্প বলে রাত্রি শেষ করে দিত। এইভাবে তোতা গল্প বলে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেন ও ময়মুন ফিরে আসেন। তোতা ইতিহাসের অনেক গল্পই জীবজন্তু নিয়ে। কোন কোন গল্প হিতোপদেশ বা পঞ্চতন্ত্রে আছে।[১] লং-এর ক্যাটালগে আরব্য উপন্যাস, গোলেবকা-গুলি, চার দরবেশ ইত্যাদি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য

১৮৩৯	আরব্য রজনী—হরিমোহন সেন
১৮৫৩	পারসিক ইতিকথা, তোতা ইতিহাস
১৮৫৪	চার দরবেশ, লয়লা-মজনু—দ্বারকানাথ রায়
১৮৫৫	গোলেবকাগুলী

গোলেবকাগুলী লং-এর ভাষায় very popular work. বঙ্কিমের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত গোলেবকাগুলীকে বাঙালীচিত্ত জয় করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

(৩) এই সঙ্গে তৃতীয় ধারার আখ্যানক এল ইংরেজি থেকে। প্রথমত বাইবেল। ষোড়শ শতাব্দীতে যখন ইংরেজি ভাষায় বাইবেল অনুবাদ হয় তখন ইংরেজি সাহিত্যের এক নবীন ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার খুলে গিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাংলায় তা হয়নি। তার কারণ বাংলাদেশে খ্রীষ্টধর্ম ছিল বিদেশী ধর্ম। তখন বাংলা গদ্য গড়ে ওঠেনি—কাজেই অনুবাদও হয়েছিল অবাঙ্গালীসুলভ। তাই বাইবেলের গল্প বাঙালীর মনের মধ্যে গাঁথতে পারে নি। তবে খ্রীষ্টান মিশনারীরা অনেক ট্রাক্ট প্রকাশ করতেন। তাছাড়া ইসপস ফেবল, ইংলণ্ডের ঐতিহাসিক কাহিনী ও ইউ-রোপের অন্যান্য দেশের কিছু কিছু কাহিনী এইভাবে আসতে থাকে।
পুস্তক ও সংবাদপত্র উভয় পথেই এই আখ্যানগুলি আসতে থাকে। লং-এর ক্যাটালগ থেকে এগুলির পরিচয় পাওয়া যায়।

১। তেবরস্তান রাজার চৌকিদারের গল্প ও বীরবর-উপাখ্যান তুলনীয়।

১৮০৩ ইসপের গল্প—তারিণীচরণ মিত্র
১৮২৪ ছোট হেনরী—মিসেস শিআরউড।
১৮৪৮ রাজদূত ও সরলতার পুরস্কার১
১৮৫১ নিগ্রো সারভেন্ট
১৮৫৫ সদাচার দীপক২
রবিনশন ক্রুশো

সামান্য কয়েকটি উদাহরণ থেকে বোঝা যায় ইংরেজি গল্পধারা, নীতি, ধর্ম ও নিতান্ত সাহিত্যরস তিন পথ অবলম্বন করেই বাংলায় প্রবেশ করেছিল। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করছিল পত্রপত্রিকা। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত দিগদর্শন পত্রিকা এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক। এখানে প্রায়ই নীতিমূলক গল্প ছাপা হত।৩ একটি গল্প উদ্ধার করি।

> তাতার দেশের এক বাদশাহ আপন অমাত্যগণের সহিত ভ্রমণ করিতেছিলেন; ইতোমধ্যে এক দরবেশ ফকীর অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়া উচ্চস্বরে কহিল, যে আমাকে শতখণ্ড স্বর্ণ যে দিবেক তাহাকে আমি এক উপদেশ দিবা· বাদশাহ তাহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তত সুবর্ণ দিলেন· ফকীর বাদশাহকে এই উপদেশ দিল যে যে কর্মের শেষ না দেখ তাহার আরম্ভ করিও না·। অমাত্যেরা সে-কথা সোজা জ্ঞান করিয়া উপহাসপূর্বক কহিল, যে এই ফকীর উপদেশ দিয়া অনেক লাভ করিল· বাদশাহ তাহাতে এমত তুষ্ট হইলেন যে ঐ উপদেশ-বাক্য তার রাজগৃহে সুবর্ণাঙ্কিত করিয়া লিখিয়া রাখিলেন·
> কতককাল পরে কোন শত্রু বাদশাহের রক্তমোক্ষনকালে তাহাকে বিষ দিয়া মারিবার কারণ বাদশাহের চিকিৎসককে অনেক টাকা ঘুষ দিয়াছিল· পরে

১। লং এই বইটি সম্পর্কে বলেছেন a great boon to Bengali literature.

২। **মৃত্যুভয়, একটি বালকের বাইবেলের প্রতি শ্রদ্ধা, একটি বালকের মিথ্যা-ভাষণের ভয়** ইত্যাদি গল্প।

৩। দিগদর্শন ১৮১৮। জুন। পৃঃ ১১৭। ইসপের **গাধা ও পিতাপুত্রের** গল্প ছাপা হয়েছে।
সেপ্টেম্বর। পৃঃ ২৫৫-৬০। **অবিদা (ভু) অথবা ধনের অনিত্যতা**
অক্টোবর। পৃঃ ৩১০ । **নিত্যকর্মের ফল**
১৮১৯। ফেব্রুয়ারী। পৃঃ ৫০২ । **উপদেশ**
ফেব্রুয়ারী। পৃঃ ৫০৭-০৮। **এক বাদশাহ ও ফকীর**
মার্চ। পৃঃ ৫৫৫ । **মাতৃভক্তি**
পরিশ্রমের ফল
এপ্রিল। পৃঃ ৬৭ । **রোমদেশের বাদশাহ তীতস**

যখন চিকিৎসক বাদশাহের হাত বান্দিল ও মৃত্যুসূচক অস্ত্র হস্তে করিল, তৎকালে ঐ চিকিৎসক ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিল, ও যে কর্ম্মের শেষ না দেখ তাহার আরম্ভ করিও না, এই উপদেশবাক্য দেখিয়া চমৎকৃত হইল এবং তৎক্ষণাৎ অস্ত্র তাহার হাত হইতে পড়িল· বাদশাহ তাহার এই ব্যবহার দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন· পরে চিকিৎসক বাদশাহের পদাবনত হইয়া সে সকল বিষয় তাহাকে সত্য কহিল· তাহাতে বাদশাহ তাহাকে ক্ষমা করিলেন· কিন্তু যাহারা তাহাকে ঘুষ দিয়াছিল তাহাদের বধ করিলেন· যাহারা পূর্ব্বে উপদেশবাক্য হেয় মনে করিয়াছিল, তাহারদের প্রতি অবলোকন করিয়া বাদশাহ কহিলেন, যে যে উপদেশবাক্য দ্বারা এক বাদশাহের জীবন রক্ষা হইল তাহার উপযুক্ত মূল্য দিতে পার না·১

১৮১৯ খৃঃ অব্দে একটি খ্রীষ্টীয় মিশনারী পত্রিকা প্রকাশিত হয়।২ এটি দ্বিভাষিক পত্রিকা। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারই ছিল উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যেই ছোট ছোট উপাখ্যান প্রকাশিত হত। ১ম সংখ্যায় **'বালককালে শিক্ষার গুণ'** নামে একটি উপাখ্যান ছিল। তাতে একটি ছোট মেয়ে তার বাড়ির হিন্দু-চাকরকে খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করল।

পরের বৎসর আর একটি গল্প প্রকাশিত হয় **দস্যুবৃত্তি** নামে।৩ রূপক কাহিনী।

"কোন সময়ে কতক লোক এক দেশ হইতে অন্য রাজ্যে যাত্রা করত অতি দূর গমন করিয়া কোন স্থানে উত্তরিল, তথায় একজন দস্যুলোক আসিয়া ঐ লোকেরদিগের সহিত সখ্যতা করিয়া যথেষ্ট আত্মীয়তা জানাইয়া তাহারদিগের সহিত অতি প্রীতি করিল, ইহাতে তাহারাও উহাকে অতিবন্ধু জানিয়া বিশ্বাস করিল· পরে ঐ দুষ্ট আপনার স্ববৃত্তি সাধনের জন্য কতকগুলা ধুতুরার বীজ মিষ্টান্নতে মিশাইয়া তাহারি লড্ডু নির্মাণ করিয়া ঐ লোক সকলকে খাওয়াইল· মাদকদ্রব্য ভক্ষণে তাহারা সুতরাং উন্মত্ত হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইল· পশ্চাৎ নিষ্কণ্টক ঐ দস্যু তাহারদিগের সকল সম্পত্তি হরণ করিয়া পলাইল·"

এই পথিকদল মানুষজাতির প্রতীক, তাদের যাত্রা পথ সময় থেকে অসীম অনন্তের পথে যাত্রার প্রতীক, ঐ দস্যুদল শয়তানের প্রতীক।

পঞ্চম সংখ্যায় একটি উপাখ্যান আছে।৪ তের বৎসর ঘুরে ঘুরে এক হিন্দু সন্ন্যাসী খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নিলেন। দেবালয়ে প্রতিমা পূজা দেখে তাঁর মনে পরিবর্তন এল।

১। এক বাদশাহ ও ফকীর : ১৮১৯। ফেব্রুয়ারী। পৃঃ ৫০৭-০৮

২। Gospel Magazine, 1819, December

৩। ঐ, ১৮২০, ফেব্রুয়ারী, পৃঃ ৮৮

৪। ঐ, ১৮২০, এপ্রিল, পৃঃ ৭৯ Anecdote of a Hindoo pilgrcim

সংবাদ কৌমুদীর (১৮২৩) থেকে একটি কাহিনী উদ্ধার করি। পূর্বালোচিত 'চূর্ণক' গোত্রীয়।

> গ্রীকদেশে একজন পণ্ডিত অবিরোধে কালযাপন করিতেন। একসময় তিনি আপন মিত্রদিগের সহিত পথ ভ্রমণ করিতেছেন, ইত্যবকাশে এক ব্যক্তি গোঁয়ার আসিয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিল। তাহাতে তিনি কিছুই উত্তর করিলেন না। ইহা দেখিয়া তাঁহার মিত্ররা কহিল, একি আপনি যে ইহাকে কিছু কহিলেন না, পণ্ডিত কহিলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি গর্দভের নিকট যায় এবং সে গর্দভ চাটইট মারে তবে কি গর্দভের নামে কেহ নালিশ করিয়া থাকে।১

বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫০)-এর মধ্যেও অনূদিত কাহিনী প্রকাশিত হত। তার পূর্বে সংবাদ-প্রভাকরে (১৮৩০) ইংরেজি বই থেকে ছোট ছোট কাহিনী অনুবাদ করে দেওয়া হত। কোন কোন ঘটনাকে গল্পের আকারে প্রকাশ করার চেষ্টাও লক্ষিত হয়।২ বিবিধার্থ সংগ্রহে একবার শেক্সপীয়রের 'দি মার্চেন্ট অফ ভিনিস' গল্পাকারে প্রকাশিত হয়।৩ কখনও বা সহজ নীতিমূলক আখ্যান প্রকাশিত হয়েছে।৪

১৮৬৮ খৃঃ অব্দে 'রহস্যসন্দর্ভ' পত্রিকায় 'ভল্লুকসুন্দরী' নামে একটি রূপকথা প্রকাশিত হয়। যদিও উল্লেখ নেই তবুও লেখার ধরন ও লেখার মধ্যে সামাজিক আচার-ব্যবহারের উল্লেখ থেকে মনে হয় এটি কোন ইংরেজি আখ্যানের অনুবাদ। এক পরীর অভিশাপে এক হতভাগ্য রাজপুত্র ভল্লুক হয়েছিল। তাকে একটি মেয়ে ভালবাসল। সেই মেয়েটির ভালবাসায় তার অভিশাপ শেষ হল। সে আবার নরদেহ ফিরে পেল। ইংরেজি রূপকথা এর আগে থেকেই বাংলায় অনুবাদ হতে আরম্ভ করেছে।

'খ্রীষ্টীয় বাংলা সাহিত্য' নামে একটি প্রবন্ধে এসময়কার অনেক গল্পের বইর নাম পাওয়া যায়।৫ যেমন

১। ক্ষুদ্র মেষশাবকের গল্প
২। মনোরঞ্জন গল্প
৩। রাখালমোহিনী
৪। জমীদার ও রায়তের গল্প
৫। ভুলোই শেষে ভোলানাথ হবে

লেখক মনোরঞ্জন গল্প ও রাখালমোহিনী সম্পর্কে লিখেছেন "এ ট্রাকট্‌খানিতে

১। সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যে গদ্য (৩য় সংস্করণ, ১৯৪৯) পৃঃ ৪৮ থেকে উদ্ধৃত।
২। ৩৯০২ সংখ্যা। ১২৫৭, ৯ই পৌষ, সোমবার (১৮৫০, ডিসেম্বর) পৃঃ ৪ **এক জীবন্ত ব্যক্তির সমাধির ভয়ংকর বিবরণ**
৩। ১২শ খণ্ড। **কাজির বিচার**
৪। ৫ম সংখ্যা। **সরলের উপখ্যান**
৫। বঙ্গমিহির। ১২৮০, জ্যৈষ্ঠ। পৃঃ ৬৫। লেখকঃ শ্রী নিঃ

তিনটি গল্প লিখিত হইয়াছে। প্রথমটি সুশীলার মনোবেদন। আমাদিগের মনে বড় ধরিয়াছে। ইহার ভাষা অতি উত্তম ও মিষ্ট।" এবং "এ গল্পটি সুন্দর হইয়াছে।" অন্য গল্পগুলির সম্পর্কে 'ভাল লাগিল না' মন্তব্য করেছেন। এই ধরনের ট্রাক্ট্ বাঙালী সমাজে কতটা জনপ্রিয় হয়েছিল বলা কঠিন।১ তবে এগুলির পাঠক সংখ্যা খুব কম ছিল না। অধিকাংশ ট্র্যাক্টের মধ্যে একটু বিদেশী গন্ধ আছে। শুধু ভাষায় নয়, কাহিনীর প্রকৃতিতে। কিন্তু বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ধীরে ধীরে বিদেশী গল্পের অনুবাদ হতে শুরু করল। সেই গল্পগুলি বাঙালীর গল্প-পিপাসায় নতুন পানীয়। তার অনুকরণ ও অনুসরণ সবেগেই আরম্ভ হল ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা পত্র-পত্রিকায়।

(৪) আখ্যানগুলির এই তিনটি শ্রেণী ছাড়াও চতুর্থ একটি শ্রেণী আছে। সেখানে বাংলাদেশেরই লোকপ্রচলিত গল্পের লিখিত রূপ পাওয়া যায়। এইজন্য মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের কাছে আমরা ঋণী। তাঁর প্রবোধচন্দ্রিকা পুস্তকে এই ধরনের অনেক গল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। লোকপ্রচলিত জনপ্রিয় গল্পগুলিকে তিনিই সর্বপ্রথম স্থায়ী রূপ দেবার চেষ্টা করেন। যদিও তিনি মূলত রাজপুত্রদের শিক্ষার জন্য জ্ঞানগর্ভ কথা বলতেই এই গল্পগুলি বেঁধেছেন তবুও গল্প বলার দক্ষতা যে তাঁর অসাধারণ তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু গল্প বলাই নয় মানবচরিত্র অনুধাবনের ক্ষমতাও তাঁর বিস্ময়কর, বাস্তববোধ বিস্ময়জনকভাবেই তীক্ষ্ন। আজ আধুনিক রুচিতে তাঁর অনেক গল্প গ্রাম্য মনে হতে পারে কিন্তু তা তাঁর বাস্তববোধ ও শব্দচয়নে মুক্তমনের পরিচয়বহ। কিন্তু কিছু কিছু গল্প যে এখনও আধুনিক মনের কাছে জনপ্রিয়তা ও সম্মানলাভ করবে তা বলা যায়। এই গল্পগুলির অনেকগুলিই নিতান্ত চূর্ণক—অর্থাৎ খুবই অল্প কথায় একটি ঘটনা দেশলাই-কাঠির আলোর মত কিছুক্ষণ জ্বলেই নিভে যায়।২ এই ধরনের

১। বঙ্গমিহির। ১২৮০, আষাঢ়। পৃঃ ১২০। নিম্নলিখিত বইগুলির বিক্রয়ের হার দ্রষ্টব্য

পাকা আঁব	৪,৫৫৯
প্রেমোপাখ্যান	৪,৫৫৩
ঋণ পরিশোধ	২,৬৮০
গল্প	২,৫৭৮
	২,৪৯৮
মনোরঞ্জন গল্প	২,২০৫

২। **অন্ধগোলাঙ্গুলন্যায়**—প্রবোধচন্দ্রিকা। ১ম স্তবক, ৫ম কুসুম। পৃঃ ২৬-২৭
অর্দ্ধজরতী—ঐ। পৃঃ২৭-২৮
ব্রাহ্মণ ও চর্মকারের কাহিনী। দ্বিতীয় স্তবক। চতুর্থ কুসুম। পৃঃ ৫৯-৬১
ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গল্প রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথামৃতে রাশি রাশি আছে। সংস্কৃত আখ্যানের পরিচয়ও এই গ্রন্থে আছে।১ কিন্তু আধুনিক পাঠকের ভাল লাগার মত কাহিনীও আছে। একটি কাহিনী সংক্ষেপে বলা যাক।২

> এক অসতী স্ত্রী ছিল। সে রোজ রাত্রে নদীর ওপারে তার উপপতির কাছে যেত। স্বামী রাজবাড়ির প্রহরী। রাত্রে প্রহরা দিত। স্ত্রী সকালবেলা স্বামী এলে ভান করত যেন সে জীবনে ঘরের বাইরে যায় নি। কাক পর্যন্ত দেখেনি। এমনকি কাক ডাকলে অবাক হয়ে অর্ধমূর্ছিত হত ও স্বামীকে বলত "এগুলো কি ডাকে? শুনিবামাত্র আমার হৃৎকম্প হয়, ওমা এ বালাই-গুলোর ডাক এমন কেন?" স্বামী ভাবতেন তাঁর স্ত্রী সুশীলা, অসূর্যম্পশ্যা এবং সতী সাধ্বী।
>
> এই বাড়িতে একদিন এক সন্ন্যাসী এলেন। স্বামী অতিথি পরিচর্যা করে রাত্রে গেলেন রাজবাড়িতে। সন্ন্যাসী তাঁর বাড়িতে রাত্রে ঘুমোলেন। এই সন্ন্যাসীটি আবার অদ্ভুতচরিত্র। তিনি ছিলেন মূলত চোর। পরে সন্ন্যাসী হন। কিন্তু সন্ন্যাসী হয়েও তাঁর চৌর্যবৃত্তি ত্যাগ করা কঠিন হল। যখন অন্য সন্ন্যাসীরা ঘুমোতেন তখন তিনি একজনের কমণ্ডলু অন্যের কাছে রেখে দিতেন। সন্ন্যাসীর চৌর্যমনোভাব বিভিন্ন পথে এইভাবে প্রকাশ পেত। যাই হোক সন্ন্যাসী শুয়েছেন, স্বামী বাড়ির বাইরে, স্ত্রী এখন বাইরে যাবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। বার বার দেখছে সন্ন্যাসী ঘুমোলেন কিনা। আর ভাবে "আ মর এ পাপটার চক্ষে কি ঘুম নাই?" তখন সন্ন্যাসীর সন্দেহ হল। তিনি নাক ডাকাতে শুরু করালেন। তখন স্ত্রী পথে বেরোল। সন্ন্যাসী চললেন পেছনে পেছনে। তিনি দেখলেন এক নদীর ধারে গিয়ে সেই রমণী অনেক হলুদ মেখে নদী সাঁতরে অন্য পারে গেল ও দুই প্রহর রাত্রির পর ঘরে ফিরে এল। ভোরবেলা স্বামী ফেরার পর পূর্ববৎ ন্যাকামি করল। সন্ন্যাসী জানতেন যে কুমীর হলুদের গন্ধে ভয় পায়—তাই মেয়েটি হলুদ ব্যবহার করত। ভোর-বেলা স্বামী সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। সন্ন্যাসী আশীর্বাদ করলেন ও বললেন দিবাবিভেতি কাকেভ্যো রাত্রৌ সঞ্চরেত নদীং অর্থাৎ দিনের বেলায় যে কাককে ভয় করে সে-ই রাত্রে একলা নদী সাঁতরায়। স্বামী বললেন 'অত্র নক্রভয়ং নাস্তি?' অর্থাৎ কুমীরের ভয় কি নেই? সন্ন্যাসী বললেন 'তদ্ধি জানন্তি তদ্বিদঃ' অর্থাৎ সেটুকু যে জানে তার থেকে নিষ্কৃতির পথও সে জানে। সন্ন্যাসীর এই সাংকেতিক কথাবার্তা তাদের নিশ্চিন্ত গৃহ-জীবনে এক বিপ্লব এনে দিল। স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করল।

১ ৩য় স্তবক। ১ম কুসুম। পৃঃ ৮০-৮১ **বৃদ্ধ বানরের গল্প**
পৃঃ ৮২-৮৭ **রাজপুত্র ও ভল্লুকের গল্প**
পৃঃ ৮৭-৯১ **নারীবেশী কালিদাসের গল্প**

২ ২য় স্তবক। ৩য় কুসুম। পৃঃ৪৯-৫২

এই কাহিনী হয়ত মৃত্যুঞ্জয়ের উদ্ভাবিত নয় কিন্তু এর কথন-কৌশল নিজস্ব। সন্ন্যাসী চরিত্রটি বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। মৃত্যুঞ্জয়ের একটি রচনা আজও বাংলা গল্পসংকলনগুলিতে অন্তর্ভুক্তির দাবী রাখে। বিশ্ববঞ্চক ও বিশ্বভণ্ড এই কাহিনীর নায়ক।১

"ভোজপুরে বিশ্ববঞ্চক নামে একজন থাকে, তাহার ভার্যার নাম গতিক্রিয়া, পুত্রের নাম ঠক।" এই অপূর্ব সংসারের কর্তা বিশ্ববঞ্চকের কাজ লোক প্রতারণা। সে একটি ঘটে ছাই-ধুলো ইত্যাদি ভর্তি ক'রে ওপরে এক-আধ সের ঘি দিয়ে ঢেকে দেয়। তারপর সমস্তটি ঘির ঘট বলে বিক্রি করে। বিশ্ব-ভণ্ড নামে আরেক ব্যক্তি সেও এক গুড়ের কলসীতে কাদা ভরে ওপরে কিছুটা গুড় নিয়ে ঘোরে। একদিন বিশ্ববঞ্চক ঘির ঘট গাছতলায় রেখে স্নানে গেছে। বিশ্বভণ্ড দেখল সেখানে কেউ নেই। ভাবল কত আর গুড়ের কলসী মাথায় ঘুরি! এই ভেবে ঘৃতকলসী নিয়ে আনন্দিত মনে পালাল। বিশ্ববঞ্চক সেই কলসী মাথায় তুলে নিল ও বাড়িতে ফিরে "আপন স্ত্রীকে ডাকিল, ও ঠকের মা, ওরে দৌড়িয়া শীঘ্র আয়, মাথা হইতে ভার নামা, আজি এক বেটাকে বড় ঠকাইয়াছি...এক বেটা লক্ষ্মীছাড়া আপন এই গুড় ফেলাইয়া আমার সেই ঘি-এর ঘড়া জানিস্ তো তাহা নিয়া অমনি প্রস্থান করিয়াছে; মনে ২ বড় হর্ষ হইয়াছে যে আজি যথেষ্ট ঘৃত পাইলাম, পশ্চাৎ টের পাইবে; যা শীঘ্র রাঁধা-বাড়া কর, আমি নাইয়াই আসিয়াছি, ক্ষুধাতে পেট জ্বলিতেছে।" স্ত্রী চটে উঠল, "তেল নাই, লুন নাই, চাউল নাই।" শেষ পর্যন্ত ঘরে ক্ষুদ পাওয়া গেল। কিন্তু নুন নেই, তেল নেই। তখন ঠক গেল নুন আনতে। ঠক বাপকো বেটা। "তৎপিতা জিজ্ঞাসিল, কিরূপে তৈল লবণ আনিলি? ঠক কহিল, এক ছোঁড়াকে ভুলাইয়া বন্ধক দিয়া মুদি শালাকে ঠকাইয়া আনিলাম।" পিতা-পুত্রে যখন এইরকম কথাবার্তা হচ্ছে তখন গতিক্রিয়া এসে জানাল যে "গুড় ঢালিতে প্রথম খানিক গুড় পড়িয়া তদুপরি এককালে কতকগুলা পঙ্ককর্দম পড়িল।" বিশ্ববঞ্চক মাথায় হাত দিল।

কিন্তু বুঝল যে এই তার যোগ্য বন্ধু। যথাসময়ে দুজনের বন্ধুত্ব হল এবং দুজনে মিলে এক জায়গায় বাণিজ্য করতে গেল। সেখানে এক বণিকের কাছ থেকে একলক্ষ টাকা ধার করল। বিশ্ববঞ্চক সেই টাকা মেরে দেবার মতলব আঁটতে লাগল। দুই বন্ধু মিলে প্রস্তাব করল যে ছোট একটা ঘর ক'রে তার মধ্যে কয়েক হাজার টাকার তুলা কিনে আগুন লাগাও। তারপর বণিককে বলল যে আমার সব টাকা পুড়ে গেছে। কিন্তু তোমরা আমার সঙ্গে লোক

১। ২য় স্তবক, ৪র্থ কুসুম, পৃঃ ৬১-৬৮
পরিমল গোস্বামী সম্পাদিত **ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী** নামক গল্প সংকলনে (বেঙ্গল পাব-লিশার্স, কলিকাতা, ১৯৫৯) এই গল্পটি সংকলিত হয়েছে।

দাও, আমি বাড়ি গিয়ে দিয়ে দোব। তারপর মহাজন যখন লোক দেবে তখন মধ্যপথে বিশ্ববঞ্চক চলে যাবে আর বিশ্বভণ্ড পাগলের মত 'ভূ ভূ' শব্দ করবে। তখন বিরক্ত হয়ে মহাজনের লোক চলে যাবে। তারপর দুই বন্ধু সেই লক্ষ টাকা ভাগ করে নেবে। তাই হল। বিশ্ববঞ্চকের ভূ ভূ শুনে মহাজনের লোকেরা চলে গেল। তখন বিশ্ববঞ্চক এল বিশ্বভণ্ডের কাছে—"মহাজন বেটাকে কেমন ফাঁকি দিলাম, এক্ষণে আমার ভাগ দেও। ইহা শুনিয়া বিশ্বভণ্ড পূর্ববৎ পাগল হইয়া ভূ ভূ কেবল ইহাই কহিল। পরে বিশ্ববঞ্চক কহিল, যাও ২ ভাই আমার সহিত কৌতুক করার কার্য নাই, আমার ন্যায্য ভাগ আমাকে শীঘ্র দেও। ইহাতেও ভূ ভূ এইমাত্র উত্তর করিল।"

এই আখ্যানগুলি মনে হয় পুরোনো গল্পের কাঠামোর ওপর রচিত। এদের চরিত্র চিত্রণে মৃত্যুঞ্জয়ের কুশলতা আছে। ভাষাতেও কথাসাহিত্যিকসুলভ চিন্তা আছে। চরিত্র-উপযোগী সংলাপও আছে। কিন্তু নিতান্ত প্রাত্যহিক ও পরিচিত জীবনের ছবি এগুলির মধ্যে নেই। কিন্তু তার জন্য বাঙালীকে বেশীদিন অপেক্ষা করে থাকতে হয়নি। সংবাদপত্রে এক নতুন ধরনের চরিত্র ও ঘটনা পরিচয় শুরু হল। তার নাম নক্সা।

৩

নক্সা কাহিনীর কাঠামো মাত্র, তার মধ্যে কাহিনীর আভাস আছে। কিন্তু পূর্ণতা নেই। সাহিত্যিক নক্সামাত্রেই প্রধানত দুটি শ্রেণীর, একটি চরিত্র নক্সা, আর একটি ঘটনার নক্সা। নক্সাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হলে-হতে-পারত গল্প। কিংবা যেন কোন গল্পের শুরু। কিংবা শেষ। কিংবা তার মধ্য। অর্থাৎ গল্পের আভাস ও সম্ভাবনা নিয়ে এদের জন্ম। এদের স্রষ্টারা যে সচেতনভাবে তা ভেবেছেন তা মনে হয় না। তবুও সেই গল্পের আভাস আছেই। এ বিষয়েও প্রথম কৃতিত্ব ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের। উইলিয়াম কেরী Dialogues বা কথোপকথন নামে একটি দ্বিভাষিক গ্রন্থ রচনা করেন ১৮০১ খৃঃ অব্দে। এর কিছু অংশ লেখেন কেরী, কিছু অংশ তাঁর সহকারী বাঙালী লেখকরা। প্রথম কতকগুলি কথোপকথনে (পৃঃ ১০-৫৩) এক ইউরোপীয় ভদ্রলোকের খণ্ডচিত্র। ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় বাংলাদেশে ভেস্তি, ধোবা, মেহতর, হুকাবরদার, বেহারা, পেয়াদা, চৌকিদার ও দারবান পরিবেষ্টিত এক সাহেবের ছবি পাই এখানে। তিনি মধ্যে মধ্যে রুষ্ট হন। মধ্যে মধ্যে মোটা পুরস্কার দেন। একদিন তাঁর মনে হল এদেশীয় ভাষা শেখা দরকার। তখন মুন্সী রাখলেন। তারপরই সব খণ্ডিত। কিন্তু পাঠকচিত্তে কৌতূহল থাকে তারপর কী হল। কিংবা 'স্ত্রীলোকদের কথোপকথন' অংশটিতে।[১]

১। পৃঃ ১০৬-১১০

আসো গো ঠাকুরঝি নাতে যাই।
ওগো দিদি কালি তোরা কি রেন্ধেছিলি।
আমরা মাচ আর কলাইর ডাইল আর বাগুন ছচাকি করেছিলাম।
তোরদের কি হইয়াছিল।
আমাদের জামাই কালি আসিয়াছে রামমুনিকে নিতে। তাইতে শাকের ঘণ্ট সুক্তানি আর বড়া বাগুন ভাজা মুগের ডাইল ইলসা মাচের ভাজা ঝোল ডিমের বড়া আর পাকা কলার অম্ল হইয়াছিল।

অনাগত কথাসাহিত্যের সংকেত দুর্লভ নয়। আরেকটি উদাহরণ২

আর শুনতোছিসতে নির্ম্মলের মা। এই যে বেনে মাগীর অহংকারে আর চকে মুখে পথ দেখে না। হ্যা দ্যাখ কালি যে আমার ছেলে পথে ডাড়িয়া ছিল তা ঐ বুড়া মাগী তিন চারি ছেলে মা করিলে কি ভরন্ত কলসিতা অমনি ছেলের মাথার উপর তলানি দিয়া গেল। সেই হইতে ষাইটের বাছা জ্বরে ঝাউরে পড়েছে। এমন গরবাশুকি বল্লে আবার গালাগালি ঝকড়া করে। এ ভাতার-খাগি সর্ব্বনাশি পুতটা মরুক তিনদিনে উহার তিনডা মাথা খাউক ঘাটে বসে মঙ্গল গাউক।

কেরীর সবকটি চরিত্রই 'প্রতিনিধিমূলক' বা type, 'ব্যক্তি' বা individual নয়। জেলে, রাইয়ত, দিনমজুর, ব্রাহ্মণযজমান ইত্যাদি বহু প্রতিনিধিমূলক চরিত্রেই কথোপকথনপূর্ণ। আখ্যানকের চরিত্রগুলি যদিও ব্যক্তিচরিত্র তবু বহু ব্যবহার ও বহু প্রাচীনতার ফলে ও নীতির স্পর্শে তারা প্রায়ই ব্যক্তিস্বর্বর্জিত চরিত্র মাত্র। নক্সার type চরিত্রগুলির মধ্যেই ব্যক্তিচরিত্র বিকাশের বীজ ছিল। কেরী রাইয়ত ও জমিদার অংশের রাইয়ত বা জমিদার দুটি শ্রেণীর প্রতিনিধি মাত্র। কিন্তু ধীরে ধীরে প্রতিনিধি চরিত্রের পাশাপাশিই ব্যক্তিচরিত্রের জন্ম হচ্ছিল।

এই প্রতিনিধিমূলক চরিত্রের সূচনা সংবাদপত্রেই বেশী। বাস্তব জীবনের প্রয়োজনের তাগিদে নক্সার সৃষ্টি হতে শুরু করে। সাংবাদিক গদ্যের ক্রমবিকাশ ও বাস্তবজীবন সমালোচনার যুগ্ম প্রেরণায় নক্সার অভ্যুদয়।

জীবনের নানা অসংগতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা ও জীবনকে নানাভাবে দেখার প্রেরণায় এ ধরনের লেখার জন্ম। এ এক ধরনের সমালোচনা। সমাচার চন্দ্রিকায় নানা

২। পৃঃ ১২২

নক্সা প্রকাশিত হত। সমাচার দর্পণে সেগুলি আবার প্রকাশিত হত।* সমাচার দর্পণে ১৮৩২ খৃঃ অব্দে ১৪।১৫ এপ্রিলে একটি নক্সা প্রকাশিত হয়েছিল। বহু পাঠক সে ধরণের লেখা প্রকাশ করতে অনুরোধ জানান। সেজন্য নতুন নতুন নক্সা প্রকাশিত হতে থাকে। লেখাটির নাম 'অভিনব নাটক বৃত্তান্ত'। প্রথম সংখ্যায় ছিল বিচারকদের নিয়ে পরিহাস ও ব্যঙ্গ। পরের সংখ্যায় বিচারকদের অধীন পেয়াদা পেশকার, নাজীর প্রভৃতিদের নিয়ে। পরে সিরিস্তাদার। এইভাবেই কাহিনী চলেছিল। ১২ই মে থেকে একটি উদাহরণ দিই। সমাচার দর্পণের ২২২ পৃঃ ঘটনাটি আছে।

> "নদীতীরে নাট্যশালা অপূর্ব অট্টালিকাময়ী কখন বা আটচালা নাট্যশালা হয়। সিরিস্তাদারের বেশ বর্ণন। নেড়ামাথা খিড়গীদার পাগড়ি জোড়াপরা অপূর্ব দাড়ি সেয়ানা পাল্কীতে সওয়ার হইয়া কাছারিতে আসিতেছেন চার-পাঁচজন চাপরাশি সঙ্গে আর্দালি পথে যাইবার সময়ে ঐ আশ্চর্য সং দর্শনার্থ অনেক নিকট গিয়া থাকে কেহ এক চিরকুট লিখিয়া পাল্কীতে ফেলিয়া দেয় কেহবা একটি নেকড়ার পুটুলি পাল্কীর ভিতরে দেয় কেহ কর্ণের কাছে গিয়া কিছু কহে এবম্বিধায় আস্তে আস্তে আগমন করিয়া দেখেন কাছারীর তাবৎ আমলাগণ ম্রিয়মাণ রহিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলেন কি খবর তাহারা কাছারী-সুদ্ধ গাত্রোত্থান পূর্বক সেলাম করিয়া কহিল অভাগাদিগের ভাগ্য হেতুক গত শনিবার রাত্রিতে বিচারপতি অতি পীড়িত হইয়া স্বাস্থ্যজনক স্থানে গমন করিয়াছেন তৎপ্রতি নির্বীভূত নূতন একজন সাহেব আসিয়াছেন সাহেব বাঙ্গালি বা হিন্দুস্থানী কাহারো সঙ্গে মুলাকাৎ করেন না বা সেলাম লয়েন না আমলা কিম্বা অন্য কাহারো সহিত আলাপ করেন না ভারি মেজাজ সর্বদা ক্রুদ্ধ মুখ বেদীতে উপবিষ্ট হইলে মুখ আরো তোলো হাঁড়ি হয় সকলের উপর তর্জন গর্জন করেন......ইত্যাদি।"

এ যুগে এ ধরনের রচনা অজস্র। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকাতা কমলালয়' (১২৩০) ও 'নববাবু বিলাস' গ্রন্থটির মধ্যে কথাসাহিত্যের মালমশলা যে জমেছে তাতে সন্দেহ নেই। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র

* সমাচার দর্পণ:	২৮শে এপ্রিল	১৮৩২,	পৃঃ ১৯৯
	২৬শে মে	১৮৩২,	পৃঃ ২৪৮
	২রা জুন	১৮৩২,	পৃঃ ২৫৮
	৯ই জুন	১৮৩২,	পৃঃ ২৭১
	১৬ই জুন	১৮৩২,	পৃঃ ২৮২
	২৩শে জুন	১৮৩২,	পৃঃ ২৯৫

মধ্যে অনেক নক্সা ও উপভোগ্য সত্যকাহিনী পাওয়া যায়।১ ১৮৬২ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' এই ধারার চরম পরিণতি। হুতোম প্যাঁচার নক্সা নানা কারণেই বাংলা সাহিত্যের স্মরণীয় গ্রন্থ। সমাজ-ঐতিহাসিক এই গ্রন্থে সেই যুগের নিখুঁত ছবি পাবেন, ভাষাতাত্ত্বিক এই গ্রন্থের ধ্বনিতাত্ত্বিক বানানপদ্ধতি দেখে সেকালের উচ্চারণপদ্ধতি ও কলকাতার ভাষার দামী প্রমাণ পাবেন, সাহিত্যের ছাত্র হুতোমের রচনাপদ্ধতির আধুনিকতা ও সাহসিকতায় উল্লসিত হবেন। এই গ্রন্থে অনেক চুর্ণক আছে। যেমন দ্বিতীয় নক্সায় চড়কপূজার পরের কলকাতা বর্ণনার মধ্যে একটি রসোজ্জ্বল কাহিনী আছে। এক বাবু তাঁর জন্মদিনে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছেন। কিন্তু সেদিন বর্ষার জন্য কোথাও মাছ পাওয়া যাচ্ছে না। বাবু বহু জায়গায় লোক পাঠিয়েও কিছুতেই মাছ সংগ্রহ করতে পারলেন না। শেষে এক জেলে বিবাট রুই নিয়ে হাজির। বাবু খুশি হয়ে যে-কোন দাম দিতে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু জেলে বলল, আমি চাই কুড়ি ঘা জুতো। বাবু ভাবলেন বুঝি বাদলার দিনে একটু মদ খেয়েছে। কিন্তু সে কিছুতেই দাম নিতে রাজী হল না। তার চাই বিশ জুতো। বাবু আর কী করেন, বাধ্য হয়ে রাজী হলেন। তার পিঠে দশ ঘা জুতো পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে বললে, থামুন। আমার একজন অংশীদার আছে। তার পিঠে বাকী দশ ঘা পড়বে। সে হল বাবুর বাড়ির দরোয়ান। সে জেলেকে কিছুতেই ঘরে ঢুকতে দিচ্ছিল না। শেষে বলেছে যদি তোমার দামের অর্ধেক দাও তবেই ঢুকতে দেব। জেলে রাজী হয়েছে। তাই বিশ ঘা জুতো দাম নিয়েছে।

এই ধরনের চুর্ণক হুতোমের নক্সার মধ্যে আছে। কিন্তু প্রতিনিধিমূলক চরিত্রেই হুতোমের নক্সার বৈশিষ্ট্য। পদ্মলোচনবাবু বা বংশলোচনবাবুদের দলের যে ছবি তিনি এঁকেছেন তা গল্পের অভিমুখী।

১৮৭৫ খৃঃ অব্দে **হুতোম** পত্রিকায় নক্সা পাওয়া যায় অনেক। **রেস্তশূন্য আমীর ও পেঁচো পোদ্দারের ছেলে নবকুমার রায়চৌধুরী** তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। একটি প্রাচীন নক্সা উদ্ধার করছি। এটি প্রায় গল্পের পাশ দিয়ে গেছে।২

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় **সংবাদপত্রে সেকালের কথা**ঃ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা, (১৩৫৬)

সমাজ পর্বে অনেকগুলি ঘটনাই অপূর্ণ গল্পমাত্র, **বাবুর উপাখ্যান** (পৃঃ ১০৮), **বৃদ্ধের বিবাহ** (১১৬), **এক নবীন যোগির উপাখ্যান** (১৩২) ইত্যাদি।

২। সমাচার চন্দ্রিকা ২৩৬২ সংখ্যা

১০ই আষাঢ় সোমবার ১২৫১ সাল, ২৩শে জুন, ১৮৪৫, চিঠি হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে।

চেতনীয়ার চাতুর্যের উদাহরণ (ভু)

কাচিদেকা দেবরাসঙ্গে গর্ভিনী হইয়া গ্রাম্যদেবী চেতন শরণাগতা হইলে এমতকালে উহার পতি গৃহমাগত হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্থানে স্বভার্যার দুশ্চর্যার কথা শ্রবণে ক্রোধান্ধ হইয়া যথাকালে যথোচিত ভার্যাকে প্রহার পুরস্কার পূর্বক পরিত্যাগ করিল, অনন্তর ঐ কুলটা কোন সুযোগে চেতনীয়াকে ডাকিয়া বলিল, তোমার আশা ভরসা সব কি মিছা হইল লোক তামাসা দেখিতেছে শত্রু হাসিতেছে যদি শীঘ্র উপায় না কর তবে তোমার উপর হত্যা দিয়া প্রাণত্যাগ করিব। এই কথার পর চেতনীয়া উপায় চিন্তা করিল, উহারা বরের ঘরের মাসি কন্যার ঘরের পিসি দেবঋষির ন্যায় সর্বত্রগামী। সুযোগে স্বামী সমীপগতা হইয়া সুহৃতুল্য হিত কথা কহিতেছে বাবাজী তোমাকে লোকে বুদ্ধিমান কয় কই তার মত কিছু তো দেখি না তুমি পরের কথায় ঘর ভাঙিতে বসিয়াছ কও শুনি কোন বুদ্ধিমান চোরের উপর মান করিয়া আহার ত্যাগ করে, ঐ কুকর্ম কার দোষে ঘটিয়াছে তাহার কি জানিয়াছ। এই কথায় দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া স্বামী কহিল কার কথায় বিশ্বাস করিব চাক্ষুস দেখি নাই কর্ণে শুনিয়াছি তদন্তর উহাকে অনেক ধোঁকার কথায় বোকা বানাইয়া চাতুরী ফন্দি বন্দি করিয়া কহিল যদি কাহাকে না কহ তবে আমার কাছে ধর্মতৈল আছে কুকর্মকারিণী নিদ্রাগতা হইলে তাহার বদন বক্ষে ছিটা দিলে স্বমুখে সত্য কথা ব্যক্ত করিবে এই কথায় স্বামী হর্ষযুক্ত হইয়া উহার গাত্রস্পর্শ পূর্বক শপথ করিয়া তৈল লইয়া নারীর নিদ্রা প্রতীক্ষায় রহিল। তনন্তর গৃহাভ্যন্তরে সংকেত বুঝিয়া বুদ্ধিমতী নিদ্রাবতী হইয়া থাকিল পরে উহার গাত্রে তৈল দিবা মাত্র কহিতেছে "আমি পতি পরায়না সতীকন্যা কখন স্বপনেও পরপুরুষেও গমন করি নাই স্বামীর দূর গমনে ক্ষীণামলিনা হইয়া বিচ্ছেদে খেদে কাল হরণ করিতাম একরাত্রে ভাশুরঠাকুর আমায় উপগত হইলেন ভয়ে চোর বলিয়া বার বার সোর সার করিলাম কেহ আইলনা তিনি জোর করিয়া যা ইচ্ছা তাই করিলেন শেষে কাঁপিতে কাঁপিতে কান্দিতে কান্দিতে শাশুড়িকে সেই কথা কহিলে কহিলেন বাছা ভারিকেই ভার সয এই বই নয় দেখ কুন্তীর কথায় দ্রৌপদী পাঁচভাতার স্বীকার করিয়াছিল তাহাতে কি তাহার সতীত্ব গিয়াছে এমত কর্ম কোন ঘরে না আছে ইহা কি তুমি সম্বরণ করিতে পারিবা না এই কথার মাথায় কংকন মারিয়া বোবার স্বপ্নদর্শনপ্রায় সরমে কারে কিছু কহিতে না পারিয়া তদবধি রামের মায়ের সংগে শয়ন করিতাম তবু মধ্যে মধ্যে সেই পোড়ায় পুড়িতে হইত, ইচ্ছা অনিচ্ছায় আগুনে হাত পড়িলে পুড়িয়া যায় ও দুগ্ধে অম্ল স্পর্শ করিলে দধি জন্মে তথায় আমারো দুইমাস গাভারি জন্মিয়াছে কেবল আমিই জানি লোক জানাজানি হয় নাই।

এই কথার পর পুনরায় নিদ্রায় বিহবলা হইল, বিষাক্ত শেলবৎ নারী বাক্যে বক্ষ ভেদ হইয়া মর্মবেদনা প্রাপ্ত পতি মনে মনে চিন্তা করিল কি কাল মাহাত্ম্য যে রক্ষক সে ভক্ষক তক্ষকরূপে দংশন করিয়া ওঝা হইয়া শিরে তাগা বান্ধিয়া দেয়, পরে ভার্যাকে চেতন করিয়া অনেক প্রকার জিজ্ঞাসা করিল কিন্তু ঐ সুমতি কল্যাণী আর কোন কথা কহিল না ইহাতে স্বপ্ন কথা দৈব-

বাণীর ন্যায় সত্য জানিয়া পরপ্রাতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাতাকে পৃথক করিয়া ভিন্ন চত্বরে বাস করিল ও বিদেশে গমনকালে প্রিয়ার প্রিয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নারীর রক্ষণাবেক্ষনার্থে নিযুক্ত করিয়া দিল। চেতনীয়া মনোমত কার্য করিয়া মনোরথ পূর্ণ করিল।"

ভাষার জটিলতা ছেড়ে দিলে রচনাটি বিশেষ লক্ষণীয়। চেতনীয়া ও নারীর যে চরিত্রটি ফুটে উঠেছে তা প্রায় নিখুঁত। নারী প্রকৃতির একটি অদ্ভুত ছবি নক্সাটিকে গল্পের কাছাকাছি টেনে নিয়ে গেছে।

এই সমস্ত নক্সা থেকেও বোঝা যায় এক নূতন গল্পরীতি জন্মের অভিমুখে। আমরা মোট তিনটি ধরণের লেখার ভেতরে এর ইঙ্গিত পেলাম। চূর্ণক, আখ্যানক এবং নক্সা। চূর্ণকের মধ্যে আছে ক্ষণমুহূর্ত, আছে খণ্ড কাহিনী। তার হঠাৎ শেষ ও কাহিনীর খণ্ডতা লক্ষণীয়। আর লক্ষণীয় এক বিশেষ মুহূর্তের ছাপ ধরে রাখা।

আখ্যানক বা দ্বিতীয় স্তরের রচনার ইংরেজি নাম Tale বা Fable এরা কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। কাহিনীর গঠন আদিম। গল্পের প্রথম থেকেই বলা আরম্ভ হয় এবং যখন শেষ হয় তখন সম্পূর্ণভাবেই শেষ হয়। অর্থাৎ কাহিনী জীবনের মাঝখান থেকে হঠাৎ আরম্ভ হয় না কিংবা কাহিনীর শেষে কোন অনিঃশেষ ব্যঞ্জনা থাকে না। ছোটগল্পের সঙ্গে এর সম্পর্ক শুধু কাহিনী বলার ক্ষেত্রে।

নক্সা বা তৃতীয় ধরণের রচনায় উপন্যাসের কাঁচা মসলা প্রচুর। কিন্তু চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে এখনও পর্যন্ত কোন সূক্ষতা দেখা দেয়নি। চরিত্রে বহিরঙ্গই ধরা পড়েছে। তার অন্তরঙ্গ রহস্য ধরা পড়েনি কোথাও। কিন্তু নক্সার ঘটনা অধিক পরিমাণে জীবনমুখী ও বাস্তবধর্মিতার ফলে ভাষা ও বর্ণনায় প্রাত্যহিকতার পদক্ষেপ ঘটেছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এগুলির সঙ্গে সত্যিকারের কোন সম্পর্ক আছে কিনা ছোটগল্পের। তার উত্তরে এইটুকুই বলা চলে, যে একটি নতুন রূপে জন্ম নিল তাকে বিশিষ্ট বা unique বলতে হয়। প্রত্যেকটি মানুষ, যে অর্থে বিশিষ্ট, প্রত্যেক শিল্পরীতি, শুধু রীতি কেন, প্রত্যেকটি সৃষ্টিই বিশিষ্ট সেই অর্থে। কিন্তু কোন শিল্পই স্বয়ম্ভু নয়। অলক্ষিতে কোথায় তার বীজ থাকে। তারপর অনুকূল সময়ের রোদজলে তা পল্লবিত হয়ে ওঠে। সেই বীজের সন্ধান করতে গেলে এগুলি অনিবার্য হয়ে পড়ে। কারণ এগুলির মধ্যে গল্পের তৃষ্ণা মিটছিল মানুষের। অর্থাৎ আধুনিক গল্পের পূর্বপুরুষ রূপে এরা সে যুগের মানুষের কাছে সম্মান পাচ্ছিল। আমাদের এই আলোচনা সেই পূর্বসূত্রের অনুসন্ধান মাত্র। গল্পের সম্ভাবনার বীজ যে তখন আমাদের সাহিত্যে অঙ্কুরিত হতে চাচ্ছিল তারই পরিচয় গ্রহণ করে উৎসের সন্ধানে আরো একদিকে অগ্রসর হব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

॥ উৎসের দিকে : দ্বিতীয় পর্যায় ॥

চূর্ণক, আখ্যানক ও নক্সার পরবর্তী স্তর ছোট ছোট উপন্যাস। পরিভাষার অভাবে এদের 'নভেলা' বলতে পারি।১ মনে রাখতে হবে চূর্ণক, আখ্যানক ও নক্সার ধারার পরিণতি নভেলায় নয়—নভেলা আর একটি পরবর্তী নতুনধারা। ছোটগল্পের ইতিহাসে নভেলার দান সামান্য নয়। স্পেনের ছোটগল্পের ইতিহাসে নভেলার দান সমালোচকেরা বিশেষভাবে স্মরণ করেছেন। সার্ভান্তাসের *Novelas Ejemplares* (১৬১৩) প্রকাশিত হবার পর ছোটগল্প ত্বরান্বিত হয়। শুধু স্পেন নয় অন্যান্য দেশেও এই ধরনের নভেলা প্রচলিত ছিল। বিশেষভাবে স্মরণীয় ইটালী। ইংরাজী ও ফরাসীতেও ছোটগল্পের পূর্বপ্রস্তুতি ছোট ছোট উপন্যাস ব দীর্ঘ কাহিনীর মধ্যেই।

চরিত্রসৃষ্টি, প্লট ও প্লটের গঠন—এই তিনদিক দিয়েই নভেলা উপন্যাসেরই সগোত্র। তবে কাহিনীর অব্যাপ্তি এবং চরিত্রসৃষ্টিতে জটিলতার অভাব একে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের রূপ দেয়নি। উপন্যাসের সাধারণ লক্ষণ বহুমুখিতা। বহু চরিত্র বিকাশে, বহু ঘটনার সজ্জায় ও বহু আখ্যান সৃষ্টিতে তাকে সময় দিতে হয় এবং একটি সাধারণ চিন্তাসূত্রে সব কটিকে গেঁথে নিতে হয়। সেই জন্য উপন্যাসে সবচেয়ে বড় জিনিষ তার প্লটের বিকাশ। সাধারণত প্লটের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলা হয় কার্যকারণে গাঁথা আখ্যান।২ যদিও প্রত্যেকটি প্লটের স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, অভিনবত্ব রয়েছে, তবুও তাদের ভাগ করা চলে। কোন কোন প্লটের আরম্ভেই কার্যকারণ সম্বন্ধ নিহিত। আর কোন কোন প্লটের কার্যকারণ সম্বন্ধে ধীরে ধীরে

১। *Novella*-র অর্থ 'a short or middle-length story whence E(nglish) *novel* with sense gradually enlarging to that of full length story (the F(rench) *roman*) It(alian) *novella* and its derivative the Sp(anish) *novela* are occ(asionally) used by scholars; the It(alian) dim(inutive) novelletta per(haps) suggested the E(nglish) novelist.

*Patridge Eric : : **Origins**, A Short Etymological Dictionary of Modern English*, Routledge & Kegan Paul, London, 1958, P. 441

২। Forster, E. M., Aspects of Novel, London, 1927, পৃ. ১১৬

বিকশিত হচ্ছে। প্রথম ধরনের প্লট, ধরা যাক, রাজা ইডিপাসের কাহিনী। কাহিনী যতই এগুচ্ছে ততই পূর্বকথা প্রকাশিত হচ্ছে। সব ঘটনা পূর্বে ঘটে গেছে কিন্তু বোঝা যায় না। এখন ঘটনাস্রোত সেই পূর্বকাহিনীকেই প্রকাশিত করে দিল। আর দ্বিতীয় ধরনের প্লটে কার্য কারণ সৃষ্টি করছে, সেই কারণ আবার কার্য সৃষ্টি করছে এবং চরিত্রগুলির মধ্যে আত্মিক পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ টলস্টয়ের 'বিগ্রহ ও শান্তি' উপন্যাসের নায়ক পিয়েরকে ধরা যাক। কাহিনী আরম্ভ হয়েছিল এক আত্মকেন্দ্রিক যুবককে নিয়ে, সেই পিয়ের কাহিনীর শেষে রূপান্তরিত। পূর্ণ বিবর্তিত। প্রথম ধরনের প্লট 'পরিকল্পিত'—দ্বিতীয় ধরনের প্লট 'বিবর্তিত'। মনে রাখতে হবে এর দ্বারা কোন মূল্য বিচার করা হচ্ছে না—শ্রেণীবিচার করা হচ্ছে। প্রথমে কাহিনী ভাবা হয়ে গেছে। দ্বিতীয় কাহিনী ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছে।১ নভেলার প্লটও দুই স্তরের। উপন্যাসের সঙ্গে শুধু পার্থক্য আকৃতিতে।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের পূর্বসূরী তাই নভেলা। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরী বিনিময়'২ বাংলা উপন্যাসের সার্থক পথিকৃৎ। অঙ্গুরী বিনিময় গঠন-কৌশলের দিক থেকে সে যুগে যথেষ্ট অভিনব শুধু নয়, আঙ্গিকের দিক থেকেও যথেষ্ট অগ্রসর। এই কাহিনীর গঠন কৌশল অত্যন্ত ঘনাপিনদ্ধ। দিল্লীর মধ্যেই ঘটনাকে আবর্তিত করেছেন, স্বগতোক্তির সাহায্যে চরিত্রগুলির অন্তর যেমন পরি-স্ফুট হয়েছে, তেমনই ঘটনাস্রোতও পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। বঙ্কিমের আবির্ভাবের পর বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস সুপ্রতিষ্ঠিত হল। তখন 'অঙ্গুরী বিনিময়' কালের নিয়মেই পাঠকচিত্ত থেকে দূরে চলে গেল। কিন্তু পাঠকচিত্তের গল্পতৃষ্ণা আরেকটি পথ নিতে চাইল। পাঠক চাইল গল্প পড়তে—ছোট ছোট চূর্ণক নয়, আখ্যান নয়, নক্সা নয়—উপন্যাসের সমগোত্রীয় গল্প! কিন্তু 'ক্রমশঃ'র নির্দয় পরিসমাপ্তি যেন না থাকে। যেন এক সংখ্যাতেই কাহিনী শেষ হয়। সংবাদ-পত্র বা মাসিকপত্রগুলি পাঠকচিত্তের এই আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করতে চাইল। সংবাদ-পত্র সব দেশেই ছোট ছোট কাহিনী রচনার উৎসাহ সঞ্চার করেছে। আমেরিকা ও ইংলণ্ডের ছোটগল্পের জন্ম সংবাদপত্রে। বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। স্টীলের *Coverlay Papers*, অ্যাডিসনের **স্পেক্টেটর**, হক্সওয়ার্থের **দি অ্যে ভেঞ্চার**-এ গল্পের আভাস শুরু হয়েছিল। **ব্ল্যাকউড পত্রিকায়** স্কট, হগ প্রভৃতি লেখনি। লেখা শুরু করে দিয়েছিলেন। *Baltimore Saturday Visitor* ...লিকে অ্যালান পোর গল্পের পথ উন্মুক্ত করেছিল। স্পেনের গল্পের সূত্রপাত *s ; Poe*

...থিকৃৎ *Tieck*

১। **The Journal of Aesthetic and Art** Cr*emalde* অর্থাৎ **XVII··No 4. June, 1959**

২। **ঐতিহাসিক উপন্যাস, হুগলী, সংবৎ ১৯১৯।** ...তে বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী।

Emilia Pardo Bazan, Palacio Valdes, Leopoldo সকলেই পত্রপত্রিকার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন। বাংলাতেও তাই ঘটেছে। সমকালীন এক সমালোচক বঙ্গদর্শনে (১২৮১)১ দুটি উপন্যাস ও একটি নক্সা প্রসঙ্গে বলেছেন যে "এখন এ সকলের কিছু বাড়াবাড়ি হইতেছে। ইহার বৃদ্ধি দেখিয়া আমরা সুখী নহি। ভাল হইলে ক্ষতি নাই—কিন্তু মধ্যশ্রেণী গল্প ও নক্সায় বিশেষ লাভ নাই।" চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় লিখেছেন২ "আমাদের দেশীয় অধিকাংশ লোক গল্প শুনতে বড় ব্যগ্র। মাসিক সমালোচকে কাহিনী থাকে না বলিয়া অনেকে আমাদিগকে সময়ে সময়ে পীড়াপীড়ি করেন।" এই কারণে তখনকার অধিকাংশ পত্রিকাই কোন না কোন উপায়ে গল্প রাখতেন। শশিচন্দ্র দত্ত তাঁর Tales of Yore গল্পগ্রন্থটিও এইরকম সংবাদপত্রের প্রয়োজনেই লেখেন।৩ ভারতের অন্যান্য ভাষাতেও এর অন্যথা হয়নি।৪

১। **বঙ্গদর্শন**। ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা বৈশাখ। **'প্রমোদিনী'** নামক মাসিক-পত্রিকার আলোচনা।

২। **মাসিক সমালোচক**। ১২৮৬, বৈশাখ।

৩। "I began to scrible at about the same time that I entered the service of the Government writing short historical tales for the Saturday evening News papers"···
এই গল্পগুলি পরবর্তী বাংলা গল্পের প্রেরণাবাহী। দ্রষ্টব্য ঃ সুকুমার সেন, বা.সা.ই, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৪ পরে এই গ্রন্থ **উপন্যাসমালা** (১৮৭৭) নামে প্রকাশিত হয়।

৪। ভারতীয় সাহিত্যে এর প্রভাব মূলত বাংলা থেকেই ছড়িয়ে পড়েছিল ঃ
"अंगरेजी की मासिक पत्रिकाओं में जैसी छोटी छोटी आख्यायिकाएं निकलती हैं वैसी आख्यायिकाओं की रचना 'गल्प' के नामसे बंगभाषा में चल पड़ी थी। इन आख्यायिकाओं में बड़े ही मधुर और भावव्यंजक ऐतिहासिक या सामाजिक खंड रहते थे। 'सरस्वती' पत्रिकामें इस प्रकार की छोटी छोटी आख्यायिकाओं के दर्शन होने लगे। जहाँ तक मुझे स्मरण आता है, इस प्रकार की कहानियों का आरंभ सरस्वती के दूसरे या तीसरे वर्ष से बाबु गिरिजा कुमार घोष ने किया था जो हिंदी मे अपना नाम "लाला पार्वतीनंदन" रखते थे।"
हिंदी साहित्यका इतिहास—रामचन्द्र शुक्ल, प्रयाग, ১৯৯০ সংবদ, পৃঃ ৫৭৩

অধ্যাপক বিরাজ কর্তৃক হিন্দী প্রতিনিধিস্থানীয় গল্পের সংকলন **"যথার্থ আউর কল্পনা"** (দিল্লী, রাজপাল এণ্ড সন্স) গ্রন্থের ভূমিকাতেও সংবাদ-পত্রের কথা (পৃঃ ১১) বলা হয়েছে।

এই তাড়নাতেই পত্র-পত্রিকায় দীর্ঘপূর্ণাঙ্গ কাহিনী প্রকাশিত হতে থাকে। এই লেখাগুলিকে লেখকরা 'উপন্যাস' নামেই অভিহিত করতেন। বড় জোর 'ক্ষুদ্র উপন্যাস'। অন্য কোন নাম তখনও চালু হয়নি।১ কিন্তু আলোচনা করলে দেখা যাবে এগুলি কিভাবে ছোট উপন্যাস থেকেও সরে এসেছে এবং এক অনাগত অজ্ঞাত শিল্পরূপের সম্ভাবনাকে ব্যক্ত করছে।

বঙ্গদর্শনে (১২৭৯/১৮৭৪) চৈত্র মাসে **ইন্দিরা** প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর সম্পাদকেরা বলেছেন, 'ইন্দিরা বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পরচনা পরীক্ষার প্রথম ফল'।২ ইন্দিরা প্রথম সংস্করণে আকৃতির দিক থেকে নিতান্তই ছোট ছিল। পঞ্চম সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র জানালেন ইন্দিরা ছোট ছিল—বড় হইয়াছে। এবং সেই সঙ্গে এও বললেন যে, প্রকৃতপক্ষে পুরাতন নামে এ একখানা নূতন গ্রন্থ। বাস্তবিকই তাই। ১ম সংস্করণে পরিচ্ছেদ মাত্র ৮টি। পঞ্চম সংস্করণে পরিচ্ছেদ ২২টি। প্রথম সংস্করণে প্রকৃতপক্ষে ইন্দিরা, উপেন্দ্র ও হারানী দাসী ছাড়া আর

অন্যান্য প্রদেশেও অনুরূপ ব্যাপার। কানাড়া ভাষায় **সচিত্র ভারত, শ্রীকৃষ্ণসূক্তি** ও মারাঠী ভাষায় **মনোরঞ্জন** এবং **নিবন্ধ চন্দ্রিকা** প্রকাশিত হয়। গুজরাটি, আসামী, ওড়িয়া, তামিল সব ভাষাতেই এই ধারা ক্রিয়াশীল। মারাঠীতে **মনোহর** নামে শুধুই একটি ছোটগল্পের পত্রিকা প্রকাশিত হয় (দ্রষ্টব্য G. Chimnaji Bhate—History of Modern Marathi Literature, 1939, পৃ. ৬৮৩)

১। ১২৮২, শ্রাবণ, বঙ্গদর্শনে **হরিহরবাবু** নামে একটি রম্যরচনা প্রকাশিত হয়েছিল। রচনাটির প্রথমে একটি রসগল্প ছিল। লেখক সে সম্পর্কে বলেছেন 'গল্পটি উপন্যাস মাত্র'। **কৃষ্ণচরিত্রের** (১৮৮৬) মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণ সম্পর্কে বহু অলৌকিক গল্পকে 'উপন্যাস' বলেছেন। (তৃতীয় পরিচ্ছেদ)। বোঝা যায় শিক্ষিত বাঙালী **উপন্যাস** অর্থে ইংরেজি *Fiction*ই বুঝতেন। সংস্কৃতেও তাই অর্থ। তুলনীয়ঃ **কিমিদম উপন্যস্তম্**। শকুন্তলা, ৫ম অঙ্ক। বিবিধার্থসংগ্রহে (১৭৭৩ শক। ফাল্গুন, ১৭৭৫ শক, কার্তিক)—**গল্প, উপন্যাস, আখ্যায়িকা, উপাখ্যান** পাওয়া যায়। উপন্যাস শব্দটি নানাভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে—যথা আরব্য উপন্যাস, অদ্ভুত উপন্যাস। মনে রাখতে হবে যে **ছোটগল্প** শব্দটি নিতান্ত আধুনিক—শব্দটির বয়স একশ বছর হয়নি। ইউরোপেও *short story* শব্দটিও আধুনিক। *Irving* তার গল্পগুলিকে *story, tale* নামে অভিহিত করেছেন, কখনও বা *Sketches; Poe* কখনও *tales*, কখনও *articles*, *sketches*. এমনকি *parables*. জার্মান গল্পের অন্যতম পথিকৃৎ *Tieck* তাঁর প্রথম গল্পসংকলনের নাম দিয়েছিলেন *Die Gemalde* অর্থাৎ **চিত্রাবলী**।

২। সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্কিম-গ্রন্থাবলী। ইন্দিরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

কারও চরিত্রই বিকশিত নয়। পঞ্চম সংস্করণে কামিনী, কৃষ্ণদাসবাবু, হেনা, সুভাষিণী, রামণী, হারানী, রতনবাবু—ইত্যাদি কত ছোটবড় চরিত্রের ভীড়। প্রথম সংস্করণে ঘটনা কম। সংক্ষিপ্ত। কাহিনীর গতি দ্রুত। স্থির লক্ষ্যের দিকে দ্রুত-গতিতে কোন বাইরের ঘটনায় ভ্রূক্ষেপ না করে কাহিনী চলেছে—একমুখিনতাই এর বৈশিষ্ট্য। শুধু উপেন্দ্র ও ইন্দিরার কাহিনী বঙ্কিমের লক্ষ্য। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে এই ধরনের কাহিনীর গঠন আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করিনি। একমুখিতা, চরিত্রের বিরলতা, ঘটনা সংক্ষিপ্ত ও দ্রুতগতি—একাধারে অন্য কোন শিল্পরূপের মধ্যে আমরা পাইনি।

পঞ্চম সংস্করণে ইন্দিরার গঠনের সঙ্গে আবার তুলনা করলে আরো স্পষ্ট হবে। এখানে লেখকের দৃষ্টি খুঁটিনাটির প্রতি। "আমি যাইতেছি কাঁধে, তাহারা কাঁধে বহিতেছে"—পাল্কীবাহকদের প্রতি এই সহানুভূতি ইন্দিরার ১ম সংস্করণে ছিল না। কারণ সেখানে ইন্দিরার সময় বড় কম। ঘটনা তাই দ্রুত। অন্যদিকে পরবর্তী সংস্করণে কাহিনী ধীর। ডাকাতের বর্ণনা, বনের বর্ণনা, নদীর বর্ণনা সব আছে। প্রথম সংস্করণে ইন্দিরার স্বামীপ্রাপ্তি দ্রুত। বর্তমান সংস্করণে বৈষ্ণব-নায়িকার মত ধীরে ধীরে অনুরাগ আপেক্ষানুরাগ, রসোদ্গার, বেশকসজ্জা ও ভাবসম্মিলন। ইন্দিরা যখন ছোট ছিল তখন সে স্বামীকে পেতে চেয়েছে এবং ফিরে পাওয়াই তার তৃপ্তি। কিন্তু বড় ইন্দিরার তৃপ্তি কীভাবে সে স্বামীকে পেল। তার চাতুর্য, তার কুশলতা তাই বর্তমান সংস্করণের প্রাণ। রাধার মত অতি ধীরে ধীরে সে অভিসারে চলেছে। অর্থাৎ বর্তমান ইন্দিরা পত্রপল্লবিত। এই কাহিনীর প্লট অবশ্য 'কল্পিত'। মিলনান্ত কাহিনীর প্রস্তুতি যেন কাহিনীর গোড়া থেকেই। গোড়ার দিকে ইন্দিরার আনন্দ চপল কথাবার্তা অতি দুঃখের সময়েও তার চাঞ্চল্য থেকে ভ্রষ্ট হয়নি—বরং তার কৌতুকপরায়ণ মনোভঙ্গি তার বিপদগুলিকে রোমাঞ্চকর আনন্দেই পর্যবসিত করেছে। প্লট সরল। এবং প্লটটিতে কাহিনী শেষ পর্যন্ত পাঠককে তৃপ্ত করে—অর্থাৎ কাহিনীর শেষ অতর্কিত নয়, প্রত্যাশিত, রূপকথার মত বা আখ্যানকের মত। তবুও এইযুগে এরচেয়ে প্লটগঠনের কুশলতা আর কেউ দেখাতে পারেন নি। ইন্দিরার প্রথম সংস্করণে যে ধরনের গল্প পাওয়া গেল তা যে ইতিপূর্বে পাঠকের আস্বাদিত নয় তাও সত্য।

যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪) ও রাধারানী (১৮৭৫) প্লটরচনার দিক থেকে ইন্দিরার সগোত্র ও কাহিনী হিসেবে মিলনান্তক, অদৃষ্টের প্রসন্ন হাসিতে উজ্জ্বল।১ বঙ্কিমের

১। স্মরণীয় যে বঙ্কিম এগুলির নাম দিয়েছিলেন **উপকথা**। এই গল্প তিনটি সম্পর্কে অতি মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন **শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত**। **বঙ্কিমচন্দ্র**, ১৩৪৫, কলিকাতা। পৃঃ ১৭৭—১৮৭ (দ্বিতীয় সংস্করণ) "উপকথার মতই ইহাদের মধ্যে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে, নানা বিপদের মধ্য দিয়া নায়ক-নায়িকা আপনাদের অভীষ্ট লাভ করিয়াছে।"

ঘটনাবহুল উপন্যাস থেকে এই ঘটনা বিরল, স্বল্পচরিত্রের কাহিনীগুলি বিশেষ ইঙ্গিতপূর্ণ। বলাই বাহুল্য এই ধরনের ছোট ছোট কাহিনী রচনার পথ বঙ্কিমই উন্মুক্ত করলেন পর পর তিনটি গল্প লিখে। তিনটি গল্প তিনটি ফুল্ল কুসুমের মত একটি গুচ্ছ সৃষ্টি করল ও আরো অন্য লেখককে উৎসাহিত করল। আর সেই প্রেরণায় অনেক গল্পই লিখিত হল। বঙ্কিমের উৎসাহ সম্ভবত তাঁর পরিবারের লেখকদেরই উৎসাহিত করেছিল এবং তাঁর দুই ভাই পূর্ণচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র এই কাহিনী রচনার পরীক্ষায় অগ্রসর হলেন। ছোট কাহিনী রচনার প্রেরণা নানাদিকে ছিল তবুও শিল্পীচিত্ত ছিল দ্বিধাগ্রস্ত। ১৮৭৩ খৃঃ অব্দে (১২৮০, জ্যৈষ্ঠ) বঙ্গদর্শনে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় **মধুমতী** নামে একটি গল্প লিখলেন। তার পর বৎসর (১২৮১, জ্যৈষ্ঠ) ভ্রমর পত্রিকায় সঞ্জীবচন্দ্র **দামিনী** ও **রামেশ্বরের অদৃষ্ট** নামে দুখানি গল্প লিখলেন। আর তিন বছর পরে (১২৮৪) ভারতী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের **ভিখারিণী** গল্প প্রকাশিত হল।

'মধুমতী' উপন্যাস নামে প্রকাশিত হয়েছিল। কাহিনীটি সে যুগের পক্ষে কিছুটা অভিনব সন্দেহ নেই। মধুমতী নদীর ধারে এক অচেতনা নারীকে জমিদার-পুত্র ব্রাহ্ম করালীপ্রসন্ন কুড়িয়ে আনেন। তাঁর চেষ্টায় মেয়েটি জ্ঞান ফিরে পেল এবং সুস্থ হল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে স্মৃতি ফিরে পেল না। কিছুতেই মনে পড়ল না সে কোথায় ছিল, কি তার নাম, কে তার স্বামী।

তখন করালীপ্রসন্ন তার নাম রাখলেন মধুমতী। শেষ পর্যন্ত তিনি মধুমতীকে বিবাহ করলেন। তিনি ভেবেছিলেন মধুমতী হয়ত বিধবা। মধুমতীও তার উদ্ধার-কর্তার প্রতি অতি কৃতজ্ঞ। এই নূতন স্বামীকে মধুমতী শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। তাদের জীবন অত্যন্ত আনন্দময় হয়ে উঠল।

একদিন রাত্রে মধুমতী হঠাৎ গান শুনতে পেল। বাইরে এক পাগল গান গাইছিল "আদর তরঙ্গ বহে রূপের সাগরে।" মধুমতীর মনের আবরণ সরে গেল। সে তার স্মৃতি ফিরে পেল। মনে পড়ল তার নাম আদরিণী। বুঝতে পারলে যে ঐ পাগলই তার স্বামী। মধুমতীর সুখের জীবনে এল বিপ্লব। সে করালীচরণকে সব খুলে বলল। করালীচরণ মধুমতীকে মুক্তি দিলেন। ইচ্ছে করলে সে তার স্বামীর কাছে অবশ্যই ফিরে যেতে পারে। মধুমতী ফিরে গেল স্বামীর কাছে।

কিন্তু ইহজীবনে আর নূতন করে মিলন সম্ভব নয়। গঙ্গার জলে তারা উভয়ে জীবন বিসর্জন দিল।

কাহিনীটির বিশেষত্ব আছে। পরবর্তীকালে স্মৃতিবিভ্রম নিয়ে বহু গল্পই রচিত হয়েছে। পূর্ণচন্দ্র এ বিষয়ে অগ্রণী। এই আখ্যানটির মধ্যে কোন জটিলতা নেই। লেখক চরিত্রসৃষ্টির চেয়েও ঘটনা ও ঘটনার প্রতিবেদন বা effect-এর প্রতি জোর দিয়েছেন বেশী। এডগার অ্যালান পো গল্পে, তাঁর ভাষায় tale-এ, এই প্রতিবেদন

সৃষ্টিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যে সমস্ত গল্প আলোচনা করেছি তার থেকে মধুমতীর পার্থক্য এখানে। পো বলেছেন যে, প্রথম ছত্র থেকেই সেই প্রতিবেদন সৃষ্টির জন্য পরিবেশ তৈরী করতে হবে, পূর্বকল্পিত কাঠামোকে প্রতিমুহূর্তে ঘটনার দ্বারা সঞ্জীবিত করতে হবে।১ মধুমতী অ্যালান-পোর কোন *Tale*-এর সঙ্গে তুলনীয় নয় ঠিকই তবে গল্পটিতে এক রহস্যময় পটভূমিকা সৃষ্টি করা হয়েছে। মধুমতীর তীর এই কাহিনীর পটভূমি। মধুমতীর তীরই কাহিনীটিকে ঐক্য দিয়েছে। প্রথম যে মধুমতী তীরের শান্ত রূপ ও পরে জ্যোৎস্না রাত্রিতে তার উদাসী রূপ মধুমতী গল্পটির ঘটনাগুলিকে একসূত্রে গেঁথেছে। মধুমতীর মনের মধ্যেও তাই লক্ষণীয়। তার আনন্দময় মনের মধ্যে মধ্যে একটা কী যেন ভাবনা। হঠাৎ তার মনে বিষাদ ঘনিয়ে আসে। তারই পরিণতি এই শেষ দৃশ্যে। পাঠকচিত্তে প্রথম ছত্র থেকেই এই প্রতিবেদন সৃষ্টির চেষ্টা দেখা যায় এবং শেষ ছত্রে কপালকুণ্ডলার সমাপ্তির মতই কাহিনীটি শেষ হয়ে পাঠকচিত্তে প্রবল ছাপ রেখে যায়। প্লটের সারল্য, ঘটনার অতিনাটকীয়তা ও রহস্যময়তা মধুমতীর বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য **দামিনী** গল্পটিরও। প্রথম অংশটি পাঠকচিত্তের কৌতূহল জাগ্রত করার পক্ষে যথেষ্ট ঃ

> বহুদিন হইল একদিন সন্ধ্যার সময় সপ্ত বৎসর বয়স্কা একটি বালিকা ভাগীরথী তীরে দাঁড়াইয়া অনিমেষলোচনে স্রোতস্তাড়িত দীপশালা দেখিতে দেখিতে পশ্চাদ্বর্তিনী এক বৃদ্ধাকে বলিল, আই! আমার দীপ ভাসিয়া গেল। আই উত্তর করিলেন, তা যাক, এখন তুমি ঘরে চল, অন্ধকার হইল। আর একটু দেখি বলিয়া বালিকা দাঁড়াইয়া রহিল।
>
> বালিকাটির নাম দামিনী। বৃদ্ধ মাতামহী ব্যতীত আর কেহই ছিল না। সেই মাতামহীর সঙ্গে আসিয়া দামিনী এই প্রথম দীপ ভাসাইল ঃ দীপ ভাসিয়া গেল, অন্য বালিকার ন্যায় দামিনী হাসিল না, অন্য বালিকার ন্যায় ঐ আমার দীপ যাইতেছে বলিয়া সঙ্গিনীকে দেখাইল না, কেবল গম্ভীরভাবে একদৃষ্টিতে সেই দীপের প্রতি চাহিয়া রহিল।
>
> নদী প্রশস্ত, অন্ধকারে সেই নদী আবার গভীর এবং অকূল বলিয়া বোধ হইতেছিল। সেই অকূল নদীতে দামিনীর দীপ একা ভাসিয়া চলিল।২

১। "If his (লেখকের) very initial sentence tend not to be the out bringing of this effect, then he has failed in his first step. In the whole composition there should be no word written, of which the tendency, direct or indirect, is not to the one pre-established design." পোর এই উদ্ধৃতিটি *Encyclopedia Briitannica*, Vol 20 *William L. Philips* লিখিত *short story* প্রবন্ধটি (pp. 5577-79) থেকেউদ্ধৃত। *London, 1961*

২। ভ্রমর, ১২৮১, জ্যৈষ্ঠ ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৩১—৩২।

এই ব্যঞ্জনাময় সূচনাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক হতভাগ্য নারী-জীবন এই কাহিনীর উপজীব্য। কয়েকটি ছত্রে অনেক আভাস ছড়িয়ে আছে। দামিনী যে জগতে একা, মাতামহী ছাড়া তার আর কেউ নেই তা বোঝানো হয়েছে। তার প্রকৃতি গম্ভীর। কোন্ গভীর দুঃখ এই নবীন বয়সেই তাকে এমন উদাসীন করেছে। সামনে তার জীবনের অন্ধকার। দামিনীর বিবাহের পর ফৌজদার-পুত্রের দলবল তাকে ধরে নিয়ে যায়। তারপর কলঙ্কিতা বলে শ্বশুরবাড়িতে তার স্থান হয়নি। তখন নিঃস্বরিক্ত হয়ে জীবনের "অকূল নদীতে দামিনীর দীপ একা ভাসিয়া চলিল।"

মূল প্লট এইটি। সেইসঙ্গে আছে দামিনীর মাতামহী। তিনি পাগলিনী হয়ে যান। শেষ পর্যন্ত উভয়েরই ভয়াবহ মৃত্যু হয়। ফলে কাহিনীর মধ্যে বীভৎসতার অনুভব স্পষ্ট। কাহিনী হত্যা, নারীলুণ্ঠন ইত্যাদি উত্তেজনায় ভরা। রচনাটি পড়লে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ে যে, সঞ্জীবের রচনায় গৃহস্থালী ছিল না। তিনি এটিকে অবলীলায় ভালো রচনার পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু অবহেলায় কোন দৃষ্টিই দিলেন না। তিনি অবান্তর চরিত্রসৃষ্টি ও রসিকতার দিকে মনোযোগী হলেন। দামিনীর লুণ্ঠনের পর শ্বশুর বলছিলেন যে, কাল দামিনীর স্বামী রমেশ থাকলে এমন হত না। তখন গণেশচন্দ্র নামে এক প্রতিবেশী বললেন ঃ

> "রমেশের প্রয়োজন কি ? আমরাই যে আপনার পুত্রবধূকে রক্ষা করিতে পারিতাম। ...আমি তখন অন্দরে শয়ন করিয়াছিলাম। শয়ন করিলে সহজে ওঠা যায় না, তথাপি ব্রাহ্মণীর কথায় উঠিলাম, ভাল করে কাপড় পরিলাম। সেই অন্ধকারে অনুসন্ধান করিয়া নস্যাশম্বুক বাহির করিলাম, এক টীপ বিলক্ষণ গ্রহণ করিলাম। এ সকল কার্যে নস্য আবশ্যক। তাহার পর দেখি আমি ঘর্মাক্ত কলেবর। এ সকল কার্যে ঘর্ম ভাল নহে। কি জানি পাছে যবনেরা পিছলে পালায় এই মনে করিয়া গাত্র মার্জনী দ্বারা বিলক্ষণ ঘর্ম পরিষ্কার করিলাম সকল বিষয় এককালে স্মরণ হয় না গাত্র মার্জনী রাখিলে অস্ত্রের কথা মনে পড়িল। আমি বলিলাম পুতির তক্তা আনো। ব্রাহ্মণী বলিলেন, তাহার কর্ম নহে। শেষে একটি শিশু, আমার সপ্তম সন্তান একটি ইট আনিয়া দিল, আমি সেই ইট হাতে করিয়া ছাদে আসিয়া দেখি, দুর্বৃত্তেরা তখন ফিরিয়া যাইতেছে, আমি অমনি সেই ইট ছুড়িলাম।
>
> প্রতিবাসী এইরূপ আত্মবীরত্বের পরিচয় দিতেছেন এমন সময় একজন কৃষী আসিয়া বলিল যে, ফৌজদার-পুত্র পথে মারা পড়িয়াছে। কে তাহারে মারিয়াছে তাহার স্থির নাই।
>
> গণেশচন্দ্র আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন তবে সে আমারই ইটে মরিয়াছে, নিশ্চয়ই বলিতেছি আমিই যবন মারিয়াছি। আমার অব্যর্থ সন্ধান।
>
> আর একজন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'ওরূপ কথা মুখে আনা ভালো নহে। যিনি মরিয়াছেন তিনি ফৌজদারের একমাত্র পুত্র; সে পুত্রকে যে মারিয়াছে তাহার অদৃষ্টে নিশ্চয়ই শূলে আছে।'

গণেশ অমনি ভয়ে জড়বৎ হইলেন। কম্পান্বিত স্বরে বলিতে লাগিলেন আমি উপহাস করিতেছিলাম, আমি তা বলি নাই, আমি কি বলেছি, কিছুই নহে।"১

চরিত্রনক্সা হিসেবে প্রশংসনীয় অংশ। কিন্তু এই কাহিনীর মধ্যে এই সুদীর্ঘ ভাঁড়ামি অপ্রয়োজনীয়। শাসকের লোলুপ দৃষ্টি অন্তঃপুরচারিণীর প্রতিও পতিত। সেই লুব্ধ দৃষ্টির জন্য দামিনীর জীবনের দুঃখ, তার শোচনীয় মৃত্যু। নারীর জীবনের এই দুঃসহ লজ্জা ও অপমানের মধ্যেই গল্পের কেন্দ্র। এখানেও শেষ পর্যন্ত কোন বিশেষ ঘটনা বা চরিত্রের ওপর জোর পড়েনি। শেষ পর্যন্ত প্রধান হয়েছে একটি ভাব বা প্রতিবেদন।

এই ধারার আর একটি কাহিনী 'ভিখারিনী'। ভিখারিনীর বিষয়বস্তু বা ঘটনা সংস্থান দামিনী ও মধুমতীর তুলনায় অনেক কাঁচা। রবীন্দ্রনাথের বাল্যবয়সের রচনা হিসেবে গল্পটির ঐতিহাসিক মূল্য ছাড়া আর বিশেষ কোন মূল্য আছে বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের ভাষা অবিকৃত রেখে সংক্ষেপে কাহিনীটি বলিঃ

"কাশ্মীরের দিগন্তব্যাপী জলদস্পর্শী শৈলমালার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটিরগুলি আঁধার আঁধার ঝোপঝাপের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। ... এই গ্রামে দুইটি বালক বালিকার বড়ই প্রণয় ছিল। ...নীরব মধ্যাহ্নে স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়ায় শৈলের সর্বোচ্চ শিখরে বসিয়া ষোড়শ-বর্ষ অমর সিংহ ধীর মৃদুল স্বরে রামায়ণ পাঠ করিত, দুর্দান্ত রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ পাঠ করিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিত। দশম বর্ষীয়া কমলদেবী তাহার মুখের পানে স্থির হরিণনেত্র তুলিয়া নীরবে শুনিত, অশোকবনে সীতার বিলাপ-কাহিনী শুনিয়া পঙ্কজরেখা অশ্রুসলিলে সিক্ত করিত। ...পৃথিবীর মধ্যে তাহার কেহ ছিল না, কেবল একটি বিধবা মাতা ছিল আর স্নেহময় অমরসিংহ ছিল।

...একবার মোহনলাল নামে একজন ধনীর পুত্রের সহিত কমলের বিবাহের প্রস্তাব হয়। কিন্তু কমলের পিতা তাহার চরিত্র ভাল নয় জানিয়া তাহাতে সম্মত হন নাই।...

কমলের পিতার মৃত্যু হইল, ক্রমে তাঁহার বিষয় সম্পত্তি ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া গেল ...স্নেহময়ী মাতা ভিক্ষা করিয়াও কমলকে কোনমতে দারিদ্র্যের রৌদ্র ভোগ করিতে দেন নাই।...

অমরের সহিত কমলের শীঘ্রই বিবাহ হইবে। বিবাহের আর দুই সপ্তাহ অবশিষ্ট আছে। ...তখন রাজধানী হইতে সংবাদ আসিল যে রাজ্যের সীমায় যুদ্ধ বাধিয়াছে। সেনানায়ক অজিতসিংহ যুদ্ধে যাইবেন এবং যুদ্ধ শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার পুত্র অমরসিংহকে লইবেন।...কমল কুটিরে গিয়া কাঁদিতে লাগিল। অমর অশ্রুসলিলে শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিল।...

১। ভ্রমর, পৃঃ ৪০

অমর তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, কমল, কমল কোথায়? শুনিলেন স্বামী আলয়ে। মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।...কিন্তু মনে তাঁহার যতই তোলপাড় হইয়াছিল প্রশান্ত মুখশ্রীতে একটিমাত্র রেখাও পড়ে নাই...

...সেই শৈল শিখরের উপরে, সেই বকুলতরুচ্ছায়ায় মর্মাহত অমর বসিয়া আছেন। এক একটি করিয়া ছেলেবেলাকার সকল কথা মনে পড়িতে লাগিল।...

শীতকাল...অবিশ্রান্ত বরফ পড়িতেছে। কুটিরে রুগ্ন মাতা অনাহারে শয্যাগত, সমস্ত দিন বালিকা একমুষ্টিও আহার করিতে পায় নাই, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে। ...শীতে অবসন্ন বালিকা আর চলিতে পারে না...বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। রাত্রি বাড়িতে লাগিল, বরফ জমিতে লাগিল, বালিকা একাকিনী শৈলপথে পড়িয়া রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

ব্যাকুল বিধবা প্রত্যেক পদশব্দে কমল আসিতেছে বলিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন।...বিধবা বক্ষে করাঘাত করিয়া অধীরভাবে কাঁদিতে লাগিলেন।...কেহ শুনিল না, সে বৃষ্টি বজ্রে কে বাহির হইবে?...এমন সময় বাহিরে পদশব্দ শোনা গেল।...সে...গৃহে প্রবেশ করিল এবং কমলের মাতাকে কি কহিল। শুনিবা মাত্র বিধবা চিৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এদিকে তুষার ক্লিষ্ট কমল ক্রমে ক্রমে চেতনালাভ করিল...একটি প্রকাণ্ড গুহা......কতকগুলি কঠোর শ্মশ্রুপূর্ণ মুখ কমলের মুখের দিকে চাহিয়া আছে।...অবশেষে একজন কহিল আমরা দস্যু, তুই আমাদের বন্দিনী, তোর মাতার নিকট বলিয়া পাঠাইতেছি যে যদি নির্ধারিত অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না দেয় তবে তোকে মারিয়া ফেলিব।......দরিদ্র বিধবা অর্থ পাইবেন কোথায়? একে একে সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন...কিন্তু নির্দিষ্ট অর্থের অর্ধেকও সংগৃহীত হইল না।...

...দস্যুপতির পুত্র কমলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল...যদি কমল তাহাকে বিবাহ করে তবে সে তাহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিবে...

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ

...গ্রামের মধ্যে মোহনের ন্যায় ধনী আর কেহ ছিল না, আকুল বিধবা অবশেষে তাঁহার বাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। মোহন উপহাসের স্বরে হাসিয়া কহিলেন ঃ এ কি অপূর্ব ব্যাপার।...বিধবা আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন।...

(মোহনলাল উপহাস করতে লাগল। শেষে অনেক অনুনয়ের পর বললে যে সে টাকা দিতে রাজী আছে অবশ্য যদি কমলের সংগে তার বিয়ে হয়।

বিধবা অশ্রুপূর্ণ নয়নে অনেক মিনতি করল। কিন্তু সে অন্যকথা শুনল না। অবশেষে নিরুপায় বিধবা মেয়ের দস্যু হাত থেকে বাঁচবার জন্য রাজী হলেন।)

—অভাগিনী বালিকা এক দস্যুর হস্ত হইতে আর এক দস্যুর হস্তে পড়িল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

...ঘুমন্ত বিধবা দ্বারে আঘাত শুনিয়া জাগিয়া উঠিলেন। দ্বার খুলিয়া দেখিলেন সৈনিক বেশে অমরসিংহ...বিধবা কিছুই বলিতে পারিলেন না...

সহসা শুনিলেন উচ্ছ্বসিত স্বরে কে কহিলঃ ভাই অমর...

...তাঁহার জন্য বিবাহিতা বালিকার কর্তব্য কর্মে বাধা না পড়ে এই নিমিত্ত তিনি...কোথায় যে চলিয়া গেলেন তাহা কেহই স্থির করিতে পারিল না।

...বালিকার সুকুমার হৃদয়ে দারুণ বজ্র পড়িল...মৌন হইয়া সমস্তদিন সমস্তরাত্রি ভাবিত, কাহারো সহিত মিশিত না, হাসিত না, কাঁদিত না।...

কমলের পীড়া গুরুতর হইল...

অন্ধকার রাত্রের তারাগুলি ঘোর নিবিড় মেঘে ডুবিয়া গিয়াছে, বজ্রের ঘোরতর গর্জন শৈলের প্রত্যেক গুহায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং...মুষল-ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে।...

সহসা অশ্বের পদধ্বনি শোনা গেল...দ্বার উদ্ঘাটিত হইল চিকিৎসক গৃহে প্রবেশ করিলেন...বিষাদময় নেত্র চিকিৎসকের মুখের তুলিয়া কমল দেখিল সে চিকিৎসক নয়, সে সেই সৌম্য গম্ভীর মূর্তি অমরসিংহ।...প্রেম-পূর্ণ স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বিশাল নেত্র ভরিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল...ধীরে ধীরে বক্ষের কম্পন থামিয়া গেল, ধীরে ধীরে প্রদীপ নিভিয়া গেল। শোক বিহ্বলা সঙ্গিনীরা বসনের উপর ফুল ছড়াইয়া দিল। অশ্রুহীন নেত্রে, দীর্ঘশ্বাসশূন্য বক্ষে, অন্ধকারময় হৃদয়ে অমরসিংহ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন। শোকবিহ্বলা বিধবা সেইদিন অবধি পাগলিনী হইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন এবং সন্ধ্যা হইলে প্রত্যহ সেই ভগ্নাবিষ্ট কুটিরে একাকিনী বসিয়া কাঁদিতেন।"

এই তিনটি কাহিনীই পো-কথিত Tale পর্যায়ভুক্ত। ইন্দিরা, যুগলাঙ্গরীয় ও রাধারাণী থেকে এদের পার্থক্য এইখানে। **রামেশ্বরের অদৃষ্ট** গল্পটি প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমী উপকথা শ্রেণীর। বঙ্কিমের কাহিনীগুলি রূপকথার মতই মিলনান্ত। সঞ্জীবচন্দ্রের কাহিনীও মিলনান্তক তবে বেদনার ছাপ বড় স্পষ্ট। *Poetic Justice* যেন সমস্ত কাহিনীটিকে চালনা করেছে। রামেশ্বর প্রাণের তাড়নায় চুরি করেছিল, কেউ সে চুরির কথা জানত না। কিন্তু হঠাৎ এক অদ্ভুত উপায়ে তার শাস্তি হল। এক অপরাধীকে পাওয়া যাচ্ছিল না। টাকার লোভে রামেশ্বর নিজেকে অপরাধী বলে সমর্পণ করল। তারপর সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাস এল। সে ডাকাত হয়ে

গৃহ হইতে কমলের মাতা উত্তর দিলেন। সে শাখাদীপ* হস্তে গৃহে প্রবেশ করিল, এবং কমলের মাতাকে কি কহিল, শুনিবা মাত্র বিধবা চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এদিকে তুষার-ক্লিষ্ট কমল ক্রমে ক্রমে চেতন লাভ করিল, চক্ষু মেলিয়া চাহিল, দেখিল, একটি প্রকাণ্ড গুহা, ইতস্ততঃ বৃহৎ শিলাখণ্ড বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, গাঢ় ধূম্র মেঘে গুহা পূর্ণ; সেই মেঘের অন্ধকার ভেদ করিয়া শাখাদীপের আলোক-দীপ্ত কতক গুলি কঠোর শ্মশ্রুপূর্ণ মুখ কমলের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। প্রাচীরে কুঠার, কৃপাণ,প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র লম্বিত আছে, কতক গুলি সামান্য গার্হস্থ্য উপকরণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। বালিকা সভয়ে চক্ষু নিমীলিত করিল। আবার চক্ষু মেলিয়া চাহিল, একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "কে তুমি?" বালিকা উত্তর দিতে পারিল না, বালিকার বাহু ধরিয়া সবেগে নাড়াইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল "কে তুই?" কমল ভীতি-কম্পিত মৃদুস্বরে কহিল "আমি কমল!" সে মনে করিয়াছিল এই উত্তরেই তাহারা তাহার সমস্ত পরিচয় পাইবে। একজন জিজ্ঞাসা করিল 'আজ সন্ধ্যার দুর্য্যোগের সময় পথে ভ্রমণ করিতেছিলে কেন?" বালিকা আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া উঠিল, অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল "আজ আমার মা সমস্ত দিন আহার করিতে পান নাই"—সকলে হাসিয়া উঠিল, তাহাদের নিষ্ঠুর অট্টহাস্যে গুহা প্রতিধ্বনিত হইল, বালিকার মুখের কথা মুখে রহিয়া গেল, কমল সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিল, দস্যুদের হাস্য বজ্র-ধ্বনির ন্যায় বালিকার বক্ষে গিয়া বাজিল, সে সভয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল "আমাকে আমার মায়ের কাছে লইয়া যাও!" আবার সকলে মিলিয়া হাসিয়া উঠিল। ক্রমে তাহারা কমলের নিকট হইতে তাহার বাসস্থান, পিতামাতার নাম প্রভৃতি জানিয়া লইল, অবশেষে একজন কহিল, "আমরা দস্যু, তুই আমাদের বন্দিনী, তোর মাতার নিকট বলিয়া পাঠাইতেছি সে যদি নির্দ্ধারিত অর্থ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না দেয় তবে তোকে মারিয়া ফেলিব।" কমল কাঁদিয়া কহিল "আমার মা অর্থ কোথায় পাইবেন? তিনি অতি দরিদ্র; তাঁহার আর কেহ নাই; আমাকে মারিও না, আমাকে মারিও না, আমি কাহারো কিছু করি নাই।,, আবার সকলে হাসিয়া উঠিল। কমলের মাতার নিকটে একজন দূত প্রেরিত হইল। সে গিয়া কহিল, "তোমার কন্যা বন্দিনী হইয়াছে, আজ হইতে তৃতীয় দিবসে আমি আসিব, যদি পাঁচশত মুদ্রা দিতে পার তবে মুক্ত করিয়া দিব, নচেৎ তোমার কন্যা নিশ্চিত হত হইবে।" এই সংবাদ শুনিয়াই কমলের মাতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

দরিদ্র বিধবা অর্থ পাইবেন কোথায়?

* পার্ব্বত্য লোক চীড় বৃক্ষের শাখা জ্বালাইয়া মশালের ন্যায় ব্যবহার করে।

ভারতীতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প ভিখারিণীর একাংশ

গেল। শেষ পর্যন্ত এক বিচিত্র মুহূর্তে পিতাপুত্র ও স্বামী স্ত্রীর মিলন ঘটল। ঘটনার সমস্ত নাটকীয়তা সত্ত্বেও মানসিক পরিবর্তনগুলি স্বাভাবিক। অপ্রয়োজনীয় বর্ণনা ও সংলাপ এবং পার্শ্বকাহিনীহীনতা এই লেখাটির বিশেষ গুণ। মিলনান্তক কাহিনী হওয়া সত্ত্বেও বিশ বছরের নির্বাসনদণ্ডের পর যে মিলন তাতে বিচ্ছেদ রেখা আরো স্পষ্ট। মিলন মুহূর্তেও যেন দুঃখের অভিশাপ।

বঙ্কিম তাঁর গল্পগুলিতে কোন বিশেষ প্রতিভা দেখাতে পারেননি। এমন কি তাঁর প্লটের কুশলতাও যথেষ্ট নয়। শুধুমাত্র কাহিনী রস এই গল্পগুলিতে প্রচুর —তাই তৎকালীন বাঙালীমন তৃপ্ত পেয়েছিল। কিন্তু মধুমতী, দামিনী ও ভিখারিণী বাংলাগল্পের ইতিহাসে এক পদ অগ্রসর হয়েছে, কাহিনীর প্রতিবেদন সৃষ্টি, পো কথিত *effect*-এর ওপর জোর দেবার ফলে। বঙ্কিম কাহিনীর তিনটি প্রধান চরিত্র নারী। তাদের জীবন সুখে-সম্পদে তৃপ্ত। অন্য তিনটি কাহিনীরও মূল চরিত্র নারী। তিনজনেই জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বঞ্চিতা। তিনজনেই অভিশাপ। তিনটি গল্পেরই বিষয় প্রেম। মৃত্যুতে তিনটি কাহিনীর সমাপ্তি। তিনটি কাহিনীরই পটভূমি মুক্ত প্রকৃতি। প্রথম দুটিতে নদী। তৃতীয়টিতে কাশ্মীরের পাহাড়ী উপত্যকা।

প্রেম ও মৃত্যু পৃথিবীর করুণতম বিষয়। পো একদা বলেছিলেন যে জগতের করুণতম ঘটনা মৃত্যু, বিশেষ করে যদি সেই মৃত্যুর সঙ্গে প্রেমের সুরভি জড়ানো থাকে। আর সেই করুণতম বিষয় লাবণ্যময় হয়ে ওঠে যখন সেই মৃত্যু আর প্রেম সুন্দরী নারীর। তাঁর *The fall of the House of Usher* তাঁর নির্ধারিত আখ্যানক বা Tale-এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তাঁর কাহিনী আরম্ভ হয়েছে সেই পূর্ব-কল্পিত প্রতিবেদন সৃষ্টির আশায়। শরতের ম্লান, অন্ধকার শব্দহীন, মেঘলাদিনে ঘোড়ায় চড়ে শূন্য রুক্ষ মাঠ পেরোতে পেরোতে সন্ধ্যের আসন্ন ছায়ায় 'আশারের' ম্লান বিষণ্ণ অট্টালিকাটি দেখা গেল। এই সূচনাই পাঠকমনকে চঞ্চলিত করে তোলে। ছোট ছোট বর্ণনাগুলি আরো তীক্ষ্ণ, আরো ব্যঞ্জনাময়। গথিক কায়দায় গাঁথা বাড়ি, অন্ধকার সরু পথ। কালো মেঘে, চিকিৎসকের ধূর্ত হাসিতে, ঝড়ের রাত্রিতে, কবরের ভয়াবহ বর্ণনায় পো তাঁর ঈপ্সিত প্রতিবেদন সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কাহিনীতে চরিত্র বিকশিত হওয়াই প্রধান নয়, ঘটনা ও চরিত্র মিলে একটি পূর্ব-কল্পিত কাঠামোকে প্রাণ দিতে থাকে ও শেষ পর্যন্ত রহস্যময়, বেদনাময় পরিণতির দ্বারা পাঠকচিত্তকে ভরিয়ে দেয়। মধুমতী, দামিনী ও ভিখারিণী এই তিনটি গল্পই কোন না কোন দিক থেকে পো-র আখ্যানকে অজ্ঞাতসারেই অনুসরণ করেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

॥ ছোটগল্পের অভিমুখে ১৮৭৩—১৮৯০ ॥

১৮৭৩ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয় পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধুমতী।১ ১৮৯১ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয় হিতবাদী পত্রিকা। এই অন্তর্বর্তী সময়ের গল্পগুলির আলোচনা বর্তমান অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। এই সময়ে বাঙালীর গল্পতৃষ্ণা যে আরো বৃদ্ধি পেয়েছে তা বোঝা যায় কারণ পত্রিকাগুলি গল্পের প্রতি উৎসাহী হয়েছেন। দ্বিতীয়ত, গল্পগুলির মধ্যে বিষয়-বৈচিত্র্য বেড়েছে। দুঃখবেদনা মিশ্রিত জীবনের কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে হাসি-আনন্দভরা জীবনের ছবি লেখকদের কৌতুহলী করেছে। তৃতীয়ত এই সময়ে স্বর্ণকুমারী দেবী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রমুখ লেখকেরা গল্প সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী. রবীন্দ্রনাথের দুটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে—অর্থাৎ ছোটগল্পের জন্মের অব্যবহিতপূর্ব পটভূমি এই পর্ব। এই সতের বৎসর কালকে দুটি পর্বে ভাগ করা চলে। প্রথম পর্ব ১৮৭৩-১৮৮৪। দ্বিতীয় পর্ব ১৮৮৪-'৯০। ১৮৮৪ কে দুটি পর্বের ব্যবধানকাল করার যুক্তি হল এই বৎসর রবীন্দ্রনাথের দুটি গল্প প্রকাশিত হয় এবং এই দুটি গল্প ছোট গল্পের লক্ষণ সমন্বিত বলেই সমালোচকরা স্থির করেছেন।২

১

এই পর্বের প্রধান গল্পগুলির তালিকা করা হল। তার ওপর ভিত্তি করেই আমাদের আলোচনা। এইগুলি ছাড়াও, বলাবাহুল্য, আরো গল্প এসময়ে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের অনুসন্ধানে এই গল্পগুলিই পাওয়া গেছে এবং এগুলিকে এযুগের প্রতিনিধিস্থানীয় পত্রিকা থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে। কতকগুলি বড় লেখকের লেখাও বটে। কাজেই এই গল্পগুলি অবলম্বনে এই পর্ব সম্পর্কে মন্তব্য ও ধারণা করা অন্যায় হবে না মনে করা অসংগত নয়।

১। বঙ্গদর্শন, জ্যৈষ্ঠ।

২। **সুকুমার সেন : বাসাই** (৩য়) ১ম সংস্করণ ১৯৫২, **বর্ধমান সাহিত্য সভা।** পৃঃ ২০৮—৯।
(২য়) ৩য় ,, ১৩৬২ ,,
পৃঃ **২৩৬।**

বঙ্গাব্দ	খৃষ্ট অব্দ	লেখার নাম	লেখক	পত্রিকা	মাস
১২৮০	১৮৭৩-৭৪	মধুমতী	পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বঙ্গদর্শন	জ্যৈষ্ঠ
		কুসুমকুমারী	অজ্ঞাত	বঙ্গমিহির	ফাল্গুন
১২৮১	১৮৭৪-৭৫	রামেশ্বরের অদৃষ্ট	সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	ভ্রমর	বৈশাখ
		দামিনী	,,	ভ্রমর	জ্যৈষ্ঠ
১২৮২	১৮৭৫-৭৬	নিদ্রিত প্রণয়	অজ্ঞাত	বঙ্গদর্শন	জ্যৈষ্ঠ
১২৮৪	১৮৭৭-৭৮	মজলিসিগল্প	রামগতি ন্যায়রত্ন		
		ভিখারিনী	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভারতী	শ্রাবণ-ভাদ্র
১২৮৫	১৮৭৮-৭৯	গল্পরচনা	অজ্ঞাত	আর্যদর্শন	বৈশাখ
		আগমনী	শ্রীসোমড়া	কল্পদ্রুম	...
১২৮৬	১৮৭৯-৮০	জেমস ব্র্যামটন	...	মাসিক সমালোচক	বৈশাখ
১২৮৭	১৮৮০-৮১	চঞ্চলা	...	নলিনী	৬ষ্ঠ সংখ্যা
		হাবা	অজ্ঞাত১	নলিনী	৮ম সংখ্যা
১২৮৮	১৮৮১-৮২	ললিত ও সৌদামিনী	তারক গঙ্গোপাধ্যায়	জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব	অগ্রহায়ণ-মাঘ
১২৮৯	১৮৮২-৮৩	বিষ্ণুনারদ সংবাদ	...	প্রবাহ	ভাদ্র
১২৯০	১৮৮৩-৮৪	প্রেমদাসের জীবন-নাটকের এক অঙ্ক	'প্রেমদাস'	কল্পনা	৪র্থ খণ্ড
		বাঁশরী২		'নব্যভারত পত্রিকা'	
১২৯১	১৮৮৪-৮৫	নসীরাম	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	কুসুমমালা	
		নবধর্ম	,,	,,	
		ঘাটের কথা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	নবজীবন	কার্তিক
		রাজপথের কথা	,,		অগ্রহায়ণ

১। 'হাবা' গিরিশচন্দ্র ঘোষের লেখা। বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত গিরিশ গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

২। 'বাঁশরী' গ্রন্থখানি আমরা দেখিনি। নব্যভারত পত্রিকায় (১২৯০ অব্দে চৈত্র মাসে ৫৭৯ পৃঃ) পুস্তক সমালোচনায় এর সন্ধান পেয়েছি।

এই গল্পগুলির মধ্যে মধুমতী, রামেশ্বরের অদৃষ্ট, দামিনী ও ভিখারিনী পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। বঙ্গমিহিরে ছোট ছোট উপাখ্যান ও চূর্ণক প্রকাশিত হত। তার উদাহরণ ইতিপূর্বেই দেওয়া হয়েছে। 'কুসুমকুমারী' সেই চূর্ণকগুলি থেকে একপদ অগ্রসর। এখানে একটি কাহিনী রচনার চেষ্টা করা হয়েছে। ধীরে ধীরে ঘটনা যত অগ্রসর হয়েছে কাহিনীর বুনন তত ঘন হয়েছে। 'নিদ্রিত প্রণয়' একটি অস্পষ্ট রচনা। লেখক 'রূপক' নাম দিয়েছেন। কিন্তু রূপকের অন্তরালে কাহিনী নীতিমূলক আখ্যান মাত্র।

গল্প রচনা, আগমনী, বিষ্ণুনারদ সংবাদ, প্রেমদাসের জীবন নাটকের একটি অঙ্ক, জেমস ব্র্যামটন প্রভৃতি গল্পগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যায় যে কাহিনীর প্রতি লেখকরা মনোযোগী হয়েছেন। যেমন তেমন করে দ্রুত কাহিনী সমাপ্ত না করে একটি কাহিনী গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এই গল্পগুলির মধ্যে **জেমস ব্র্যামটন** পরবর্তী রোমাঞ্চকর ও ডিটেকটিভ কাহিনীর পূর্বসূরী। কয়েক সংখ্যা ধরে জেমস ব্র্যামটনের অদ্ভুত কীর্তিকলাপের পরিচয় বেরিয়েছিল। অন্য রচনাগুলি কৌতুকের। পৌরাণিক দেবদেবীকে এই কৌতুক সৃষ্টির অবলম্বন করা হয়েছে কোন কোন গল্পে। এই কৌতুক-কৌশল নিতান্ত আধুনিককাল পর্যন্ত বহমান। পৌরাণিক চরিত্র বা দেবী চরিত্র নিয়ে আধুনিক লেখকেরা অনেক দেশেই আধুনিক সাজে সাজিয়ে কৌতুকের অবতারনা করেছেন। এই গল্পগুলি তার আদি উৎস সন্দেহ নেই। 'আগমনী' গল্পটি থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করি :

> আহারান্তে ভগবতী শয়নঘরের দাওয়ায় বসিয়া তাম্বুল চর্বণ করিতেছিলেন। উঠানে দাঁড়াইয়া শ্যামার মা নামক প্রতিবাসিনী বিধবা খড়কে খাইতে খাইতে শাকের ঘণ্ট উত্তম রাঁধিয়াছিল, ঝালের ঝোলে নুন হয়নি ইত্যাদি গল্প করিতেছেন। ভগবতী কহিলেন, 'গণেশের কোলের ছেলে রামচন্দ্রের গাটা তপ্ত হওয়ায় আজ আর বৌমাকে রাঁধতে দিইনি।' এই সময়

সমালোচক লিখেছেন ঃ

"বাঁশরী নবন্যাস, মূল্য ।·, গ্রন্থকারের নাম নাই। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে একটি ক্ষুদ্র গল্প আছে, গল্পটির প্রথমাংশ তত ভাল নহে। 'প্রিয়তম', 'প্রাণাধিক' প্রভৃতি কতকগুলি অনাবশ্যক বাহ্য প্রণয়, প্রকাশক কথার ছড়াছড়ি দেখিয়া মনে একটু দুঃখের উদ্রেক হইয়াছিল, মনে করিয়াছিলাম বিচ্ছেদ সংগীত প্রচারই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সে ভ্রম দূর হইয়াছে। পুস্তকখানি শোকউদ্দীপক। এ-প্রকার পুস্তক প্রচারে দেশের উপকার আছে—স্থায়ী ফল ফলে। লেখকের শত শত ত্রুটি সত্ত্বেও আমরা এ পুস্তকের প্রশংসা না করিয়া পারিলাম না। লেখক যিনি হউন, তাঁহার গল্প-রচনার বেশ শক্তি আছে।"

লক্ষ্মী-সরস্বতী হাত ধরাধরি করিয়া হেলিতে দুলিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাদের মধ্যে লক্ষ্মীর পরিধেয় বস্ত্রখানি লাল রঙের এবং সরস্বতীর পরিধেয় বস্ত্রখানি নীল রঙের অভ্র লাগান ছোপান। উভয়ের অঙ্গে তখন তাদৃশ স্বর্ণাভরণ ছিল না, কেবল হস্তে দুগাছি করিয়া হিরের বলয়, চরণে জলতরঙ্গ মল এবং কর্ণে দুইটি করিয়া দুল শোভা পাইতেছিল. তাহারা উপস্থিত হইলে ভগবতী আদর করিয়া বসিতে বলিলেন এবং উপবিষ্ট হইলে কহিলেন, 'সরি, তুই দিন দিন এত কাহিল হচ্ছিস কেন?'
লক্ষ্মী। আহা। আজকাল ওর দুর্দশার সীমা নাই। আগে আগে ওকে তিন-বর্ণে বিদ্যা দান করতে হতো, আজকাল ছত্রিশ বর্ণে বিদ্যা বিতরণ হরতে হচ্চে। তারপর বিলাত যাওয়ার দল আছে।......এই সময় কার্তিক ঘুম থেকে উঠে এসে ছিপে বঁড়শী খাটাতে বসিলেন।......ভগবতী কহিলেন, 'তোকে বল্লে শুনিসনে, দিনে এত ঘুমুস কেন* এর পর রাত্রে একে গ্রীষ্ম তাতে মশা ছারপোকার দৌরাত্ম্যে তো ঘুম হবে না; সমস্ত রাত্রি কেবল ছটপট করে কাটাবি আর বাবা তোর মাছ ধরতে গিয়ে কাজ নেই, পয়সা দেব কিনে খাস, ভাদুরে রোদ লাগিয়ে যদি জ্বর করে বসিস মর্ত্যে যাওয়া হবে না।

হাবা, নসীরাম এবং নবধর্ম—এই গল্প তিনটি গিরিশচন্দ্র ঘোষের লেখা। গল্পগুলির মধ্যে কোন উন্নত শিল্পকৌশলের পরিচয় নেই। হাবা গল্পটিতে আতিশয্যের চরম ব্যবহার করা হয়েছে। পরোপকারী দেবেন্দ্রবাবু মারা যাওয়ার সময় তাঁর উইলের সাক্ষী করে যান বিশ্বনাথ নামে এক প্রতিবেশীকে। তিনি মারা যান স্ত্রী সৌদামিণী ও দুটি ছেলেকে রেখে। বিশ্বনাথ অর্থলোভী এবং লম্পট। সে সৌদামিনীকে সর্বস্বান্ত করে ও শেষে তাকে কু-প্রস্তাব করে'। আর সৌদামিনীর বড় ছেলে বাবুগিরি করে, বাড়ির বাইরে থাকে, মদ খায়। গল্পের সব কিছুই আতিশয্যেভরা। অবশেষে সৌদামিনী পালিয়ে যান'। বড়ছেলে বিশ্বনাথকে খুন করে। শেষে তার ফাঁসী হয় ও সৌদামিনী শোকে দুঃখে কষ্টে মারা যান। সংবাদ-পত্রের খবরের মত গল্পটি সাদাসিধেভাবে বর্ণিত ও কোন শিল্পকুশলতা নেই। গিরিশচন্দ্রের অন্য গল্পদুটি নক্সামাত্র। **নসীরাম** স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এক উৎসাহী ভদ্রলোকের ক্যারিকেচার আর **নবধর্ম** সম্ভবত ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে ঠাট্টা। বন্ধুর স্ত্রী এক নবধর্ম গ্রহণ করেছেন। বন্ধু তাঁর দুঃখের কাহিনী অন্য কোন বন্ধুকে, নিবেদন করছেন। এমন সময় বাড়ির মালী এসে বললে যে বেদব্যাস এসেছেন। ইনি তাঁর স্ত্রীর গুরুদেব। ইনি নবীন সন্ন্যাসী। ছানা মুখে দিয়ে সাধন-ভজন করেন। মণ্ডা মুখে দিলে তাঁর ভাবোদয় হয়, 'আরক' পান ক'রে বলেন, "তোমাদের সকলের পাপ পান করিলাম"। এরপর আরেক গুরুদেব এলেন, তিনি সেণ্টপল। লম্বা দাড়ী, ইজার, চাপকান পরা, মাথায় কৃষ্টানী টুপি। ইনি বিসকুট আর কাটলেট নিয়ে ধ্যান করেন। এ'রা দুজনে বেদ ও বাইবেল নিয়ে বক্তৃতা করছেন। তখন এই বন্ধুদের এক বন্ধু 'মামদো' সেজে হাজির হয়ে কোরাণের

মতবাদ প্রচার করতে লাগলেন। তখন সেখানে হৈ হল্লা উপস্থিত হল। আস্তে আস্তে আসর ভেঙে গেল। গল্পটির মধ্যে কোন শিল্পগুণ নেই।

চঞ্চলা গল্পটি যুগের তুলনায় অগ্রসর। চঞ্চলার বাবার মৃত্যুর পর সুরেন্দ্রনাথ তাকে নিয়ে যায় ও প্রতিপালন করে। চঞ্চলার বাবার ইচ্ছে ছিল তিনি চঞ্চলার সঙ্গে তাঁর বন্ধুপুত্র অরুণের বিয়ে দেন। এই অরুণও সুরেন্দ্রনাথের আশ্রয়ে থাকত। সুরেন্দ্রনাথের বিধবা বোন শৈবলিনী। সে অরুণকে ভালবাসে। কিন্তু তাদের আশা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। শৈবলিনী জানে সে বিধবা। বিধবার বিয়ে অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত শৈবলিনী মারা গেল। চঞ্চলা সুরেন্দ্রনাথকে বিবাহ করল। প্রেমবঞ্চিতা বিধবা নারীর মর্মবেদনা প্রকাশে লেখকের দক্ষতা বিশেষ প্রশংসনীয়।

> সন্ধ্যা হইয়াছে—নিশা জ্যোৎস্নাময়ী। চারিদিকে ফুল ফুটিয়াছে, সৌরভ ছুটিতেছে, কোথাও মেঘ নাই—আকাশ উজ্জ্বল নীল। সেই নীল আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, তারা ফুটিয়াছে, চাঁদের আলোয় জগৎ ভরা। ধীরে ধীরে বাতাস বহিতেছে, সরসিবক্ষে আকাশের প্রতিবিম্ব নাচিতেছে, স্বভাব নীরব।...
>
> মনে মনে ভাবিল—"এত মধুর, তবু দেখ প্রাণ জ্বলে কেন॰ ভাবিতে ভাবিতে শৈবলিনী বাপীতটে আসিয়া দেখিল বিষাদ প্রতিমা চঞ্চলা। শৈবলিনী বলিল · চঞ্চলা, সারা রাতই কি এইখানে বসিয়া থাকিবি?
>
> চঞ্চলা। রাত কি বেশী হইয়াছে। চল যাই।
>
> শৈ । 'চল যাই'। যেতে এত অনিচ্ছা কেন?
>
> চ । না
>
> শৈ । 'না' তাত জানি। চঞ্চল কি ভাবছিস?
>
> চ । দিদি, এইসব দেখিয়া আমাদের সেই কুটির মনে পড়ে। এমনি সময় সেই বল্লভীতীরে অরুণ আর আমি বসিয়া চাঁদের আলোয় বনফুলের মালা গাঁথিতে গাঁথিতে বাবার কাছে গল্প শুনিতাম। —বলিতে বলিতে চঞ্চলার কণ্ঠরুদ্ধ হইল। চঞ্চলা উঠিয়া দাঁড়াইল—অঞ্চল হইতে কতকগুলি পুষ্প ঝরিয়া পড়িল। চঞ্চলা সেইদিন মনে করিয়া মালা গাঁথিতেছিল।
>
> শৈবলিনী বলিল—"তুই মালা গাঁথিযা এখন কাহার গলায় পরাইবি? আমি অরুণকে ডাকি।"
>
> চঞ্চলা ঈষৎ লজ্জিতা হইয়া কহিল—'দিদি সকল সময়েই তামাসা।'
>
> শৈ । চঞ্চলা, মাকে তোর মনে পড়ে
>
> চঞ্চলা ধীরে ধীরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, না।
>
> শৈ । চঞ্চলা তোর বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে।
>
> এইকথা জিজ্ঞাসা করিয়া শৈবলিনী অন্যমনস্কা হইল। চঞ্চলা নীরবে বসিয়া রহিল।

গল্পটির কাহিনীগঠন যদিও সুগঠিত ও সংহত নয় তথাপি মধ্যে মধ্যে চরিত্রসৃষ্টি ও বর্ণনাভঙ্গির কুশলতা আছে সন্দেহ নেই। নারী-হৃদয়ের অবরুদ্ধ বেদনাকে এই

গল্পকার নিপুণভাবেই ফুটিয়েছেন। মিলনান্তক পরিণতির মধ্যেও বিধবার হৃদয়ের বেদনা কাহিনীটিকে ভারাক্রান্ত করেছে।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের **ললিত ও সৌদামিনী** এই যুগের আরেকটি বিশিষ্ট গল্প। এখানেও নারীর স্বাধীনতাই গল্পের প্রাণ। এই যুগের সকল সাহিত্যিকই নারীর বিশিষ্টসত্তার প্রতি বিশেষভাবে আকর্ষিত হয়েছিলেন। ললিত ও সৌদামিনী তারই একটি নিদর্শন মাত্র। কাহিনী হিসেবে যে এটি খুব উৎকৃষ্ট তা বলা চলে না। নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত এই দীর্ঘ কাহিনীর একটি গুণ হল যে কাহিনীটি ললিত ও সৌদামিনীর ভালবাসা ও বিবাহকে লক্ষ্য করে এগিয়েছে ও অন্য কোনদিকে কাহিনীকে ভ্রষ্ট হতে দেয়নি। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশত মূল চরিত্র দুটির চেয়েও পার্শ্ব-চরিত্রগুলিই এই কাহিনীতে উজ্জ্বল ও পার্শ্ব-ঘটনাগুলি বেশী উপভোগ্য। ললিত ও সৌদামিনী পরস্পরকে ভালবাসে। কিন্তু কৌলীন্যের জন্য সৌদামিনীকে ললিতের সঙ্গে বিবাহ দিতে রাজী হলেন না তার বাবা বামনদাস। মা সাবিত্রী ললিতকে পছন্দ করেছিলেন। তিনি মেয়ের মন বুঝতেন তাই মেয়ের ভালবাসাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। ললিত অসুস্থা সৌদামিনীকে দেখতে আসত, সেই অবকাশেই প্রেমের জন্ম। বাবা এদিকে রামকানাই নামে একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে স্থির করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বিয়ে করল না। পরিণতি মিলনান্তক। ললিত ও সৌদামিনীর বিয়ে হল। কাহিনীটি সহজ সরল। প্লটের কোন জটিলতা নেই। চরিত্রগুলিও স্পষ্ট ও পরিচিত। তারকনাথের উপন্যাস যেমন দরদী মনেরই সৃষ্টি, তাঁর গল্পও সেই দরদ-ভরা। সেকালে গল্পটি বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। শ্রীযুক্তা J. B. Knight এই গল্পটির ইংরেজি অনুবাদ করেন ও *Indian Magazine and Review* পত্রিকায় ছাপা হয়।

রবীন্দ্রনাথের ঘাটের কথা ও রাজপথের কথা গল্প দুটি এই যুগের সৃষ্টি। এর পর প্রায় সাত বছর পরে রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প রচনায় প্রবৃত্ত হন। এই গল্পগুলি তাই আকৃতি ও প্রকৃতিতে গল্পগুচ্ছের মূল অংশ থেকে যেন আলাদা

এই গল্পদুটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা ছিল—১৩১৪ সালে 'বিচিত্র প্রবন্ধ'র মধ্যে তাদের স্থান হয়েছিল। ১৩৩৩ সালেই প্রথম তারা গল্পগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত হল। রাজপথের কথার মধ্যে কাহিনীর কোন স্থান নেই। পরবর্তীকালের লিপিকার গদ্যকবিতাগুলির সঙ্গেই তার যোগ বেশী। এখানে কাহিনীর সূক্ষ্ম ছায়া যেন ধরা দিয়েই মিলিয়ে গেছে কোন নির্দিষ্ট কায়ার পরিচয় নেই। ঘাটের কথা অবশ্যই এসময়ের গল্পগুলির মধ্যে বিশেষ স্মরণীয়। নারীর প্রেম-বেদনাই গল্পের প্রাণ। স্বামী পরিত্যক্ত নারী কুসুম। একদিন এক সন্ন্যাসী এলেন তাদের গ্রামে। তাকে তার স্বামীর মত দেখতে। কুসুম তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করল। কিন্তু

সন্ন্যাসী কঠিন আদেশ দিলেন যে "আমাকে তোমার ভুলিতে হইবে।" কুসুম সেই কঠিন আদেশ পালন করল গঙ্গার জলে আত্মহত্যা করে। গল্পের মধ্যে কোমল-মেদুর ভাব আছে যা এযুগে কারো লেখার মত কখনই দেখা যায়নি। কিন্তু কাহিনী-গঠন শিথিল। ঘাটের কথার মধ্যে কাহিনী বলার আড়ম্বর বড় বেশী। প্রথম অনেকখানি অংশ নদী ও নদীতীরের বর্ণনায় ব্যাপৃত হয়েছে। এখনও যেন কাহিনী-বর্ণনায় লেখকের দক্ষতা নেই। তাই সরাসরি কাহিনীর মধ্যে প্রবেশের আগে লেখককে অনেক প্রস্তুত হতে হয়েছে। কাজেই কাহিনীর গঠনে দ্বিধার চিহ্ন অতি সুস্পষ্ট। কিন্তু চরিত্রসৃষ্টি ও ঘটনাবর্ণনার মধ্যে কুশলতাও অতি স্পষ্ট। করুণ প্রেমের লাবণ্য-বিলাস সংযমের কঠিন প্রস্তরের ওপর মাধুর্য বিস্তার করেছে। কাহিনী-শেষের সংযমে এক অনাগত কুশলী শিল্পীর পদধ্বনি স্পষ্ট।

২

১৮৮৪-৯০ দ্বিতীয় পর্বের কালসীমা। এই অংশে বাংলা গল্পের অগ্রগতি অত্যন্ত স্পষ্ট। এই পর্ব বাংলায় গল্প বেশ দ্রুতই প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথমেই একটি বাছাই-করা তালিকা প্রস্তুত করা হল। এই গল্পগুলির ওপর ভিত্তি করেই আমাদের আলোচনা চলবে।

এখানে উল্লিখিত অনকেগুলি গল্প সমালোচক চক্ষুর অন্তরালে এতদিন ছিল। কোন কোনটি বা ঈষৎ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে মাত্র। অনেকগুলি গল্পের লেখক অজ্ঞাত। তবে নবজীবনে প্রকাশিত গল্পগুলি অক্ষয়কুমার সরকারের। অনেকগুলি গল্পই এখন দুষ্প্রাপ্য। পত্রিকার জীর্ণ কলেবরে তাদের স্থান। পত্রিকা থেকে দ্বিতীয় জন্মলাভ অনেকেই করেনি। তাই কোন কোন গল্পের সংক্ষিপ্ত রূপ এখানে উদ্ধৃত করা হল। লেখকের ভাষা অবিকৃত রেখে যথাসাধ্য গল্পের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত না করে গল্পগুলিকে সংক্ষিপ্ত করা হল। এই গল্পগুলিকে আমরা তিনটি দিক থেকে আলোচনা করব, বিষয়বস্তু, প্লটগঠন ও কাহিনীর প্রকৃতি।

৯১/১৮৮৪ ৮৫	বড়গল্প নয়	অজ্ঞাত	নব	ফাল্গুন	(পৃঃ ৪৯৯-৫০০)
১২৯২/১৮৮৫-৮৫	হলধর ঘটক	,,	,,	শ্রাবণ	(পৃঃ ৪৭- ৫২)
	ভজহরির বিয়ে	,,	,,	কার্তিক	(পৃঃ ২০৭- ১৭)
	বাঙ্গালার বসন্তোৎসব	শ্রীশচন্দ্র মজুমদাব	বালক	চৈত্র	(পৃঃ ৫৬২- ৬৬)
১২৯৩/১৮৮৬-৮৭	কুমার ভীমসিংহ	স্বর্ণকুমারী দেবী	ভারতী ও বালক	বৈশাখ	
	ক্ষত্রিয় রমণী	,,	,,	জ্যৈষ্ঠ	
	পূজার গল্প	অজ্ঞাত	নবজীবন	আশ্বিন	(পৃঃ ১৭৯- ৮৯)
	আর্নিপসী	,,	,,	মাঘ	(পৃঃ ৩৯৬-৪০৬)
২৯৪ ৮৭-৮৮	চুরি না বাহাদুরি	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	ভারতী ও বালক	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ (১৮০৬ শক)
২৯ ৮-৮৯	গল্পস্বল্প	স্বর্ণকুমারী দেবী			(পৃঃ ২০- ২২)
	যামিনী	অজ্ঞাত	নবজীবন	৪র্থ ভাগ ১ম সংখ্যা বৈশাখ	
	ভূতের গল্প	,,	,,	অগ্রহায়ণ (পৃঃ ১৮৭)	
১২৯৬/১৮৮৯-৯০	দুইবার	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	ভারতী ও বালক	বৈশাখ	
	বাঁধবের বাসনা	,,	ভারতী	আষাঢ়	
	ঘরের অলক্ষ্মী	,,	ভারতী ও বালক	আষাঢ়	
	ভৈরবী	,,	,,	শ্রাবণ	
	চিরকুমারী	,,	,,	ভাদ্র	
১২৯৭/১৮৯০-৯১	বনগ্রামে দুর্গোৎসব	অক্ষয়কুমার সেন	সুবোধিনী		
	সনাতন সর্দার	অজ্ঞাত	জন্মভূমি		
	বারুই কন্যা রমা	অজ্ঞাত	,,		
	দেনাপাওনা	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	হিতবাদী		
	পোস্টমাস্টার				

॥ বড় গল্প নয় ॥

গোবর্ধন মোদকের পুত্র নিধিরাম মোদক। নিধিরাম—গোবর্ধন ও তদীয় সহধর্মিণীর একমাত্র সন্তান। সুতরাং আজন্ম যৎপরোনাস্তি সমাদরে লালিত-পালিত। একখানি সন্দেশ মিঠাইয়ের গোবর্ধনের দোকান ছিল, তাহাতেই তাহার ও তাহার স্ত্রীপুত্রের ভরণ পোষণ চলিত। নিজে চিরকাল কষ্ট পাইয়াছে তাহাতে গোবর্ধনের দুঃখ নাই, কিন্তু প্রাণাধিক পুত্র যে কষ্ট পাইবে ইহা তাহার সহ্য হইবে না, এজন্য আপনার যৎসামান্য উপার্জন হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ নিধিরামের শিক্ষার ব্যয়ের জন্য বাঁচাইয়া রাখিত। বড় হইলে নিধিরামকে ইস্কুলে ইংরাজি শিখাইবে, ইহাই গোবর্ধনের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। ইস্কুলে দিলেই যে নিধিরাম অচিরে বিদ্বান হইবে মোদক দম্পতী তাহার প্রচুর প্রমাণ পাইয়াছে।...

কিন্তু যখন নিধিরাম ৩/৪ বৎসর পাঠশালায় কাটাইল অথচ নিজের নাম বানান করিতে শিখিল না; তখন গুরুমহাশয়ের আশঙ্কা হইল...যাহাই হউক এ আশঙ্কা আরো দুই এক বৎসরের মধ্যে দূর হইয়া গেল। নিজের নাম দূরে থাকুক, নিধিরাম তাহার বাপের নাম পর্যন্ত বানান করিতে শিখিল। গোবর্ধনের বিদ্যার দৌড়ও ঐ পর্যন্ত...সহধর্মিণীর মত লইয়া গোবর্ধন নিধিরামকে ভবানীপুরের পাদরী সাহেবদের স্কুলে ভর্তি করিয়া দিল। পাঠশালায় যেরূপ নিধিরামের বুদ্ধি ঘুরিত, ইস্কুলেও সেইরূপ ঘুরিতে লাগিল। যে শ্রেণীতে যায় সেই শ্রেণীতে ঘোরে...এইরূপে দুতিন বৎসর এক এক শ্রেণীতে থাকিয়া নিধিরাম চতুর্থ শ্রেণীতে উঠিল। নিধিরামের সম-পাঠীরা কিন্তু এক্ষণে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া জলপানি পাইতেছে।... গোবর্ধন বিরক্ত হইয়া কহিল 'তোর সঙ্গে একত্তর যারা পড়তো তারা এখন জলপানি পাচ্ছে, তুই পাসনা কেন?'

নিধিরাম। "তা কি তুমি, বল্লে বুঝবে? ওদের পড়া সব কাঁচা হয়ে আছে, এক বছরের বেশী এক কেলাসে থাকে না। আমি যা শিখছি, সব পাকা হচ্ছে। ওদের জলপানি এক বছর কি জোর দুবছর থাকবে। আর আমি যখন জল-পানি পাব তখন ১০ বছর ক্রমাগতই পাব।...

গোবর্ধন ভাবিল তাই বা হবে। সুতরাং আর কিছু বলে না। নিধিরাম এখন প্রাপ্ত বয়স্ক..পিতামাতাকে কিছু না বলিয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিল... সুরাপানে শিক্ষা করিল...ক্রমে নিধিরামের ১০৲-১২৲ টাকা দেনা পড়িল... অনেক চিন্তা করিয়া নিধিরাম এক দিবসে বাপের নিকট গিয়া কহিল "এত-দিনের পর আমার পড়া পাকা হয়েছে, এখন ১৫৲ টাকা খরচ করিতে পারিলেই আমিও জলপানি পাব। এই ১৫৲ টাকা কালই চাই।"

গোবর্ধনের গৃহে সে দিবস অন্ন নাই...গোবর্ধন রাগ করিয়া কহিল, 'আমি পাকানো বিদ্যাও চাইনে, তোর জলপানিও চাই নে। তোর খরচ জুগিয়ে জুগিয়ে আমার যথাসর্বস্ব গিয়েছে।...যা তুই আমার বাড়ি থেকে যা। আমার বাড়ীতে তুই আজ অবধি ঢুকতে পাবিনে'।

গোবর্ধনের সহধর্মিণী পুত্রের পক্ষ লইয়া স্বামীর সহিত বিবাদ আরম্ভ করিল। দম্পতির কলহে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া বটে কিন্তু গলা কার কতদূর ওঠে তাহা শাস্ত্রকারেরা নিরূপণ করিয়া যান নাই। আমরা অনেক দেখিয়া শুনিয়া স্থির করিয়াছি যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের গলা অন্ততঃ ১০ গুণ উঠে। সুতরাং মোদক পত্নী যখন কথা কহিতেছেন তখন একজন চাপরাশী বাহির হইতে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছিল "এই কি গোবর্ধনবাবুর বাড়ী" তাহা কাহারও কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই। চাপরাশী উত্তর না পাইয়া অনাহূত হইয়াও গৃহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল।..."এই কি গোবর্ধনবাবুর বাড়ী।"

গোবর্ধন অবাক। এতকাল কেহ তাহাকে বাবু বলিয়া ডাকে নাই। সাহস করিয়া নিজে বাবু খ্যাতি লইতে অসমর্থ। এজন্য জিজ্ঞাসা করিল 'কোন্ গোবর্ধনবাবু ?'

চাপরাশী উত্তর করিল, 'জনার্দনবাবুর ভাই'

...এস্থলে পাঠককে বলিয়া দেওয়া উচিত। গোবর্ধনের এক ভাই ছিল, তাহার নাম জনার্দন। গোবর্ধনের স্বজাতীয় কোন এক ধনী ব্যক্তি জনার্দনকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করে।...মৃত্যুর পূর্বে জনার্দন উইল করিয়া গোবর্ধনকে নগদ এক হাজার টাকা ও সাম্বৎসরিক দুইশত টাকা আয়ের ভূমি সম্পত্তি দিয়া গিয়াছে।

...পত্র প্রাপ্ত মাত্র গোবর্ধন লোক পাঠাইয়া টাকা আনিল। টাকা আসিলে, তর্ক উপস্থিত হইল, এ টাকায় কি করা উচিত ? নিধিরামের মত, নগদ টাকার একটা বাড়ী খরিদ করা উচিত এবং ভূমি-সম্পত্তির আয়ে ভরণপোষণ চালান কর্তব্য; আর ময়রার ব্যবসায় একেবারে ত্যাগ করা কর্তব্য। নিধিরাম উপযুক্ত পুত্র বলিয়া নিধিরামের কথাই সকলের গ্রাহ্য হইল।...অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল চানকে বাটি খরিদ করিতে গমন করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিধিরাম বাটী খরিদার্থে চানকে আসিয়াছে। বাজারে এক দোকানে বাসা করিয়া নিত্য নিত্য বাটির অনুসন্ধান করে...এক দিবস অপরাহ্নে পারকে বেড়াইতেছে এমন সময় একটি পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল।...নিধিরাম কামিনীর রূপ লাবণ্য দর্শন করিয়া...সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল। পুরুষটি অগ্রসর হইয়া নিধিরামের নাম জিজ্ঞাসা করিল। নিধিরাম নাম বলিল...পরিচয় দিল। নিজ উদ্দেশ্য সাধনার্থে যে অর্থ আনিয়াছে, তাহাও প্রকাশ করিতে বাকি রাখিল না।...

নিধিরামের সে রাত্রে আনন্দে নিদ্রা হইল না।...অদৃষ্ট ক্রমে পুনরায় যুবক ও কামিনীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল।... দীনবন্ধু [সেই যুবকটি] পরদিবস তাহাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন।

এইরূপ কএক দিবস পরেই নিধিরামের সহিত ব্রাহ্মদ্বয়ের যৎপরোনাস্তি

সদ্‌ভাব হইল।...বাটী অনুসন্ধান করার কথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে।...এক-দিবস যথাসময়ে ব্রাহ্মদের বাটীতে গিয়া দেখিল দীনবন্ধু বাটীতে নাই...... আসিবার সময় কামিনী হঠাৎ নিধিরামের হস্ত ধরিয়া কহিল, "দীনবন্ধুবাবু আর সাতদিন বাটী আসিবেন না। তিনি বর্ধমানে গিয়াছেন। আমার একলা থাকতে বড় কষ্ট হয়। অনুগ্রহ করিয়া কাল আর একটু সকাল সকাল আসিবেন।"

কামিনীর হস্তস্পর্শে নিধিরামের শরীর শিহরিয়া উঠিল।...

পরদিন সকালে সকালে আহারাদি করিয়া নিধিরাম ব্রাহ্মিকার বাটীতে গমন করিল। অনেকক্ষণ একথা সেকথার পর ব্রাহ্মিকা নিকটে আসিয়া নিধিরামের স্কন্ধে নিজ মস্তক স্থাপন পূর্বক কহিল, 'একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, সত্য বলবে কি?'

...ব্রাহ্মিকা নিধিরামের দিকে কোমল নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসিল, "তুমি আমাকে ভালবাস কি?"...

নিধিরাম...কহিল, "আমি তোমাকে ভালবাসি না?" যে অবধি তোমার সহিত দেখা হইয়াছে, সে অবধি তুমিই ধ্যান, তুমিই জ্ঞান।

এমন সময়ে গৃহদ্বারে পদপ্রক্ষেপের শব্দ হইল।...দাসী...কহিয়া গেল, বাবু আসছেন। ব্রাহ্মিকা ব্যস্ত হইয়া কহিল 'এখন উপায় কি? তুমি ঐ পরদার আড়ালে যাও।' নিধিরাম কহিল, "কেন আমি খিড়কীর দুয়ার দিয়া বাহির হইয়া যাইনা কেন?"

ব্রা। না, না, তাহলে সর্বনাশ হবে।......উপায়ান্তর না দেখিয়া পরদার আড়ালে লুক্কায়িত হইয়া রহিল।

ব্রাহ্ম এবং তাহার আর একটি বন্ধু উভয়ে আসিয়া গৃহে...বসিয়া নানা-বিধ গল্প করিতে লাগিল। ব্রাহ্মিকা আসিয়াও সেই গল্পে যোগ দিল। কহিল, 'এসেছ, নাঃ বাঁচলাম। এই দুদিন একা একা থেকে আমি পাগল হবার যো হয়েছি।...নিধিরাম মনে মনে বলিতে লাগিল "বেশ, বেশ, কামিনী কি কুহকিনী।" মশার কামড়ে নিধিরামের প্রাণ ওষ্ঠাগত। জোরে চাপড়ে মশা মারিবার যো নাই। মূষিকগণ গৃহের একোণ ওকোণ কিচ্ কিচ্ শব্দ করিয়া বেড়াইতেছে। নিধিরাম সর্বদাই ভয় পাইতেছে, পাছে তাহাকে কামড়ায়। ক্রমে রাত্রি দুই প্রহর হইল...দীনবন্ধু চুরুট দিলে বন্ধুবর চুরুটটি ধরাইয়া টানিতে আরম্ভ করিল।...চুরুটের গন্ধ পাইয়া নিধিরাম নাক টিপিয়া ধরিল এবং অতিকষ্টে প্রথমবার হাঁচি সংবরণ করিল, কিন্তু কতক্ষণ নাক টিপিয়া থাকিবে? অবিলম্বে হাঁচিয়া ফেলিল। বন্ধুবর 'কেও কেও' বলিয়া পিছাইল। কিন্তু পুনঃ পুনঃ হাঁচায় আলোক আনিয়া...নিধিরামকে ধৃত করিল। নিধিরামের হস্ত ধরিবামাত্রই বেহুঁস। কিন্তু দুই চারি বেত্রাঘাত রূপ উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগে. চৈতন্য হইল।...নিধিরাম রোদন করিয়া কহিল...আমার কাছে যা আছে সব নেও।'...

শুনা গিয়েছে, ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মিকা ও বন্ধুবর এইরূপেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করে...গোবর্ধনের পরলোক হইয়াছে। নিধিরাম এখন কলিকাতার চীনে-বাজারের মোড়ে দোকান করিয়াছে।...

। ভজহরির বিয়ে ॥

দোলগোবিন্দ, মান গোবিন্দ, ভজ গোবিন্দ, গুরু গোবিন্দ, ভজহরি, কৃষ্ণ-হরি, রামহরি, পণ্ডু, ন্যায়চণ্ডু, হাবু বিদ্যালঙ্কার, গোবর্ধন, শিরোমণি, কেলু নীলু চাকর—সকলেই পাকা মেম্বার। আড্ডা ভারি গুলজার, মহা সরগরম। কেউ গাঁজা টিপচে, কেউ আগুন চড়াচ্চে, কেউ নলচে ফাটাচ্চে, কেউ দম মেরে ভোঁ হয়ে বসে আছে—কেউ রাজা-উজীর মারছে—ধুমে ঘর অন্ধকার।

(ভজহরির কেউ নেই। শুধু মা। দুপুর বেলা মা কেঁদে বললেন, ভজ, শুধু গাঁজা খেয়ে দিন কাটালি, ভেবেছিলুম বিয়ে দোব। বৌর মুখ দেখে মর্ব। কিন্তু তোকে কে মেয়ে দেবে? গাঁজা খাওয়া ছেড়ে দে।)১

বউ কি মজার জিনিষ। বউর নাম শুনে ভজর মনে সুখের তরঙ্গ উছলে উঠল। বল্লে মা, তুমি আর দুঃখু করো না। আমি আর গাঁজা খাবো না।..শুয়ে ভাবতে লাগল, গাঁজা খাবো না বেশ, কিন্তু দূর থেকে দেখে আসতে দোষ কি।...এই ভেবে আস্তে আস্তে আড্ডার অভিমুখে চলল।.. অমনি সকলে ধরে ভজাইকে টানাটানি—কাঁধে করে নৃত্য।—ভজহরির কিছুতেই সুখ নাই, প্রাণ কেঁদে উঠল, বল্লে—ভাই আর আমি গাঁজা খাবো না, আর এখানে আসব না, তোমরা আমাকে বিদায় দেও। ভেউ ভেউ করে ভজই কেঁদে আকুল।...সকলেই গাঁজা সেজে এনে ভজাইকে ধরে টানাটানি, ভজাই—গাঁজা খা। তুই কি একেবারে অধঃপাতে গেলি।

(ভজা সব ব্যাপার বললে। সবাই বললে ঠিক আছে, গাঁজা খাওয়া চলুক। তোমার বিয়ে আমরা দেব। কানাই গ্রামে কসাই ঠাকুরের একটি মেয়ে আছে। তিনি তখন সবে তামাক সেবন করছেন—সবাই সদলে গিয়ে হাজির। মেয়ের বিয়ে নিয়ে কথাবার্তা হল। কর্তার টাকা চাই—দু হাজার টাকা না হলে তিনি মেয়ের বিয়ে দেবেন না। অনেক দর কষাকষির পর দেড় হাজার সাব্যস্ত হল। শেষ পর্যন্ত বিয়ের দিনও ধার্য হল। কিন্তু ভজহরি কোথায় টাকা পাবে। সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। দলের সবাই টাকার জন্য উঠে পড়ে লাগল। দোল গোবিন্দ কোন রকমে একশ টাকা জোগাড় করলে। তারপর বসে বসে নানা ফন্দী ফিকির আঁটলে)

দোল গোবিন্দ টাকা পেয়ে নাচতে নাচতে আড্ডায় গেল। আর ভয় কি। টাকার জোগাড় হয়েছে। সকলেই দোলকে ধন্নি ধন্নি বলিল। বেলা দুটোর সময়, সকলে মহাসমারোহে বাজনা বাদ্দি পাল্কি বেহারা একমণ চিঁড়ে মুড়কি আধমণ দই,.দুইশত কলাপাতা, পাঁচসের গাঁজা নিয়ে বে দিতে চলিল। আমোদ দেখে কে?...

১। বন্ধনীর মধ্যের অংশ বর্তমান লেখকের।

রাত দশটার সময় অর্ধেক পথ গিয়ে সকলে এক ঠাঁই আড্ডা গাড়িল। মুহুর্মুহু গাঁজা চলিল।...ভজর আর সে আহ্লাদ নেই—তার প্রাণ ধড়পড় কর্চ্চে। যত রাত্রি দেরি হচ্ছে ততই তার মন কেঁদে কেঁদে উঠছে—ভয় হচ্ছে। ভাই গোধূলি লগ্নে বে, আর দেরি কর না। এই কথা বলে কেবল সকলকে খ্যাঁচকাচ্ছে।

এদিকে গোধূলি লগ্নে বে।...ক্রমে রাত হল। বরের দেখা নেই। মেয়ের গায়ে হলুদ হয়েছে, বে দিতেই হবে, না দিলে জাত যাবে। মহা বিপদ।.. কর্তার মাথা ঘুরে গেল—জাত যাবে বলে নয়, পাছে টাকাগুলো মারা যায় এই ভয়ে। কামিনী, ভামিনী, গোলাপ...যত সব নারী বাসর জাগবে এসে আসর করে বসে ছিল হতাশ হয়ে ভগ্নহৃদয়ে একে একে ঘরে ফিরে গেল। কর্তার মুখে কেবল সর্বনাশ হল—সর্বনাশ হল—দেড় হাজার টাকা।

(সবাই বললেন মেয়ের বিয়ে দিন, নইলে জাত যাবে। এই গ্রাম থেকেই পাত্র আনছি। ছেলে মন্দ নয়। কর্তা রেগে টং। আমার মেয়ে আমার জাত আমি বুঝবো। সেজেগুজে বড় কর্তামো করতে এসেছো।)

কতলোকে কত বুঝাইল—কত শাস্ত্র কথা উঠিল। কর্তা কিছুতেই রাজি হলেন না। রাত্রি বারোটা বাজিল। দেখে শুনে পুরুৎ ম্লান মুখে ঘরে ফিরে গেলেন, তাঁর বিদায়ের টাকা মারা গেল। ফলারে ব্রাহ্মণ গাল দিতে দিতে ফিরে গেল। ফচকে ছোঁড়ারা হাততালি দিয়ে ধুলো ছড়াতে ছড়াতে ছড়া বাঁধতে বাঁধতে চলে গেল। কর্তাও গালে হাত দিয়ে ভাবতে ভাবতে অন্দরে গেলেন। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লেন। বে বাড়ী নীরব।...

রাত পোহায় পোহায় কর্চে এমন সময় চুপে চুপে দোল গোবিন্দরা দলে দলে বর নিয়ে নিঃশব্দে উপস্থিত। রাত্রি জেগে গোলমালে গ্রামের ও বে বাড়ীর সকলেই অকাতরে ঘুমুচ্ছে। নীলু চাকর পাঁচিল টপকে বাড়ীর ভিতর গিয়ে দরজা খুলে দিল, সকলে ভিতরে গিয়ে উঠানে, রকে—স্থানে স্থানে যে সকল কলাপাত ছিল পাতিয়া দই চিঁড়ে মাখিয়া খাইল। ছড়াইল এবং পরিশেষে পাতাগুলা বাড়ীর চারিদিকে ফেলিল।

যেন বে হয়ে চুকে বুকে গেছে এইভাবে ভজহরিকে সাজাইয়া চণ্ডীমণ্ডপে বসাইয়া আপনারা পাশে বসিল।

(সকাল বেলা পুরুৎ দেখতে এলেন—কী, হল ব্যাপারটা। পুরুৎ ঠাকুরকে নমস্কার করে দোলগোবিন্দ বললে, মশাই আসুন, বসতে আজ্ঞা হক। আপনি মনে কর্বেন না আমরা আপনার টাকা মারব। এই বলে পাঁচটি টাকা দিলেন। পুরুৎমশাই ত খুব খুশি।)

তারপর বলল, দেখুন কর্তামশাইর ব্যবহার। ঝড় বৃষ্টিতে আমাদের আসতে দেরী হল। বড় বড় গাছ ভেঙে পড়ল। যাইহোক অনেক রাত্রে এলাম। আমাদের সঙ্গে শিরোমণি ছিলেন তিনিই বিয়ে দিয়েছেন। দেড় হাজার টাকা দিয়াছি তিনি আরো দুশো টাকা চান। দেখুন আপনারা পাঁচ-জন ভদ্রলোক--ব্যবহার কি ভালো—। পুরুৎ ঠাকুর কর্তার ব্যবহারের নিন্দে করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে যে সব মেয়েরা বাসর জাগতে এসেছিল তারা শুনল যে বিয়ে হয়ে গেছে। কর্তা মেয়ে পাঠাচ্ছে না বলে পুরুৎ বকছে।

তারা বাসর জাগানির দাবী করল। দোল গোবিন্দ সঙ্গে সঙ্গে দশটাকা দিল। পাড়ার পান্ডা মাতব্বর কয়েকজন এল। দোল গোবিন্দ তাদের দশটাকা দিল। তারা হাসিমুখে বললে, সত্যি এমন ভদ্রলোক আর হয় না। সেই ভদ্র-লোকদের সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার, কর্তার কি দুটো মাথা। দেখি কে কি করে। আমরা মেয়ে পাঠাব।

তারা হৈ হৈ করে টানতে টানতে মেয়েকে বার করে আনল।

আর কর্তা বুক চাপড়াতে চাপড়াতে পুলিশের কাছে ছুটলেন, ওগো মেয়ের বিয়েই হয়নি, আমি এক পয়সাও পাইনি—আমার দেড় হাজার—দেড় হাজার টাকা।

হেড কনেষ্টবল এলেন। দোল গোবিন্দ বললে, জমাদার মশাই আসুন। শুভকার্যে আপনারাও কিছু পেয়ে থাকেন—এই নিন পাঁচ টাকা। জমাদার ত আহ্লাদে ফেটে পড়ে। বললে কর্তা বোধহয় পাগল হয়ে গেছে। ঠিক আছে আপনারা চলে যান।

বৌ পাল্কীতে উঠল। বেহারারা ছুটল।

সেই রাত্রিতে ভজর বাড়িতে মহাধুমধাম।

শুনা গিয়াছে যে বৌভাতের সময় গাঁজার ধুমের, অন্ধকারে নববধূ—পরিবেশন করিবার সময় কিছুই দেখিতে পায় নাই।

॥ যামিনী ঃ (কাহিনীর সারাংশ) ॥

যামিনীর পিতার বাড়িতে রামকৃষ্ণ নামে একটি ছেলে পালিত হত। রামকৃষ্ণ ও যামিনী উভয়ে উভয়কেই ভালবাসত। কিন্তু যামিনী ব্রাহ্মণ কন্যা। রামকৃষ্ণ শূদ্র। কাজেই তাদের বিয়ে হল না। যামিনীর অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেল। আর রামকৃষ্ণের জন্য একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দিলেন।

রামকৃষ্ণ চাকরি করে। কিন্তু মন দিয়ে করে না। কারণ তার ধারণা সে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবি। সুতরাং মনদিয়ে কাজ করা সম্ভব নয়। কারণ কবিরা উদাসীন হয়। এই সময় যামিনীর জীবনে বড় দুর্বিপাক এল। তার পিতৃবিয়োগ হল। এবং কদিন পরেই স্বামীর মৃত্যু হল। সম্পূর্ণ নিঃসহায় হয়ে পড়ল সে। তখন রামকৃষ্ণ যামিনীকে চিঠি দিল, তোমরা কলকাতায় আমার কাছে এস। এই ঔদার্যের পরিচয় সে দিল। কারণ কবিরা নাকি উদার। ইতিমধ্যে সে যামিনী ও তার মাকে নিয়ে এল। সে এখন নাকে সোনার চশমা রাখে। চুলগুলি এলোমেলো। চাদর লুটোয়। ভাবল সে বালজাক হবে। কিন্তু সম্পাদকেরা লেখা ছাপল না। সে পত্রিকা বার করল চলল না। ইতিমধ্যে অফিসে একহাজার টাকার হিসাবে গোলমালে চাকরি গেল। পুলিশ ধরল। যামিনীর বুদ্ধিমত্তায় সে যাত্রায় রক্ষা পেল।

ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ বিবাহ প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু কোনদিনই সে সম্মত হয়নি। কাহিনীর শেষে আবার যেদিন রামকৃষ্ণ শেষবারের মত প্রস্তাব করল। যামিনী বললে আচ্ছা একটু দাঁড়াও। রামকৃষ্ণের মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। "সহসা যামিনীর শয়নকক্ষ হইতে এক সন্ন্যাসিনী নিষ্ক্রান্তা হইলেন। সন্ন্যাসিনী হাসিয়া বলিলেন, মা দেখ, রামকৃষ্ণ দেখ। আমার বিবাহের পরিচ্ছেদ কেমন হইয়াছে।"

॥ সনাতন সর্দার ॥

প্রথম পরিচ্ছেদ :

আশ্বিন মাস। এখনও গঙ্গার জল 'কানে কানে' পূর্ণ—হ্রাস নাই, বরং বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সময়ে জলপথে যাত্রা করা অনেক সময়ে ভয়ের কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা বলিয়া যে কেহ জলযাত্রা করে না এমন নহে। প্রয়োজন উপস্থিত হইলে সকলকেই যাইতে হয়। যাহা হউক, এই আশ্বিন মাসে পঞ্চমীর দিন একখানি ক্ষুদ্র নৌকা পালভরে ভাগীরথীর বিশাল বক্ষ দিয়া তীর বেগে উত্তরাভিমুখে যাইতেছে। দূর হইতে দেখিলে বোধহয় যেন কোন একটি বৃহদাকার পক্ষী শ্বেত পক্ষ বিস্তার করিয়া স্রোতে গা ভাসাইয়া যাইতেছে।

উক্ত নৌকার আরোহী দুইজন। একজন বাবু—অপরজন তাঁহার ভৃত্য। বাবুর নাম কৃষ্ণকিশোর আচার্য। তাঁহার বয়স ৪১ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। বর্ণ গৌর, মধ্যমাকৃতি, ললাট উন্নত ও প্রশস্ত, চক্ষু বিশাল এবং শান্তপ্রভ. মুখমণ্ডল শ্মশ্রুল, গম্ভীর অথচ কোমল এবং উদার। তাঁহার যেন দেব-বিনিন্দিত বপু, কান্তিও তদনুরূপ সুশীতল। তাঁহার মুখে প্রসন্নতার মাধুরী, হৃদয়ের মহত্ত্ব ও চিত্তের ঔদার্য ফুটিয়া বাহির হইতেছে।...কৃষ্ণকিশোর বাবুর বাড়ি হরিপুর। তিনি কলকাতায় কোন এক হাউসের মুৎসুদ্দি। বেতনও মোটা—উপার্জনও যথেষ্ট আছে।......তাঁহাকে ষষ্ঠীর দিন বাড়ী পঁহুছিতেই হবে। এজন্য মাঝিদের বিশেষ পুরস্কৃত করিবেন বলেন।...... তাঁহার সংগে বিশ্বাসী প্রভুপরায়ণ ভৃত্য সনাতন সর্দার। সনাতনের বয়স প্রায় ৪২ বৎসর। সে কিছু খর্বাকৃতি। তাহার বক্ষ বিস্তৃত—যেন লোহার কপাট। হস্তপদ মুদ্গরের ন্যায় গোলগাল এবং সুবদ্ধ, পেশী বিজড়িত।

..কিছুদূরে গেলে সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে।...নিশাচন্দ্রিকা শালিনী। গঙ্গার জল উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে ঝিকমিক করিতেছে। আকাশে দুই একখণ্ড মেঘ দেখা যাইতেছে।—তাহা আবার চন্দ্রকে কখন কখন ঢাকিয়া ফেলিতেছে... এমন সময়ে নীল কাদম্বিনী সমুদয় আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া দিঙমণ্ডল একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।...ক্রমে ঝড় প্রচণ্ড মূর্তি ধারণ করিল।... মাঝিরা প্রাণপণেও নৌকা স্থির রাখিতে পারিল না।...সৌভাগ্য ক্রমে নৌকা তীরে যাইবার পূর্বেই ঝড়বৃষ্টি থামিয়া গেল।...

...যথাসময়ে নৌকা তীর লগ্ন হইল। কৃষ্ণকিশোর বাবু মাঝিদের নোঙর করিতে বলিলেন এবং সে রাত্রি সেখানে বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু একথায় মাঝিরা কিছুতেই রাজি হইতে চাহে না।...যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, সে সময়ে সুখসাগরের নিকটবর্তী স্থানে ডাকাইতদের অত্যন্ত ভয় ছিল।...এসকল কথা মাঝিরা বেশ জানিত সেইজন্যই কৃষ্ণকিশোর বাবুকে সতর্ক করিয়া দিতেছিল।...যাহাই হউক তিনি সনাতনকে ডাকিয়া

বলিলেন, 'সনাতন মাঝিরা যাহা বলিল, তাহা শুনিলে ? আমি কিন্তু আর আজ রাত্রে কোন স্থানে যাইতে ইচ্ছা করিনা, এখানে থাকাই স্থির করিলাম।... কৃষ্ণকিশোরবাবুর নৌকা সেই জনশূন্য স্থানে নোঙর করিয়া রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

...নদীতীর জনহীন, নিস্তব্ধ, অন্ধকারময়, বড়ই ভয়ঙ্কর।......কৃষ্ণকিশোর বাবুর সঙ্গে মাত্র ছোট একটি কাঠের বাক্স ছিল—সেটি বহুমূল্য দ্রব্যসামগ্রীতে পূর্ণ। তিনি বাক্সটিকে আপনার নিকট রাখিয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সুখী লোক, অধিক রাত্রি জাগরণ করা অভ্যাস নাই—কিয়ৎকাল বসিয়া থাকিতে না থাকিতে তাঁহার নিদ্রা আসিল। তিনি সনাতনকে জাগাইয়া আপনি নিদ্রা গেলেন।...সনাতন অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু আর থাকিতে পারিল না, অজ্ঞাতসারে নিদ্রা আসিয়া তাহাকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে ঢুলিতে আরম্ভ করিল।......একবার তন্দ্রার আবেগে সে কিছুক্ষণ ঝিমাইতেছিল, হঠাৎ চমক ভাঙিগয়া উঠিয়া দেখে সম্মুখে বাক্সটি নাই...তাহার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল।

..সনাতন...গামছাখানি কাঁধে ফেলিয়া এবং তাহার চির পাকা বাঁশের লাঠি লইয়া অতি সাবধানে নৌকা হইতে বাহির হইল।...

...সনাতন কূলে উঠিয়া দেখে, নিকটে মনুষ্যের বাসোপযোগী স্থানের চিহ্নমাত্রও নাই, কেবল চারিদিকে অনন্ত প্রান্তর...কিছুদূর গিয়া কয়েকখানি খড়ের ঘর দেখিতে পাইল।...সে প্রত্যেক ঘরের পশ্চাতে, কোন ঘরের বা রওয়াকের কাছে আসিয়া উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিল, কোন সাড়াশব্দ পাইল না।. .এমন সময় অদূরে আর একখানি ঘর দেখিতে পাইল।...ঘরের এক কোণে মৃত্তিকানির্মিত দীপাধারে একটি ক্ষীণালোক জ্বলিতেছে।... সনাতনের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল।...সে আস্তে আস্তে নিদ্রিত ব্যক্তির পার চাদর উঠাইয়া পদতলের আঘ্রাণ লইল এবং...গৃহ হইতে নিষ্কান্ত হইল। .. .. খুঁজিতে খুঁজিতে একটি ডোবা পাইল। ডোবাটি পানায় পরিপূর্ণ। ঘাটের নিকটে আসিয়া বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, কতকগুলি পানা একস্থানে একত্রিত করা রহিয়াছে। সনাতন গামছা পরিয়া সেই চিহ্নিত স্থান লক্ষ্য করিয়া ডুব দিল। ডুব দিবামাত্র একটি বাক্স পাইল। সেটি যে তাহার মনিবের বাক্স সেটি দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল।. .সে শীঘ্রপদে. নৌকায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

...এই সময়ে কৃষ্ণকিশোর বাবুর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি গাত্রোত্থান করিয়াই নৌকা ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। সনাতন তাঁহাকে বলিল, এখানে তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন আছে, সুতরাং তাঁহাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে।

. .সনাতন কৃষ্ণকিশোরবাবুকে সঙ্গে করিয়া......ডোবার পাড়ে অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে গিয়া বসিল। ক্রমে একঘণ্টা, দুইঘণ্টা করিয়া স্নানের সময়

উপস্থিত হইল......কিছুক্ষণ পরেই ডোবার অপর পারে একটি লোক আসিয়া দেখা দিল।......তাহার আকৃতি এরূপ ভীষণ যে, রাত্রে তাহাকে একাকী দেখিলে হঠাৎ অপদেবতা বলিয়া ভয় হইতে পারে। যাহা হউক, তাহাকে দেখিয়া সনাতন উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাহারা উভয়ে কিছুক্ষণ কি এক বিজাতীয় ভাষায় কথা কহিতে লাগিল। কথা শেষ হইলে, আগন্তুক সনাতনকে গললগ্নীকৃতবাসে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল, তখন সনাতন কৃষ্ণকিশোরবাবুকে বলিল, চলুন, এখন আমরা নৌকায় যাই।

...কৃষ্ণকিশোরবাবু তাঁহার ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন... ...তুমি এখন আমায় সকল বিষয় খুলিয়া বল। সনাতন তখন আপনার প্রভুকে বলিল : বাবু। ঐ যে ঝাঁকড়াচুলো লোকটিকে দেখিলেন, সে একটা ডাকাইত, কালরাত্রে সে আপনার এই টাকার বাক্সটি চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছিল।... .

(তাহার পর যে যে উপায়ে উক্ত বাক্সটি উদ্ধার করিয়াছিল, তাহা একে একে সব বলিল। তারপর সনাতন বলতে আরম্ভ করল যে, সে আগে এক ডাকাত সর্দার ছিল, ভয়াবহ নিষ্ঠুর ডাকাত। আমার সেই পাপে পুত্র, কন্যা, স্ত্রী ও ভিটা সব গেছে। অবশেষে আমি আপনার কাছে আশ্রয় পেয়েছি। সেই অভিজ্ঞতাবলে জেনেছি যে, অপহৃত জিনিষ সাধারণতঃ হয় ছাইগাদা নয় পাঁকে পুঁতে রাখতাম। তাই আজও সেইভাবে পূর্ব অভিজ্ঞতার ফলে সব-কিছু উদ্ধার করে এনেছি। কৃষ্ণকিশোরবাবু সনাতনের প্রতি কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হলেন। সনাতন প্রভুর প্রতি কর্তব্য করল আজীবন।)১

১। বন্ধনী মধ্যের অংশের ভাষা বর্তমান লেখকের।

॥ ভূতের গল্প (কাহিনীর সারাংশ) ॥

এক সহরে একটি বাড়ি ছিল। লোকের ধারণা সে বাড়িতে ভূত থাকে। এক সাহেব সে বাড়ি ভাড়া নিল। ভাড়া কম। স্ত্রী ও বাচ্চা ছেলে আছে তাঁর। বিকেলে বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ সাহেবের নাকে এক গন্ধ এল। তিনি দেখলেন বাবুর্চি খিচুড়ি ও ইলিশ মাছ ভাজছে। সাহেব বললেন : আমরা এই খাবার খাব।

খাবার দেওয়া হয়েছে এই সময় খড়ম পায়ে, বৃহদাকার এক পুরুষ, নিশ্চিন্তভাবে চলে এসে সেই খাদ্য খেতে আরম্ভ করলেন। বাবুর্চির কথা শুনল না।

পরে সাহেব একথা বিশ্বাস করলেন না। তিনি বাবুর্চিকে খুব প্রহার করলেন। তারপর নিজে খাবার ঘরে ঢুকে স্বচক্ষে দেখলেন। একজন নিশ্চিন্তে খাচ্ছে। সাহেব গুলি করলেন। পাঁচবার। কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। সে পরম তৃপ্তিতে খাচ্ছে এবং খাচ্ছে।

তখন সাহেব ভয় পেল।

আগন্তুক ভোজন শেষ করে 'দিন দুনিয়া সব আমারই'—এইভাবে পা ফেলে মেম সাহেবের কামরায় ঢকলো। ঢুকেই আলো নিভিয়ে দিল।

বাবুর্চি তাড়াতাড়ি আলো আনল। দেখল মেমসাহেবের খাটিয়া কড়ি সংলগ্ন। বাবুর্চি বলল সাহেব আমি কোরাণ পড়তে জানি, পড়ব কি? সাহেব সম্মত হল। সে কোরাণ এবং সাহেব বাইবেল পড়তে লাগল। তিনঘণ্টা পরে ঘড়ির ছোট কাঁটার চালে সেই খাটিয়া নামতে আরম্ভ করল এবং প্রাতঃকালে সাহেব ঘর ছেড়ে দিলেন।

আর ভাড়াটিয়া জোটেনা। বহুদিন পরে আবার এক সাহেব ভাড়াটে হল। জমিদার বললেন কিছুদিন বাস কর। তারপর কথাবার্তা হবে। সাহেব ব্যাচিলার—রাত আটটা। দেখলেন একজন কে খটখট করে খড়ম পায়ে আসছে। বিরাট পুরুষ। সাহেব চেয়ার ছেড়ে খাটিয়ায় গিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন। আগন্তুক এসে চেয়ারে বসল। আগন্তুকের চোখ সাহেবের ওপর—সাহেবের চোখ তার দিকে। মিনিট পনের কাটল। আগন্তুক টেবিলের জিনিশ পত্তর দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা ক্ষুর পেল। ক্ষুর ধরে সাহেবের দাড়ি কামাতে লাগল। সাহেব ঠায় বসে রইলেন। সব কাটা হয়ে গেল।

হঠাৎ সাহেব খপ্ করে উঠে আগন্তুকের গালে জল মাখাতে আরম্ভ করল। আগন্তুক নিস্পন্দ। কামানো শেষ হল। সাহেব আবার খাটিয়ায় শুলেন। ও আগন্তুক অনেকক্ষণ পরে বলল আঃ বাঁচলাম, কি আরাম। ভূত হয়ে পর্যন্ত কামাইনি। দেখ এই বাড়ি আমার। জমিদার খুন করে এই বাড়ি নিয়েছে। তাই আমি ভূত হয়ে উপদ্রব করি। আজ সন্তুষ্ট হয়ে তোমায় বাড়ি দিলাম। কাঁটাল তলায় টাকা আছে নিও।

সা। কিন্তু জমিদার কি বলবে?

ভূত। বিপদে পড়লে স্মরণ করবে।

ছ'মাস পরে জমিদার ভাড়ার জন্য লোক পাঠাল। সাহেব মেরে তাড়িয়ে দিল। জমিদার স্বয়ং এল। তখনও মেরে ভাগিয়ে দেওয়া হল। তখন মোকোদ্দমা হল। হাকিম শুনলেন যে ভূত আসামীকে বাড়ি দিয়েছে। প্রমাণ কি?

আসামী কি ভাবল। তারপর মটমট শব্দ হল।

হাকিম দেখলেন যে তাঁর টানা পাখার উপর কে পা ঝুলিয়ে বসে আছে।

আসামী বলল : ঐ আমার সাক্ষী।

সেও বলল : হ্যাঁ। আমি একজন ভূত।

ভূত বলল : আমি হলফ পড়তে পারব না।

শেষে অনেক ঝামেলার পর ঠিক হল যে ব্রাডলার মতে ভূত সাক্ষীকে Solemn affirmation দেওয়া হবে। ভূতের সাক্ষীতে আসামী বাড়ি পেল।

শোনা যায় সে বাড়ি সহর কলিকাতা থেকে ৬৬ মাইল দূরে। কিন্তু কোন্ দিকে তা জানা যায় নি।

বিষয়বস্তুর দিকে থেকে গল্পগুলির বৈশিষ্ট্য আছে। 'বড়গল্পের' বিষয় ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি ব্যঙ্গ, 'ভজহরির বিয়ে' হাসির, 'যামিনীর' বিষয় প্রেম, 'সনাতন সর্দার' রোমাঞ্চ ও 'ভূতেরগল্প' হাসির। বিষয়বস্তুগুলি বাংলাগল্পের সমকালীন বৈচিত্র্যই সূচীত করে। 'বড় গল্পনয়'-এ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ব্যঙ্গ অতি প্রত্যক্ষ ও স্থূল—সেই কারণেই গল্পের কোন কাহিনী বিশেষভাবে দানা বাঁধেনি। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ব্যঙ্গ অনেকটা জ্বালাপ্রসূত। ভজহরির বিয়ে নিছক হাসির। এই কিশোর বন্ধু দলের চাঞ্চল্যই পরে যেন কিঞ্চিৎ মার্জিত হয়ে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্পে রূপ পেয়েছে। যামিনী গল্পটি এদিক থেকে অন্য ধরনের। গল্পটির গোড়ায় ব্যঙ্গ ও ঈষৎ কটাক্ষই ছিল প্রধান। শেষে যামিনীর চরিত্রের শেষ দৃশ্য পাঠককে হঠাৎ চমক দেয়। ঘটনা খুব স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে বলে মনে হয় না। সনাতন সর্দারের কাহিনীটিতে রোমাঞ্চপ্রধান। শুরু থেকেই এক আসন্ন বিপদের ছায়া গল্পটিতে ক্ষীণ suspense-এর সঞ্চার করেছে। বাংলাদেশের দস্যুদের নিয়ে বহু গল্পই আছে। সনাতন সর্দার সেই সব বিভীষিকাময় দস্যুদের ক্ষীণ স্মৃতি মাত্র। 'ভূতের গল্প' 'ভজহরির বিয়ে'র মতই নিষ্কলুষ হাসি। এই গল্পের হাসি অনেক বেশী উপভোগ্য—কারণ লেখকের ভূতের সঙ্গে কৌতুক করেছেন। ভূত-বিশ্বাসী পাঠকের লেখকের প্রতি অনুকম্পা হতে পারে কিন্তু ভূতের দাড়িকামানোর মত অসাধ্যসাধন করিয়ে লেখক ভূতবিষয়ক গল্পের অগ্রণী হলেন এতে কোন সন্দেহ নেই।

গঠনের দিক থেকে যামিনী ছাড়া সব কটি গল্পেই সুখসমাপ্তি। যামিনীর বিষয় বস্তু ও চরিত্র সৃষ্টর মধ্যে অসংগতি আছে—তাই ব্যঙ্গ প্রধান গল্প শেষে

অত্যন্ত গম্ভীর সুরে পর্যবসিত হয়েছে। প্লট গঠনের দিক থেকে ভূতের গল্প বা ভজহরির বিয়ে পরিচ্ছন্ন ও পরবর্তী গল্পধারায় আদি। যামিনীর প্লট গঠনের মধ্যে অকুশলতা থাকলেও হঠাৎ চমকের দ্বারা একটি চরিত্রের একটি দিক আলোকিত করে তোলার প্রবণতা অভিনন্দনযোগ্য। এই গল্পগুলি ছাড়াও অন্য গল্পগুলির মধ্যে এই প্লটগঠনের কুশলতা লক্ষ্য করা চলে। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের গল্পগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।১ তাঁর বধিরের বাসনা, ঘরের অলক্ষ্মী, ভৈরবী ইত্যাদি গল্পের মধ্যে দেখা যায় একটি একটি করে চরিত্র বিকশিত হচ্ছে। মুহূর্তের আলোয় আলোকিত হচ্ছে। নগেন্দ্রনাথের গল্পগুলি উপরিউক্ত গল্পগুলির চেয়ে একপদ অগ্রসর। এই গল্পগুলি মানুষের দীর্ঘ কাহিনী নয়, জীবনের কোন একটি খণ্ডাংশ মাত্র। চরিত্র সংখ্যা স্বল্প। এক বা দুই। ঘটনাবলী ক্ষিপ্র এবং তারা চরিত্রের কোন একটি ব্যথা, বেদনা বা আনন্দ বা রহস্যের সন্ধান দিয়েই শেষ হয়ে যায়। চূর্ণকগুলির মধ্যে যেমন ক্ষণকালের মধ্যেই climax সৃষ্টি এই গল্পগুলিতে তা নয়, চরম মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হয়। এই চরম মুহূর্ত সৃষ্টির কৌশল নগেন্দ্রনাথের গল্পগুলিকে পূর্বতন গল্প থেকে পৃথক করেছে। এই চরম মুহূর্ত নানাভাবে সৃষ্টি হতে পারে। কখনও পাঠকের অভাবিত পথে লেখক কাহিনীকে চালিত করে পাঠককে চমৎকৃত করেন। কখনও বা ঘটনাকে এমন একটি স্থানে সমাপ্ত করেন যেখানে চরিত্রটির ব্যথা বা বেদনা, আশা বা আনন্দ সব চেয়ে উজ্জ্বল। এই চরম মুহূর্ত সৃষ্টির গুণেই ছোটগল্পের সৃষ্টি। আমাদের আলোচিত গল্পগুলির মধ্যে আদিমভাবে ও স্থূলভাবে এই প্রবণতা দেখা দিয়েছে। কিন্তু নগেন্দ্রনাথের গল্পে তার প্রকাশ আরো স্পষ্ট। ঘাটের কথার মধ্যে ছোট-গল্পের এই গুণটি পরিস্ফুট। কুসুম চরিত্রের দ্বন্দ্ব সর্বাপেক্ষা চরম মুহূর্তে এসেছে যখন সন্ন্যাসী বলেছে তাকে ভুলতে হবে। এখানেই ছোটগল্পের বীজ। রবীন্দ্রনাথ তার পরেও ঘাটের কথার দ্বারা কাহিনীর শেষ পরিণাম দেখিয়েছেন—কিন্তু শুধু ঐ দৃশ্যটির দ্বারাই 'ঘাটের কথা' তার পূর্ববর্তী সকল গল্প থেকে পৃথক।

ছোটগল্পের লক্ষণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনার পরিমাণ সাহিত্যের অন্যান্য শাখার আলোচনার তুলনায় কম সন্দেহ নেই—কিন্তু যে পরিমাণ আলোচনা দেশে ও বিদেশে হয়েছে তার পরিমাণ নিতান্ত কম নয়। আমরা শুধু চেষ্টা করলাম বাংলা গল্পধারার প্রকৃতির নির্ণয় করতে করতে ছোটগল্পের স্বরূপ আবিষ্কারের। ছোট-গল্প চূর্ণক, আখ্যানক বা নক্সা থেকে আলাদা এক শ্রেণীর গল্প। ছোট উপন্যাস বা নভেলায় থেকেও আলাদা শ্রেণী। এই শ্রেণীবিভাগের সূক্ষ্মতা নির্ভর করছে শুধু

১। দ্রষ্টব্য ঃ পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ছোটগল্পের চরম মুহূর্ত সৃষ্টির উপর। মনে রাখতে হবে উপন্যাসে চরম মুহূর্ত সৃষ্টির পরও কাহিনীকে চলতে হয়, কারণ তার চলার শেষও পাঠকের আকাঙ্ক্ষিত। ছোটগল্পে সেখানেই কাহিনীর বিরতি। হিতবাদীতে প্রকাশিত দুটি গল্প বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। 'দেনাপাওনা' গল্পটির মধ্যে মূল ঘটনা হল এক হতভাগিনী বধূ তার শ্বশুরবাড়িতে লাঞ্ছিতা। তার বৃদ্ধ দরিদ্র পিতা যথেষ্ট পরিমাণ পণ দিতে পারেননি। এই অর্থালোভী শ্বশুর ও ব্যক্তিত্বহীন স্বামীর কাছে হতভাগিনী বধূর মৃত্যু বেদনার বিষয় নয়। কারণ তারপরই নগদ হাজার টাকা ও প্রচুর গহনাসহ একটি নববধূর আবির্ভাব হয় সেই পরিবারে। এখানেই কাহিনীটি শেষ। যেখানে বেদনা ও দুর্ভাগ্যের কথা চরমতা প্রাপ্ত হয়েছে তখনই সেখানে যবনিকাপাত হয়েছে। উপন্যাসের শেষ অজস্র জটের মুক্তিতে। ছোটগল্পের শেষ অতর্কিতে, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়, একটি জটের মুক্তিতে। তাই ছোটগল্পের সঙ্গে গীতিকবিতার বা একাঙ্কিকা নাটকের যোগ ঘনিষ্ঠ। গীতিকবিতা যেমন একটিমাত্র ভাবকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়ে পরিপূর্ণ মুহূর্তে শেষ হয়, ছোটগল্পও তেমনিই পরিণতির মুহূর্তেই বিরত। মনে রাখতে হবে সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যই ব্যঞ্জনা প্রধান—উপন্যাসের শেষেও ব্যঞ্জনাময়, তা অনিঃশেষের আভাস বহন করে। কিন্তু ছোটগল্পের ক্ষেত্রে শুধু ব্যঞ্জনার অনিঃশেষতাই নয়, কাহিনীর প্রকৃতির মধ্যেই খণ্ডতার আভাস থাকে, তাই সমগ্রের ব্যঞ্জনা পাঠককে বিচলিত করে। উপন্যাস বা মহাকাব্যের গৌরব তার সমগ্রতায়, ছোটগল্প ও গীতিকবিতার পরিচয়ই খণ্ডতায়। তাই উপন্যাসে বা মহাকাব্যে জাতির জীবন প্রায় পরিপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, কিন্তু ছোটগল্প ও গীতিকবিতায় জাতির জীবনের মূল্যবান খণ্ডাংশগুলিই ধরা পড়ে। উপন্যাসে জীবনের নিতান্ত তুচ্ছ, নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন অংশও ধরা পড়ে, সমগ্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা ঐকতান সৃষ্টি করে; কিন্তু ছোটগল্প বা গীতিকাব্য মূল্যবান, গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ অংশকেই অবলম্বন করে রচিত হয়, কারণ খণ্ডতাই তার বিষয়; আর বৈচিত্র্যহীন খণ্ডাংশকে নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে না। অভিনবত্ব ও বৈচিত্র্যই সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অলংকার।

হিতবাদীতে প্রকাশিত দ্বিতীয় গল্প 'পোস্টমাস্টারে' এই সত্যটি আরো স্পষ্ট। পোস্টমাস্টারের বৈচিত্র্যহীন জীবনের কাহিনী হয়েও গল্পটি বৈচিত্র্যময়। গ্রাম্য পোস্ট-মাস্টারের গ্রামের দুঃসহ দিনগুলির মধ্যে অজানিতভাবে এক মানবহৃদয়ের বন্ধন রচিত হল। সেই বন্ধন এই দৈনন্দিন যাওয়া-আসা বিচ্ছেদ-পরিচয়ের পরিচিত কাহিনীকে গভীর তাৎপর্য দিল। একজন সাহিত্যিক বলেছেন "উপন্যাসের প্রাণ গল্প এবং গল্পের গুণ চমৎকারিত্ব।"[১] এই চমৎকারিত্ব পোস্টমাস্টারকে মনোহর মনোহর করেছে। উপন্যাসের প্রাণ সর্বত্র সঞ্চারিত—বৃক্ষ পল্লবের মত। ছোটগল্পের

১। অন্নদাশঙ্কর রায় : **যার যেথা দেশ,** কলকাতা, ১৩৩৯, ভূমিকা, পৃঃ ৪

প্রাণ একটিমাত্র স্থানে। পূর্বউল্লেখিত লেখক বলেছেন। উপন্যাসকার ক্রমাগত সূতা ছাড়তে থাকেন, মাছকে অনেকক্ষণ ধরে খেলিয়ে তারপর ডাঙগায় তোলেন। ছোটগল্প হাউয়ের মতো বোঁ করে ছুটে গিয়ে দপ্ করে নিভে যায়। উপন্যাসের পক্ষে বেগ সংবরণ করা সময় সাপেক্ষ তার অস্তগমনের পরেও গোধূলি থাকে।" রবীন্দ্রনাথ তাঁর পোস্টমাস্টার গল্পের শেষে বলেছেন—

"বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরনীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মতো চারিদিকে ছলছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন --একটি সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল, 'ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড় বিচ্যুত সেই অনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি'—কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে..."*

বৈচিত্র্যহীন জীবনঘটনা এখানেই চমৎকৃতি লাভ করেছে। মুহূর্তের জন্য এই মানব-হৃদয়ের বন্ধনের জন্য মানুষেরই আকর্ষণ। আর এই গল্পেই বাংলা ছোট-গল্পের তরী "পালে বাতাস পাইয়াছে।"

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পোস্টমাস্টার। গল্পগুচ্ছ ১ম (১৯৫৭ সংস্করণ) পৃঃ ২৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

॥ ছোটগল্প সম্পর্কে বাঙালী লেখক ॥

বাংলা দেশের ছোটগল্পকারেরা বিভিন্ন সময়ে 'ছোটগল্প' এই সাহিত্য রূপটিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। আমাদের সাহিত্যের সমালোচনার দিক অপূর্ণাঙ্গ ও অপুষ্ট থাকার জন্যই আমরা সাধারণতঃ বিভিন্ন বিদেশী সমালোচনার মানদণ্ডে সাহিত্য বিচারে অভ্যস্থ। বিদেশী সাহিত্যে যে সমালোচনা গড়ে উঠেছে তা সেই ভাষার সাহিত্য নির্ভর। এক দেশের বা বিশেষ কালের সাহিত্য হয়েও সাহিত্যের অন্তর্গত মৌলিকগুণ সর্বজনীনতা। সেই ভরসাতেই আমরা তার নিরিখে বাংলা সাহিত্যের বিচার করি। কিন্তু সব সময় সেই নিরিখ অভ্রান্ত নয়। অনেক সময় কোষ্টিপাথরে ফুল বিচারের মত উপহাস্য ব্যাপারও ঘটে। ছোটগল্প সম্পর্কে অবশ্য এমন কিছু ঘটেনি। কারণ এর জন্ম বাইরে। বাইরের প্রভাব এসেছে আমাদের সাহিত্যে। তবুও আমাদের সাহিত্যের অন্তরেব তাগিদও এই রূপটিকে ক্রমশঃ স্পষ্ট করে তুলেছিল। তাই আমরা যদি লেখকদের মুখে এর ব্যাখ্যা শুনি তাতে ছোট গল্পের স্বরূপ বুঝতে সুবিধে হবে।

দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন লেখকের দৃষ্টিকোণ দিয়ে এই সাহিত্যরূপটিকে দেখলে তাব বৈচিত্র্য ও তার সমগ্রতা বুঝতেও সাহায্য হতে পারে। এমন কি কোন কোন লেখকের গল্পবিচারেও সুবিধে হতে পারে। কারণ কোন একটি নির্দিষ্ট, কঠিন সংজ্ঞা দিয়ে কোন সাহিত্যরূপকে আলাদা করা যায় না। শিল্পীআত্মা তাতে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। 'আমারে বাঁধবি তোরা তোদের কি সেই বাঁধন আছে'—চিরকালের শিল্পী-আত্মার এই জিজ্ঞাসা। কাজেই এই সম্বন্ধে মতামত থেকে আমরা একটি মোটা-মুটি সংজ্ঞা পাবো।

সর্বোপরি লেখকদের সচেতন শিল্প সাধনার একটি নিদর্শন এখানে মিলবে। লেখকেরা যে রূপ সৃষ্টি করেছেন সে রূপটি যে কি, তার সম্পর্কে অচেতন হয়ে অন্ধ প্রেরণায় যে সৃষ্টি হয় না—এই বোধটি লেখকদের কী পরিমাণে ছিল সে কথা স্পষ্ট হবে। এখানে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প চিন্তার সঙ্গে আমরা পরিচিত হব। তিনি যখন ছোটগল্প লিখছেন বা সবে লেখা শুরু করেছেন সেই সময়ে একটি কবিতা লিখেছিলেন ঃ বর্ষাযাপন। তাতে তিনি কী ধরনের ছোটগল্প লিখতে চান তার একটি আভাস দিয়েছেন। তখনও রবীন্দ্রনাথের বেশী ছোটগল্প প্রকাশিত হয়নি। হিতবাদী পত্রিকা সবে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ছ'টি সাতটি মাত্র গল্প লিখেছেন। এই সময়ে তিনি ছোটগল্প নিয়ে যে চিন্তা করেছিলেন তা মূল্যবান। কারণ তাই হয়ত তাঁর সমগ্র গল্প-সাহিত্যের ভূমিকা।

ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে।
ছোট প্রাণ, ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারিটি অশ্রুজল
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।
জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত
অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল,
অজ্ঞাত জীবনগুলা অখ্যাত কীর্তির ধুলা
কত ভাব কত ভয় ভুল
সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝরঝর বরষার মতো—
ক্ষণ-অশ্রু ক্ষণ-হাসি পড়িতেছে রাশি রাশি
শব্দ তার শুনি অবিরত।
সেই সব হেলা ফেলা, নিমেষের লীলাখেলা
চারিদিকে করি স্তূপাকার,
তাই দিয়ে করি সৃষ্টি একটি বিস্মৃতি বৃষ্টি
জীবনের শ্রাবণ-নিশার।

প্রকৃতপক্ষে এই কাব্যাংশ রবীন্দ্র গল্পসাহিত্যের ভূমিকা স্বরূপ। ক্ষণ অশ্রু ও ক্ষণ হাসির যে জীবন সেই বিচিত্র জীবনরসে রবীন্দ্রনাথের গল্পলোক পূর্ণ। এই অংশ থেকে রবীন্দ্রনাথের অভিলষিত ছোটগল্পের একটি রূপ অঙ্কন করা চলে।

এই গল্পের বিষয় ছোট প্রাণের ছোট সুখ দুঃখের কথা। যে মানুষের দুঃখ কারো চোখ পড়ে না, যে দুঃখ বুকের তলায় লুকানো সেই দুঃখে রাঙানো। জগতে মানুষের সত্তার একটি স্বয়ং-নিরপেক্ষ মূল্য আছে। সে রাজা বা মহারাজ, ধনী বা আমীর না হওয়া সত্ত্বেও তার জীবনের এক স্বতন্ত্র সম্ভাবনা। এক জায়গায় সে সম্রাট। মনুষ্যত্বের সেই রূপটিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পের মধ্যে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। নিতান্ত দরিদ্র রতনের যে বেদনা ও নিঃসঙ্গতা তা সংসারের নির্মম উদাসীনতায় বৈশাখী ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মতো উড়ে যায়। বোবা বালিকা শুভার বাক্যহীন নয়নের ভাষার অতীত কান্না আমাদের মুখরতার অন্তরালে লুপ্ত।

কোন দরিদ্র সেকেন্ড মাস্টারের জীবনের এক ঝড় জলের অন্ধকার রাত্রি এক অনন্ত রাত্রি বহন করে আনে। তুলার ব্যবসায়ী অনুভব করে আকবর বাদশার সংগে তার কোন ভেদ নেই; মনুষ্যত্বের এই অবলুপ্ত মহিমার মুহূর্তগুলি আবিষ্কারই রবীন্দ্রনাথের তথা সার্থক ছোটগল্পের লক্ষণ।

তার আঙ্গিক সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের ইঙ্গিত আছে। ছোটগল্পের ছোট পাত্রের মধ্যে প্রাচুর্যের স্থান কম। পল্লবিত বাক্ বিস্তার বর্ণনার সূক্ষ্মায়িত দৈর্ঘ্য সেখানে কাহিনীর প্রাণকে ব্যহত করবে। কোন তত্ত্ব বা উপদেশ তার লক্ষ্য হতে পারে না। নীতি নয়, উদ্দেশ্যমূলকতা নয়। নিটোল ফলের মত রূপগন্ধময় সৃষ্টিই ছোটগল্প। তার আরম্ভ যেমন সংসারের বিশালতার মাঝখানে, তার শেষও হবে তেমনই সেই জীবনের মাঝখানে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মাঝখানে যেন মুহূর্তের বিশ্রাম। ক্ষণিক বিহ্বলতা। রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছেন কাহিনীর সেই অসীম বিলুপ্তির মধ্যেঃ শেষ হয়ে হইল না শেষ।

রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প সম্বন্ধে আবার বলেছেন।১ সেটি আরো মূল্যবান। কারণ সেটি বলেছেন জীবনের শেষে। তখন তাঁর গল্পগুচ্ছ লেখা শেষ হয়ে গেছে। তখন 'তিন সঙ্গীর' গল্পও লেখা হয়েছে—শুধু ল্যাবোরেটরী লেখা বাকী। কাজেই এই সময়ের মন্তব্যের মূল্য আরো গভীর, আরো প্রগাঢ়। এই আলোকে তাঁর গল্পগুলিকে বিচার করার সুযোগ মিলবে।

> "সাহিত্যে বড়ো গল্প বলে যেসব প্রগল্ভ বাণীবাহন দেখা যায় তারা প্রাক্ ভূতাত্ত্বিক যুগের প্রাণীদের মতো—তাদের প্রাণের পরিমাণ যত দেহের পরিমাণ তার চারগুণ, তাদের লেজটা কলেবরের অত্যুক্তি।
>
> "অতি পরিমাণ ঘাসপাতা খেয়ে যাদের পেটটা মোটা তারা ভারবাহী জীব, স্তূপাকার মালের বস্তা টানা তাদের অদৃষ্টে। বড়ো গল্প সেই জাতের, মাল বোঝাইওয়ালা। যে সব প্রাণীর খোরাক স্বল্প এবং সারালো, জাওর কেটে কেটে তারা প্রলম্বিত করে না ভোজন ব্যাপার অধ্যায়ের পর অধ্যায়ে। ছোটগল্প সেই জাতের, বোঝা বইবার জন্য সে নয়, একেবারে সে মার লাগায় মর্মে লঘু লম্ফে।...মানুষের জীবনটা বিপুল একটা বনস্পতির মতো। তার আয়তন তার আকৃতি সুঠাম নয়। দিনে দিনে চলছে তার মধ্যে এলোমেলো ডালপালার পুনরাবৃত্তি। এই স্তূপাকার একঘেয়েমির মধ্যে হঠাৎ একটি ফল ফলে ওঠে, সে নিটোল, সে সুডোল, বাইরে তার রং রাঙা কিংবা কালো, ভিতরে তার রস তীব্র কিংবা কটু।. সে সংক্ষিপ্ত, সে অনিবার্য, সে দৈব লব্ধ, সে ছোটগল্প।
>
> "একটা দৃষ্টান্ত দেখানো যাক। রাজা এডওয়ার্ড ভ্রমণে বেরলেন দেশদেশান্তরে। মুগ্ধ স্তাবকদের ভিড় চলল সংগে সংগে, খবরের কাগজের প্যারাগ্রাফের ঠোঙাগুলো ঠেসে ভরে উঠল। এমন সময় যতসব রাজদূত,

---

১। শেষকথা—রবীন্দ্রনাথ দেশ ১৩৪৬, ৩০শে অগ্রহায়ণ পৃঃ ১৬৫—৬৬ রবীন্দ্র রচনাবলী (২৫ খণ্ড) তিনসঙ্গীর পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

রাষ্ট্রনায়ক, বণিক সম্রাট, লেখনী বজ্রপাণি সংবাদ পত্রিকার ঘেঁষাঘেঁষি ভিড়ের মধ্যে একটা কোন ছোটো রন্ধ্র দিয়ে রাজার চোখে পড়ল এক অকুলীন আমেরিকানী। শব্দভেদী সমারোহের স্বরবর্ষণ মুহূর্তে হয়ে গেল অবাস্তব, কালোপর্দা পড়ে গেল ইতিহাসের অসংখ্য দীপ-দীপ্ত রঙ্গমঞ্চের উপর। সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে জ্বলজ্বল করে উঠল ছোটো-গল্পটি দুর্লভ দুর্মূল্য।

"গোলমালের মধ্যে অদৃশ্য আর্টিস্ট ছিলেন আড়ালে, তাকিয়ে ছিলেন ব্যক্তিগত জীবন সরোবরের গভীর অগোচরে। দেখছিলেন অতলসঞ্চারী অজানা মাছ কখন পড়ে তাঁর বড়শিতে গাঁথা, কখন চমক দিয়ে ওঠে তাঁর ছোটোগল্পটি নানা বর্ণচ্ছটা খচিত লেজ আছড়িয়ে।

"পৌরাণিক যুগের একটি ছোট্টো গল্প মনে পড়ছে—ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আখ্যান। দুঃসাধ্য তার তপস্যা। নিষ্কলঙ্ক ব্রহ্মচার্যের দুরূহ সাধনায় অধিরোহণ করছিলেন বশিষ্ঠ--বিশ্বামিত্র—যাজ্ঞবল্ক্যের দুর্গম উচ্চতায়। হঠাৎ দেখা দিল সামান্য রমণী, সে শুচি নয়, সাধ্বী নয়, সে বহন করেনি তত্ত্ব বা মন্ত্র বা মুক্তি; এমন কি ইন্দ্রলোক থেকে পাঠানো অপ্সরীও সে নয়। সমস্ত যাগযজ্ঞ ধ্যানধারণা সমস্ত অতীত ভবিষ্যৎ আঁট বেঁধে গেল একটি ছোট গল্পে।"

এইখানে রবীন্দ্রনাথের মত আরো স্পষ্ট করে পাওয়া গেল। একে সূত্রাকারে সাজালে দাঁড়ায়ঃ (১) ছোটগল্পের আকৃতি ছোট, (২) ছোটগল্প খণ্ড হয়েও অখণ্ডতার স্বাদবাহী, (৩) ছোটগল্পের সার্থকতা সেইখানে যেখানে মানুষের বাইরের জীবন নয় ভেতরের জীবনের অলক্ষিত পূর্বরূপটি ধরা পড়ে, (৪) প্রাত্যহিক একঘেয়েমির থেকে একটু স্বতন্ত্র মুহূর্ত তার উপজীব্য। এই মতগুলি আলোচনা করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ ছোটগল্পের আকার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ঠিক নয়। তিনি বলেছেন বড় গল্পগুলিকে মালবাহী। কিন্তু ছোটগল্প সংক্ষিপ্ত। রবীন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের ত্রুটি আছে। তিনি বলেছেন সাহিত্যে বড়গল্প অনেকটা প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগের প্রাণীর মত, প্রাণের চেয়ে দেহের পরিমাণ যাদের বেশী। কিন্তু পৃথিবীতে অনেক ছোটগল্পের উদাহরণ দেওয়া চলে যাদের দৈর্ঘ্য অত্যন্ত বেশী। মপাসাঁর 'বুল দ্য সুইফ' বা 'মাদাম টেলিয়ারস্ এসটাবলিসমেন্ট' দৈর্ঘ্য খুব কম নয়। আধুনিক কালেই সমারসেট মমের 'রেন' গল্পটির দৈর্ঘ্য অত্যন্ত বেশী। গোগোলের 'টেলস অফ গুড এ্যান্ড ইভিল' গ্রন্থের কোন গল্পই আকারে ছোট নয়। অর্থাৎ তথ্যগত দিক থেকে ছোটগল্পের আকার সবচেয়ে ছোট নয়। আবার তত্ত্বগত দিক থেকেও প্রশ্নটিকেও দেখা যেতে পারে। বড় উপন্যাস-এর সংক্ষিপ্ত রূপ কি ছোটগল্প রূপে গ্রাহ্য হতে পারে? বলাই বাহুল্য না।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ প'রে নিজের এইসব প্রশ্নের সমাধান করেছেন। তিনি উপন্যাস বা বড়গল্পের সঙ্গে ছোটগল্পের পার্থক্যটি প্রথমেই লক্ষ্য করেছেন। তিনি জীবনকে তুলনা করেছেন বনস্পতির সঙ্গে। তার ডালপালা ভরা রূপটিই

উপন্যাসের উপজীব্য। অন্যপক্ষে ছোটগল্পের উপজীব্য তার নিটোল, সুডোল ফল। কাজেই উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত ছোটগল্পে পৌঁছয় না। উপন্যাস বহুমুখী। ছোটগল্প একমুখী। বহু ঘটনার সন্নিবেশ উপন্যাসের বিষয়। তার মধ্য থেকে একটি একটি বিশেষ ঘটনা ছোটগল্পের। রবীন্দ্রনাথের চোখে অষ্টম এডওয়ার্ড-এর জীবন ও রামায়ণের একটি ঘটনায় সেই ছোটগল্পের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

কিন্তু ছোটগল্পের আকৃতির প্রশ্ন এখনও রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবতঃ বাইরের আকারের কথাটি বড় করে ধরেননি। তাঁর দৃষ্টিদান, মেঘ ও রৌদ্র, নষ্টনীড় ত খুব ছোট আকারের নয়। তাঁর বক্তব্য সম্ভবত, : ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ততার অর্থ তার directness. সমস্ত বাহুল্যকে ত্যাগ করে ছুটে চলা। ঘটনাগুলিকে আস্তে আস্তে বিকশিত করার সম্ভাবনা নেই। চরিত্রকে ধীরে ধীরে উন্মোচিত করার অবকাশ কম। রবীন্দ্র কথিত সংক্ষিপ্ততার অর্থ নিশ্চয়ই বাহুল্যবর্জন। সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ অপ্রয়োজনীয়। কারণ তা শেষ পর্যন্ত মার লাগায় মর্মে লঘু লম্ফে।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বক্তব্যটি ছোটগল্প সম্পর্কে সবচেয়ে সত্য। অন্য কথাগুলি তারই কারণ-সূত্রে আসে। ছোটগল্প জীবনের খণ্ড অংশ। কিন্তু তার অর্থ কখনই এই নয় যে খণ্ডতার শ্রীহীনতা তার মধ্যে আছে। দেহ থেকে একটি অংশকে আলাদা করে রাখলে তার মধ্যে কোন শ্রী থাকে না। ছোটগল্প সেই শ্রীহীন বস্তু নয়। অপারেশন টেবিলে রেখে দেওয়া একটি পা, কিংবা হাত নয়। রবীন্দ্রনাথ উপমা দিয়ে বলেছেনঃ গাছের ফল। গাছেরই সৃষ্টি। কিন্তু সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ।

এই কথাটিকেই নানা সাহিত্যিক ও সমালোচক নানাভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই যে বলেছিলেন, 'শেষ হয়ে না হইবে শেষ' তাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করার চেষ্টা ছেড়ে দিচ্ছি। কাহিনীর যে খণ্ডতা তা কাহিনীতে নিহিত যে ব্যঞ্জনা তার দ্বারাই পূর্ণতা পাবে। অখণ্ড রূপ ধারণ করবে। এই ব্যঞ্জনা যে শুধু ছোটগল্পেরই গুণ তা নয়, সব সাহিত্য সৃষ্টিরই গুণ ব্যঞ্জনা। কাহিনীর এই অখণ্ড নিটোল রূপটির সঙ্গে গীতিকবিতার সাদৃশ্য অনেকে লক্ষ্য করেছেন। সেখানে খণ্ড মুহূর্তের ভাব। এখানে খণ্ড মুহূর্তের রূপ। এইখানে আবার উপন্যাসের সঙ্গে পার্থক্যের প্রশ্ন উঠছে। উপন্যাসকারের গতি যেন পর্বতারোহনের। ধীরে ধীরে। লক্ষ্য তাঁর সুদূর তারই ফলে তিনি পর্বতের নদীর বাঁক, তার গতি সব দেখাতে পারেন। অন্যপক্ষে ছোটগল্পকার যেন ট্রেন থেকে নদী দেখছেন, মুহূর্তের জন্য তার একটি বাঁক। স্বভাবত এজন্য ছোটগল্পে প্রধান হল ব্যঞ্জনা, ব্যাখ্যার চেয়েও।

২

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ঘরের কথা' (১৯১০ খৃঃ) নামক গল্পের বইর ভূমিকায় ছোটগল্প সম্পর্কে লেখেন১

"উপন্যাসের মত, ছোটগল্প জিনিষটাকেও আমরা পশ্চিম হইতে বঙ্গ-সাহিত্যে আমদানি করিয়াছি। ছোটগল্পের জন্ম সুদূর পশ্চিমে—আমেরিকায়। মার্কিনেরা বড় ব্যস্ত জাতি—তাহাদের নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই—তাই বোধহয় সে দেশে ছোটগল্পের জন্ম হইয়াছিল। আমেরিকা হইতে ইউরোপে এবং তথা হইতে আনীত হইয়া এখন ইহা মহিয়সী বঙ্গ-বাণীর চরণে নূপুর স্বরূপ বিরাজিত, মৃদু মধু শিঞ্জন-রবে বঙ্গীয় পাঠকের চিত্ত বিনোদন করিতেছে। পূর্বকালে বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমবাবু তিনটি ছোট-গল্প লিখিয়াছিলেন;—সঞ্জীববাবুও দুই একটি লিখিয়াছিলেন বলিয়া স্মরণ হইতেছে। কিন্তু সেগুলি আকারে ছোটমাত্র, নচেৎ উপন্যাসেরই লক্ষণাক্রান্ত। বর্তমান সময়ে ছোটগল্পের মধ্যে যে একটা নিজস্ব বিশেষত্ব আছে, তাহা সেগুলিতে ছিল না। ছোটগল্প বলিতে আমরা যাহা বুঝি, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর মহাশয়ই তাহা বঙ্গসাহিত্যে প্রথম প্রবর্তন করিয়াছিলেন। দেবী বীণাপাণির নূপুরের উজ্জ্বলতম, মিষ্টতম ঘুঙ্গুরগুলি তাঁহারই প্রদত্ত।

ছোটগল্পের জন্ম আমেরিকায় হইলেও তথাকার সাহিত্যে ইহা তেমন স্ফূর্তিলাভ করে নাই। প্রথম শ্রেণীর ছোটগল্প-লেখকের সংখ্যা আমেরিকায় অধিক নহে, বরঞ্চ ইংরাজী সাহিত্যে ইহার সমধিক বিকাশ দৃষ্ট হয়; আর সম্পূর্ণ বিকাশ ফরাসী সাহিত্যে। ইংরাজী ছোটগল্প ঘটনা প্রধান। ফরাসী ছোটগল্পে রসের প্রাধান্য পরিস্ফুট। বিষয়টা কিছুই নহে—ঘটনাটা তুচ্ছ বলিলেও হয়—কিন্তু পড়িতে পড়িতে পাঠকের হৃদয়ে বিচিত্রভাবের লহরী খেলিতে থাকে। এক পলাতক সৈনিক জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছে। রাত্রি হইয়াছে। সে একটা গিরি গুহায় আশ্রয় লইল। প্রভাতে উঠিয়া দেখিল —সেই গুহায় এক বাঘিনী নিদ্রিত। বাঘিনী তাহাকে কিছু বলিল না। ক্রমে সেই বাঘিনীর সঙ্গে সৈনিক পুরুষের বন্ধুত্ব জন্মিল। মানবী যেমন স্বীয় প্রণয়ীর প্রতি প্রেমানুভব করে—ঐ সৈনিকের প্রতি বাঘিনীরও সেইরূপ ভাবাবেশ অদ্ভুত কৌশলে লেখক বর্ণনা করিয়াছেন। কিছুদিন যায়। একদিন সৈনিক, বাঘিনীর অনুপস্থিতিতে জঙ্গল হইতে পলাইতেছিল, অনেক দূরে গিয়া দেখে, বাঘিনী উর্দ্ধশ্বাসে আসিতেছে। সৈনিকের কাছে আসিয়া সে তীব্র অনুযোগ ও গভীর অভিমানপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কথা কহিতে পারিল না, কিন্তু নিপুণ লেখক এমন করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন যে সে কথা কহার অধিক। বাঘিনীকে আদর করিতে করিতে সৈনিক আবার ফিরিয়া আসিল। বড় বিপদে পড়িল। আবার যদি পলাইতে যায়, এবার হয়ত তাহার উপেক্ষিতা প্রণয়িনী তাহার রক্তাস্বাদন করিবে, তাই একদিন

১। সাহিত্যসাধক চরিতমালার ৫ম খণ্ড থেকে উদ্ধৃত।

সে, বাঘিনীকে আদর করিতে করিতে, তাহার সহিত খেলা করিতে করিতে, তাহার বক্ষে তীক্ষ্ম ছুরিকা আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল। হায় মানব প্রণয়ী, তুমি এমনি অবিশ্বাসী বটে। বাঘিনী মরিল। মরিবার সময় তাহার চক্ষুর ভাব লেখক যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, পড়িলে পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়।

ব্যাপারটি অদ্ভুত হইলেও ঘটনাটা কিছুই নয়। ইংরাজ সমালোচকেরা অনেক সময় অক্ষম ঔপন্যাসিকের গ্রন্থ সমালোচনা করিতে যেমন বলেন, ইহাতে কিছুই ঘটিল না (nothing happens) সেইরূপ উপরোক্ত গল্পে কিছুই ঘটিল না—একটা বাঘ মারা গেল মাত্র। কিন্তু এই কিছু না ঘটার ভিতর দিয়ে লেখক যে Emotion-এর রঙ ফলাইয়া গেলেন, তাহা সাহিত্যের পরম সম্পদ।

আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছোটগল্পের ভিতর দিয়া নানা রসের প্রবাহ বহাইয়াছেন। তাঁহার ছোটগল্পগুলিও ঘটনা বিরল—রস প্রধান, ধরুন তাঁহার কাবুলিওয়ালা।...

রবীন্দ্রবাবুর অনেকগুলি ছোটগল্প এইরূপ Emotion-এর স্বর্ণরেখায় উদ্ভাসিত। শিক্ষিত পাঠক সেগুলির সহিত পরিচিত। আড়ম্বর করিয়া সেগুলির পরিচয় দিতে যাওয়াই আমার পক্ষে ধৃষ্টতা।

রবীন্দ্রবাবুর সকল গল্পই যে ঘটনাবিরল তাহা নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'ত্যাগ', 'মুক্তির উপায়', 'জীবিত ও মৃত', 'মানভঞ্জন' প্রভৃতি উল্লেখ করিতে পারা যায়। তবে সে ঘটনার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহাতে সেগুলিকে বিশেষ করিয়া ছোটগল্পেরই উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে। উপন্যাসে নানা ঘটনার ভিতর দিয়া দিয়া এক একটি চরিত্র বিকশিত হইয়া উঠে। ছোটগল্পে চরিত্র বিকাশের স্থান নাই। বর্ণিত চরিত্র বিকশিতভাবেই পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা এবং ঘটনাটির সঙ্গে সে চরিত্রের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া দিতে পারিলেই লেখকের কার্য সম্পন্ন হইল। সুতরাং সে ঘটনাটি এমন হওয়া চাই, যাহাতে পর্দায় পর্দায় চরিত্রটির সঙ্গে মিলিয়া যায়, অথচ তাহার কোন অংশ নিরর্থক পড়িয়া না থাকে। উক্ত গল্পগুলি আলোচনা করিলে এই কথার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। যদি ছোটগল্পে এমন কোন ঘটনা ঘটে, যাহা বর্ণিত চরিত্রের সঙ্গে বেশ মিশিয়া যাইতেছে না অথবা সে চরিত্রটি বুঝিবার পক্ষে সে ঘটনাটি অত্যাবশ্যক নয়, তাহা হইলে সে ছোটগল্প ভাল হইল না। ঘটনায় ও চরিত্রে যদি জমাট না বাঁধিল, তাহা হইলে দুই-ই বিফল।"

প্রভাতকুমার ছোটগল্প বিশ্লেষণে আরো কয়েকটি দিক স্পষ্ট করেছেন। ঘটনার অবাহুল্য এবং চরিত্রের ও ঘটনার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য করা ছোটগল্পের বিশেষ লক্ষ্য। কারণ এখানে অনাবশ্যক কোন ঘটনা বা চরিত্র কাহিনীকে প্রকাশে সাহায্য করবে না।

দ্বিতীয়তঃ প্রভাতকুমার ছোটগল্পের গঠনের দিক থেকে শ্রেণী বিভাগ করেছেন: (১) ঘটনা প্রধান (২) রস প্রধান। তিনি রবীন্দ্রনাথের খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, প্রায়শ্চিত্ত, জীবিত ও মৃত, ত্যাগ, মুক্তির উপায় ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে রসপ্রধান বা Emotion প্রধান গল্পের উদাহরণ হিসেবকে বালজাকের A passion in the Desert গল্পটি তুলেছেন। যে বাঘটিকে সেই সৈনিক প্রিয়তম বলে ডাকত,

যাকে সেই জ্যোৎস্না রাত্রে সোনালি রং-এর এক আশ্চর্য সত্তা মনে হয়েছিল যাকে দেখে মনে হয়েছিল 'এর আত্মা আছে'—সেই বাঘের গল্প। প্রভাতকুমার অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন এই গল্পের প্রাণের দিকে। এর আখ্যানের চেয়েও এর অন্তর্নিহিত বেদনা ও মূক পশুর মধ্যে নারীত্বের আবির্ভাব অনেক বড়। অথচ আখ্যানের প্রতি মানুষের আকর্ষণ আরো বেশী। পৃথিবীর অজস্র শ্রেষ্ঠ গল্প এই দুই পর্যায়ের। এবং অনেক ক্ষেত্রেই একটি একটিকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

পুশকিনের 'পিস্তল ছোঁড়া' গল্পটি একটি উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। এই গল্প আখ্যান প্রধান। কাহিনীর আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত কাহিনী ধীরে গতিতে এগোয়। রুদ্ধশ্বাসে আমরা প্রতীক্ষা করি। সেই সৈন্যদের ব্যারাক, তাস খেলা, দিনে একবার চিঠি আসা নিয়ে কাহিনী শুরু। তারপর দেখা গেল ডুয়েলের লড়াই-এর অতীত দৃশ্য। ডুয়েলের সময় যে পিস্তল ছোঁড়ার কথা ছিল তা আজো ছোঁড়া হয়নি। বছরের পর বছর কেটে গেছে। এইভাবে বর্ণনায় কাহিনীর আখ্যানরস জমে উঠেছে। মুক্তির উপায় বা প্রায়শ্চিত্ত দুটি গল্পই এই আখ্যান প্রধান গল্পের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে গল্প-শেষের ব্যঞ্জনা প্রধান নয়। খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনে আখ্যানের দিকে লেখকের দৃষ্টি বেশী, যদিও ভাবের প্রতি কম নয়, কারণ কাহিনীটির ঘটনাধারার ওপর চরিত্রটি বিকশিত হচ্ছে। ঠিক সাধারণ ঘটনা নয়, অভূতপূর্ব অস্বাভাবিক ঘটনা।

৩

প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'ছোটগল্প' ও 'গল্পলেখা' নামক দুটি লেখায় ছোটগল্প সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলেছেন। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমারের কথারই সমর্থন রয়েছে।

> 'বড় গল্পের তোড়া বাঁধতে হলে হয়ত তার ভেতর দেদার পাতা পুরে দিতে হয়। কিন্তু ছোটগল্প হওয়া উচিত ঠিক একটি ফুলের মত, বর্ণনা ও বক্তৃতার লতাপাতার তার ভেতর কোন স্থান নেই।'

অন্যত্র প্রমথ চৌধুরী আরেকটি কথা বলেছেন সেটি একটি সাধারণ সত্য না হলেও অনেকের ক্ষেত্রে সত্য।

> "যা নিত্য ঘটে, তার কথা কেউ শুনতে চায় না। ঘরে যা নিত্য খাই তাই খাবার লোভে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায়? বা নিত্য ঘটে না, কিন্তু ঘটতে পারে, তাই হচ্ছে গল্পের উপাদান।"

৪

সুরেশচন্দ্র সমাজপতির কথা দিয়ে এই প্রসঙ্গের শেষ করা যেতে পারে :

"কবিতা যেমন হৃদয়ের একটা ভাব বা আবেগ প্রকাশের চেষ্টা করে, ছোটগল্প সেইরূপ জীবনের একটা ঘটনার বর্ণনার চেষ্টা করে। একখানা উপন্যাসে হয়তো যে ক্ষুদ্র ঘটনাটি কয়েকছত্র মাত্র অধিকার করিতে পারে, ছোটগল্পে তাহাই পাঁচ সাত পৃষ্ঠা স্থান অধিকার করিয়া বসে। চতুর্দিক-

ব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে 'বুলস আই' লণ্ঠনের আলো যেমন একস্থানে পতিত হইয়া সেই স্থানটুকুর সকল খুঁটিনাটি সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করিয়া তুলে, ছোটগল্প রচনার কৌশল তেমনি জীবনের একটা ঘটনার উপর পতিত হইয়া তাহাকে সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল করে। সেই চতুর্দিক ব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে একটা স্থানের উজ্জ্বলতা স্বাভাবিক নাও হইতে পারে। কিন্তু তাহাই সেই লণ্ঠনের আলোর কার্য। তেমনি বিচিত্র সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ, উত্থান, পতন, সংঘাতময় জীবনের একটা ছোট ঘটনাই অধিক প্রাধান্য পাইবার উপযোগী নাও হইতে পারে। কিন্তু তাহাকে সেই প্রাধান্যদান করাই গল্প রচনা কৌশলের কার্য।"১

সুরেশচন্দ্র সমাজপতির এই বক্তব্য যথার্থ। ছোটগল্পের প্রাণ রহস্যকে তিনি অনুভব করেছেন। বুলস আই লণ্ঠনের উপমা সত্যই সুন্দর। জীবনের একটি বিশেষ মুহূর্তের প্রতি যে প্রাধান্য, একটি জীবনের একটি খণ্ড ঘটনার প্রতি যে স্পষ্ট পরিচয় দান তাই ছোটগল্পের প্রাণ।

১। নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—'বাংলা ছোটগল্প' থেকে উদ্ধৃত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

॥ বাংলা ছোটগল্পের দুই শিল্পী ॥

বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসের কালানুক্রমিক কালবিভাগের সূক্ষ্মতা অবলম্বন আপাতত করছি না। প্রথমস্তরে স্বর্ণকুমারী দেবী ও নগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে ধরছি। অবশ্যই এ'দের লেখা যখন প্রকাশিত হচ্ছে তখনই রবীন্দ্রনাথ স্ব-প্রতিষ্ঠ। রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র আলোচনা হবে। তার আগে এই দুইজনের বৈফল্য ও সাফল্য ইতিহাসের দিক থেকে আলোচনার যোগ্য। ফর্মের দিক থেকে এ'রা প্রাচীন। রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্পের যে ফর্ম সৃষ্টি করলেন তা এ'দের হাতে পুষ্টিলাভ করেনি। স্বর্ণকুমারী সে চেষ্টাও করেননি। নগেন্দ্রনাথ কোন কোন ক্ষেত্রে ছোটগল্পের প্রতি মনোযোগী হয়েছেন কিন্তু তাও রবীন্দ্রপ্রভাবে নয়—তা তাঁরই রচনাপদ্ধতির স্বাভাবিক বিবর্তন সূত্রে। তাই এই দুটি লেখককে প্রাক্-রবীন্দ্র ছোটগল্পের ধারায় আলোচনা করা দরকার। কারণ এ'রা রবীন্দ্রনাথের আগে যে গল্পধারা প্রচলিত ছিল তারই বাহক।

স্বর্ণকুমারী দেবী ১৮৫৫—১৯৩২

রবীন্দ্রনাথের প্রথম ভালো ছোটগল্প দেনাপাওনা। এর আগে তাঁর ঘাটের কথা, রাজপথের কথা বেরিয়েছে। আরো আগে প্রকাশিত হয়েছে ভিখারিণী। বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র প্রভৃতি লেখকেরা ছোটগল্পের প্রকৃতি স্পষ্ট করে অনুভব করেননি। যদিও ঊনবিংশ শতাব্দীর পত্রিকাগুলির পাতা ওলটালেই বোঝা যায় ছোটগল্প জিজ্ঞাসা ক্রমশঃ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হচ্ছে। ছোটগল্পের প্রকৃতি রবীন্দ্রনাথের আগে যে কজন মুষ্টিমেয় লেখক অনুভব করেছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী তাদের অন্যতম। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকের পত্রিকায় 'গল্প' 'ক্ষুদ্রগল্প' 'ক্ষুদ্রকথা' প্রভৃতি নামের সৃষ্টি হয়েছে। ১২৯৩ বঙ্গ অব্দের কল্পনা পত্রিকায় (৬ষ্ঠ খণ্ড)। 'বাঙলার উপন্যাস লেখক' প্রবন্ধে এক লেখক বলেছেন, "ইংরাজিতে যাহাকে Novel বা Fiction বলে, আমরা সেই অর্থে এখানে 'উপন্যাস' আর Story বা Tale শব্দের পরিবর্তে 'গল্প' কথা ব্যবহার করিতেছি।" স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর গ্রন্থের নাম দিয়েছেন নবকাহিনী বা ছোট ছোট গল্প। এই নামটি তাৎপর্য পূর্ণ। 'নবকাহিনী'—তিনি যে নূতন ধরনের কাহিনী সৃষ্টি করেছেন এ বিষয়ে তিনি সতর্ক। দ্বিতীয়তঃ তিনি জোর দিয়েছেন গল্পের ছোটত্বের প্রতি, 'ছোট ছোট' কথাটির মধ্য দিয়ে। যদিও আধুনিককালে আমরা এই ছোটত্বকে খুব গুরুত্ব দিই না। অর্থাৎ আগে ছোটগল্প ছিল কর্মধারয় সমাস। একালে নিত্য সমাস।

স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম ছোটগল্পের বই ১৭ই আগষ্ট ১৮৯২ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হয়।১ ১৮৯২ খৃঃ অব্দে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প প্রকাশিত হয়ে গেছে। কিন্তু স্বর্ণকুমারী ছোটগল্প লিখতে শুরু করেছেন অনেক আগে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ আছে : "আমি সন্ধ্যাকালে সকলকে একত্র করিয়া ইংরাজী হইতে ভালো ভালো গল্প তর্জমা করিয়া শুনাইতাম। তাঁহারা সেগুলি বেশ উপভোগ করিতেন। ইহার অল্প দিন পরে দেখা গেল যে আমার একটি কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী কতকগুলি ছোট ছোট গল্প রচনা করিয়াছেন।..............তখনও তিনি অবিবাহিতা।"

স্বর্ণকুমারীর বিবাহ হয় ১৮৬৭ খৃঃ অব্দের ১৭ই নভেম্বর। অতএব তিনি ১৮৬৭-র আগেই ছোট ছোট গল্প রচনা করেছেন। তাঁর নবকাহিনীর প্রথম দুটি গল্প ভারতী ও বালকে ১২৯৩ বঙ্গাব্দে বৈশাখ ও জৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তখনও রবীন্দ্রনাথ কোন ছোট গল্প লেখেন নি। নবকাহিনীর গল্পগুলি যে একই সময়ে লেখা তা মনে হয় লেখার ভঙ্গী, দৃষ্টিভঙ্গীর ঐক্য থেকে। অর্থাৎ যদিও নবকাহিনীর প্রকাশকাল ১৮৯২, তবুও তার রচনা কাল আরও আগে সম্ভবতঃ ১৮৬৭-তে তার সূচনা।

স্বর্ণকুমারীর ছোটগল্প রচনার ইতিহাস যে আরো আগে শুরু হয়েছে তার অন্য প্রমাণও আছে। ১২৯৫ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৮৮ খৃঃ অঃ স্বর্ণকুমারী ও হিরন্ময়ী দেবী 'গল্প স্বল্প' নামে একটি শিশু পাঠ্য গল্প গ্রন্থ প্রকাশ করেন।২ কিন্তু এই গ্রন্থের কোন কোন গল্প অনেক অনেক আগে লিখিত হয়েছিল। 'বীরেন্দ্র সিংহের রত্নলাভ' কাহিনীটি সর্বপ্রথম সখা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে।৩ এইসব তথ্য থেকে সহজেই এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে স্বর্ণকুমারী বাংলা সাহিত্যে প্রথম যুগ থেকেই সচেতন ছোটগল্পশিল্পী এবং সম্ভবতঃ ঐতিহাসিক অর্থে তিনি রবীন্দ্রনাথেরও পূর্বসূরী।

১। সূচী : কুমার ভীম সিংহ, ক্ষত্রিয় রমণী, ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী, অশ্ব ও তরবারী, সন্ন্যাসিনী, প্রতিশোধ, যমুনা, কেন, আমার জীবন, লজ্জাবতী, গহনা। গ্রন্থাবলীর মধ্যে আরো গল্প আছে—চাবি চুরি ও রক্তপিপাসু।

২। স্বর্ণকুমারী দেবী : শুভকাজের সুযোগ হারাইও না, বীরেন্দ্র সিংহের রত্ন লাভ, সঙ্গদোষ, সত্য, ক্ষমা।
হিরন্ময়ী দেবী : সুবুদ্ধির উপদেশ, সাররত্ন, কৃতজ্ঞতা।

৩। ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে, ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যায় গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৫৪—১৫৬ পৃষ্ঠায় গল্পে লেখিকার নাম ছিল না। ছিল : শ্রীমতী × × দেবী।

স্বর্ণকুমারীর সমস্ত রচনায় অত্যন্ত স্পষ্ট যে গুণটি তা হল তাঁর সুরুচি। তাঁর রচনায় সর্বত্র এক সুরুচি বিরাজিত। এবং দ্বিতীয় গুণ লেখার আভিজাত্য। হয়ত দ্বিতীয় গুণটি প্রথম গুণেরই পরিপূরক। এবং শেষত তাঁর রচনার মধ্যে সর্বত্রই একটি নিভৃত বেদনার সমাগম। শরৎকালের আকাশে হঠাৎ যেমন এক খণ্ড মেঘ কালো ছায়া বিস্তার করে কিন্তু বর্ষণ হয় না—কোথাও ভেসে যায়ঃ—স্বর্ণকুমারীর রচনায় সেই রকম একটি কারুণ্য মেঘের মত ধীরে প্রসারিত হয় কিন্তু কোথাও বিহ্বলতায় পথিকের মনকে আর্দ্র করে তোলে না।

এইসঙ্গে গল্প বলার ক্ষমতাটিও তাঁর মনোরম। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর মনকে অধিকার করেছিল। ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনাভঙ্গী ও চরিত্রায়ণ অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর রচনার মধ্যে আসন রচনা করেছিল। কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও কয়েকটি অন্তর্নিহিত দুর্বলতার ফলে স্বর্ণকুমারী ছোটগল্পের রচনায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি।

স্বর্ণকুমারীর প্রধান ত্রুটি ছিল তিনি যথার্থ আখ্যান বা Plot রচনা করতে পারেন নি। কাহিনী আদ্যোপান্ত বর্ণনার মধ্যে যথার্থ শক্তির বিকাশ নেই।—বরং সেই কাহিনীটিকে চালনা করার শক্তি বেশী প্রয়োজনীয়। লেখক যেন এক অদৃশ্য ঘোড় সোওয়ার—তিনি অশ্বটিকে চালনা করেন অলক্ষ্যে। তিনি যখন অশ্বারোহী চালিত অশ্বের বেগ বর্ণনা করতে চান তখন তিনি অপেক্ষাকৃত কম শক্তিমান। রবীন্দ্রনাথের ঘাটের কথা বা রাজপথের কথার মধ্যে এই ত্রুটি আছে। স্বর্ণকুমারীর বেশীরভাগ রচনায় এই অক্ষমতার চিহ্ন আছে।

নবকাহিনীর প্রথম তিনটি গল্পই ঐতিহাসিক উপাদান ভিত্তিক। কুমার ভীমসিংহ গল্পটিই এই ধরণের গল্পের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কুমার ভীমসিংহ পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র হওয়া সত্ত্বেও কনিষ্ঠ পুত্র জয়সিংহকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করার আয়োজন চলেছিল। হঠাৎ মহিষীর ভর্ৎসনায় সম্রাটের মন পরিবর্তিত হয়। তিনি ভীমসিংহকে ডেকে রাজ্য দিতে চান কিন্তু ভীমসিংহ উদারতা দেখিয়ে রাজ্য দিয়ে চলে যান। কাহিনীর বিষয়বস্তুর মধ্যে ক্ষিপ্র বর্ণনাভঙ্গী থাকা সত্ত্বেও কোথাও পাঠক মনকে আকর্ষণ করার মত ক্ষমতার পরিচয় নেই। যথার্থমাপের পোষাক না হলে যেমন শারীরিক অস্বস্তি হয় এই গল্পগুলিতে ঘটনার অপরিমিত বাহুল্যে প্রাণ বিকশিত হতে পারে নি। ক্ষত্রিয়রমণী ও ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী, অশ্ব ও তরবারী ইত্যাদি গল্পও এই শ্রেণীর উদাহরণ। কোথায় পরিণামের আনন্দ ও পরিণতির গতির চিহ্ন নেই।

সন্ন্যাসিনী গল্পটি এক ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী। মনোরম বর্ণনায় কাহিনীটি মেদুর হলেও কোথাও গল্প দানা বাঁধতে পারেনি। এমনকি গল্পটি প্রতি মুহূর্তে

রবীন্দ্রনাথের ভিখারিনীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আখ্যানবস্তু ও গঠনে অসাধারণ ঐক্য।

প্রতিশোধ গল্পটির মধ্যে অতিনাটকীয় ঘটনাসন্নিবেশ ও প্রায় গাণিতিক নিয়মে ঘটনার সংঘটন সত্ত্বেও চরিত্রগুলি অনেক বেশী প্রদীপ্ত ও গল্পরস বেশী মানবিক। যদিও কাহিনীর মধ্যে নাটকীয়তা সৃষ্টির অসংযমের ফলে গল্পটি অসম্পূর্ণ সৃষ্টির নিদর্শনরূপেই গণ্য হবে। স্বর্ণকুমারীর যথার্থ প্লট রচনায় যে অক্ষমতা তা আরো তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে 'কেন', 'যমুনা', 'চাবিচুরি' প্রভৃতি রচনায়।

এই ব্যর্থতার মধ্যেই অবশ্য স্বর্ণকুমারীর সু-অনুশীলিত মনের ক্ষমতা শেষ নয়। তাঁর সাধনার সবকটি কোরক দল মেলতে পারেনি, বেশীর ভাগই সুরভিহীন মৃত্যুর মধ্যে অবলুপ্ত—কিন্তু দুই-একটি কোরক পুষ্পরূপে বিকশিত হয়েছিল। —সেগুলি বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে স্মরণীয়। নবকাহিনীর মধ্যে সংকলিত 'আমার জীবন' ও 'গহনা' দুটিই তাঁর রচনা প্রতিভার অব্যর্থ নিদর্শন।

'আমার জীবন' গল্পটির আরম্ভ উত্তমপুরুষে। নায়ক চিকিৎসক। চিকিৎসা করতে এসে মৃণালিনীর সঙ্গে তার পরিচয়। নায়ক বলে,

> "একবার ভালোবাসিলে নাকি আর একবার ভালবাসা যায় না। তবে যে আমার মৃণালিনী দেবীকে দেখিতে ভালো লাগে—তাঁহার সহিত গল্প করিতে ভালো লাগে, ইহার সহজ কারণ তাঁহাকে আমি ভালবাসি। কিন্তু নিতান্ত সাদাসিধে বন্ধুতার ভালোবাসা মাত্র অন্য কিছু নহে, হইতেই পারে না—এক বার ভালোবাসিলে নাকি আবার দুইবার ভালোবাসা যায় না কখনও কখনও তাঁহার স্বরে, তাঁহার হাসিতে, নয়নের দৃষ্টিতে, হাতের স্পর্শে আমার কেমন একটা মোহময় বিহ্বলতা জন্মে সত্য, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি তাঁহার কারণ অন্য কিছু নহে তাহা পুরাতন স্মৃতির আকস্মিক উদ্রেক মাত্র।"

মৃণালিনী সদা বিষণ্ণ। অশ্রুবাষ্পের মধ্যে ছায়ার মত প্রতিবিম্বিত ক্ষীণমূর্তি।

দুইজনে গভীর বন্ধুত্ব, একদিন নায়ক মৃণালিনীকে তার জীবনের অতীত ভালবাসার এক কাহিনী শোনালেন। তিনি ইংলণ্ড থেকে এসে প্রাণকৃষ্ণবাবুর অতিথি হয়েছেন। প্রাণকৃষ্ণবাবু তাঁর আত্মীয় নন, বহুকালের পারিবারিক বন্ধু। বড় উকীল। পয়সার অভাব নেই। বিলাত না গেলেও তিনি ইংরাজ-মেজাজের লোক। ইংরাজ পাড়ায় বাড়ি। ইংরেজ কেতায় থাকতেন। মেয়েও ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিতা। অবিবাহিত মেয়েটির একটি অদ্ভুত ধরণের হিষ্টিরিয়া আছে। পীড়ার সময় কোন উপদ্রব নেই, শুধু চেতনা থাকে না। মনে হয় গভীর নিদ্রামগ্ন, অথচ পরে শোনা যায়, সে অবস্থাতেও ভিতরে ভিতরে তার জ্ঞান থাকে স্পর্শ অনুভব করে, কথা শুনতে পায়। কিন্তু চোখ মুদ্রিত থাকায় কাউকে দেখতে পায় না।

প্রথম যেদিন নায়ক প্রাণকৃষ্ণবাবুর বাড়ি এলেন তখন মায়া শয্যাগত। কয়েকদিন আগেই পীড়া হয়েছিল। নায়ক মায়াকে দেখেছিলেন পাঁচ বছর আগে। আলুথালু চুলে অসজ্জিত বেশ, চঞ্চলনয়না একটি বালিকা ছিল।

এখন নায়ক দেখলেন, কৌচে একজন যুবতী অর্ধশায়িতভাবে অবস্থিতা, সুললিত বেশবিন্যাস শুভ্র পরিচ্ছদের চমৎকার পারিপাট্য, কপালে কুঞ্চিত অলক, শিথিল কবরী।

তাদের মধ্যে কিছুক্ষণ গল্পগুজব হল। বিলাতের নানা কথা। বিলাতের নানা ব্যাপার নিয়ে মায়ার সূক্ষ্ম রসিকতা। এইভাবে হু হু করে সময় কেটে গেল। নায়ক সেই বালিকা মায়াকে নূতন বেশে রহস্যময় দেহমনের মোহনায় দেখে বিস্মিত হলেন। সম্ভবতঃ ভালেবাসলেন।

এবং একদিন তিনি সংকোচ ও লজ্জার ব্যূহ ভেদ করে প্রাণকৃষ্ণবাবুর কাছে প্রস্তাব করলেন যে মায়াকে বিয়ে করতে চান।

কিন্তু প্রাণকৃষ্ণবাবু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানালেন যে মায়ার বিবাহ শশীবাবুর সঙ্গে স্থির হয়ে গেছে।

মায়ার সঙ্গে যখনই দেখা করার ইচ্ছে হয় তখনই শোনা যায় সে এখন শশীবাবুর সঙ্গে গল্প করছে। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় খাওয়ার টেবিলে মায়া এলো না। সে অবশ্য মাঝে মাঝে একাকী খেত কাজেই কেউ বিস্মিত হল না। প্রাণকৃষ্ণ আহারের পর গড়গড়া টানতে টানতে অর্ধ নিদ্রায় মগ্ন হলেন। শশীবাবুও কেমন বিষণ্ণ। তিনি উঠে গিয়ে বেহালার কান টিপতে লাগলেন।

"আমি আস্তে আস্তে জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সুন্দর জ্যোৎস্না শীতের অবসানে মৃদুমন্দ বসন্ত বাতাস বহিতেছে, সেই বসন্ত হিল্লোলে বাগানের গাছপালা কাঁপিতেছে, ছায়া কাঁপিতেছে এবং জ্যোৎস্নালোকও যেন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। বেহালার কোমল সুর সেই কম্পিত রজনীর প্রাণ সহসা আরো কাঁপাইয়া তুলিল।. . .যখন প্রাণকৃষ্ণবাবু আমার প্রস্তাবে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তখন আমি এত বিহ্বল ও আত্মহারা হই নাই, বজ্রাহতের ন্যায় তখন আমি কেবল স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এখন বেহালার প্রতি সুরে আমার হৃদয়ের শিরায় শিরায় নৈরাশ্যের তীব্র যন্ত্রণা জাগিয়া উঠিতে লাগিল। সেই সুরে সুরে হৃদয় কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতে লাগিল—সে আমার নহে, সে আমার নহে।"

নায়ক গৃহ পরিত্যাগ করলেন। মায়া তখন ঘরে নিদ্রিতা। চাঁদের আলো তার মুখের ওপর পড়েছে। মোহপরায়ণ হয়ে নায়ক তার মুখ চুম্বন করলেন।

গল্প এই পর্যন্ত শুনে মৃণালিনী উত্তেজিত স্বরে বললেন—আপনি চোরের মত—

নায়ক তারপরও বলে চললেন, তারপর জানা গেল মায়া কাল রাত থেকে আবার অজ্ঞান হয়েছে। তিন-চারদিন পরে মায়া আরোগ্য লাভ করল। ইতি-মধ্যে হঠাৎ শশীবাবুর মাতাপিতা বিবাহে আপত্তি করলেন। ফলে মায়ার সঙ্গে বিবাহ হল নায়কের।

'তারপর? তারপর জানিলাম কিছুতেই জীবনের সুখ নাই... মায়ার এখন সে প্রফুল্লভাব নাই, মন খুলিয়া আমার সঙ্গে কথা কহে না, সর্বদাই বিষণ্ণ।...আমি বুঝিলাম সে আমাকে ভালবাসে না।'

একদিন গঙ্গার তীরে দুজনে বসে আছি। আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ।

হঠাৎ বহুদূরে থেকে বেহালার সুর বেজে উঠল। মায়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, সেইদিনও ঐ সুর বেজেছিল—ঐ সে

ঃ কে?

ঃ শশীবাবু। মায়া সেদিনের ঘটনাটি বলল।

কিন্তু নায়ক বলতে চাইল যে তার জন্য শশীবাবু দায়ী নন—কিন্তু বলার আগেই মায়া বলল, সেদিন দুপুরে বলেছিলাম যে শশীবাবুকে আমি বিয়ে করব না, আমি তোমাকে ভালবাসি। সে তার প্রতিশোধ নিয়েছিল যখন আমি অসুস্থ—

নায়কের কিছু বলার আগেই মায়া অজ্ঞান হয়ে গঙ্গায় পড়ে গেল। নায়ক গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ল—কিন্তু—

এই সময় হঠাৎ মৃণালিনী বলল—আমি মরি নাই—যদি কেবল একবার তখন আজিকার এই কথা বলিতে—

তুমি—মায়া?

হ্যাঁ—আমি মায়া, তুমি আমাকে চিনিতে পার নাই—আমি তোমাকে দেখিবামাত্র চিনিয়াছিলাম।

এই গল্পটি বিস্তারিতভাবে উদ্ধার করলাম এইজন্য যে, স্বর্ণকুমারীর দোষগুণ দুইই এই রচনায় স্পষ্ট। তাঁর স্নিগ্ধ ভাষা ও সুরুচি সর্বত্র পরিস্ফুট। প্লট রচনার একটি প্রবল চেষ্টা কাহিনীটির সর্বাঙ্গে—যদিও তা শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস-যোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি। যাদের মধ্যে একদা বিবাহ হয়েছিল তারা কয়েক বছর পরে নিজেদের দেখে চিনতে পারে না—এ প্রায় অবাস্তব—কাহিনীর শেষের উপ-ভোগ্যতার জন্য জোর করে তৈরী করা। চরিত্রগুলি রেখাচিত্রের মত—পূর্ণ অবয়ব পেতে দেরী আছে। অর্থাৎ অপূর্ণ ছোটগল্পের একটি নিদর্শন।

এই গল্পটির প্লট-এর সঙ্গে পুশকিনের 'তুষার ঝড়' গল্পটির সুদূর সাদৃশ্য আছে।১

মারিয়া নামে একটি মেয়ে ভ্যাদিমির নামে একটি ছেলেকে ভালবেসেছিল। মারিয়া জানত তার মা-বাবা এই বিয়েতে সম্মতি দেবেন না। তাই সে লুকিয়ে একটি গীর্জায় ছেলেটির সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু সেই রাত্রে ছেলেটি কিছুতেই আসতে পারল না। সে রাস্তায় পথ হারাল। রাস্তায় তখন ভয়াবহ তুষার ঝড়। অমানুষিক পরিশ্রমের পর যখন সে এসে পৌঁছল তখন দেখা গেল গীর্জা বন্ধ। কেউ নেই। মারিয়া ফিরে গেছে।

তারপর বহু দিন কেটে গেল। মারিয়া তার বাপের বাড়িতেই আছে। বাবা মারা গেল। চারদিকে তার জুটল পাণিপ্রার্থী। তার অর্থ অনেক, সম্পত্তি অনেক। মা চাইল মেয়ে বিয়ে করুক কিন্তু মেয়ে রাজী হল না। আর ভ্যাদিমির—সে মস্কোতে ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে মারা গেছে। মারিয়া তার স্মৃতি ধ্যান করে কাটায়।

১ Puskin, Alexander, S. *The snow storm*

ইতিমধ্যে যুদ্ধ শেষ হল। সৈন্যরা ফিরে এল। জনতা বিজয়ী সৈন্যদের অভিনন্দন জানাতে ছুটল। পথে পথে আনন্দ উল্লাস, জয়ধ্বনি। মারিয়া প্রতিদিনের মতই পাণিপ্রার্থী বেষ্টিতা হয়ে বসে আছে। বুরমঁ নামে একটি আহত সৈনিকও সেখানে এসেছিল। তার প্রতি মারিয়ার বিশেষ আকর্ষণ দেখা গেল। বুরমঁ'র স্বভাব চমৎকার। মেয়েদের কথা বলে তৃপ্তি দিতে পারে। মারিয়ার ভাল লাগল তাকে। আস্তে আস্তে তার ভালবাসার কথা লোকের কানে উঠল। প্রতিবেশীরা জল্পনা-কল্পনা করতে লাগল। অবশেষে একদিন বুরমঁ তার মনের কথা খুলে বলল। বাগানে বসেছিল মারিয়া। সেইখানে বুরমঁ বলল, আমি তোমায় ভালবাসি। মারিয়া চুপ করে থেকে বলল, আমি কোনদিনই তোমার স্ত্রী হতে পারব না। বুরমঁও বলল, তুমি একজনকে ভালবেসেছিলে, কিন্তু হায় আমি যে বিবাহিত—অথচ কার সঙ্গে জানি না, তাকে চিনি না। এই বলে বলতে লাগল, বহুদিন আগে আমি সৈন্যদলের শিবিরে ফিরে যাচ্ছি হঠাৎ রাস্তায় এল তুষার ঝড়। ঘোড়াগুলো কিছুতেই ছুটতে পারছিল না। হঠাৎ দূরে আলো দেখতে পেয়ে সেখানে গেলাম। সেখানে ছোট একটি গীর্জা। তার ভেতরে একজন লোক খালি ঘর-বাইর করছে। আমাকে দেখেই তারা বলে উঠল, এই যে এসে গেছে। কেউ কেউ বলল, মেয়ে মূর্ছা গেছে, শিগগির এস। দেখলাম গীর্জার ভেতরে দুটি কি তিনটি মোমবাতির আলো জ্বলছে, একটি মেয়ে দূরে বেঞ্চির ধারে অন্ধকারে বসে আছে। সে বলল, বাঁচা গেছে, আপনি এসেছেন। পুরোহিত বললেন তাহলে শুরু করি। আমি অন্যমনস্কের মত বললাম, হ্যাঁ। বিয়ে হয়ে গেল। তারপর পুরোহিত বললেন, তোমার স্ত্রীকে চুমু খাও। তখন আমি তাকালাম মেয়েটির দিকে—সে বিবর্ণ হয়ে গেছে। তারপর সে আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, এ সে নয়, সে নয়। সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। সাক্ষীরা আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি কোন কথা না বলে গাড়িতে উঠলাম। তারপর জানি না সেই অভাগিনীর কী হল। আমার এই নির্দয় রসিকতার ফল ভোগ করছে সে। মারিয়া চেঁচিয়ে উঠল, কী আশ্চর্য, তাহলে তুমিই সেই—অথচ আমায় চিনতে পারলে না। বুরমঁ বিবর্ণ হয়ে গেল—তার পায়ে পড়ল ঝাঁপিয়ে।

নবকাহিনীর 'গহনা' গল্পটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কাছে স্বর্ণকুমারী ফরাসী গল্প পড়েছিলেন। নিশ্চয়ই গল্পরাজ মপাসাঁর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। যদিও মপাসাঁর স্বভাব ও তাঁর ব্যঙ্গ, কটাক্ষ, আঘাত স্বর্ণকুমারীর ভালো লাগবার কথা নয় তবুও তাঁর কাহিনীর যে মোচড়—সমস্ত কিছুর উপর একটি কশাঘাত দিয়ে স্তব্ধ করে দেওয়া স্বর্ণকুমারীর মনকে স্বভাবতঃই তা আকর্ষণ করেছিল। এইরকম পরিচয় একটিমাত্র গল্পের মধ্যে আছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী ছেলেদের বিলেতে যাত্রায় অভিভাবকদের প্রধান আশঙ্কা ছিল পুত্রের বিবাহ। সেই ঘটনার উপরই এই কাহিনীর প্রতিষ্ঠা। এক দরিদ্র কেরাণী বহু কষ্টে পুত্রকে বিলেত পাঠিয়েছিলেন। বহু দুঃখের মধ্যেও তিনি

ছেলের আশায় বসে আছেন। ইতিমধ্যে প্রতিবেশিনীর মেয়ে ভবানীর সংগে পুত্রের বিবাহ স্থির করে রেখেছিলেন। পারিবারিক সম্পর্ক নানা উপহার দান-প্রদানের মধ্য দিয়ে বেড়ে চলল। এদিকে ছেলে যখন এল তখন জানা গেল সে বিলাতে বিয়ে করে এসেছে।

সমস্ত কাহিনীটির মধ্যে এক আশ্চর্য নির্মমতা আছে। কাহিনীটি অতি দৈনন্দিন মধুর সম্পর্কের মধ্য দিয়ে যখন পরিণাম-রমণীয় হয়ে উঠতে যাচ্ছে তখন বিলেত-ফেরৎ পুত্রের আচরণ সমস্ত কাহিনীকে প্রথম তীব্র আঘাত দেয়। অর্ধশিক্ষিত বাঙগালী মেয়েটি নতমুখে বিদেশ-প্রত্যাগত বাঙগালী-সাহেবের ইংরেজি-উচ্ছ্বাসের সামনে লজ্জায় ও সংকোচে ম্রিয়মাণ। আর শেষ পর্যন্ত যখন চরম ঘটনাটি জানা গেল তখন দরিদ্র পিতার নির্বাক চাহনি কাহিনীটিকে মৃতব্যক্তির নিষ্পলক নয়নের শূন্য-তায় ভরিয়ে তুলেছে। সর্বাধিক তীব্রতা পুঞ্জিত হয়েছিল শেষে, যখন বহু অশ্রুর, বহু দুঃখের সঞ্চয়, নববধূর জন্য মাতৃস্নেহের পবিত্র উপহার দুইগাছি বালা নিয়ে আনন্দময়ী জননী যখন ঢুকলেন—তখন সেই অসংস্কৃতা বালিকাবধূ ম্লান অপমানে সেখান থেকে চলে গেছে, বৃদ্ধ পিতা স্তব্ধ, পুত্রও স্থির —এই পর্বতকঠিন মৌনতার উপর মাতৃস্নেহের উৎসধারা তীব্রবেগে উচ্ছ্বসিত হবার আগেই লেখিকা বিহ্বলা জননীর সেই একান্ত নিভৃত আত্মবেদনাকে পাঠকের সামনে থেকে সরিয়ে কাহিনীর যবনিকাপাত করেছেন।

এটি স্বর্ণকুমারীর প্রথম গল্প যেখানে স্বর্ণকুমারী গল্পবলার কৌশল, প্লট রচনার ক্ষমতা, চরিত্র চিত্রণের পারদর্শিতা, স্বল্পভাষণে বহু ইঙ্গিতময়তা ও সমাপ্তির মধ্যে আকস্মিকতা সৃষ্টি পূর্ণভাবে আয়ত্ত করেছেন। গঠনভঙ্গী—ঘন, কোথাও অপ্রয়োজনীয় বাক্‌বিস্তারে কাহিনী বিপথচালিত নয় ও বর্ণনার ঘনঘটার দ্বারা ব্যথিত নয়। এই সমস্ত দিক থেকে 'গহনা' স্বর্ণকুমারীর শ্রেষ্ঠ রচনা।

'পেনেপ্রীতি' স্বর্ণকুমারীর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য রচনা। এই রচনাটি স্বর্ণ-কুমারীর শ্রেষ্ঠ রচনা হতে পারত। কিন্তু কাহিনীর মধ্যে লেখিকার পথভ্রান্তির লক্ষ্য অতি স্পষ্ট। কাহিনীর প্রথম পর্বের সংগে গল্পের কোন যোগ নেই। তা নিছক ভ্রমণ কাহিনী মাত্র। ছোটগল্পের দৃষ্টি শেষ পর্যন্ত স্বর্ণকুমারী স্থির রাখতে পারেন নি। যেন কোন বনচারী পথিক বহু পথ ভ্রমণের পর এক হ্রদের তীরে বসে জলের আলোছায়ার চঞ্চলতা উপভোগ করেছেন। এই কাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব ঐ হ্রদজলের আলোছায়ার চঞ্চলতায়—কিন্তু কাহিনীটিকে ব্যাহত করেছে বনচারণের ক্লান্তি।

এক সাহেব এক দেহাতী মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। তার ছোট বোনকেও তিনি ঠাট্টা করে বলেছিলেন বিয়ে করবেন। সরলমতি, গ্রাম্য মেয়েটি আজও সেই বাল্য-স্মৃতির আকর্ষণে ও সাহেবের প্রতিশ্রুতির বিশ্বাসে রোজ বহুদূর থেকে ফুল নিয়ে

আসে। আজ সেই সাহেব নেই। কত সাহেব বদলী হয়েছেন। আজও ধ্রুবতারার মত স্থির একাগ্রতায় সেই গ্রাম্যবালিকা পথ চেয়ে আছে। সেই অটল বিশ্বাসের মধ্যে কোন ফাঁক নেই। গোধূলির ছায়া যেমন সমস্ত আকাশটিকে করুণ করে তোলে, তেমনই এই জনহীন প্রান্তরের পরপারের কোন দরিদ্র গ্রামের দরিদ্রতর বালিকার দীর্ঘ আয়ত চক্ষুপল্লবের স্নিগ্ধতায় সমস্ত কাহিনীটি করুণ। কন্যা-কুমারীর মত তার চিরন্তন প্রতীক্ষা। লেখিকা অসাধারণ সংযমে তার হৃদয়াবেগকে প্রকাশে সক্ষম হয়েছেন। এই রচনাটি স্বর্ণকুমারীর স্মরণীয় রচনাগুলির অন্যতম।

তাঁর 'মিউটিনি' গল্পটির মধ্যে কোন সূক্ষ্ম কৌশলের অবতারণা নেই, পরিণতির মধ্যে কোন দূর-সঞ্চারী ব্যঞ্জনাও নেই। কিন্তু সিপাহী যুদ্ধের পটভূমিকায় ইংরেজ রমণীদের এক গল্প। বিদ্রোহের বিভীষিকা ও অপরিচিত ভারতবর্ষের প্রতি সর্বদা শংকা দুই মিলে কাহিনীতে রোমাঞ্চকর আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে।

'অমরগুচ্ছ'* গল্পটি সুন্দর। বিধবার যে নিঃশব্দ প্রেম তারই এক অকলংক স্মৃতিচিহ্ন এই গল্পটি। বিধবা তরুণীর দাদার বিদেশী বন্ধু এলেন নৈনিতালে বেড়াতে। একদিন সেই বন্ধুর সংগে বেড়াতে গেলেন টাইগার হিলে। দূরে পাহাড়ে অমর ফুল ফুটেছে। বন্ধু অনেক কষ্টে দুঃসাহসে পাহাড় ডিঙিয়ে সেই ফুল আনলেন। বিধবা নারীর জীবনে সুপ্ত নারীত্বের চৌম্বিক শক্তি আবার জেগে উঠল। পুরুষের এই দুঃসাহস, এই দুর্জয়শক্তির উপহারের লক্ষ্য একমাত্র নারীর হৃদয়। কিন্তু তারপর সেই বন্ধু চলে গেলেন। বন্ধুর বিয়ে হল। মেয়েটি ফুল রেখে দিলে বাক্সে। অমর ফুল—অম্লান থাকে। ছ'মাস পরে যখন বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর সংগে আগেই লেখিকা বিহ্বলা জননীর সেই একান্ত নিভৃত আত্মবেদনাকে পাঠকের সামনে

কাহিনীর মধ্যে বর্ণনা পল্লবিত হলেও, দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। পরিণতিটি আশ্চর্য সংকেতবহ। প্রাণ পর্যন্ত পণ করে যে ফুলগুলি একদিন বন্ধু উপহার দিয়েছিল—আজ সেই ফুলগুলিই ফিরিয়ে দেবার মধ্যে এক তীব্র চাপা অভিমান ও চিরঅম্লান ক্ষণপ্রেমের মহিমাই ব্যক্ত হয়ে উঠেছে।

স্বর্ণকুমারীর ছোটগল্পের পরিচয় এই পর্যন্ত। এখান থেকেই বোঝা যায় যে সমস্ত শিল্পী এই নবীন শিল্পরীতিকে অভিবাদন জানিয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী তাঁদের অন্যতম। আজ ইতিহাসের নেপথ্যলোকে তাঁর অধিষ্ঠান। তাঁর গল্পের পরিচয় আজ অতি ক্ষুদ্র মহলে সীমিত। এ যুগের সমস্যাব্যথিত, জীবনযুদ্ধক্লিষ্ট মানুষের কাছে তাঁর কোন আবেদন নেই। কিন্তু যে ক্ষুদ্র জলবিম্বে আজ আমরা বিশ্বের প্রতিবিম্ব দেখতে পারি—স্বর্ণকুমারী তারই উৎসদেশে একদা ছিলেন—এই

* সম্ভবত 'অমরগুচ্ছ' শব্দটি স্বর্ণকুমারী ইংরেজি 'Amarnath' নামক কাল্পনিক চির অমর ফুলের নামবাচক শব্দের অনুবাদ।

কৃতজ্ঞতাবোধ আমাদের অন্তর থেকে উৎসারিত হোক। স্বর্ণকুমারীর উদ্দেশ্যে লিখিত দেবেন্দ্রনাথ সেনের একটি সনেট উদ্ধৃত করি:*

চাহি না চামেলি, বেলা, কেতকী, মোতিয়া
বিখ্যাত গাজীপুরের গোলাপি আতর
চাহি না মৃগকস্তুরী, সৌরভে ক্ষেপিয়া
আপনি হরিণ যাহে হয় রে কাতর।
আমি চাহি ঝুরু ঝুরু মলয়াবাহিত
বনতুলসীর এই গন্ধ মনোহর
সরলা বনদেবীর সোহাগে রঞ্জিত
দোপাটির অতি মৃদু সৌরভ সুন্দর
মঞ্জু কুহরিত আর অলি মুখরিত
নিভৃত কুঞ্জ ভবনে, বসিয়া বসিয়া
আমার এ কবি হিয়া হয় উলসিত
বনসারিকার মৃদু সম্ভাষ শুনিয়া।
নিম্নে শুধু ঝাড়, নৃত্য, আলোক সংগীত
আমার এ ছাদ ভাল—জ্যোৎস্না আকুলিত।

* "আনন্দ"—সাহিত্য ২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১২৯৮, পৃঃ ১৩৭-১৩৮

॥ ২ ॥

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৮৬১—১৯৪০

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত আজ বাংলাসাহিত্যের পাঠকস্মৃতিতে ক্ষীণজ্যোতি ধূসর নক্ষত্রের মত ক্রমশঃ বিলীয়মান। প্রায় ষাট বৎসর ধরে তিনি অবিরলভাবে বাণী-সাধনা করেছেন, কিন্তু তাঁর বিপুল রচনাগুলি তাঁকে অমরলোকে পৌঁছে দিতে পারেনি। তিনি রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী ছিলেন। সমকালীন পাঠকের কাছে অভিনন্দনও পেয়েছিলেন। কিন্তু আজ এই স্বল্পকালের ব্যবধানে তাঁর সেই বিশাল গল্পগুচ্ছ থাকা সত্ত্বেও তিনি অপরিচিত ও অপঠিত। রবীন্দ্রনাথের এত কাছে থেকেও তিনি আশ্চর্যভাবে রবীন্দ্রপ্রভাব এড়িয়ে গেছেন। তাঁর ভাষাশৈলী পর্যন্ত রবীন্দ্র প্রভাবিত নয়। সাহিত্যরচনার ক্ষেত্রে তিনি প্রথম থেকেই মানসিকভাবে নিঃসঙ্গ ছিলেন।

তাঁর বেশীর ভাগ রচনা অভিশপ্ত। রচনাগুলি তিনি যেন পরম অবহেলায় রচনা করেছেন। আর একটু যত্ন, আর একটু পরিশ্রম করলে তাঁর মধ্যে শিল্পোৎকর্ষ আরো বিকশিত হত। তাঁর রচনাগুলি বেদনাকরভাবে খণ্ডিত। যেখানে কাহিনী শুরু হওয়া উচিত ছিল সেখানেই তাঁর বহু কাহিনী শেষ হয়ে গেছে। শিল্পীর সংযমবোধ ছিল কিন্তু পরিমান-বোধ ছিল না। এই কারণেই তিনি পাঠকচিত্তে স্থায়ী ছাপ রাখতে সমর্থ হননি। রচনার দিক থেকে তাঁর সঙ্গে তুলনীয় স্বর্ণকুমারী দেবী। স্বর্ণকুমারী যেমন গল্প বলার কুশলতা আয়ত্ত করেছিলেন, অবশেষে প্লট রচনাও করতে শিখেছিলেন তেমনি নগেন্দ্রনাথেরও মধ্যে সে গুণ ছিল। কিন্তু ছোটগল্পের প্রাণটিকে তিনি যথার্থভাবে অনুভব করতে পারেননি। তিনি সংক্ষিপ্তকায় আখ্যান বর্ণনায় উৎসাহী। কিছু ক্ষণ অশ্রু, ক্ষণ হাসির যে জীবন তাকে তিনি ঠিক চিত্রিত করতে পারেননি। স্বর্ণকুমারীর সঙ্গে তাঁর প্রাথমিক তুলনা চললেও তিনি অধিকতর শক্তিমান শিল্পী। তাঁর গল্পের বিষয় বৈচিত্র্য তাঁর সেই শক্তির বিভিন্নমুখিতাকেই প্রমাণ করে। তিনি বহু বিষয়ে গল্প লিখেছেন। রাজা থেকে আরম্ভ করে পরিচারিকা পর্যন্ত তাঁর গল্পের নায়ক নায়িকা। অতীত রহস্য ও ঐতিহাসিক সৌন্দর্যে তাঁর যেমন রুচি, তেমনিই আসক্তি রহস্যপ্রধান আখ্যানে ও গোয়েন্দা কাহিনীতে। পতিতার সৌন্দর্য যেমন তার বন্দনা পেয়েছে, গতযুগের বাংলাদেশের জীবন তেমনই তাঁর চিত্তকে আকর্ষণ করেছে। রূপকথায় তাঁর তৃপ্তি, শিশুদের মনোহরণ তাঁর প্রয়াস। তিনি বিচিত্রধর্মা লেখক। ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী তাঁর অধিকাংশ লেখাকেই পাঠযোগ্যতার মূল্য দিয়েছে।

হিতবাদী প্রকাশের আগে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি প্রকাশিত হবার আগেই নগেন্দ্রনাথ ভারতী ও বালকে ছ'টি গল্প লেখেন।১ সেই গল্পগুলি বাংলা-সাহিত্যে এক অভিনবত্বের সন্ধান যে এনেছিল এতে সন্দেহের কোন কারণ নেই। ছ'টি গল্পের মধ্যে নগেন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যমুখিতার স্বাক্ষর দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত। গল্পের বিষয় বস্তুগুলিও নূতন। রবীন্দ্রনাথের আগে জীবনের বহু অদৃষ্ট-পূর্ব আশা-বেদনাকে শিল্পরূপ দিতে তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন।

'চুরি না বাহাদুরি' (১২৯৪, বৈশাখ) নামক গল্পটি তাঁর ভারতী ও বালকে প্রকাশিত প্রথম গল্প। বাংলাভাষায় তখনও পর্যন্ত ঠিক রহস্যজনক গোয়েন্দা-কাহিনীর সূত্রপাত হয়নি। এই অর্থে নগেন্দ্রনাথকে রহস্যকাহিনীর স্রষ্টা বলা চলে। রোমাঞ্চকর পরিবেশে সৃষ্টি, ভৌতিক আবেশ রচনা, শেষ পর্যন্ত এক অদম্য কৌতূহল সজাগ রাখার ক্ষমতা তাঁর ছিল। 'চুরি না বাহাদুরি' গল্পে দুই ভদ্র-লোকের ট্রেনে চুরি হয়। চুরি আশ্চর্যভাবে হয়েছিল। গোয়েন্দারা তাদের কূল-কিনারা করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত টাকা পয়সা আবার চোর ফেরৎ দিয়ে যায় অবাক কৌশলে। গল্পটির মধ্যে আখ্যান অংশের কোন চমৎকারিত্ব নেই কিন্তু বর্ণনা কৌশল অসাধারণ, অন্ধকার রাত্রির ছমছমে ভাব, ট্রেনের কামরার নির্জনতা, মধ্যরাত্রে কালো চশমা পরা এক যুবকের অতর্কিত আবির্ভাব—সব মিলিয়ে যে রহস্যময় পরিবেশ তা পাঠকের কৌতূহলকে শেষ পর্যন্ত আকর্ষণ করে।

ভারতী বালকে প্রকাশিত 'দুইবার' (১২৯৬ বৈশাখ) গল্পটি আবার অন্যধরনের। একটি সন্ন্যাসী ও তার প্রণয়িনীর কাহিনী। গল্পটি কাব্যগুণ সমৃদ্ধ। ঘাটের কথা গল্পের একটি অস্পষ্ট দূরাগত আভাস যেন এই গল্পের রমণী চরিত্রের আছে। যদিও কাহিনীর মধ্যে একটি রহস্যময়তার অংশুক ব্যাপ্ত হয়েছে তবুও এই কাহিনী আগের গল্প থেকে ভিন্ন। এই ভিন্নতা ধরা পড়েছে 'বধিরের বাসনা' (১২৯৬, আষাঢ়) ও 'ঘরের অলক্ষ্মী' (১২৯৬, আষাঢ়) নামক দুটি গল্পে। বিশেষতঃ 'ঘরের অলক্ষ্মী'। এই গল্পটিতে করুণরসের আধিক্য থাকা সত্ত্বেও কোথাও তা পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তিকে স-পূর্ণ পিচ্ছিল পথে ঠেলে দেয় না। একটি হাবা কালা মেয়ে। তাকে সবাই মনে করত ঘরের অলক্ষ্মী। শেষ পর্যন্ত কয়েকদিনের জ্বরে সে মারা গেল। সাদা ঝরঝরে ভাষায় সেই কাহিনী লেখা। লেখা পড়তে পড়তে মনে হয় 'শুভা'র কথা।

এই সময়ের শ্রেষ্ঠ রচনা 'ভৈরবী' (১২৯৬, শ্রাবণ)। শুধু নগেন্দ্রনাথেরই নয়—গল্পটি প্রাক্ রবীন্দ্রধারায় শ্রেষ্ঠ গল্প। গল্পটির পটভূমিকা সিপাহী যুদ্ধ।

১। তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য : পৃঃ ৪৫

সিপাহী যুদ্ধের স্মৃতি তখনও জনচিত্তে অম্লান ছিল। তখনও বহু বৃদ্ধ সিপাহী তাঁদের যৌবনের সেই কাহিনী শুনিয়ে কিশোরদের উৎসাহিত করতেন। সিপাহী-যুদ্ধ সম্ভব অসম্ভব বহু কাহিনীর উৎসলোক ছিল। মধ্যযুগের শেষ রশ্মি এই যুদ্ধেই বিলীন হয়েছিল। বহু ছোট ছোট রাজা রানী, সামন্ত সকলেরই ভাগ্য এই যুদ্ধে বদলে গিয়েছিল তাই সিপাহীযুদ্ধ এক মহাকাব্যের উপযোগী বিষয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই জাতীয় কাহিনী সেই মহিমায় প্রতিষ্ঠা পায়নি। কিন্তু যে স্বল্প কয়েকজন ব্যক্তি সিপাহী যুদ্ধের মধ্যে শিল্প সৃষ্টির উপাদান দেখেছেন নগেন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রথম পথিকৃৎ।

'ভৈরবী' গল্পটি পড়তে পড়তে আধুনিক কালে প্রমথনাথ বিশীর 'চাপাটি ও পদ্মের' সুন্দর গল্পগুলির কথা মনে হতে থাকে। নগেন্দ্রনাথ স্বভাবসিদ্ধ রহস্য-সৃষ্টি ও উন্মোচনের মধ্যে দিয়ে কাহিনীটিকে পরিণতি দিয়েছেন। এক ভৈরবী এসেছেন কাশীতে। তীর্থলোভাতুর কাশী। সেখানে সুন্দরী ভৈরবী ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তার পেছনে রূপলোভে ঘুরছে গুণ্ডা। আরো দেখা গেল ঘুরছে পুলিশ। ঘুরছে—মোমতাজ—যে মমতাজ একদা ভৈরবীর প্রণয়প্রার্থী হয়েছিল।

সেদিন সকাল বেলায় গঙ্গাতীরে যখন ভৈরবী বসে আছেন তখন মোমতাজ এসে বললে, ছদ্মবেশের মধ্যেও আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। ভৈরবী ভ্রূক্ষেপ করলেন না। মোমতাজ বলে চললে, তুমি যদি আমাকে বিবাহ কর তাহলে পুলিশ তোমাকে ধরবে না! ভৈরবী তাকে বিদ্রূপ করলেন। অপমান করলেন। তখন সেই জনতার মধ্যে থেকে সিপাইরা বেরিয়ে এল। কিন্তু ভৈরবীর হাতে বর্শা আলোয় ঝলসে উঠল। তারপর তিনি নিজের বুকে বিদ্ধ করলেন। তারপরই জনতা ভেঙে পড়ল। আর জনতার মুখে শুধু একটি কথা রানী চন্দা—'আজম গড়ে ইংরাজের সঙ্গে যে বড় লড়াই করিয়াছিল।'

রাজ্য হারিয়ে পলাতকা রানীর যে জীবন সেই জীবনকে সূক্ষ্মভাবে নগেন্দ্র-নাথ বর্ণনা করেছেন। এক আশ্চর্য সংযমে কাহিনীটি স্নিগ্ধ। কোথাও কোন বাহুল্য নেই। দ্রুতগতিতে কাহিনীটি এগিয়ে গেছে অনিবার্য পরিণতির মুখে। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি প্রকাশের আগেই নগেন্দ্রনাথ পরবর্তী শিল্পীদের জীবনের বিচিত্র দিকে আকর্ষণ করে গেছেন।

নগেন্দ্রনাথের গল্পসংখ্যা অজস্র এবং বহু গল্পই মাসিক পত্রিকার মধ্যে আজও ছড়িয়ে আছে।১ তাঁর গল্পগুলিকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা চলে।

.১। ১। সংগ্রহ ১২৯৯/১৮৯২
২। উপন্যাস সংগ্রহ ও রহস্য ১৮৯৯
অবশ্য রহস্য অংশটি গল্প নয়। চুলের কলপ, কোঁচার কথা ও হিসাবে ভুল-

(১) রহস্য ও রোমাঞ্চ, (২) প্রেম, (৩) বিবিধ।

রহস্যসৃষ্টি নগেন্দ্রনাথের রচনার বিশিষ্ট ধর্ম। শুধু যে তাঁর ছোটগল্পগুলির মধ্যে এ ভাব রয়েছে তা নয় তাঁর উপন্যাসবলীও রহস্যছায়ায় পরিব্যাপ্ত। এই রহস্য সৃষ্টি আবার প্রধানতঃ দুটি পথ অনুসরণ করেছে। একটি স্বভাবতঃই তাকে অতীতমুখী করেছে। ধূসর অতীতের স্বপ্নাবেশ রচনায়, লুপ্ত আভিজাত্যের ভাংগা ঐশ্বর্যের শেষ দ্যুতির বর্ণনায়, ভাগীরথীর বুকে জলদস্যুদের আতঙ্কময় আবির্ভাবের সংকেত সৃষ্টিতে তিনি আসক্ত। আবার অন্যদিকে এই রহস্যবোধ তাঁকে দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে টেনে এনেছে। যেখানে দূর অতীতের রোমাঞ্চ ও ইতিহাসের স্বপ্নঘন স্পর্শশূন্য দৈনন্দিন কাহিনী—অর্থগৃধ্নুতা, হত্যা, অপহরণের কাহিনী। প্রথমটিতে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র প্রভাবিত দ্বিতীয়টিতে তিনি বাংলা সাহিত্যের রহস্যকাহিনীর পথিকৃৎ।

নিম্নের কয়েকটি উদ্ধৃতি নগেন্দ্রনাথের প্রাচীন জীবনের সৌন্দর্য প্রীতি ও তার আতঙ্কময় বিভীষিকার স্মৃতিবাহী।

> ১। রোষে অভিমানে, স্ফুরিতধরা আয়তালোচনা প্রবীণার যৌবন যেন ফিরিয়া আসিল। দ্রুতপদে, কম্পিত হস্তে সিন্দুক বাক্স খুলিয়া ফেলিয়া সকল সামগ্রী বেগে আসফজঙ্গের সম্মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কত-রকম কারুকার্য খচিত পেশোয়াজ, বহুমূল্য ইজার বন্ধ শুদ্ধ পায়জামা, জরিদার আঙ্গরাখা ও কাঁচুলি স্তূপাকার হইয়া উঠিল। রাশীকৃত ঝন ঝন করিয়া গৃহময় ছড়াইয়া ফেলিল। ॥ হীরার মূল্য ॥
>
> ২। গৃহের আয়তন অত্যন্ত বৃহৎ। স্বর্ণ ও রজত শৃঙ্খল লম্বিত স্ফটিকাধারে নীল, পীত লোহিত বর্ণের আলোক মৃদু মৃদু জ্বলিতেছিল। পারস্য দেশীয় উৎকৃষ্ট গালিচার উপর কোথাও কিংখাব, কোথাও অতি কোমল লদ্দাক দেশীয় মেষ চর্ম, কোথাও বোখারার বিচিত্র কারুকার্য বিশিষ্ট রেশমের চাদর। গৃহের একদিকে ক্ষুদ্র উপবনের ন্যায়; ক্ষুদ্র তমাল ও লতা-কুঞ্জের মধ্যে স্ফটিক সরোবর, তাহার মধ্যে চীন দেশীয় মৎস ক্রীড়া

তিনটি লঘু রচনা।

৩। রথযাত্রা ও অন্যান্য গল্প ১৯৩১

৪। গ্রন্থাবলী। ১ম ও ২য় খণ্ড।

তাঁর কয়েকটি গল্প প্রথমে স্বাক্ষরহীনভাবে মুদ্রিত হয়। যেমন

মায়াবিনী	পৌষ ১৩০৬		পৃঃ ৩৩- ৪০
অলকামন্দির(?)	মাঘ ১৩০৬	”	পৃঃ ৯৫-১০৬
মৃত্যু	চৈত্র ১৩০৬	”	পৃঃ ১২৫-১২৮
নিস্ফল অপরাধ	চৈত্র ১৩০৬	”	পৃঃ ১০২-১০৮
ছোট বৌ	বৈশাখ ১৩০৭	”	পৃঃ ১৫৬-১৬১

করিতেছে। পরীর মুখের ন্যায় একটি উৎস রহিয়াছে; হীরকের দন্তপংক্তি, নীলকান্তমণির চক্ষু, সুবর্ণনির্মিত বাহু, তাহার রন্ধ্র হইতে জল উর্দ্ধে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। আলোকে শতবর্ণে রঞ্জিত হইয়া সূক্ষ্ম বারিকণা স্ফটিকের সরোবরে পতিত হইতেছে। গৃহের ঊর্দ্ধদেশ মুকুর মণ্ডিত; প্রাচীরে দিল্লীর প্রধান চিত্রকরদিগের নির্মিত চিত্র, সেই সকল চিত্র দেখিয়া রমণীর মুখ লজ্জায় লোহিত বর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। ॥ **রোশিনারা** ॥

৩। জটাশূন্য, কৃষ্ণ, কুঞ্চিত কেশভারের মধ্যে সে মুখ ঢল ঢল তরল লাবণ্যময়, চিত্রকরের স্বপ্নতুল্য, দেখিতে নিমেষ পাতের বিলম্ব অসহ্য বোধ হয়। সুঠাম, সর্বাঙ্গ সুন্দর গঠন, চন্দ্রকর বিধৌত, হিল্লোল তরঙ্গ-শূন্য, লাবণ্য সমুদ্র মথিত রূপরাশি যেন সেই মুখে ও দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। দীর্ঘ পক্ষ্ম সংযুক্ত আয়তলোচনদ্বারা যেন নিদ্রাভারাক্রান্ত। সর্বদা নত-দৃষ্টি। অর্দ্ধ মুদ্রিত চক্ষে যখন সেই রমণী কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল তখন আমি নিশ্বাস ত্যাগ করিলাম, রূপমোহ ভঙ্গ হইল, বুঝিতে পারিলাম যে এই রূপ সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নহে। সে কটাক্ষ কঠিন, সে চক্ষের জ্যোতি বড় তীব্র। সে কটাক্ষ আমার শরীর রোমাঞ্চ হইল, পার্শ্বস্থিত ব্যক্তিকে অত্যন্ত লঘুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ এই ভৈরবী। ॥ **ভৈরবী মন্দির** ॥

৪। ভাগীরথীর উপর অন্ধকার রাত্রি। উভয় তীরে অরণ্য, কোন কোন স্থানে তীরের নিকট চড়া পড়িয়াছে, কিন্তু জোয়ারের জলে চড়া অল্পে অল্পে ডুবিয়া যাইতেছে। জল ধীরে ধীরে স্ফীত হইতেছে। মন্দ মন্দ কল কল কুলু কুলু শব্দ, অধিক উচ্ছ্বাস, তরঙ্গ ভঙ্গ নাই। আকাশে নক্ষত্র, জলে নক্ষত্রের আন্দোলিত প্রতিবিম্ব, অন্য আলোক নাই। অরণ্যে কখন শ্বাপদ গর্জন, বালুকায় কদাচিত টিট্টিভ রব—অন্য শব্দ নাই। ॥ **বোম্বেটে** ॥

এই সমস্ত বর্ণনায় নগেন্দ্রনাথ মূলতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসারী। প্রাচীন জীবনের প্রতি যে আকর্ষণ তাঁর ছিল তারই মধ্য থেকে এই ধরনের গল্পের জন্ম হয়েছে। তাঁর 'ব্রাহ্মণবাদ', 'টিকিয়াশাহ', 'চন্দ্রাপীড়ের ঐশ্বর্য', 'বোম্বেটে', 'হীরার মূল্য' প্রভৃতি গল্পের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে রোমান্সের আতিশয্য আছে। কোন কোন গল্প তাই বাস্তব জীবনের সীমারেখা ছাড়িয়ে উপকথায় বা রূপকথার পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। একদিকে যেমন সৌন্দর্যবোধ ও অতীত প্রীতির ফলে নগেন্দ্রনাথ এই ধরনের গল্প রচনা করেছেন তেমনই বিশুদ্ধ রহস্যবোধের তাগিদে আধুনিক ডিটেকটিভ গল্প লিখেছেন। এই সমস্ত ডিটেকটিভ গল্পের মধ্যে আবার আধুনিক ডিটেকটিভ গল্পের যে সূক্ষ্মভাবে নিদর্শন ধরে ধরে অনুসন্ধান চলে তা কিন্তু নগেন্দ্রনাথ করেননি। তিনি খুনী বা গোয়েন্দার মনস্তত্ত্ব নিয়ে দীর্ঘ প্রসঙ্গের অবতারণা করেননি। তাঁর সমস্যাগুলি সহজ কোথাও তার জটিলতা মনকে আচ্ছন্ন করে না—শুধু তার মধ্যে একটি অস্পষ্ট কুয়াশার জাল কাহিনীকে রহস্যময় করে তোলে। এই দিক থেকে তাঁর এই দুই স্তরের কাহিনীর মধ্যে আন্তর ঐক্য আছে।

'ব্রাহ্মণবাদ' হঠাৎ নারীর প্রতি অপমানে ধ্বংস হয়ে যায়, 'টিকিয়াশাহ' সিপাহী-যুদ্ধের সময় হঠাৎ গ্রামের গাছের তলায় আবির্ভূত হন। 'চন্দ্রাপীড়ের' ঐশ্বর্য হঠাৎ একদিন বিপুলভাবে আসে, ভৈরবমন্দিরের গুপ্ত গুহাপথে অপূর্ব রূপবতী ভৈরবীকে দেখা যায়—এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে তাঁর মন যেমন আনন্দ পায়—তেমনি আনন্দ পায়—যখন হঠাৎ একদিন কুঞ্জলাল এসে ডাক্তারকে বলে তার একটি হাতের আঙুল কেটে ছোট করে দিতে এবং তার বিনিময়ে সহস্র টাকার পারিশ্রমিক, কিংবা নূতন বাড়ির অন্ধকারে সারা রাত্রি ভয়াবহ শব্দ, কিংবা ট্রেনের মধ্যে অকস্মাৎ কালো চশমা পরা যুবকের আবির্ভাব। 'জাল কুঞ্জলাল', 'টিকিয়াশাহ', 'চুরি না বাহাদুরি', 'নূতন বাড়ি' প্রভৃতি গল্পে মনের এই দিকটি প্রকাশিত।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বা প্রেম সম্পর্কিত গল্পগুলিতে নগেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব উপেক্ষণীয় নয়। প্রেম সম্পর্কে তাঁর মনোভাব গল্পগুলিকে সর্বত্রই এক বিশেষ রুচির স্নিগ্ধতায় উদ্ভাসিত করেছে। তার 'মিরিয়ামে ও 'সোহরাব' গল্পটিতে বলেছেন,

> "দৈহিক সুখে সুখ নাই। যদি মনকে ফিরাইয়া আনিতে পার, তবে সোহরাব, তুমি আমায় বিবাহ কর। এই সাগরের কূলে নারিকেল বীথিতে বসিয়া, লুকাইয়া, ছুটিয়া, শুইয়া আমরা যে শান্তি পাইতাম যদি সেই পরম শান্তি এখন সোহরাব আমরা আবার ফিরিয়া পাই, তবে এস, আমরা মিলিত হই, নতুবা কেন ? আর কেন ? ভোগে সুখ নাই, ত্যাগেই শান্তি।"

'কাহার ভ্রম'. 'দুইবার মিলন', 'মেহেরজান', 'ফাতিমা', এবং 'বিক্রমসিংহ' প্রভৃতি গল্পের মধ্যে তাঁর এই রুচির ছাপ অতি স্পষ্ট। কোথাও কোথাও স্বভাবসিদ্ধ মধ্যযুগীয় রোমান্স ও বীর্যের ছায়াপাত ঘটেছে। দুর্গপ্রাকার থেকে পালিয়ে যেতে গিয়ে নায়ক নায়িকা মৃত্যু আলিঙ্গনে বদ্ধ থাকার মত ঘটনার মধ্যে নাটকীয়তা যেমন আছে তেমনিই লেখকের একটি আদর্শবোধ এই নাটকীয়তার আঘাতকে স্তব্ধ করে রেখেছে। নগেন্দ্রনাথ কয়েকটি প্রেমের গল্পে চরিত্রচিত্রণ ও বর্ণনাকুশলতার বিশেষ পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'শ্যামার কাহিনী' গল্পটি বিশেষ স্মরণীয়। শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের অনেক আগেই তিনি শ্যামার কথা লিখেছেন এবং শ্যামার মনের মতই লিখেছেন। তিনি কোথাও ভারসাম্যের ত্রুটির মধ্যে পতিত হননি। 'কাহার ভ্রম' রচনাটি 'রীতি' হিসেবে উল্লেখযোগ্য। কাহিনীটি চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেছে।

তৃতীয় স্তরকে 'বিবিধ' পর্যায় আখ্যা দিয়েছি। এই পর্যায়ে বহু বিচিত্র বিষয়ে তিনি গল্প লিখেছেন। গ্রাম্য যুবকের বন্ধুত্ব, ছোটদের মনোরঞ্জক গল্প, বাঙালীর ঘরের দুর্গোৎসব, ছোট বৌর মত চরিত্র, অসহায় নারীর ব্যর্থতা, পতিতার মাতৃত্ববোধ এমন কি উনিশ' এগারো সালে বাঙালী ফুটবল দলের শিল্ড বিজয়—সমস্তই তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু। 'পূজার পোষাক', 'ঘরের অলক্ষ্মী', 'ছোট বৌ' প্রভৃতি গল্পে তাঁর রোমাঞ্চবিলাসী মন প্রাত্যহিক সংসারের মধ্যে নেমে এসেছে এবং আমাদের উদ্‌ঘাটন করেছেন। নগেন্দ্রনাথের 'লক্ষ্মীহারা' গল্পটি আজো বিশেষভাবে স্মরণীয়।

লক্ষহীরার মত একটি নটী একটি ছেলেকে ভালবেসেছিল—সেই স্নিগ্ধ সুন্দর বুভুক্ষু মাতৃত্বের তৃষ্ণা ব্যথিত গল্পটি নগেন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। এই গল্পটি চলিত ভাষায় লেখা। এর থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে নগেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ শেষ করি।

> "আগে নরম সুরে, ধীরে ধীরে, গানের কথাগুলি স্পষ্ট সুরের তার যেন প্রাণ থেকে টানা, যে শোনে, মর্মে মর্মে লাগে। প্রার্থনার একটি গান, অনুতপ্ত হৃদয়ের ব্যথা, মার্জনার জন্য ব্যাকুলতা, কণ্ঠ ক্রমে মুক্ত হল, ঐ টুকু ঘরে যেন গলা ধরে না। এমন প্রাণের আকুলতা, যেন দেবতা সাক্ষাতে, যেন তিনি নিজে সব শুনছেন। সেই ঘরখানি যেন দেব মন্দির হয়ে উঠল।"

১৮৯০-৯১ থেকে রবীন্দ্রনাথ গল্পক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন এবং এক নবীন মহাদেশ আবিষ্কার করলেন। তখন থেকেই নগেন্দ্রনাথের গুরুত্ব কমতে শুরু করল এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ম্লান হয়ে গেলেন। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত তিনি পুরোদমে লিখেছেন—সাময়িক জনপ্রিয়তা যে পাননি তাও নয়—বসুমতী থেকে তাঁর গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছিল—তিনটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল—কিন্তু তাঁর মৃত্যুর আগেই তার জনপ্রিয়তা লুপ্ত হয়। আর কুড়ি-পঁচিশ বছর পরের পাঠকেরা তাঁর নাম জানবে না। তিনি ইতিহাসের সামগ্রী হয়ে রয়েছেন।

এর জন্য পাঠক সমাজের সেই বহুশ্রুত অকৃতজ্ঞতাই একমাত্র কারণ নয়। নগেন্দ্রনাথের রচনার মধ্যেই তার বীজ নিহিত ছিল। নগেন্দ্রনাথের রচনার বহুগুণ থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে তাঁর গল্পের বিষয়গুলি পাঠকচিত্তকে আশ্বস্ত করতে পারেনি। কারণ দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে তিনি বিরাজিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ঐন্দ্রজালিক গল্পের পাশে পাশেই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আশ্চর্য কথা বলার কুশলতায় পাঠকের মন জয় করেছিলেন। নগেন্দ্রনাথ এঁদের মাঝখানে পড়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি।

অবশ্য আরো একটি নিহিত কারণ ছিল বলে মনে হয়। নগেন্দ্রনাথ যদিও উনিশ শ' চল্লিশ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন তবুও চিন্তার দিক থেকে তিনি আধুনিক সাহিত্যিকদের চেয়ে স্বতন্ত্র ছিলেন। তিনি কোন রকম বিদেশী আদর্শের দ্বারা যেমন প্রভাবিত হতে চাননি তেমনই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন আদর্শের অনুগত্যও ত্যাগ করতে চাননি। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শই তাঁর মনকে প্রভাবিত করেছিল। ফলে তাঁর রচনার মূল বক্তব্যে ও রীতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্পষ্ট যোগাযোগ অনুভব করা কঠিন নয়। কিন্তু সাহিত্য জগতে যখন ক্রমশই রবীন্দ্রপ্রভাব বাড়তে লাগল তখন নগেন্দ্রনাথের রচনাগুলিও অপেক্ষাকৃত মলিন ও হীনপ্রভ মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তবুও ঐতিহাসিক অর্থে তিনিই প্রাক্-রবীন্দ্র যুগের শ্রেষ্ঠ গল্পকার।

ছোট গল্প।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
Ravindranātha Thākura.

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

৫৫নং চিৎপুর রোড।

১৫ ফাল্গুন ১৩০০ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের প্রচ্ছদপট

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ॥

বাংলাসাহিত্যের অধিকাংশ সমালোচকই বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোট-গল্পের স্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা ছোটগল্প এখন সার্থক শিল্পরূপ লাভ করেছে সন্দেহ নেই যদিও ঐতিহাসিক অর্থে রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই ছোট-গল্প রচনার প্রয়াস যথেষ্ট দেখা গেছে। স্বর্ণকুমারী দেবী বা নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছোটগল্পের কলাকৌশল পূর্ণ আয়ত্ত করতে না পারলেও ছোটগল্প রচনার চেষ্টা করেছেন। অনেক নামহীন এবং বর্তমানে বিস্মৃতপ্রায় লেখকেরা বাংলা গল্পকে ছোটগল্পের দিকে অগ্রসর করিয়ে দিয়েছেন এতেও কোন সন্দেহ নেই। রবীন্দ্র-নাথ সেই অপরিণত শিল্পরূপটিকে পূর্ণতা দিয়েছেন এখানেই তাঁর সর্বাধিক গৌরব।১ রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন সৃষ্টি করেছেন অনেক, সেই সঙ্গে পুরানো ও প্রচলিত কিন্তু অস্ফুট ও অপরিণত আঙ্গিক ও গঠনকলাকে বিচিত্রভাবে ব্যবহার করে তাকে পূর্ণ পরিণত করেছেন। ছোটগল্প তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ বাংলা দেশে কথাসাহিত্যের জন্মের পর থেকে, এবং অজস্র পত্রিকার প্রকাশের পর ছোট ছোট গল্পের দিকে বাঙালী সমাজের আকর্ষণ ক্রমশই বাড়তে থাকে' রবীন্দ্রনাথ নিজেও ভিখারিণী (১২৮৪।১৮৭৪ খৃঃ) নামে একটি গল্প লিখে সেই গল্পধারাকে বাড়ান। কিন্তু তখনও তাঁর হাত অপটু, কাহিনী বন্ধন তখনও শিথিল। ১২৯১।১৮৮৪-৫-তে তিনি 'ঘাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা' নামে দুটি গল্প লেখেন। এই দুটির মধ্যে 'রাজপথের কথা'য় গল্পাংশ নেই, 'ঘাটের কথা'য় সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের গল্পরচনার ক্ষমতার স্ফুরণ।২ এই গল্পরচনার শক্তি ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছিল এবং তার যথার্থ প্রকাশ ঘটল 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে।

১২৯৮ (১৮৯০ খৃঃ) সালে 'হিতবাদী' পত্রিকার প্রকাশ। এখানে রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' 'পোস্টমাস্টার' গিন্নি, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, ব্যবধান ও তারা-প্রসন্নের কীর্তি—এই ছটি গল্প প্রকাশিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'খাতা' গল্পটি হিতবাদীতে প্রকাশিত হয়েছিল। হিতবাদীর পুরোনো সংখ্যা-গুলি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এই তথ্য প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

১। পূর্বে দ্রষ্টব্য ঃ ১র, ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদ
২। পূর্বে দ্রষ্টব্য ঃ ৩য় পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৪৫

যখন রবীন্দ্রনাথ গল্প লিখতে শুরু করেন তখন তিনি ছিলেন শিলাইদহে, পদ্মাতীরে। জমিদারী দেখাশোনার জন্য তাঁকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শিলাইদহে পাঠান। রবীন্দ্রনাথ থাকতেন পদ্মার ওপরে একটি হাউস-বোটে। এতদিন তাঁর জীবন কেটেছে শহরে। কলকাতার বাইরে যে সব জায়গায় তিনি মধ্যে মধ্যে বেড়াতে গেছেন সেগুলিও প্রধানতঃ শহর। কখনও আমেদাবাদে, কখনও ইংলণ্ডে, কখনও গাজীপুরে। প্রকৃতিকে দেখেছেন দূরে থেকে। পাহাড় সমুদ্র নদী বনকে দূরে থেকে উপভোগ করেছেন। আর সাধারণ মানুষের জীবন সম্পর্কে তাঁর ধারণা তখনও পুঁথিগত। সাধারণ মানুষের জীবনের সুখদুঃখ তখনও তাঁর অজানা। তিনি শিলাইদহে এসে দুটি জিনিষ লাভ করলেন, এক প্রকৃতি, আর অন্যটি সাধারণ মানুষ। তাঁর প্রথম গল্প 'ভিখারিণী'র পটভূমিকা, কাশ্মীরের এক সুন্দর উপত্যকা, তার অপরূপ বন, তার শীতের তুষারপাত। এই পটভূমিকা অতি কৃত্রিম, অতি বিশেষত্বহীন। কোন বিশেষ স্থানের পরিচয় সেখানে নেই। পাহাড় বন তুষার এই ত্রয়ের সমাহার মাত্র। 'ঘাটের কথায়' গঙ্গার পটভূমি। গঙ্গা তাঁকে বাল্যকাল থেকে প্রভাবিত করেছিল, বিশেষত বাল্যকালে পেনেটিতে ও কৈশোরে চন্দননগরে গঙ্গাতীরে কিছুকাল কাটিয়েছিলেন। গঙ্গা তাঁর কবিতায় ও গল্পে মধ্যে মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু শিলাইদহে প্রথম প্রকৃতির অন্তরঙ্গতা লাভ করলেন তিনি। ঋতুতে ঋতুতে আকাশ ও পৃথিবীর যে পরিবর্তন তা কলকাতায় বসে তিনি অনুভব করতে পারেননি। সকাল থেকে মধ্যাহ্ন, মধ্যাহ্ন থেকে অপরাহ্ন, অপরাহ্ন থেকে গোধূলি, গোধূলি থেকে অন্ধকার—এই যে সময়ের রূপ ও রং পরিবর্তন তা ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ কখনও লক্ষ্য করেননি। এই সময়ে লেখা চিঠিগুলির মধ্যে বারবার বিস্ময়ে তিনি প্রকৃতির এই অনন্ত মাধুরীর কথা উল্লেখ করেছেন। এক চিঠিতে লিখছেন"—

> "ঐ-যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি —ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা— শুদ্ধ দু হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম? স্বর্গ আর কী দিত জানিনে, কিন্তু এমন কোমলতা দুর্বলতাময়, এমন সকরুণ আশঙ্কাভরা অপরিণত এই মানুষগুলির মতো এমন আদরের ধন কোথা থেকে দিত! আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শস্যক্ষেত্র এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই সমস্ত দরিদ্র মর্ত হৃদয়ের অশ্রুর ধন-গুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে।"[১]

১। ছিন্নপত্র : পত্রসংখ্যা ১৩, পৃঃ ৩৫

এই প্রকৃতি ও এই মানুষ রবীন্দ্রনাথের কাছে এক নতুন জগৎ খুলে দিল। প্রকৃতিপ্রীতি, মর্ত্যপ্রীতি ও মানুষেরা 'সুখদুঃখময় ভালোবাসার' প্রতি ভালোবাসা রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের সাহিত্যসৃষ্টির প্রধান সুর। আর ছোটগল্প তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির প্রধান বাহন ছিল এই শিলাইদহ বাসকালে। এই সময়েই তাঁর বহু শ্রেষ্ঠ কবিতা (মানসী, সোনারতরী, চিত্রা, চৈতালী, ক্ষণিকা) রচিত হয়েছে। তাঁর গল্প-গুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার পাশেই আসন দাবী করতে পারে।

ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের তিনটি গল্প পাঠ করলে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ কাহিনীর উপাদান সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। কাশ্মীরের পাহাড়ী উপত্যকায় তাঁকে কাহিনী সন্ধান করতে হচ্ছে, ঘাটের কথার মধ্যেও কাহিনী নিয়ে তিনি চিন্তিত—বাক্‌প্রগলভতাও কম নয়, রাজপথের কথার মধ্যে কাহিনীই নেই। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম এলেন মানুষের সাহচর্যে। আলাপ হল অনেক লোকের সঙ্গে, কেউ পোষ্টমাষ্টার, কেউ ইস্কুলমাষ্টার, কেউ মাঝি, কেউ বাউল, কেউ ভিখারী। নৌকো থেকে দেখতে পেলেন দূরের মাঠে চাষীদের যাওয়া আসা' সন্ধ্যে সকাল গ্রাম্য মেয়েদের নদীতীরে আসা, স্নান করা, জলভরা, বিকেল বেলায় গ্রামের ছেলেদের খেলা করা। দেখলেন নদীর ঘাটে শহর থেকে আসা নতুন বাবু; নদীর ঘাটে সদ্যবিবাহিতা বাল্যবধূ চলেছে শ্বশুরবাড়ি মা-বাপকে কাঁদিয়ে। জীবনের এই স্রোত রবীন্দ্রনাথ কোনদিন দেখেননি। তাই তিনি আনন্দে লক্ষ্য করছেন নদীতীরে "কোনো কোনো লজ্জাশীলা বধূ দুই আঙুলে ঘোমটাটা ফাঁক করে ধরে কলসী কাঁখে জমিদারবাবুকে সকৌতুকে নিরীক্ষণ করছে"১, কখনও দরিদ্র ছাত্ররা বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় নিবেদন করে তাদের স্কুলে টুল ও বেঞ্চির অভাব,২ কখনও বা বেদের দল এসে পদ্মারতীরে আস্তানা পাতে৩, পোষ্টমাষ্টার এসে মজার গল্প বলে৪, বালকেরা নৌকার মাস্তুল নিয়ে খেলা করে।৫ এই জীবনস্রোতের মধ্যে যে মুহূর্তে তিনি প্রবেশ করলেন তাঁর আর উপাদানের অভাব হলনা। প্রত্যেকটি মুহূর্ত এক একটি গল্পের উপাদান। তাঁর গল্পের প্রবাহ অর্গল মুক্ত হল।

১। ছিন্নপত্র : ১১, পৃঃ ৩১-৩২
২। " ১২, পৃঃ ৩৩
৩। " ১৬, পৃঃ ৪১
৪। " ১৭, পৃঃ ৪৬
৫। " ২৪, পৃঃ ৫৮-৫৯

২

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্পের প্রথম প্রধান সার্থক লেখক। তিনিই প্রথম 'ছোটগল্প' শব্দটি ব্যবহার করেন। এর আগে ছোট ছোট গল্প ব্যবহার করা হয়েছে—কিন্তু 'ছোটগল্প' এই শব্দটি ব্যবহার হয়নি। তাঁর ছোটগল্পগুলি আকৃতিতে ছোট, চরিত্রসংখ্যাও বেশী নয় এবং সাধারণত একটি চরিত্রই উদ্ভাসিত. রবীন্দ্রনাথের পূর্বে এ ধরনের আকৃতি বা গঠন লক্ষ্য করা চলে। কিন্তু একটি ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ প্রাক্ গল্পকারদের থেকে পৃথক ও নবীন গল্প-ধারার জন্মদাতা—তা হল গল্পের গঠনে। তাঁর গল্প আরম্ভ হয় দ্রুত, অবিলম্বে তিনি গল্পের মধ্যে পাঠককে টেনে আনেন এবং গল্পের শেষ করেন সেইখানে যেখানে পাঠকমন কাহিনী সম্পর্কে সবচেয়ে কৌতুহলী। তাঁর অধিকাংশ গল্পে ঘটনা অতি সামান্য, কিন্তু সেই সামান্য ঘটনার থেকে নিঃসরিত কোমল অনুভূতিগুলি গল্পটিকে গড়ে নেয়। শরৎচন্দ্র বা প্রভাতকুমারের গল্পগুলি পাশে রাখলে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি ঘটনাপ্রধান নয়, ভাবপ্রধান। তাঁর গানে যেমন মনের অসংখ্য মুহূর্তের ভাবকে বিকশিত করেছেন, তাঁর ছোটগল্পও সাধারণ জীবনের সাধারণ ভাব। তা আড়ালে থাকে, অসংখ্য ঘটনাস্রোতে হারিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ সেই ভাবগুলিকে ধরেছেন, তাদের নিয়ে গল্প করেছেন। তিনি হিতবাদীতে যে কটি গল্প লিখেছিলেন তার থেকে এর উদাহরণ দেওয়া চলে। সেই গল্পগুলির অধিকাংশের মধ্যে একটি কথাবস্তু আছে, তা হল 'নিঃসঙ্গ মানব হৃদয়।' জগৎ-সংসারের সমস্ত কাজ ঠিকই চলেছে। সূর্য ওঠে, অস্ত যায়। মানুষ জন্মায়, মরে। এই বৃহৎ কর্মকোলাহলের মধ্যে একটি মানুষের দুঃখ বা সুখ বিশ্বের কাছে অতি তুচ্ছ—অথচ সেই তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর আনন্দই মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। সেখানে মানুষ নিঃসঙ্গ, তার বেদনা তার একার। সেই একার বেদনা, একার দুঃখই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু গল্পে তুলে ধরেছেন। 'পোস্টমাস্টার' গল্পে রতনের দুঃখ—সে দুঃখ রতনেরই—জগৎসংসারের কোন ক্ষতিই নেই। জগৎ সংসার ভাবে 'পৃথিবীতে কে কাহার'। কিন্তু রতনের নিঃসঙ্গ বেদনা তার প্রাণের, তার মনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। এই বেদনা "যুক্তিশাস্ত্রের বিধান" মানে না, "প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস" করে। এই নিঃসঙ্গ মানবই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের অন্যতম নায়ক। আশুর 'গিন্নি' নাম দেওয়ার ফলে শিশুর যে বেদনা তা আর কেউ অনুভব করতে পারে না। রামকানাইর চরিত্রবত্তা বিশ্বের চোখে নির্বুদ্ধিতা। দুই পরিবারের বিবাদের ফলে দুই শিশুর 'ব্যবধান' উদাসীন জগতের চোখে মূল্যহীন।

মানুষ সামাজিক জীব কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে সে একা। রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় কবিতার মধ্যে আছে : ১

Yes ! in the sea of life enisled
With echoing straits between us thrown
Dotting the shoreless watery wild,
We mortal millions live alone.

'রামকানাইর নির্বুদ্ধিতা' গল্পে রামকানাই বলতে পারত 'we mortal millions live alone,' সমাজ রামকানাইকে নির্বোধ বলেছে। রামকানাই তখনও তার কর্তব্য ও ধর্মবোধের দীপ জ্বালিয়ে রেখেছে। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনে' রাইচরণ এই নিঃসঙ্গ মানব। যখন সে পদ্মায় খোকাবাবুকে হারাল তখন দেখল 'কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছলছল খলখল করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিত, যেন সে কিছুই জানে না এবং পৃথিবীর এই সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।' শুধু প্রকৃতির উদাসীনতা নয় মানবের উপেক্ষা আরো বেশী তীব্র। সে যখন নিজের পুত্রকে প্রভুর হাতে তুলে দিল তখন তার এই অসামান্য আত্মত্যাগকে অপমান করল তারা অর্থের মূল্যে। অনুকূলবাবুর টাকা ফেরৎ এল। অসীম জনারণ্যে রাইচরণ হারিয়ে গেল চিরকালের মত। আর একটি উদাহরণ, কাবুলিওয়ালা। বাঙালীর চোখে কাবুলীওয়ালা রুক্ষ কর্কশ, তারা টাকা ধার দেয়, সুদের ব্যবসা করে। তাদের হৃদয় বা তাদের জীবন সম্পর্কে বাঙালী অজ্ঞ। তাই গল্পের মধ্যে যখন দেখা গেল কাবুলিওয়ালা তার মেয়েকে ভালবাসে, তার রুক্ষ কর্কশ হৃদয় কাবুলি মেওয়ার মতই সরস তখন কাবুলিওয়ালা চরিত্রের একটি নূতন রূপ উদ্ভাসিত হল। পিতৃত্বের আলোয় হঠাৎ তার সমস্ত হৃদয় স্পষ্ট হল। মিনির পিতাই শুধু তার পিতৃহৃদয়ের বেদনা অনুভব করলেন, তাই বিবাহের জন্য সজ্জিতা মিনিকে ডেকে পাঠালেন—'অন্তপুরে ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল'। রহমতকে মিনির টাকা দিয়ে দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। ফলে বিবাহের আনন্দোৎসবের কিছু অংশ বাদ দিতে হল।' "অন্তঃপুরে মেয়েরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।" আর 'মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রহমত মাটিতে বসিয়া পড়িল।' জগৎ আজ এই দীর্ঘনিঃশ্বাসের মূল্য বুঝবে না। এই অসীম জীবনসমুদ্রে মানুষ ক্ষুদ্র দ্বীপবিন্দু, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের তফাৎ। সে একা। এই নিঃসঙ্গতার বেদনা ও মাধুরী গল্পগুচ্ছের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এখানেই রবীন্দ্রনাথের গল্পের অ-সাধারণত্ব।

---

১ Matthew Arnold : *To Marguerite*

রবীন্দ্রনাথের গল্পের বিষয়বৈচিত্র্য অসাধারণ। তিনি শহর নিয়ে লিখেছেন, গ্রাম নিয়ে লিখেছেন। তাঁর গল্পে প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য বারবার এসেছে, তাঁর গল্পে অতিপ্রাকৃত আবহাওয়া সৃষ্ট হয়েছে। তাঁর গল্পের চরিত্রশালায় রাজারানী আছে, লুপ্ত বিত্ত জমিদার আছে, মধ্যবিত্ত সমাজ আছে। দরিদ্র কৃষক আছে। তাঁর গল্পে প্রেম যেমন বিরাট স্থান অধিকার করেছে। তেমনই করেছে প্রকৃতি, তেমনিই করেছে ভ্রাতৃস্নেহ, প্রভুর প্রতি আনুগত্য, মায়ের প্রতি ভালবাসা। তিনি বর্তমান জীবন নিয়ে গল্প লিখেছেন, অতীত কাল নিয়ে লিখেছেন। তাই তাঁর গল্পগুলির নানা বিষয় বিভাগ করা সম্ভব। বলাই বাহুল্য কোন সম্পূর্ণ স্বয়ংস্বতন্ত্র ভাগ সম্ভব নয়, প্রত্যেকটি ভাগ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। এই কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলিকে চারটি গুচ্ছে ভাগ করা হল। (ক) ব্যক্তি ও প্রকৃতি (খ) ব্যক্তি ও ব্যক্তি (গ) ব্যক্তি ও সমাজ (ঘ) ব্যক্তি ও অতিপ্রাকৃত।

ব্যক্তি ও প্রকৃতি ঃ গল্পগুচ্ছ যখন রবীন্দ্রনাথ লিখছেন তখন সর্বপ্রথম বাংলাদেশের প্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ চিনলেন। বাংলার মাঠ নদী আকাশ এই সর্বপ্রথম তাঁর কাব্যে ও গল্পে একটি বিশিষ্ট রূপ নিয়ে ধরা পড়ল। ভারতীয় কবিরা চিরকালই প্রকৃতিকে জীবিতসত্তা বলে পূজা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রকৃতির সঙ্গে জন্মজন্মান্তরের পরিচয় কল্পনা করেছেন। তিনি অনুভব করেন যে এই পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম আবির্ভাবের লগ্নে তিনি হয়ত গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলেন। ছিন্নপত্রের বহু চিঠিতে বারবার বলতে চেয়েছেন, 'আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে...'১ ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'লুসি' বা কালিদাসের 'শকুন্তলায়' প্রকৃতি ও মানবের যে গভীর সম্পর্ক তাই রবীন্দ্রনাথকে নাড়া দিয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এর থেকে প্রকৃতি সম্পর্কিত কোন তত্ত্বে পৌঁছননি। ওয়ার্ডসওয়ার্থের লুসি প্রকৃতির দুহিতা। 'She dwelt among the untrodden ways besides the springs of Dove'—এই অংশ বিশুদ্ধ কবিতার আনন্দ মনে পুলক সঞ্চার করে কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থ যেখানে প্রকৃতির শিক্ষা সম্পর্কে বলেছেন (Three years she grew in sun and shower) সেখানে কবির নিজস্ব একটি তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে এরকম কোন তত্ত্ব প্রকাশ পায়নি, যদিও তাঁর শিক্ষাসম্পর্কিত ধারণায় তা প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের গল্পে

১ ছিন্নপত্র, ৭০, পৃঃ, ১৪৭-৮

প্রকৃতি মানুষের অন্তরঙ্গ। বিরাট সমুদ্র বা পাহাড় তাঁর সাহিত্যে খুব সামান্য স্থান অধিকার করেছে। বাংলাদেশের সবুজ ধানক্ষেত, আঁকাবাঁকা খালবিল, ছায়াচ্ছন্ন পথঘাট, আমজামঘন ছোট ছোট গ্রাম, প্রবল দুরন্ত পদ্মা, শীতের অপূর্ব সকাল, বর্ষার মেঘমেদুর মধ্যাহ্ন, শরতের ক্ষান্তবর্ষণ নীল অপরাহ্ণ ও পদ্মাতীরের বিষাদভরা উদাসী সন্ধ্যাই তাঁর গল্পের পটভূমি। পদ্মাতীরের ধারে বসে তিনি লিখেছেন "বাংলাদেশের মাঠের দৃশ্য, নদীতীরের দৃশ্য, আমার এত বেশী ভালো লাগে।"২ এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের গল্পগুলি প্রকৃতির স্তন্যলালিত।

গল্পের মধ্যে প্রকৃতির পটভূমিকাটি বড় জিনিষ নয়, বড় জিনিষ ব্যক্তির মনের সঙ্গে তার সম্পর্ক। 'ছুটি' গল্পটি ধরা যেতে পারে। বালক সর্দার ফটিক চক্রবর্তীকে কলকাতায় পাঠানো হল লেখাপড়া শিখতে। কলকাতায় মামীর স্নেহহীন ব্যবহার ও মুক্তিহীন জীবনের মধ্যে "কেবলই তাহার গ্রামের কথা মনে পড়িত। প্রকান্ড একটা ঢাউস ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, তাইরে নাইরে নাইরে না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বরচিত রাগিনী আলাপ করিয়া অকর্মন্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেইসব দলবল উপদ্রব স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিনী অবিচারিনী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত।' প্রকৃতি মানুষকে দেয় মুক্তি, মুক্তি দেয় আনন্দ। সেই আনন্দ বঞ্চিত ফটিক মারা গেল।

প্রকৃতি ও ব্যক্তির আর একটি সম্পর্ক 'শুভা' গল্পে। শুভার সুভাষিণী নামটি যে তার জীবনে সবচেয়ে পরিহাস তা বোঝা গেল যখন দেখা গেল শুভা মূক। শুভার কথা ফোটেনি। চোখে মুখে বাণীর আভাস ফুটি ফুটি করেও ফোটেনি। তার ভাষাহীন মৌনতার ফলে সে চিরকাল নির্জন। সে মানব পরিত্যক্তা। প্রকৃতিই তার একমাত্র বন্ধু।

> "প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়। নদীর কলধ্বনি লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক, তরুর মর্মর—সমস্ত মিশিয়া চারিদিকের চলাফেরা আন্দোলন—কম্পনের সহিত এক হইয়া সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায় বালিকার চিরনিস্তব্ধ হৃদয়উপকূলের নিকট আসিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্রগতি ইহাও বোবার ভাষা, বড় বড় চক্ষুপল্লব বিশিষ্ট সভার যে ভাষা তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার, ঝিল্লিরব পূর্ণ তৃণভূমি হইতে

২ ছিন্নপত্র, ১৫৪, পৃঃ ৩৩৭

শব্দাতীত নক্ষত্রলোক পর্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গী, সংগীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘশ্বাস।"

এই গল্পে মানুষ নিষ্ঠুর। বোবা মেয়েকে বাপ মা বিয়ে দিলেন—"তাহাদের জাতি ও পরকাল রক্ষা হইল।......সপ্তাহখানেকের মধ্যে সকলেই বুঝিল, নববধূ বোবা। তা কেহ বুঝিল না সেটা তাহার দোষ নহে। সে কাহাকেও প্রতারণা করে নাই।...এবার তাহার স্বামী চক্ষু এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এক ভাষা-বিশিষ্ট কন্যা বিবাহ করিয়া আনিল"। এই নিষ্ঠুর জগতে তার একমাত্র আশ্রয় এই অনন্ত মূক প্রকৃতি। মানবসমাজের বঞ্চনা, প্রতারণা ও আঘাতের মাঝখানে তার কেউ নেই এই প্রকৃতি ছাড়া। সে যেন এক গাছ কিংবা পশুর মতই প্রকৃতির এক মূক সৃষ্টি।

'অতিথি' গল্পে প্রকৃতি ও ব্যক্তির আর একটি রূপ। রবীন্দ্রনাথের গল্পে প্রকৃতি কোমল, প্রকৃতি স্নেহাতুর। তা ভয়াবহ নয়, তা ভীষণ নয়। কদাচিৎ কখনও (যেমন খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনে) লক্ষ্য করেছেন যে প্রকৃতি মানুষের জন্য চিন্তিত নয়, প্রকৃতির রাজ্যে উদাসীনতাই সবচেয়ে বড় কথা। প্রকৃতি আমাদের প্রয়োজনের চেয়ে বড়। তার বিশাল ব্যাপ্ত রাজ্যে কারো জন্য কোন বিশেষ দয়া নেই। বিশেষ মায়া নেই। মানুষের জীবনের যা বেদনার—প্রকৃতির রাজ্যে তার জন্য কোন বেদনা নেই। বিশ্বজগতের বিশালতার মধ্যে মানুষের ক্ষুদ্র স্নেহবন্ধনের মূল্য কতটুকু!

তারাপদ একদিন অকস্মাৎ বিনাসংকোচে কাঁঠালিয়ার জমিদারদের নৌকায় আবির্ভূত হয়েছিল। সে বন্ধনহীন, হরিণশিশুর মত চঞ্চল। সে হঠাৎ এল, মানুষের স্নেহ প্রেম উপভোগ করেছিল, কয়েকটি দিন সংসারের বন্ধনকে মেনে ছিল --আবার একদিন নীরবে নিশীথরাত্রে সেই গৃহসুখ বন্ধন থেকে সহজেই মুক্তি নিয়েছে। তারাপদ যেদিন চলে গেল সেদিন নববর্ষার মেঘে মেঘে প্রকৃতির বিশ্ব-ব্যাপ্ত আহ্বান। "সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা, চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে......" আর "স্নেহ প্রেম বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্র বন্ধন তাহাকে চারিদিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই ব্রাহ্মণ বালক আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্ব-প্রকৃতির নিকট চলিয়া গিয়াছে।" এই গল্পে প্রকৃতির এই সুদূর বিস্তারী ব্যঞ্জনা ও তারাপদ চরিত্রের পরিকল্পনা এই গল্পটিকে অসাধারণত্ব দিয়েছে।

ব্যক্তি ও ব্যক্তি : ব্যক্তি ও ব্যক্তিতে অসংখ্য সম্পর্ক। তবু সেই অসংখ্য সম্পর্ককে ভাগ করা চলে কয়েকটি শাখায়। প্রেম মানুষের তীব্রতম ও মধুরতম অনুভূতি। রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি উৎকৃষ্ট গল্পের বিষয় প্রেম। এখানেও তিনি বিচিত্রধর্মী।

প্রেম কখনও মিলনমধুর কখনও বা বিরহবিধুর। কখনও তাঁর নায়িকা রাজকুমারী, কখনও সামান্য গৃহস্থ বৌ। কখনও তাঁর কাহিনী বর্তমানকালে কখনও ইতিহাসের ধূসর অধ্যায়ে। কখনও প্রেম সহজ, কখনও বা অসামাজিক ও জটিল।

প্রেমের দুর্দমনীয় শক্তির প্রকাশ ঘটেছে 'দুরাশা' গল্পে। ব্রাহ্মণ কেশরলালকে একদিন মুসলমান রাজকুমারী ভালবেসেছিল কিন্তু সেদিন কেশরলালের মনে ছিল ব্রাহ্মণ্যের অভিমান। কেশরলাল নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ তাই সে এই মুসলমান রমণীর প্রেম গ্রহণ করেনি। সেইদিন থেকে সেই নারী তার সমগ্র জীবনের মধ্যে এক প্রচণ্ড পরিবর্তন আনতে চাইলেন। সে সাধনা ব্রাহ্মণের সাধনা। তিনি এক জীবনকে বিসর্জন দিয়ে অন্য জীবনকে গ্রহণ করতে চাইলেন। পাহাড়ে পাহাড়ে মঠে মঠে মন্দিরে মন্দিরে বদ্রাওন কুমারী ঘুরে বেড়ালেন। আর অবশেষে দেখলেন যে সেই ব্রাহ্মণ্যগর্বিত কেশরলাল ভ্রষ্ট। ব্রাহ্মণ্য তার সংস্কার মাত্র, অভ্যাস-মাত্র। সে এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর একটি অভ্যাস পেয়েছে কিন্তু নারী তার সমস্ত জীবন যৌবনের পরিবর্তে আর একটি জীবন যৌবন কোথায় পাবে? পরি-বেশ রচনায়, ঐতিহাসিক ঘটনার ছায়াপাতে, সর্বোপরি প্রেমে ও ধর্মের দ্বন্দ্বের বর্ণনায় গল্পটি অসামান্য।

আর একটি অসামান্য সৃষ্টি 'একরাত্রি'। গল্পের আখ্যান অতি সামান্য। যেদিন সুরবালাকে পাওয়া ছিল সহজ সেদিন নায়ক মগ্ন ছিল দেশের কাজে। দেশের কাজের বিরাট আহ্বানের কাছে নিতান্ত গ্রাম্যবালিকার নীরব আকর্ষণ ছিল তুচ্ছ। সুরবালার বিবাহ হয়ে গেল সরকারি উকীল রামলোচন রায়ের সঙ্গে। কিন্তু এক-দিন দেশের কাজ শেষ হল। নায়কের পিতার মৃত্যুর পর সংসারের ভার নিতে হল। নায়ককে গ্যারিবল্ডি হবার আশা ছেড়ে হতে হল গ্রামের ইস্কুলের মাস্টার। ভাগ্য-চক্রে সেই গ্রামেই রামলোচন রায়ের বাড়ি। সুরবালা আজ অন্যের স্ত্রী। এখন গল্পের নায়ক মধ্যে মধ্যে যায় রামলোচনবাবুর বাড়ি। "পাশের ঘরে অত্যন্ত মৃদু একটু চুড়ির টুংটাং, কাপড়ের একটুখানি খসখস এবং পায়ের একটুখানি শব্দ শুনিতে পাইলাম; বেশ বুঝিতে পারিলাম জানালার ফাঁক দিয়া কোনো কৌতূহল-পূর্ণ নেত্র আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে।" সুরবালা একদিন ছিল সহজলভ্য—আজ সে অপ্রাপনীয়। আজ সে কেউ নয়। মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়। মন বলে "সুরবালা আমার কী না হইতে পারিত! আমার সব চেয়ে অন্তরঙ্গ, আমার সবচেয়ে নিকট-বর্তী, আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখভাগিনী হইতে পারিত—সে আজ এত দূরে, এত পর, আজ তাহাকে দেখা নিষেধ, তাহার সঙ্গে কথা কওয়া দোষ, তাহার বিষয়ে চিন্তা করা পাপ।"

সেই দরিদ্র মাস্টারের জীবনে একটি অনন্ত রাত্রি এল। একটি রাত্রি, গর্জনে বর্ষণে ভরা। সেদিন রামলোচন দূরে কী একটা কাজে। আর আকাশে প্রবল ঝড়,

প্রবল বর্ষণ। সেই অন্ধকারে সে একা পুকুরের পাড়ের ওপর এসে দাঁড়াল—নীচে বন্যা ছুটে আসছে উদ্দাম বেগে। সেই অন্ধকারে তারই কাছে এসে দাঁড়াল সুরবালা। সেখানে সুরবালার কেউ ছিল না—শুধু তার ছেলেবেলার সাথী। সেই তারাহীন অন্ধকার, সেই প্রলয়ের আসন্ন ছায়ায় একটি রাত্রি—যেন অনন্ত রাত্রি। কেউ কথা বলল না। মৃত্যুর মত স্তব্ধরাত্রির অবসানে সুরবালা কোন কথা না বলে চলে গেল। কাহিনীর নায়কও বাক্যহীন হয়ে চলে এল। ব্রাউনিং এর Last ride together-এর মধ্যে আছে প্রেমিক প্রেমিকার সঙ্গসুখের মুহূর্তে মনে করছে "Who knows but the world may end to-night." একরাত্রির নায়কও তাই ভাবে। তারপরই সে ভাবে, না, সুরবালা সুখে থাকুক। এক অনন্ত মুহূর্তের স্বাদ সে পেয়েছে—'the instant made eternity.'

মাল্যদান গল্পটিতে প্রেমের প্রথম উন্মেষের ছবি। বন্যস্বভাব কুড়ানি প্রেমের স্পর্শে যুবতী নারী হয়ে উঠল। ক্ষণপ্রেমের অবসান হল মৃত্যুর পথে। 'দালিয়া' গল্পেও এই প্রেমের স্নিগ্ধ ও সুন্দর রূপটি। দালিয়া রবীন্দ্রনাথের মধুরতম গল্প। ইতিহাস যেখানে নীরব—সেখানেই গল্পটির শুরু। সুজা আরংগজেবের ভয়ে আরাকানে পালিয়েছেন। তাঁর কন্যারা এক ধীবরের কাছে পালিত হচ্ছে। আমিনা ও জুলিখা দুই বোন। জুলিখা শাহাজাদার মেয়ে—একথা সে প্রতিমুহূর্তে স্মরণ করে। আর আমিনা আনন্দ পায় এই সাধারণ ধীবরের জীবনের মধ্যে, এই আলো-হাওয়া ভরা সুন্দর সহজ জীবনে। রাজ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি, মারামারি তার ভাল লাগে না, সে শুনতেও চায় না। আমিনার সংগে দালিয়া নামে একটি অরণ্যযুবকের ভালবাসা হল। পরে জানা গেল সে এক রাজপুত্র। রূপকথার মত শেষ। রবীন্দ্র-নাথের গল্পগুচ্ছে প্রেমের এত মধুর গল্প আর নেই। যৌবনের প্রেমে কামনা, মহিমা, বলিষ্ঠতা, ত্যাগ, হিংসা অনেক কিছুই মিশ্রিত। রবীন্দ্রনাথ তার থেকে শুধু মাধুর্যটুকুই ছেঁকে নিয়েছেন।

'সমাপ্তি' গল্পটিতে প্রেমের স্পর্শে বালিকামন নারীমনে রূপান্তরিত হয়েছে। গল্পটিতে কাহিনীর কিছুটা বিস্তার কমলে কাহিনী একমুখিতা আরো স্পষ্ট হত। 'মানভঞ্জন' গল্পটিতে গিরিবালার সৌন্দর্য ও তার বুভুক্ষু প্রেমতৃষিত হৃদয়ের কাহিনী। প্রেমের জটিলতা তীব্রভাবে ধরা দিয়েছে 'দৃষ্টিদান' ও 'মধ্যবর্তিনী' গল্পে। দুটি গল্পই চরিত্রচিত্রণ ও মনোবিশ্লেষণের দিক থেকে কুশল। 'মধ্য-বর্তিনী' গল্পটি 'দৃষ্টিদানের' চেয়েও জটিল এবং সার্থক। 'মধ্যবর্তিনী'তে রুগ্না হরসুন্দরী স্বামীকে আবার বিবাহ করতে অনুরোধ করেছিল। হরসুন্দরী নিঃসন্তানা। যদি সন্তান হয় এই আশায় স্বামী প্রথমে অনিচ্ছা দেখিয়েও শেষে বিবাহ করলে। দ্বিতীয়া স্ত্রী স্বার্থপর। সে সংসার থেকে আনন্দ চায় কিন্তু সংসারের জন্য সে ত্যাগ করে না। সে এসে প্রথমে হরসুন্দরী ও তার স্বামীর

হিতবাদী প্রকাশের আগে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি প্রকাশিত হবার আগেই নগেন্দ্রনাথ ভারতী ও বালকে ছ'টি গল্প লেখেন।১ সেই গল্পগুলি বাংলা-সাহিত্যে এক অভিনবত্বের সন্ধান যে এনেছিল এতে সন্দেহের কোন কারণ নেই। ছ'টি গল্পের মধ্যে নগেন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যমুখিতার স্বাক্ষর দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত। গল্পের বিষয় বস্তুগুলিও নূতন। রবীন্দ্রনাথের আগে জীবনের বহু অদৃষ্ট-পূর্ব আশা-বেদনাকে শিল্পরূপ দিতে তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন।

'চুরি না বাহাদুরি' (১২৯৪, বৈশাখ) নামক গল্পটি তাঁর ভারতী ও বালকে প্রকাশিত প্রথম গল্প। বাংলাভাষায় তখনও পর্যন্ত ঠিক রহস্যজনক গোয়েন্দা-কাহিনীর সূত্রপাত হয়নি। এই অর্থে নগেন্দ্রনাথকে রহস্যকাহিনীর স্রষ্টা বলা চলে। রোমাঞ্চকর পরিবেশে সৃষ্টি, ভৌতিক আবেশ রচনা, শেষ পর্যন্ত এক অদম্য কৌতুহল সজাগ রাখার ক্ষমতা তাঁর ছিল। 'চুরি না বাহাদুরি' গল্পে দুই ভদ্র-লোকের ট্রেনে চুরি হয়। চুরি আশ্চর্যভাবে হয়েছিল। গোয়েন্দারা তাদের কূল-কিনারা করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত টাকা পয়সা আবার চোর ফেরৎ দিয়ে যায় অবাক কৌশলে। গল্পটির মধ্যে আখ্যান অংশের কোন চমৎকারিত্ব নেই কিন্তু বর্ণনা কৌশল অসাধারণ, অন্ধকার রাত্রির ছমছমে ভাব, ট্রেনের কামরার নির্জনতা, মধ্যরাত্রে কালো চশমা পরা এক যুবকের অতর্কিত আবির্ভাব—সব মিলিয়ে যে রহস্যময় পরিবেশ তা পাঠকের কৌতুহলকে শেষ পর্যন্ত আকর্ষণ করে।

ভারতী বালকে প্রকাশিত 'দুইবার' (১২৯৬ বৈশাখ) গল্পটি আবার অন্যধরনের। একটি সন্ন্যাসী ও তার প্রণয়িনীর কাহিনী। গল্পটি কাব্যগুণ সমৃদ্ধ। ঘাটের কথা গল্পের একটি অস্পষ্ট দূরাগত আভাস যেন এই গল্পের রমণী চরিত্রের আছে। যদিও কাহিনীর মধ্যে একটি রহস্যময়তার অংশুক ব্যাপ্ত হয়েছে তবুও এই কাহিনী আগের গল্প থেকে ভিন্ন। এই ভিন্নতা ধরা পড়েছে 'বধিরের বাসনা' (১২৯৬, আষাঢ়) ও 'ঘরের অলক্ষ্মী' (১২৯৬, আষাঢ়) নামক দুটি গল্পে। বিশেষতঃ 'ঘরের অলক্ষ্মী'। এই গল্পটিতে করুণরসের আধিক্য থাকা সত্ত্বেও কোথাও তা পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তিকে স-পূর্ণ পিচ্ছিল পথে ঠেলে দেয় না। একটি হাবা কালা মেয়ে। তাকে সবাই মনে করত ঘরের অলক্ষ্মী। শেষ পর্যন্ত কয়েকদিনের জ্বরে সে মারা গেল। সাদা ঝরঝরে ভাষায় সেই কাহিনী লেখা। লেখা পড়তে পড়তে মনে হয় 'শুভা'র কথা।

এই সময়ের শ্রেষ্ঠ রচনা 'ভৈরবী' (১২৯৬, শ্রাবণ)। শুধু নগেন্দ্রনাথেরই নয়—গল্পটি প্রাক্ রবীন্দ্রধারায় শ্রেষ্ঠ গল্প। গল্পটির পটভূমিকা সিপাহী যুদ্ধ।

১। তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য : পৃঃ ৪৫

সিপাহী যুদ্ধের স্মৃতি তখনও জনচিত্তে অম্লান ছিল। তখনও বহু বৃদ্ধ সিপাহী তাঁদের যৌবনের সেই কাহিনী শুনিয়ে কিশোরদের উৎসাহিত করতেন। সিপাহী-যুদ্ধ সম্ভব অসম্ভব বহু কাহিনীর উৎসলোক ছিল। মধ্যযুগের শেষ রশ্মি এই যুদ্ধেই বিলীন হয়েছিল। বহু ছোট ছোট রাজা রানী, সামন্ত সকলেরই ভাগ্য এই যুদ্ধে বদলে গিয়েছিল তাই সিপাহীযুদ্ধ এক মহাকাব্যের উপযোগী বিষয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই জাতীয় কাহিনী সেই মহিমায় প্রতিষ্ঠা পায়নি। কিন্তু যে স্বল্প কয়েকজন ব্যক্তি সিপাহী যুদ্ধের মধ্যে শিল্প সৃষ্টির উপাদান দেখেছেন নগেন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রথম পথিকৃৎ।

'ভৈরবী' গল্পটি পড়তে পড়তে আধুনিক কালে প্রমথনাথ বিশীর 'চাপাটি ও পদ্মের' সুন্দর গল্পগুলির কথা মনে হতে থাকে। নগেন্দ্রনাথ স্বভাবসিদ্ধ রহস্য-সৃষ্টি ও উন্মোচনের মধ্যে দিয়ে কাহিনীটিকে পরিণতি দিয়েছেন। এক ভৈরবী এসেছেন কাশীতে। তীর্থলোভাতুর কাশী। সেখানে সুন্দরী ভৈরবী ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তার পেছনে রূপলোভে ঘুরছে গুণ্ডা। আরো দেখা গেল ঘুরছে পুলিশ। ঘুরছে—মোমতাজ—যে মমতাজ একদা ভৈরবীর প্রণয়প্রার্থী হয়েছিল।

সেদিন সকাল বেলায় গঙ্গাতীরে যখন ভৈরবী বসে আছেন তখন মোমতাজ এসে বললে, ছদ্মবেশের মধ্যেও আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। ভৈরবী ভ্রূক্ষেপ করলেন না। মোমতাজ বলে চললে, তুমি যদি আমাকে বিবাহ কর তাহলে পুলিশ তোমাকে ধরবে না। ভৈরবী তাকে বিদ্রূপ করলেন। অপমান করলেন। তখন সেই জনতার মধ্যে থেকে সিপাইরা বেরিয়ে এল। কিন্তু ভৈরবীর হাতে বর্শা আলোয় ঝলসে উঠল। তারপর তিনি নিজের বুকে বিদ্ধ করলেন। তারপরই জনতা ভেঙ্গে পড়ল। আর জনতার মুখে শুধু একটি কথা রানী চন্দা—'আজম গড়ে ইংরাজের সঙ্গে যে বড় লড়াই করিষাছিল।'

রাজ্য হারিয়ে পলাতকা রানীর যে জীবন সেই জীবনকে সূক্ষ্মভাবে নগেন্দ্র-নাথ বর্ণনা করেছেন। এক আশ্চর্য সংযমে কাহিনীটি স্নিগ্ধ। কোথাও কোন বাহুল্য নেই। দ্রুতগতিতে কাহিনীটি এগিয়ে গেছে অনিবার্য পরিণতির মুখে। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি প্রকাশের আগেই নগেন্দ্রনাথ পরবর্তী শিল্পীদের জীবনের বিচিত্র দিকে আকর্ষণ করে গেছেন।

নগেন্দ্রনাথের গল্পসংখ্যা অজস্র এবং বহু গল্পই মাসিক পত্রিকার মধ্যে আজও ছড়িয়ে আছে।১ তাঁর গল্পগুলিকে মোটামুটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করা চলে।

১। ১। সংগ্রহ ১২৯৯/১৮৯২
২। উপন্যাস সংগ্রহ ও রহস্য ১৮৯৯
অবশ্য রহস্য অংশটি গল্প নয়। চুলের কলপ, কোঁচার কথা ও হিসাবে ভুল—

(১) রহস্য ও রোমাঞ্চ, (২) প্রেম, (৩) বিবিধ।

রহস্যসৃষ্টি নগেন্দ্রনাথের রচনার বিশিষ্ট ধর্ম। শুধু যে তাঁর ছোটগল্পগুলির মধ্যে এ ভাব রয়েছে তা নয় তাঁর উপন্যাসবলীও রহস্যছায়ায় পরিব্যাপ্ত। এই রহস্য সৃষ্টি আবার প্রধানতঃ দুটি পথ অনুসরণ করেছে। একটি স্বভাবতঃই তাকে অতীতমুখী করেছে। ধূসর অতীতের স্বপ্নাবেশ রচনায়, লুপ্ত আভিজাত্যের ভাঙ্গা ঐশ্বর্যের শেষ দ্যুতির বর্ণনায়, ভাগীরথীর বুকে জলদস্যুদের আতঙ্কময় আবির্ভাবের সংকেত সৃষ্টিতে তিনি আসক্ত। আবার অন্যদিকে এই রহস্যবোধ তাঁকে দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে টেনে এনেছে। যেখানে দূর অতীতের রোমাঞ্চ ও ইতিহাসের স্বপ্নঘন স্পর্শশূন্য দৈনন্দিন কাহিনী—অর্থগৃধ্নুতা, হত্যা, অপহরণের কাহিনী। প্রথমটিতে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র প্রভাবিত দ্বিতীয়টিতে তিনি বাংলা সাহিত্যের রহস্যকাহিনীর পথিকৃৎ।

নিম্নের কয়েকটি উদ্ধৃতি নগেন্দ্রনাথের প্রাচীন জীবনের সৌন্দর্য প্রীতি ও তার আতঙ্কময় বিভীষিকার স্মৃতিবাহী।

> ১। রোষে অভিমানে, স্ফুরিতধরা আয়তালোচনা প্রবীণার যৌবন যেন ফিরিয়া আসিল। দ্রুতপদে, কম্পিত হস্তে সিন্দুক বাক্স খুলিয়া ফেলিয়া সকল সামগ্রী বেগে আসফজঙ্গের সম্মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কত-রকম কারুকার্য খচিত পেশোয়াজ, বহুমূল্য ইজার বন্ধ শুদ্ধ পায়জামা, জরিদার আঙ্গরাখা ও কাঁচুলি স্তূপাকার হইয়া উঠিল। রাশীকৃত ঝন ঝন করিয়া গৃহময় ছড়াইয়া ফেলিল। ॥ হীরার মূল্য ॥
>
> ২। গৃহের আয়তন অত্যন্ত বৃহৎ। স্বর্ণ ও রজত শৃঙ্খল লম্বিত স্ফটিকাধারে নীল, পীত লোহিত বর্ণের আলোক মৃদু মৃদু জ্বলিতেছিল। পারস্য দেশীয় উৎকৃষ্ট গালিচার উপর কোথাও কিংখাব, কোথাও অতি কোমল লদ্দাক দেশীয় মেষ চর্ম, কোথাও বোখারার বিচিত্র কারুকার্য বিশিষ্ট রেশমের চাদর। গৃহের একদিকে ক্ষুদ্র উপবনের ন্যায়; ক্ষুদ্র তমাল ও লতা-কুঞ্জের মধ্যে স্ফটিক সরোবর, তাহার মধ্যে চীন দেশীয় মৎস ক্রীড়া

তিনটি লঘু রচনা।

৩। রথযাত্রা ও অন্যান্য গল্প ১৯৩১

৪। গ্রন্থাবলী। ১ম ও ২য় খণ্ড।

র কয়েকটি গল্প প্রথমে স্বাক্ষরহীনভাবে মুদ্রিত হয়। যেমন

মায়াবিনী	পৌষ ১৩০৬		পৃঃ ৩৩- ৪০
অলকামন্দির(?)	মাঘ ১৩০৬	,,	পৃঃ ৯৫-১০৬
মৃত্যু	চৈত্র ১৩০৬	,,	পৃঃ ১২৫-১২৮
নিস্ফল অপরাধ	চৈত্র ১৩০৬	,,	পৃঃ ১৩২-১৩৮
ছোট বৌ	বৈশাখ ১৩০৭	,,	পৃঃ ১৫৬-১৬১

করিতেছে। পরীর মুখের ন্যায় একটি উৎস রহিয়াছে; হীরকের দন্তপংক্তি, নীলকান্তমণির চক্ষু, সুবর্ণনির্মিত বাহু, তাহার রন্ধ্র হইতে জল উর্ধ্বে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। আলোকে শতবর্ণে রঞ্জিত হইয়া সূক্ষ্ম বারিকণা স্ফটিকের সরোবরে পতিত হইতেছে। গৃহের উর্ধ্বদেশ মুকুর মণ্ডিত; প্রাচীরে দিল্লীর প্রধান চিত্রকরদিগের নির্মিত চিত্র, সেই সকল চিত্র দেখিয়া রমণীর মুখ লজ্জায় লোহিত বর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। ॥ **রোশিনারা** ॥

৩। জটাশূন্য, কৃষ্ণ, কুঞ্চিত কেশভারের মধ্যে সে মুখ ঢল ঢল তরল লাবণ্যময়, চিত্রকরের স্বপ্নতুল্য, দেখিতে নিমেষ পাতের বিলম্ব অসহ্য বোধ হয়। সুঠাম, সর্বাঙ্গ সুন্দর গঠন, চন্দ্রকর বিধৌত, হিল্লোল তরঙ্গ-শূন্য, লাবণ্য সমুদ্র মথিত রূপরাশি যেন সেই মুখে ও দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। দীর্ঘ পক্ষ্ম সংযুক্ত আয়তলোচনদ্বারা যেন নিদ্রাভারাক্রান্ত। সর্বদা নত-দৃষ্টি। অর্ধ মুদ্রিত চক্ষে যখন সেই রমণী কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল তখন আমি নিশ্বাস ত্যাগ করিলাম, রূপমোহ ভঙ্গ হইল, বুঝিতে পারিলাম যে এই রূপ সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ নহে। সে কটাক্ষ কঠিন, সে চক্ষের জ্যোতি বড় তীব্র। সে কটাক্ষ আমার শরীর রোমাঞ্চ হইল, পার্শ্বস্থিত ব্যক্তিকে অত্যন্ত লঘুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ এই ভৈরবী। ॥ **ভৈরবী মন্দির** ॥

৪। ভাগীরথীর উপর অন্ধকার রাত্রি। উভয় তীরে অরণ্য, কোন কোন স্থানে তীরের নিকট চড়া পড়িয়াছে, কিন্তু জোয়ারের জলে চড়া অল্পে অল্পে ডুবিয়া যাইতেছে। জল ধীরে ধীরে স্ফীত হইতেছে। মন্দ মন্দ কল কল কুলু কুলু শব্দ, অধিক উচ্ছ্বাস, তরঙ্গ ভঙ্গ নাই। আকাশে নক্ষত্র, জলে নক্ষত্রের আন্দোলিত প্রতিবিম্ব, অন্য আলোক নাই। অরণ্যে কখন শ্বাপদ গর্জন, বালুকায় কদাচিত টিট্টিভ রব—অন্য শব্দ নাই। ॥ **বোম্বেটে** ॥

এই সমস্ত বর্ণনায় নগেন্দ্রনাথ মূলতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসারী। প্রাচীন জীবনের প্রতি যে আকর্ষণ তাঁর ছিল তারই মধ্য থেকে এই ধরনের গল্পের জন্ম হয়েছে। তাঁর 'ব্রাহ্মণবাদ', 'টিকিয়াশাহ', 'চন্দ্রাপীড়ের ঐশ্বর্য', 'বোম্বেটে', 'হীরার মূল্য' প্রভৃতি গল্পের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে রোমান্সের আতিশয্য আছে। কোন কোন গল্প তাই বাস্তব জীবনের সীমারেখা ছাড়িয়ে উপকথায় বা রূপকথার পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। একদিকে যেমন সৌন্দর্যবোধ ও অতীত প্রীতির ফলে নগেন্দ্রনাথ এই ধরনের গল্প রচনা করেছেন তেমনই বিশুদ্ধ রহস্যবোধের তাগিদে আধুনিক ডিটেকটিভ গল্প লিখেছেন। এই সমস্ত ডিটেকটিভ গল্পের মধ্যে আবার আধুনিক ডিটেকটিভ গল্পের যে সূক্ষ্মভাবে নিদর্শন ধরে ধরে অনুসন্ধান চলে তা কিন্তু নগেন্দ্রনাথ করেননি। তিনি খুনী বা গোয়েন্দার মনস্তত্ত্ব নিয়ে দীর্ঘ প্রসঙ্গের অবতারণা করেননি। তাঁর সমস্যাগুলি সহজ কোথাও তার জটিলতা মনকে আচ্ছন্ন করে না—শুধু তার মধ্যে একটি অস্পষ্ট কুয়াশার জাল কাহিনীকে রহস্যময় করে তোলে। এই দিক থেকে তাঁর এই দুই স্তরের কাহিনীর মধ্যে আন্তর ঐক্য আছে।

'ব্রাহ্মণবাদ' হঠাৎ নারীর প্রতি অপমানে ধ্বংস হয়ে যায়, 'টিকিয়াশাহ' সিপাহী-যুদ্ধের সময় হঠাৎ গ্রামের গাছের তলায় আবির্ভূত হন। 'চন্দ্রাপীড়ের' ঐশ্বর্য হঠাৎ একদিন বিপুলভাবে আসে, ভৈরবমন্দিরের গুপ্ত গুহাপথে অপূর্ব রূপবতী ভৈরবীকে দেখা যায়—এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে তাঁর মন যেমন আনন্দ পায়—তেমনি আনন্দ পায়—যখন হঠাৎ একদিন কুঞ্জলাল এসে ডাক্তারকে বলে তার একটি হাতের আঙ্গুল কেটে ছোট করে দিতে এবং তার বিনিময়ে সহস্র টাকার পারিশ্রমিক, কিংবা নূতন বাড়ির অন্ধকারে সারা রাত্রি ভয়াবহ শব্দ, কিংবা ট্রেনের মধ্যে অকস্মাৎ কালো চশমা পরা যুবকের আবির্ভাব। 'জাল কুঞ্জলাল', 'টিকিয়াশাহ', 'চুরি না বাহাদুরি', 'নূতন বাড়ি' প্রভৃতি গল্পে মনের এই দিকটি প্রকাশিত।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বা প্রেম সম্পর্কিত গল্পগুলিতে নগেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব উপেক্ষণীয় নয়। প্রেম সম্পর্কে তাঁর মনোভাব গল্পগুলিকে সর্বত্রই এক বিশেষ রুচির স্নিগ্ধতায় উদ্ভাসিত করেছে। তার 'মিরিয়ামে ও 'সোহরাব' গল্পটিতে বলেছেন,

> "দৈহিক সুখে সুখ নাই। যদি মনকে ফিরাইয়া আনিতে পার, তবে সোহরাব, তুমি আমায় বিবাহ কর। এই সাগরের কূলে নারিকেল বীথিতে বসিয়া, লুকাইয়া, ছুটিয়া, শুইয়া আমরা যে শান্তি পাইতাম যদি সেই পরম শান্তি এখন সোহরাব আমরা আবার ফিরিয়া পাই, তবে এস, আমরা মিলিত হই, নতুবা কেন? আর কেন? ভোগে সুখ নাই, ত্যাগেই শান্তি।"

'কাহার ভ্রম', 'দুইবার মিলন', 'মেহেরজান', 'ফাতিমা', এবং 'বিক্রমসিংহ' প্রভৃতি গল্পের মধ্যে তাঁর এই রুচির ছাপ অতি স্পষ্ট। কোথাও কোথাও স্বভাবসিদ্ধ মধ্যযুগীয় রোমান্স ও বীর্যের ছায়াপাত ঘটেছে। দুর্গপ্রাকার থেকে পালিয়ে যেতে গিয়ে নায়ক নায়িকা মৃত্যু আলিঙ্গনে বদ্ধ থাকার মত ঘটনার মধ্যে নাটকীয়তা যেমন আছে তেমনিই লেখকের একটি আদর্শবোধ এই নাটকীয়তার আঘাতকে স্তব্ধ করে রেখেছে। নগেন্দ্রনাথ কয়েকটি প্রেমের গল্পে চরিত্রচিত্রণ ও বর্ণনাকুশলতার বিশেষ পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'শ্যামার কাহিনী' গল্পটি বিশেষ স্মরণীয়। শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের অনেক আগেই তিনি শ্যামার কথা লিখেছেন এবং শ্যামার মনের মতই লিখেছেন। তিনি কোথাও ভারসাম্যের ত্রুটির মধ্যে পতিত হননি। 'কাহার ভ্রম' রচনাটি 'রীতি' হিসেবে উল্লেখযোগ্য। কাহিনীটি চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেছে।

তৃতীয় স্তরকে 'বিবিধ' পর্যায় আখ্যা দিয়েছি। এই পর্যায়ে বহু বিচিত্র বিষয়ে তিনি গল্প লিখেছেন। গ্রাম্য যুবকের বন্ধুত্ব, ছোটদের মনোরঞ্জক গল্প, বাঙালীর ঘরের দুর্গোৎসব, ছোট বৌর মত চরিত্র, অসহায় নারীর ব্যর্থতা, পতিতার মাতৃত্ববোধ এমন কি উনিশ' এগারো সালে বাঙালী ফুটবল দলের শিল্ড বিজয়—সমস্তই তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু। 'পূজার পোষাক', 'ঘরের অলক্ষ্মী', 'ছোট বৌ' প্রভৃতি গল্পে তাঁর রোমাঞ্চবিলাসী মন প্রাত্যহিক সংসারের মধ্যে নেমে এসেছে এবং আমাদের উদ্ঘাটন করেছেন। নগেন্দ্রনাথের 'লক্ষ্মীহারা' গল্পটি আজো বিশেষভাবে স্মরণীয়।

লক্ষহীরার মত একটি নটী একটি ছেলেকে ভালবেসেছিল—সেই স্নিগ্ধ সুন্দর বুভুক্ষু মাতৃত্বের তৃষ্ণা ব্যথিত গল্পটি নগেন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। এই গল্পটি চলিত ভাষায় লেখা। এর থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে নগেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ শেষ করি।

> "আগে নরম সুরে, ধীরে ধীরে, গানের কথাগুলি স্পষ্ট সুরের তার যেন প্রাণ থেকে টানা, যে শোনে, মর্মে মর্মে লাগে। প্রার্থনার একটি গান, অনুতপ্ত হৃদয়ের ব্যথা, মার্জনার জন্য ব্যাকুলতা, কণ্ঠ ক্রমে মুক্ত হল, ঐ টুকু ঘরে যেন গলা ধরে না। এমন প্রাণের আকুলতা, যেন দেবতা সাক্ষাতে, যেন তিনি নিজে সব শুনছেন। সেই ঘরখানি যেন দেব মন্দির হয়ে উঠল।"

১৮৯০-৯১ থেকে রবীন্দ্রনাথ গল্পক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন এবং এক নবীন মহাদেশ আবিষ্কার করলেন। তখন থেকেই নগেন্দ্রনাথের গুরুত্ব কমতে শুরু করল এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ম্লান হয়ে গেলেন। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক পর্যন্ত তিনি পুরোদমে লিখেছেন—সাময়িক জনপ্রিয়তা যে পাননি তাও নয়—বসুমতী থেকে তাঁর গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছিল—তিনটি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল—কিন্তু তাঁর মৃত্যুর আগেই তার জনপ্রিয়তা লুপ্ত হয়। আর কুড়ি-পঁচিশ বছর পরের পাঠকেরা তাঁর নাম জানবে না। তিনি ইতিহাসের সামগ্রী হয়ে রয়েছেন।

এর জন্য পাঠক সমাজের সেই বহুশ্রুত অকৃতজ্ঞতাই একমাত্র কারণ নয়। নগেন্দ্রনাথের রচনার মধ্যেই তার বীজ নিহিত ছিল। নগেন্দ্রনাথের রচনার বহুগুণ থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে তাঁর গল্পের বিষয়গুলি পাঠকচিত্তকে আশ্বস্ত করতে পারেনি। কারণ দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে তিনি বিরাজিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ঐন্দ্রজালিক গল্পের পাশে পাশেই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আশ্চর্য কথা বলার কুশলতায় পাঠকের মন জয় করেছিলেন। নগেন্দ্রনাথ এঁদের মাঝখানে পড়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি।

অবশ্য আরো একটি নিহিত কারণ ছিল বলে মনে হয়। নগেন্দ্রনাথ যদিও উনিশ শ' চল্লিশ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন তবুও চিন্তার দিক থেকে তিনি আধুনিক সাহিত্যিকদের চেয়ে স্বতন্ত্র ছিলেন। তিনি কোন রকম বিদেশী আদর্শের দ্বারা যেমন প্রভাবিত হতে চাননি তেমনই বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন আদর্শের অনুগত্যও ত্যাগ করতে চাননি। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শই তাঁর মনকে প্রভাবিত করেছিল। ফলে তাঁর রচনার মূল বক্তব্যে ও রীতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্পষ্ট যোগাযোগ অনুভব করা কঠিন নয়। কিন্তু সাহিত্য জগতে যখন ক্রমশই রবীন্দ্রপ্রভাব বাড়তে লাগল তখন নগেন্দ্রনাথের রচনাগুলিও অপেক্ষাকৃত মলিন ও হীনপ্রভ মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তবুও ঐতিহাসিক অর্থে তিনিই প্রাক্-রবীন্দ্র যুগের শ্রেষ্ঠ গল্পকার।

ছোট গল্প।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
Ravindranātha Thākura.

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

৫৫নং চিৎপুর রোড।

১৫ ফাল্গুন ১৩০০ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের প্রচ্ছদপট

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

॥ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ॥

বাংলাসাহিত্যের অধিকাংশ সমালোচকই বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোট-গল্পের স্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা ছোটগল্প এখন সার্থক শিল্পরূপ লাভ করেছে সন্দেহ নেই যদিও ঐতিহাসিক অর্থে রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই ছোট-গল্প রচনার প্রয়াস যথেষ্ট দেখা গেছে। স্বর্ণকুমারী দেবী বা নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ছোটগল্পের কলাকৌশল পূর্ণ আয়ত্ত করতে না পারলেও ছোটগল্প রচনার চেষ্টা করেছেন। অনেক নামহীন এবং বর্তমানে বিস্মৃতপ্রায় লেখকেরা বাংলা গল্পকে ছোটগল্পের দিকে অগ্রসর করিয়ে দিয়েছেন এতেও কোন সন্দেহ নেই। রবীন্দ্র-নাথ সেই অপরিণত শিল্পরূপটিকে পূর্ণতা দিয়েছেন এখানেই তাঁর সর্বাধিক গৌরব।১ রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন সৃষ্টি করেছেন অনেক, সেই সঙ্গে পুরানো ও প্রচলিত কিন্তু অস্ফুট ও অপরিণত আঙ্গিক ও গঠনকলাকে বিচিত্রভাবে ব্যবহার করে তাকে পূর্ণ পরিণত করেছেন। ছোটগল্প তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ বাংলা দেশে কথাসাহিত্যের জন্মের পর থেকে, এবং অজস্র পত্রিকার প্রকাশের পর ছোট ছোট গল্পের দিকে বাঙালী সমাজের আকর্ষণ ক্রমশই বাড়তে থাকে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও ভিখারিণী (১২৮৪।১৮৭৪ খৃঃ) নামে একটি গল্প লিখে সেই গল্পধারাকে বাড়ান। কিন্তু তখনও তাঁর হাত অপটু, কাহিনী বন্ধন তখনও শিথিল। ১২৯১।১৮৮৪-৫-তে তিনি 'ঘাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা' নামে দুটি গল্প লেখেন। এই দুটির মধ্যে 'রাজপথের কথা'য় গল্পাংশ নেই, 'ঘাটের কথা'য় সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের গল্পরচনার ক্ষমতার স্ফুরণ।২ এই গল্পরচনার শক্তি ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছিল এবং তার যথার্থ প্রকাশ ঘটল 'হিতবাদী' পত্রিকার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে।

১২৯৮ (১৮৯০ খৃঃ) সালে 'হিতবাদী' পত্রিকার প্রকাশ। এখানে রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' 'পোস্টমাস্টার' গিন্নি, রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, ব্যবধান ও তারা-প্রসন্নের কীর্তি—এই ছটি গল্প প্রকাশিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে 'খাতা' গল্পটি হিতবাদীতে প্রকাশিত হয়েছিল। হিতবাদীর পুরোনো সংখ্যা-গুলি দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় এই তথ্য প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

১। পূর্বে দ্রষ্টব্য ঃ ১ম, ২য় ও ৩য় পরিচ্ছেদ
২। পূর্বে দ্রষ্টব্য ঃ ৩য় পরিচ্ছেদ, পৃঃ ৪৫

যখন রবীন্দ্রনাথ গল্প লিখতে শুরু করেন তখন তিনি ছিলেন শিলাইদহে, পদ্মাতীরে। জমিদারী দেখাশোনার জন্য তাঁকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শিলাইদহে পাঠান। রবীন্দ্রনাথ থাকতেন পদ্মার ওপরে একটি হাউস-বোটে। এতদিন তাঁর জীবন কেটেছে শহরে। কলকাতার বাইরে যে সব জায়গায় তিনি মধ্যে মধ্যে বেড়াতে গেছেন সেগুলিও প্রধানতঃ শহর। কখনও আমেদাবাদে, কখনও ইংলণ্ডে, কখনও গাজীপুরে। প্রকৃতিকে দেখেছেন দূর থেকে। পাহাড় সমুদ্র নদী বনকে দূর থেকে উপভোগ করেছেন। আর সাধারণ মানুষের জীবন সম্পর্কে তাঁর ধারণা তখনও পুঁথিগত। সাধারণ মানুষের জীবনের সুখদুঃখ তখনও তাঁর অজানা। তিনি শিলাইদহে এসে দুটি জিনিষ লাভ করলেন, একা প্রকৃতি, আর অন্যটি সাধারণ মানুষ। তাঁর প্রথম গল্প 'ভিখারিণী'র পটভূমিকা, কাশ্মীরের এক সুন্দর উপত্যকা, তার অপরূপ বন, তার শীতের তুষারপাত। এই পটভূমিকা অতি কৃত্রিম, অতি বিশেষত্বহীন। কোন বিশেষ স্থানের পরিচয় সেখানে নেই। পাহাড় বন তুষার এই ত্রয়ের সমাহার মাত্র। 'ঘাটের কথায়' গঙ্গার পটভূমি। গঙ্গা তাঁকে বাল্যকাল থেকে প্রভাবিত করেছিল, বিশেষত বাল্যকালে পেনেটিতে ও কৈশোরে চন্দননগরে গঙ্গাতীরে কিছুকাল কাটিয়েছিলেন। গঙ্গা তাঁর কবিতায় ও গল্পে মধ্যে মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু শিলাইদহে প্রথম প্রকৃতির অন্তরঙ্গতা লাভ করলেন তিনি। ঋতুতে ঋতুতে আকাশ ও পৃথিবীর যে পরিবর্তন তা কলকাতায় বসে তিনি অনুভব করতে পারেননি। সকাল থেকে মধ্যাহ্ন, মধ্যাহ্ন থেকে অপরাহ্ণ, অপরাহ্ণ থেকে গোধূলি, গোধূলি থেকে অন্ধকার—এই যে সময়ের রূপ ও রং পরিবর্তন তা ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ কখনও লক্ষ্য করেননি। এই সময়ে লেখা চিঠিগুলির মধ্যে বারবার বিস্ময়ে তিনি প্রকৃতির এই অনন্ত মাধুরীর কথা উল্লেখ করেছেন। এক চিঠিতে লিখছেন"—

> "ঐ-যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি —ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা—শুদ্ধ দু হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম? স্বর্গ আর কী দিত জানিনে, কিন্তু এমন কোমলতা দুর্বলতাময়, এমন সকরুণ আশঙ্কাভরা অপরিণত এই মানুষগুলির মতো এমন আদরের ধন কোথা থেকে দিত! আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শস্যক্ষেত্র এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই সমস্ত দরিদ্র মর্ত হৃদয়ের অশ্রুর ধন-গুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে।"১

১। ছিন্নপত্র : পত্রসংখ্যা ১৩, পৃঃ ৩৫

এই প্রকৃতি ও এই মানুষ রবীন্দ্রনাথের কাছে এক নতুন জগৎ খুলে দিল। প্রকৃতিপ্রীতি, মর্ত্যপ্রীতি ও মানুষেরা 'সুখদুঃখময় ভালোবাসার' প্রতি ভালোবাসা রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের সাহিত্যসৃষ্টির প্রধান সুর। আর ছোটগল্প তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির প্রধান বাহন ছিল এই শিলাইদহ বাসকালে। এই সময়েই তাঁর বহু শ্রেষ্ঠ কবিতা (মানসী, সোনারতরী, চিত্রা, চৈতালী, ক্ষণিকা) রচিত হয়েছে। তাঁর গল্প-গুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার পাশেই আসন দাবী করতে পারে।

ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের তিনটি গল্প পাঠ করলে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ কাহিনীর উপাদান সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। কাশ্মীরের পাহাড়ী উপত্যকায় তাঁকে কাহিনী সন্ধান করতে হচ্ছে, ঘাটের কথার মধ্যেও কাহিনী নিয়ে তিনি চিন্তিত—বাক্‌প্রগলভতাও কম নয়, রাজপথের কথার মধ্যে কাহিনীই নেই। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম এলেন মানুষের সাহচর্যে। আলাপ হল অনেক লোকের সঙ্গে, কেউ পোষ্টমাষ্টার, কেউ ইস্কুলমাষ্টার, কেউ মাঝি, কেউ বাউল, কেউ ভিখারী। নৌকো থেকে দেখতে পেলেন দূরের মাঠে চাষীদের যাওয়া আসা সন্ধ্যে সকাল গ্রাম্য মেয়েদের নদীতীরে আসা, স্নান করা, জলভরা, বিকেল বেলায় গ্রামের ছেলেদের খেলা করা। দেখলেন নদীর ঘাটে শহর থেকে আসা নতুন বাবু; নদীর ঘাটে সদ্যবিবাহিতা বাল্যবধূ চলেছে শ্বশুরবাড়ি মা-বাপকে কাঁদিয়ে। জীবনের এই স্রোত রবীন্দ্রনাথ কোনদিন দেখেননি। তাই তিনি আনন্দে লক্ষ্য করছেন নদীতীরে "কোনো কোনো লজ্জাশীলা বধূ দুই আঙুলে ঘোমটাটা ফাঁক করে ধরে কলসী কাঁখে জমিদারবাবুকে সকৌতুকে নিরীক্ষণ করছে"১, কখনও দরিদ্র ছাত্ররা বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় নিবেদন করে তাদের স্কুলে টুল ও বেঞ্চির অভাব,২ কখনও বা বেদের দল এসে পদ্মারতীরে আস্তানা পাতে৩, পোষ্টমাষ্টার এসে মজার গল্প বলে৪, বালকেরা নৌকার মাস্তুল নিয়ে খেলা করে।৫ এই জীবনস্রোতের মধ্যে যে মুহূর্তে তিনি প্রবেশ করলেন তাঁর আর উপাদানের অভাব হলনা। প্রত্যেকটি মুহূর্ত এক একটি গল্পের উপাদান। তাঁর গল্পের প্রবাহ অর্গল মুক্ত হল।

১। ছিন্নপত্র : ১১, পৃঃ ৩১-৩২
২। " ১২, পৃঃ ৩৩
৩। " ১৬, পৃঃ ৪১
৪। " ১৭, পৃঃ ৪৬
৫। " ২৪, পৃঃ ৫৮-৫৯

২

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্পের প্রথম প্রধান সার্থক লেখক। তিনিই প্রথম 'ছোটগল্প' শব্দটি ব্যবহার করেন। এর আগে ছোট ছোট গল্প ব্যবহার করা হয়েছে—কিন্তু 'ছোটগল্প' এই শব্দটি ব্যবহার হয়নি। তাঁর ছোটগল্পগুলি আকৃতিতে ছোট, চরিত্রসংখ্যাও বেশী নয় এবং সাধারণত একটি চরিত্রই উদ্ভাসিত. রবীন্দ্রনাথের পূর্বে এ ধরনের আকৃতি বা গঠন লক্ষ্য করা চলে। কিন্তু একটি ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ প্রাক্ গল্পকারদের থেকে পৃথক ও নবীন গল্প-ধারার জন্মদাতা—তা হল গল্পের গঠনে। তাঁর গল্প আরম্ভ হয় দ্রুত, অবিলম্বে তিনি গল্পের মধ্যে পাঠককে টেনে আনেন এবং গল্পের শেষ করেন সেইখানে যেখানে পাঠকমন কাহিনী সম্পর্কে সবচেয়ে কৌতুহলী। তাঁর অধিকাংশ গল্পে ঘটনা অতি সামান্য, কিন্তু সেই সামান্য ঘটনার থেকে নিঃসরিত কোমল অনুভূতিগুলি গল্পটিকে গড়ে নেয়। শরৎচন্দ্র বা প্রভাতকুমারের গল্পগুলি পাশে রাখলে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলি ঘটনাপ্রধান নয়, ভাবপ্রধান। তাঁর গানে যেমন মনের অসংখ্য মুহূর্তের ভাবকে বিকশিত করেছেন, তাঁর ছোটগল্পও সাধারণ জীবনের সাধারণ ভাব। তা আড়ালে থাকে, অসংখ্য ঘটনাস্রোতে হারিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ সেই ভাবগুলিকে ধরেছেন, তাদের নিয়ে গল্প করেছেন। তিনি হিতবাদীতে যে কটি গল্প লিখেছিলেন তার থেকে এর উদাহরণ দেওয়া চলে। সেই গল্পগুলির অধিকাংশের মধ্যে একটি কথাবস্তু আছে, তা হল 'নিঃসঙ্গ মানব হৃদয়।' জগৎ-সংসারের সমস্ত কাজ ঠিকই চলেছে। সূর্য ওঠে, অস্ত যায়। মানুষ জন্মায়, মরে। এই বৃহৎ কর্মকোলাহলের মধ্যে একটি মানুষের দুঃখ বা সুখ বিশ্বের কাছে অতি তুচ্ছ—অথচ সেই তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর আনন্দই মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। সেখানে মানুষ নিঃসঙ্গ, তার বেদনা তার একার। সেই একার বেদনা, একার দুঃখই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু গল্পে তুলে ধরেছেন। 'পোস্টমাস্টার' গল্পে রতনের দুঃখ—সে দুঃখ রতনেরই—জগৎসংসারের কোন ক্ষতিই নেই। জগৎ সংসার ভাবে 'পৃথিবীতে কে কাহার'। কিন্তু রতনের নিঃসঙ্গ বেদনা তার প্রাণের, তার মনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। এই বেদনা "যুক্তিশাস্ত্রের বিধান" মানে না, "প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস" করে। এই নিঃসঙ্গ মানবই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের অন্যতম নায়ক। আশুর 'গিন্নি' নাম দেওয়ার ফলে শিশুর যে বেদনা তা আর কেউ অনুভব করতে পারে না। রামকানাইর চরিত্রবত্তা বিশ্বের চোখে নির্বুদ্ধিতা। দুই পরিবারের বিবাদের ফলে দুই শিশুর 'ব্যবধান' উদাসীন জগতের চোখে মূল্যহীন।

মানুষ সামাজিক জীব কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে সে একা। রবীন্দ্রনাথের একটি প্রিয় কবিতার মধ্যে আছে ঃ ১

> Yes ! in the sea of life enisled
> With echoing straits between us thrown
> Dotting the shoreless watery wild,
> We mortal millions live alone.

'রামকানাইর নিবুর্দ্ধিতা' গল্পে রামকানাই বলতে পারত 'we mortal millions live alone,' সমাজ রামকানাইকে নির্বোধ বলেছে। রামকানাই তখনও তার কর্তব্য ও ধর্মবোধের দীপ জ্বালিয়ে রেখেছে। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনে' রাইচরণ এই নিঃসঙ্গ মানব। যখন সে পদ্মায় খোকাবাবুকে হারাল তখন দেখল 'কেবল পদ্মা পূর্ববৎ ছলছল খলখল করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিত, যেন সে কিছুই জানে না এবং পৃথিবীর এই সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।' শুধু প্রকৃতির উদাসীনতা নয় মানবের উপেক্ষা আরো বেশী তীব্র। সে যখন নিজের পুত্রকে প্রভুর হাতে তুলে দিল তখন তার এই অসামান্য আত্মত্যাগকে অপমান করল তারা অর্থের মূল্যে। অনুকুলবাবুর টাকা ফেরৎ এল। অসীম জনারণ্যে রাইচরণ হারিয়ে গেল চিরকালের মত। আর একটি উদাহরণ, কাবুলিওয়ালা। বাঙালীর চোখে কাবুলীওয়ালা রুক্ষ কর্কশ, তারা টাকা ধার দেয়, সুদের ব্যবসা করে। তাদের হৃদয় বা তাদের জীবন সম্পর্কে বাঙালী অজ্ঞ। তাই গল্পের মধ্যে যখন দেখা গেল কাবুলিওয়ালা তার মেয়েকে ভালবাসে, তার রুক্ষ কর্কশ হৃদয় কাবুলি মেওয়ার মতই সরস তখন কাবুলিওয়ালা চরিত্রের একটি নূতন রূপ উদ্ভাসিত হল। পিতৃত্বের আলোয় হঠাৎ তার সমস্ত হৃদয় স্পষ্ট হল। মিনির পিতাই শুধু তার পিতৃহৃদয়ের বেদনা অনুভব করলেন, তাই বিবাহের জন্য সজ্জিতা মিনিকে ডেকে পাঠালেন—'অন্তপুরে ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল'। রহমতকে মিনির টাকা দিয়ে দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। ফলে বিবাহের আনন্দোৎসবের কিছু অংশ বাদ দিতে হল।' "অন্তঃপুরে মেয়েরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।" আর 'মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রহমত মাটিতে বসিয়া পড়িল।' জগৎ আজ এই দীর্ঘনিঃশ্বাসের মূল্য বুঝবে না। এই অসীম জীবনসমুদ্রে মানুষ ক্ষুদ্র দ্বীপবিন্দু, প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের তফাৎ। সে একা। এই নিঃসঙ্গতার বেদনা ও মাধুরী গল্পগুচ্ছের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এখানেই রবীন্দ্রনাথের গল্পের অ-সাধারণত্ব।

১ Matthew Arnold : *To Marguerite*

৩

রবীন্দ্রনাথের গল্পের বিষয়বৈচিত্র্য অসাধারণ। তিনি শহর নিয়ে লিখেছেন, গ্রাম নিয়ে লিখেছেন। তাঁর গল্পে প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য বারবার এসেছে, তাঁর গল্পে অতিপ্রাকৃত আবহাওয়া সৃষ্ট হয়েছে। তাঁর গল্পের চরিত্রশালায় রাজারানী আছে, লুপ্ত বিত্ত জমিদার আছে, মধ্যবিত্ত সমাজ আছে। দরিদ্র কৃষক আছে। তাঁর গল্পে প্রেম যেমন বিরাট স্থান অধিকার করেছে। তেমনই করেছে প্রকৃতি, তেমনিই করেছে ভ্রাতৃস্নেহ, প্রভুর প্রতি আনুগত্য, মায়ের প্রতি ভালবাসা। তিনি বর্তমান জীবন নিয়ে গল্প লিখেছেন, অতীত কাল নিয়ে লিখেছেন। তাই তাঁর গল্পগুলির নানা বিষয় বিভাগ করা সম্ভব। বলাই বাহুল্য কোন সম্পূর্ণ স্বয়ংস্বতন্ত্র ভাগ সম্ভব নয়, প্রত্যেকটি ভাগ পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। এই কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলিকে চারটি গুচ্ছে ভাগ করা হল। (ক) ব্যক্তি ও প্রকৃতি (খ) ব্যক্তি ও ব্যক্তি (গ) ব্যক্তি ও সমাজ (ঘ) ব্যক্তি ও অতিপ্রাকৃত।

ব্যক্তি ও প্রকৃতি ঃ গল্পগুচ্ছ যখন রবীন্দ্রনাথ লিখছেন তখন সর্বপ্রথম বাংলাদেশের প্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ চিনলেন। বাংলার মাঠ নদী আকাশ এই সর্বপ্রথম তাঁর কাব্যে ও গল্পে একটি বিশিষ্ট রূপ নিয়ে ধরা পড়ল। ভারতীয় কবিরা চিরকালই প্রকৃতিকে জীবিতসত্তা বলে পূজা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রকৃতির সঙ্গে জন্মজন্মান্তরের পরিচয় কল্পনা করেছেন। তিনি অনুভব করেন যে এই পৃথিবীতে প্রাণের প্রথম আবির্ভাবের লগ্নে তিনি হয়ত গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলেন। ছিন্নপত্রের বহু চিঠিতে বারবার বলতে চেয়েছেন, 'আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে...'[১] ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'লুসি' বা কালিদাসের 'শকুন্তলায়' প্রকৃতি ও মানবের যে গভীর সম্পর্ক তাই রবীন্দ্রনাথকে নাড়া দিয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এর থেকে প্রকৃতি সম্পর্কিত কোন তত্ত্বে পৌঁছননি। ওয়ার্ডসওয়ার্থের লুসি প্রকৃতির দুহিতা। 'She dwelt among the untrodden ways besides the springs of Dove'—এই অংশ বিশুদ্ধ কবিতার আনন্দ মনে পুলক সঞ্চার করে কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থ যেখানে প্রকৃতির শিক্ষা সম্পর্কে বলেছেন (Three years she grew in sun and shower) সেখানে কবির নিজস্ব একটি তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে এরকম কোন তত্ত্ব প্রকাশ পায়নি, যদিও তাঁর শিক্ষাসম্পর্কিত ধারণায় তা প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের গল্পে

১ ছিন্নপত্র, ৭০, পৃঃ, ১৪৭-৮

প্রকৃতি মানুষের অন্তরঙ্গ। বিরাট সমুদ্র বা পাহাড় তাঁর সাহিত্যে খুব সামান্য স্থান অধিকার করেছে। বাংলাদেশের সবুজ ধানক্ষেত, আঁকাবাঁকা খালবিল, ছায়াচ্ছন্ন পথঘাট, আমজামঘন ছোট ছোট গ্রাম, প্রবল দুরন্ত পদ্মা, শীতের অপূর্ব সকাল, বর্ষার মেঘমেদুর মধ্যাহ্ন, শরতের ক্লান্তবর্ষণ নীল অপরাহ্ন ও পদ্মাতীরের বিষাদভরা উদাসী সন্ধ্যাই তাঁর গল্পের পটভূমি। পদ্মাতীরের ধারে বসে তিনি লিখেছেন "বাংলাদেশের মাঠের দৃশ্য, নদীতীরের দৃশ্য, আমার এত বেশী ভালো লাগে।"২ এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের গল্পগুলি প্রকৃতির স্তন্যলালিত।

গল্পের মধ্যে প্রকৃতির পটভূমিকাটি বড় জিনিষ নয়, বড় জিনিষ ব্যক্তির মনের সঙ্গে তার সম্পর্ক। 'ছুটি' গল্পটি ধরা যেতে পারে। বালক সর্দার ফটিক চক্রবর্তীকে কলকাতায় পাঠানো হল লেখাপড়া শিখতে। কলকাতায় মামীর স্নেহহীন ব্যবহার ও মুক্তিহীন জীবনের মধ্যে "কেবলই তাহার গ্রামের কথা মনে পড়িত। প্রকান্ড একটা ঢাউস ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, তাইরে নাইরে নাইরে না করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বরচিত রাগিনী আলাপ করিয়া অকর্মন্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সংকীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেইসব দলবল উপদ্রব স্বাধীনতা এবং সর্বোপরি সেই অত্যাচারিনী অবিচারিনী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত।' প্রকৃতি মানুষকে দেয় মুক্তি, মুক্তি দেয় আনন্দ। সেই আনন্দ বঞ্চিত ফটিক মারা গেল।

প্রকৃতি ও ব্যক্তির আর একটি সম্পর্ক 'শুভা' গল্পে। শুভার সুভাষিণী নামটি যে তার জীবনে সবচেয়ে পরিহাস তা বোঝা গেল যখন দেখা গেল শুভা মূক। শুভার কথা ফোটেনি। চোখে মুখে বাণীর আভাস ফুটি ফুটি করেও ফোটেনি। তার ভাষাহীন মৌনতার ফলে সে চিরকাল নির্জন। সে মানব পরিত্যক্তা। প্রকৃতিই তার একমাত্র বন্ধু।

> "প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়। নদীর কলধ্বনি লোকের কোলাহল, মাঝির গান, পাখির ডাক, তরুর মর্মর—সমস্ত মিশিয়া চারিদিকের চলাফেরা আন্দোলন—কম্পনের সহিত এক হইয়া সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায় বালিকার চিরনিস্তব্ধ হৃদয়উপকূলের নিকট আসিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্রগতি ইহাও বোবার ভাষা, বড় বড় চক্ষুপল্লব বিশিষ্ট সভার যে ভাষা তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার, ঝিল্লিরব পূর্ণ তৃণভূমি হইতে

২ ছিন্নপত্র, ১৫৪, পৃঃ ৩০৭

শব্দাতীত নক্ষত্রলোক পর্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গী, সংগীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘশ্বাস।"

এই গল্পে মানুষ নিষ্ঠুর। বোবা মেয়েকে বাপ মা বিয়ে দিলেন—"তাহাদের জাতি ও পরকাল রক্ষা হইল।......সপ্তাহখানেকের মধ্যে সকলেই বুঝিল, নববধূ বোবা। তা কেহ বুঝিল না সেটা তাহার দোষ নহে। সে কাহাকেও প্রতারণা করে নাই।...এবার তাহার স্বামী চক্ষু এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এক ভাষা-বিশিষ্ট কন্যা বিবাহ করিয়া আনিল"। এই নিষ্ঠুর জগতে তার একমাত্র আশ্রয় এই অনন্ত মূক প্রকৃতি। মানবসমাজের বঞ্চনা, প্রতারণা ও আঘাতের মাঝখানে তার কেউ নেই এই প্রকৃতি ছাড়া! সে যেন এক গাছ কিংবা পশুর মতই প্রকৃতির এক মূক সৃষ্টি।

'অতিথি' গল্পে প্রকৃতি ও ব্যক্তির আর একটি রূপ। রবীন্দ্রনাথের গল্পে প্রকৃতি কোমল, প্রকৃতি স্নেহাতুর। তা ভয়াবহ নয়, তা ভীষণ নয়। কদাচিৎ কখনও (যেমন খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তনে) লক্ষ্য করেছেন যে প্রকৃতি মানুষের জন্য চিন্তিত নয়, প্রকৃতির রাজ্যে উদাসীনতাই সবচেয়ে বড় কথা। প্রকৃতি আমাদের প্রয়োজনের চেয়ে বড়। তার বিশাল ব্যাপ্ত রাজ্যে কারো জন্য কোন বিশেষ দয়া নেই। বিশেষ মায়া নেই। মানুষের জীবনের যা বেদনার—প্রকৃতির রাজ্যে তার জন্য কোন বেদনা নেই। বিশ্বজগতের বিশালতার মধ্যে মানুষের ক্ষুদ্র স্নেহবন্ধনের মূল্য কতটুকু!

তারাপদ একদিন অকস্মাৎ বিনাসংকোচে কাঁঠালিয়ার জমিদারদের নৌকায় আবির্ভূত হয়েছিল। সে বন্ধনহীন, হরিণশিশুর মত চঞ্চল। সে হঠাৎ এল, মানুষের স্নেহ প্রেম উপভোগ করেছিল, কয়েকটি দিন সংসারের বন্ধনকে মেনে ছিল —আবার একদিন নীরবে নিশীথরাত্রে সেই গৃহসুখ বন্ধন থেকে সহজেই মুক্তি নিয়েছে। তারাপদ যেদিন চলে গেল সেদিন নববর্ষার মেঘে মেঘে প্রকৃতির বিশ্ব-ব্যপ্ত আহ্বান। "সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা, চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে......" আর "স্নেহ প্রেম বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্র বন্ধন তাহাকে চারিদিক হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই ব্রাহ্মণ বালক আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্ব-প্রকৃতির নিকট চলিয়া গিয়াছে।" এই গল্পে প্রকৃতির এই সুদূর বিস্তারী ব্যঞ্জনা ও তারাপদ চরিত্রের পরিকল্পনা এই গল্পটিকে অসাধারণত্ব দিয়েছে।

৪

ব্যক্তি ও ব্যক্তি : ব্যক্তি ও ব্যক্তিতে অসংখ্য সম্পর্ক। তবু সেই অসংখ্য সম্পর্ককে ভাগ করা চলে কয়েকটি শাখায়। প্রেম মানুষের তীব্রতম ও মধুরতম অনুভূতি। রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি উৎকৃষ্ট গল্পের বিষয় প্রেম। এখানেও তিনি বিচিত্রধর্মা।

প্রেম কখনও মিলনমধুর কখনও বা বিরহবিধুর। কখনও তাঁর নায়িকা রাজকুমারী, কখনও সামান্য গৃহস্থ বৌ। কখনও তাঁর কাহিনী বর্তমানকালে কখনও ইতিহাসের ধূসর অধ্যায়ে। কখনও প্রেম সহজ, কখনও বা অসামাজিক ও জটিল।

প্রেমের দুর্দমনীয় শক্তির প্রকাশ ঘটেছে 'দুরাশা' গল্পে। ব্রাহ্মণ কেশরলালকে একদিন মুসলমান রাজকুমারী ভালবেসেছিল কিন্তু সেদিন কেশরলালের মনে ছিল ব্রাহ্মণ্যের অভিমান। কেশরলাল নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ তাই সে এই মুসলমান রমণীর প্রেম গ্রহণ করেনি। সেইদিন থেকে সেই নারী তার সমগ্র জীবনের মধ্যে এক প্রচণ্ড পরিবর্তন আনতে চাইলেন। সে সাধনা ব্রাহ্মণের সাধনা। তিনি এক জীবনকে বিসর্জন দিয়ে অন্য জীবনকে গ্রহণ করতে চাইলেন। পাহাড়ে পাহাড়ে মঠে মঠে মন্দিরে মন্দিরে বদ্রাওন কুমারী ঘুরে বেড়ালেন। আর অবশেষে দেখলেন যে সেই ব্রাহ্মণ্যগর্বিত কেশরলাল ভ্রষ্ট। ব্রাহ্মণ্য তার সংস্কার মাত্র, অভ্যাস-মাত্র। সে এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর একটি অভ্যাস পেয়েছে কিন্তু নারী তার সমস্ত জীবন যৌবনের পরিবর্তে আর একটি জীবন যৌবন কোথায় পাবে? পরি-বেশ রচনায়, ঐতিহাসিক ঘটনার ছায়াপাতে, সর্বোপরি প্রেমে ও ধর্মের দ্বন্দ্বের বর্ণনায় গল্পটি অসামান্য।

আর একটি অসামান্য সৃষ্টি 'একরাত্রি'। গল্পের আখ্যান অতি সামান্য। যেদিন সুরবালাকে পাওয়া ছিল সহজ সেদিন নায়ক মগ্ন ছিল দেশের কাজে। দেশের কাজের বিরাট আহ্বানের কাছে নিতান্ত গ্রাম্যবালিকার নীরব আকর্ষণ ছিল তুচ্ছ। সুরবালার বিবাহ হয়ে গেল সরকারি উকীল রামলোচন রায়ের সঙ্গে। কিন্তু এক-দিন দেশের কাজ শেষ হল। নায়কের পিতার মৃত্যুর পর সংসারের ভার নিতে হল। নায়ককে গ্যারিবল্ডি হবার আশা ছেড়ে হতে হল গ্রামের ইস্কুলের মাস্টার। ভাগ্য-চক্রে সেই গ্রামেই রামলোচন রায়ের বাড়ি। সুরবালা আজ অন্যের স্ত্রী। এখন গল্পের নায়ক মধ্যে মধ্যে যায় রামলোচনবাবুর বাড়ি। "পাশের ঘরে অত্যন্ত মৃদু একটু চুড়ির টুংটাং, কাপড়ের একটুখানি খসখস এবং পায়ের একটুখানি শব্দ শুনিতে পাইলাম; বেশ বুঝিতে পারিলাম জানালার ফাঁক দিয়া কোনো কৌতূহল-পূর্ণ নেত্র আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে।" সুরবালা একদিন ছিল সহজলভ্য—আজ সে অপ্রাপনীয়। আজ সে কেউ নয়। মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয়। মন বলে "সুরবালা আমার কী না হইতে পারিত। আমার সব চেয়ে অন্তরঙ্গ, আমার সবচেয়ে নিকট-বর্তী, আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখভাগিনী হইতে পারিত—সে আজ এত দূর, এত পর, আজ তাহাকে দেখা নিষেধ, তাহার সঙ্গে কথা কওয়া দোষ, তাহার বিষয়ে চিন্তা করা পাপ।"

সেই দরিদ্র মাস্টারের জীবনে একটি অনন্ত রাত্রি এল। একটি রাত্রি, গর্জনে বর্ষনে ভরা। সেদিন রামলোচন দূরে কী একটা কাজে। আর আকাশে প্রবল ঝড়,

প্রবল বর্ষণ। সেই অন্ধকারে সে একা পুকুরের পাড়ের ওপর এসে দাঁড়াল—নীচে বন্যা ছুটে আসছে উদ্দাম বেগে। সেই অন্ধকারে তারই কাছে এসে দাঁড়াল সুরবালা। সেখানে সুরবালার কেউ ছিল না—শুধু তার ছেলেবেলার সাথী। সেই তারাহীন অন্ধকার, সেই প্রলয়ের আসন্ন ছায়ায় একটি রাত্রি—যেন অনন্ত রাত্রি। কেউ কথা বলল না। মৃত্যুর মত স্তব্ধরাত্রির অবসানে সুরবালা কোন কথা না বলে চলে গেল। কাহিনীর নায়কও বাক্যহীন হয়ে চলে এল। ব্রাউনিং এর Last ride together-এর মধ্যে আছে প্রেমিক প্রেমিকার সঙ্গসুখের মুহূর্তে মনে করছে "Who knows but the world may end to-night." একরাত্রির নায়কও তাই ভাবে। তারপরই সে ভাবে না, সুরবালা সুখে থাকুক। এক অনন্ত মুহূর্তের স্বাদ সে পেয়েছে—'the instant made eternity.'

মাল্যদান গল্পটিতে প্রেমের প্রথম উন্মেষের ছবি। বন্যস্বভাব কুড়ানি প্রেমের স্পর্শে যুবতী নারী হয়ে উঠল। ক্ষণপ্রেমের অবসান হল মৃত্যুর পথে। 'দালিয়া' গল্পেও এই প্রেমের স্নিগ্ধ ও সুন্দর রূপটি। দালিয়া রবীন্দ্রনাথের মধুরতম গল্প। ইতিহাস যেখানে নীরব—সেখানেই গল্পটির শুরু। সুজা আরংগজেবের ভয়ে আরাকানে পালিয়েছেন। তাঁর কন্যারা এক ধীবরের কাছে পালিত হচ্ছে। আমিনা ও জুলিখা দুই বোন। জুলিখা শাহাজাদার মেয়ে—একথা সে প্রতিমুহূর্তে স্মরণ করে। আর আমিনা আনন্দ পায় এই সাধারণ ধীবরের জীবনের মধ্যে, এই আলো-হাওয়া ভরা সুন্দর সহজ জীবনে। রাজ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি, মারামারি তার ভাল লাগে না, সে শুনতেও চায় না। আমিনার সংগে দালিয়া নামে একটি অরণ্যযুবকের ভালবাসা হল। পরে জানা গেল সে এক রাজপুত্র। রূপকথার মত শেষ। রবীন্দ্র-নাথের গল্পগুচ্ছে প্রেমের এত মধুর গল্প আর নেই। যৌবনের প্রেমে কামনা, মহিমা, বলিষ্ঠতা, ত্যাগ, হিংসা অনেক কিছুই মিশ্রিত। রবীন্দ্রনাথ তার থেকে শুধু মাধুর্যটুকুই ছেঁকে নিয়েছেন।

'সমাপ্তি' গল্পটিতে প্রেমের স্পর্শে বালিকামন নারীমনে রূপান্তরিত হয়েছে। গল্পটিতে কাহিনীর কিছুটা বিস্তার কমলে কাহিনী একমুখিতা আরো স্পষ্ট হত। 'মানভঞ্জন' গল্পটিতে গিরিবালার সৌন্দর্য ও তার বুভুক্ষু প্রেমতৃষিত হৃদয়ের কাহিনী। প্রেমের জটিলতা তীব্রভাবে ধরা দিয়েছে 'দৃষ্টিদান' ও 'মধ্যবর্তিনী' গল্প। দুটি গল্পই চরিত্রচিত্রণ ও মনোবিশ্লেষণের দিক থেকে কুশল। 'মধ্য-বর্তিনী' গল্পটি 'দৃষ্টিদানের' চেয়েও জটিল এবং সার্থক। 'মধ্যবর্তিনী'তে রুগ্না হরসুন্দরী স্বামীকে আবার বিবাহ করতে অনুরোধ করেছিল। হরসুন্দরী নিঃসন্তানা। যদি সন্তান হয় এই আশায় স্বামী প্রথমে অনিচ্ছা দেখিয়েও শেষে বিবাহ করলে। দ্বিতীয়া স্ত্রী স্বার্থপর। সে সংসার থেকে আনন্দ চায় কিন্তু সংসারের জন্য সে ত্যাগ করে না। সে এসে প্রথমে হরসুন্দরী ও তার স্বামীর

মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করল। অফিসের গতানুগতিক ক্লান্ত জীবনের মধ্যে স্বামীর দিন কাটত। এই তরুণী বধূ তাকে প্রথম যৌবনের নেশা ধরাল। বহ্নিমুখী পতঙ্গের মত সে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল এই নতুন নেশায়। এই প্রবল অন্ধ ভালবাসায় সে বিসর্জন দিল আপন সম্মান, ধন সম্পত্তি, পরিশেষে আহুতি দিল তার বহু-দিনের দাম্পত্য বন্ধনের অন্তরঙ্গতা। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় স্ত্রী মারা গেল। স্বামী মুক্তি পেল। হরসুন্দরীর স্বার্থাতীত ভালবাসা স্বামীকে উদ্ধার করল বিপদ থেকে। কিন্তু তাদের মাঝখানে ঘটে গেল চিরদিনের বিচ্ছেদ।

'দৃষ্টিদান' গল্পে রবীন্দ্রনাথ চরিত্র সৃষ্টি করেছেন সুনিপুণ কিন্তু আখ্যানকে মিলনান্তক করতে গিয়ে কাহিনীকে সংহত করতে পারেননি। স্ত্রী অন্ধ। স্বামীর দোষেই, চিকিৎসার অব্যবস্থায় স্ত্রী অন্ধ। কিন্তু আজ স্বামী অন্ধ স্ত্রীকে নিয়ে সুখী নয়। স্বামী হৃদয়হীন ডাক্তার। স্ত্রী তীব্র অনুভূতিময়ী নারী। স্বামী হেমাঙ্গিনীকে ভালোবাসলেন এবং তাকে বিবাহ করবেন স্থির করলেন। স্ত্রী সমস্তই অনুভব করলেন। এই বর্ণনা ও স্ত্রীর মনের বেদনা বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ অসামান্য ক্ষমতা দেখিয়েছেন। কিন্তু কাহিনীর শেষে দেখা গেল স্বামীর মানসিক পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তনে কাহিনীর সমাপ্তি সুখের হয়েছে কিন্তু কাহিনীটি বিশ্বাস্য হয়ে ওঠেনি। স্বামীর নিষ্ঠুরতা স্ত্রীকে পীড়িত করেছে—কিন্তু সেই নিষ্ঠুরতা হঠাৎ বিলুপ্ত হল কেন তার কোন সংগত উত্তর রবীন্দ্রনাথ দেননি। এই গল্পে স্বামী হেমাঙ্গিনীকে বিবাহ করতে গিয়ে শুনলেন হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর দাদার বিবাহ হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর চৈতন্য ফিরে এল এবং তিনি স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যপরায়ন হলেন। রবীন্দ্রনাথ এই গল্পে সমস্যার জটিলতা ও কাহিনীর নিষ্ঠুর সমাপ্তিকে পরিহার করেছেন। গল্প হিসেবে তাই দৃষ্টিদান সার্থক হতে পারেনি।

স্বামীর নিষ্ঠুরতা আর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ মানভঞ্জন। গিরিবালার যখন রূপ ও যৌবন মুকুলিত তখন স্বামী গোপীনাথ তার প্রতি উদাসীন। গোপীনাথ তখন রঙ্গমঞ্চ-নটী লবঙ্গের প্রতি আসক্ত। অভিমানিনী স্ত্রী শেষপর্যন্ত থিয়েটারের নটী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। সেদিন গিরিবালা বিশ্বজনধন্যা। সেদিন স্বামীকে অপমান করেই তার আনন্দ। স্বামীর নিষ্ঠুরতা থেকে গিরিবালার এই প্রতি-হিংসা প্রকৃতির জন্ম। আর স্বামীর উদাসীনতা থেকে জন্ম 'নষ্টনীড়ে'র জটিলতার। নষ্টনীড়ে প্রেম সূক্ষ্ম, অদৃশ্য তারের মত নীরবে প্রবেশ করে চারু ও অমলের মনকে বেঁধেছে, সামান্য আঘাতেই তা বেজে উঠেছে ও সেই তার যখন ছিঁড়ে গেছে তখন এক প্রবল বেদনা সর্বাঙ্গে শিহরিত হয়েছে। রাজনীতির নেশায় ভূপতি আচ্ছন্ন ছিল। তখন তার সদ্যযৌবনা স্ত্রী চারুর কোন সঙ্গী ছিল না। এমন সময় এল ভূপতির দূরসম্পর্কিত ভাই অমল। ছোট ছোট ঘটনায় অমল চারুর

হৃদয়ের অতি কাছে এসেছে। সেই নৈকট্য হঠাৎ ঘটেনি। ধীরে ধীরে অন্তরঙ্গতা এসেছে। তারপর এসেছে বড় কঠিন মুহূর্ত—বন্ধন মুক্তির পালা। যে নারী অন্তরের মধ্যে মৃতপ্রেমের মাধুরীকে বহন করে সংসার তার পক্ষে কত দুঃসহ, স্বামী তার পক্ষে কত বড় বন্ধন; আর সেই নিস্তব্ধ শোকপরায়ণা নারীকে ভালবাসা স্বামীর পক্ষে কত কঠিন। নষ্টনীড় একটি নিখুঁত গল্প। ঘটনা অল্প কিন্তু প্রত্যেকটি মূল্যবান। চরিত্রগুলি জীবন্ত। কাহিনী আকর্ষণীয়। যে সাহস ও সংযম রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন এই গল্পে তা আধুনিক সাহিত্যিকদের আদর্শ ও জটিল-দুর্ভেদ্য হৃদয়-অরণ্যের পথচারীদের অগ্রনী হিসেবেই গ্রাহ্য। চোখের বালিতেও রবীন্দ্রনাথ এই পরীক্ষা করেছেন। উপন্যাসের পটভূমিকায় জটিল ঘটনাস্রোতের ঘাতপ্রতিঘাতে যে কাহিনী সৃষ্টি সম্ভব, ছোটগল্পের পরিসরে তা সৃষ্টি করা কত কঠিন। সেই কঠিন পরীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ সার্থক হয়েছেন।

৫

প্রেম নরনারীর দেহ ও মনকে কেন্দ্র করেই শ্রেষ্ঠ স্ফূর্তি লাভ করে সন্দেহ নেই—কিন্তু প্রেম শুধু প্রেমিক-প্রেমিকা বা স্বামী-স্ত্রীকে ব্যপ্ত করেই নেই—তাকে ছাড়িয়েও প্রসারিত। সে প্রেম সমাজবন্ধনের মূল। সেই প্রেম বা প্রীতি রবীন্দ্র-নাথের গল্পের একটি উপাদান। ভ্রাতৃপ্রীতি রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি স্থান পেয়েছে। ব্যবধান, দানপ্রতিদান, দিদি, পণরক্ষা প্রভৃতি গল্প তারই প্রমাণ। হিমাংশুমালীর বাপ গোকুলচন্দ্র ও বনমালীর বাপ হরচন্দ্রে মামলা শুরু হল। যত-দিন মামলা চলছিল ততদিন হিমাংশু ও বনমালী এই দুই ভাইএর সম্প্রীতি দুষ্ট হয়নি। যেদিন হরচন্দ্রের জিত হল সেদিন বনমালীর শুধু মনে হল এ তারই পরাজয়। সে পথ চেয়ে রইল। কিন্তু কেউ এল না। সে হিমাংশুকে খুঁজতে গেল—হিমাংশু বাড়ি নেই। ভাবল হয়ত পরের দিন আসবে—এল না। এমনিই করে প্রতীক্ষা চলল—যে প্রতীক্ষার শেষ নেই।

'দানপ্রতিদান' গল্পে রাধামুকুন্দ শশিভূষণের অন্নে প্রতিপালিত। আজ উভয়েই বিবাহিত। বড় বৌ প্রতিকথায় ছোটবৌকে আক্রমণ করেন। রাধাগোবিন্দ এসব কথা গায়ে মাখে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে দাদাকে বিশ্বাসঘাতকতা করল। দাদার জমিদারির খাজনা লুঠিয়ে নিল। দাদা তখন তার আশ্রিত। রাধাগোবিন্দ শেষ পর্যন্ত জমিদারি কিনে নিলেন। শেষে অনুতাপে দগ্ধ হয়ে দাদার কাছে সব অপরাধ স্বীকার করলেন। দাদা বললেন তিনি সবই জানতেন। তিনি ভাইকে

তার অন্যায়ের জন্য ক্ষমা করলেন। মৃত্যুর মুহূর্তে আবার ভাই-ভাইর বিরোধ মিটল।

ভ্রাতৃপ্রীতির শ্রেষ্ঠ গল্প 'পণরক্ষা'। বংশীবদন রসিককে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। বংশীবদন তাঁতি। রসিক দাদাকে কোন কাজে সাহায্য করত না, সে অবশ্য বাজে কাজে অন্যের মনোরঞ্জন করত। সে দাদার কষ্টার্জিত অর্থ যথেচ্ছভাবে নষ্ট করতে পারত না বলে দাদাকে কৃপণ ভাবত এবং দাদার জন্য সে লজ্জিত বোধ করত। দাদা তার বিবাহের জন্য টাকা জমাচ্ছিল। এই সময় হঠাৎ দাদার কাছে একটা বাই-সাইকেলের জন্য সে টাকা চাইল। সেই নিয়ে দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে সে কলিকাতা চলে গেল—সেখানে সে বিয়ে করল এবং বিবাহে বাইসাইকেল পণ নিয়ে গ্রামে এল। আজ দাদা নেই। দাদা তার জন্য একটি বাইসাইকেল কিনে রেখেছে আর তার বিয়ের পণের টাকা। "কিন্তু হায়, কলিকাতা শহরে টাকার হাড়কাঠে চিরকালের মতো সে আপনার জীবন বলি দিয়া আসিয়াছে।"

ভ্রাতৃপ্রীতির আর একটি গল্প 'দিদি'। শশিকলার পিতামাতার অধিক বয়সে একটি সন্তান হয়। অল্প দিনের মধ্যেই শশিকলার মা'র মৃত্যু হয়। তখন বালকের ভার পড়ল শশিকলার ওপর। শশিকলার স্বামী জয়গোপাল এতে খুব প্রীত ছিলেন না। অবশ্য তিনি তাঁর শ্বশুরের বিশাল সম্পত্তির অধিকাংশই এই বালকটির অস্তিত্বের ফলে ভোগ করতেন। শশিকলা নিজের পুত্রের চেয়েও ভাইকে বেশী ভালবাসতেন। ধীরে ধীরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই নিয়ে ঝগড়া বাধল এবং শশিকলা ভাইকে নিয়ে স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করলেন। স্বামী জয়গোপাল শ্যালকের সমস্ত সম্পত্তি গোপনে আত্মসাৎ করলেন। তখন শশিকলা একদা সেখানকার সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে সব নিবেদন করলেন। সাহেব হৃদয়বান। তিনি জয়-গোপালের কারসাজি সমস্তই শুনলেন। শশির অনুরোধে সাহেব নীলমণিকে কাছে রাখলেন। শশিকলা স্বামীগৃহে গেল এবং সম্ভবত আত্মহত্যা করে মারা গেল। এই গল্পে দিদি শশিকলার চরিত্রটি অসাধারণ।

ভ্রাতৃপ্রীতির মতই মাতৃস্নেহ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে মূর্ত হয়েছে। 'রাসমণির ছেলে' এই বিষয়ের একটি উৎকৃষ্ট গল্প। মধ্যে মধ্যে কয়েকটি সুন্দর অনুচ্ছেদে এই মাতৃস্নেহ বিকশিত হয়ে উঠেছে...

> "রাসমণির হাতে চিত্রকরা ছিন্ন কাঁথাটি এখনো তক্তাপোষের উপর পাতা আছে, তাহার নানাস্থানে এখনো কালির দাগ রহিয়াছে, মলিন দেয়ালের গায়ে কয়লায় আঁকা সেই জ্যামিতির রেখাগুলি দেখা যাইতেছে, তক্তপোশের এক কোণে কতকগুলি হাতে-বাঁধা ময়লা কাগজের খাতার সঙ্গে তৃতীয় খণ্ড রয়াল-রীডারের ছিন্নাবশেষ আজিও পড়িয়া আছে। আর—হায়—হায়—তার ছেলে বয়সের ছোটো পায়ের একপাটি চটি যে ঘরের কোণে পড়িয়া ছিল, তাহা এতদিন কেহ দেখিয়াও দেখে নাই, আজ তাহা সকলে চেয়ে বড় হইয়া

দেখা দিল—জগতে এমন কোনো মহৎ সামগ্রী নাই যাহা আজ এই ছোটো জুতাটিকে আড়াল করিয়া রাখিতে পারে।"

ব্যক্তি ও ব্যক্তি পর্যায়ের গল্পগুলি আমরা যতই পড়ি ততই একটি বিশিষ্ট সুর লক্ষ্য করা চলে, যা রবীন্দ্র সাহিত্যে অন্যত্র বিরল। তা হল যন্ত্রণার রূপ। মানুষ সংসারে কষ্ট পায়, দুঃখ পায়। তাকে এই কষ্ট বা এই দুঃখ দেয় মানুষ, সমাজ বা আরো অন্য কিছু। তার নাম আমরা জানি না। তা হয়ত নিয়তি। তা হয়ত হিন্দুর কর্মফলের বিশ্বাস। কিন্তু কর্মফলে বিশ্বাস করি বা না করি সংসারে দুঃখ এবং যন্ত্রণা আছে, অকারণে বেদনা আছে। মানুষ মানুষকে বেদনা দেয়, আবার সৃষ্টির অন্তর্নিহিত জটিলতার ফলেই এই বেদনা চির রহস্যময়। শুভা বোবা। এই তার অপরাধ। কে এর জন্য দায়ী। অন্ধ নিয়তি। শশিকলা মরে। কেন? তার নিয়তি। রাধামুকুন্দ শশিভূষণের জমির খাজনা লুঠ করে। শশি-ভূষণ ভাইকে স্নেহ দিয়েও আঘাত পায় পরিবর্তে। কেন? একি তার নিয়তি! এই অন্ধ নিয়তির বেদনা রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলিকে এক অসাধারণ মহত্ত্ব দিয়েছে। যন্ত্রণা প্রেমে, যন্ত্রণা প্রীতিতে, যন্ত্রণা কর্তব্যে। যন্ত্রণার এই রূপ রবীন্দ্রনাথের গল্পের এক শ্রেণী।

মানুষের হৃদয়ের যন্ত্রণার রক্তরাগ মাস্টারমশাই গল্পে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা অতুলনীয়। হরলাল মাস্টারমশাই। সে বেণুগোপালকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। কিন্তু বেণুগোপাল তার ভালবাসার কোন মূল্য দেয় নাই। সে হরলালের অফিসের কয়েক হাজার টাকা নিয়ে পালাল। অফিসের সাহেব হরলালকে বিশ্বাস করতেন তাই তিনি হরলালকে সময় দিলেন টাকা সংগ্রহ করতে পারলে তার আর কোন ভয় নেই। এইবার শুরু হল হরলালের যন্ত্রণা। ভালবাসার প্রতিদান এই। স্নেহের প্রতিদান এই। জগতের অজস্র কর্মস্রোত ছুটে চলেছে—আর সে কেউ নয়, সে শুধু থেমে আছে। কী আর্ত, কী ভয়াবহ এই অনুভূতি। জগতে তার কেউ নেই। সবাই তাকে অপমান করে, বিনাঅপরাধে শাস্তি দেয়। হরলাল একটি ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে চড়ে বসল, গাড়োয়ান বলল 'কোথায় যাইবে'। হরলাল বলল 'কোথাও না। এই ময়দানের রাস্তায় খানিকক্ষণ হাওয়া খাইয়া বেড়াইল।" তারপর—

'হরলাল আপনার বন্ধনমুক্ত হৃদয়ের চারিদিকে অনন্ত আকাশের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল, যেন তাহার সেই দরিদ্র মা দেখিতে দেখিতে বাড়িতে বাড়িতে বিরাটরূপে সমস্ত অন্ধকার জুড়িয়া বসিয়াছেন। তাঁহাকে কোথাও ধরিতেছে না। কলিকাতার রাস্তাঘাট বাড়িঘর দোকান বাজার একটু একটু করিয়া তাহার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া লুপ্ত হইয়া যাইতেছে—বাতাস ভরিয়া গেল আকাশ ভরিয়া উঠিল, একটি একটি করিয়া নক্ষত্র তাহার মধ্যে মিলাইয়া গেল...'

এই গভীর যন্ত্রণা আর একভাবে রূপ পেয়েছে 'শেষের রাত্রি' গল্পে। যতীন অসুস্থ। তার স্ত্রী মণি। আর যতীনের মাসি। এই তিনজনকে নিয়ে গল্প। মণি স্বামীর জন্য চিন্তিত নয়। অসুস্থ স্বামীকে ফেলে সে যেতে চায় উৎসবে, অনুষ্ঠানে। মাসি এসে যতীনকে মিথ্যে কথা বলে, বলে মণি তার জন্য ব্যাকুল, তার অসুখের জন্য সে বিরহে-মলিন। আর যতীন সেই মিথ্যে কথা শুনে শুনে তার মনের কল্পনা মিশিয়ে এক মণিকে রচনা করে—"সেই মুখের ডাগর দুটি চক্ষু মোটা মোটা জলের ফোঁটায় ভরা।"

যতীনের সামনেই মৃত্যু। সে মণিকে দেখতে চায়, মণির স্পর্শ চায়। কিন্তু মণির কোন খেয়াল নেই। সে তখন বেড়াতে যাচ্ছে, গাড়ি রিজার্ভ করা হয়ে গেছে। মাসি এসে মিথ্যে করে বলেন যে মণিকে তিনি আনলেন। মণি কত সুন্দর, কত লাজুক সেই কথা বলেন মাসি। আর যতীন কল্পনা করে তার বধূ "অক্ষয় যৌবনে পূর্ণ—সে গৃহিণী, সে জননী, সে রূপসী, সে কল্যাণীয়া।"

একদিন ধরা পড়ে যায় সব। যতীন বুঝতে পারে মাসি তাকে মিথ্যাই সান্ত্বনা দিয়েছে। মৃত্যুর মুহূর্তে জেনে গেল তার সব কল্পনা মিথ্যা। যে পশমের শাল সম্পর্কে সে জেনেছে মণি রাত্রি জেগে তৈরী করেছে তা মিথ্যা। তাই মৃত্যুমুহূর্তে কী তীব্র ব্যথায় যতীন বলে ওঠে "না, মাসি, আমার পায়ের উপর ও শাল নয়, ও শাল নয়! ও শাল মিথ্যে, ও শাল ফাঁকি।"

মানুষের জীবনে বঞ্চনা, যন্ত্রণা বারবার রবীন্দ্রনাথের গল্পে ফিরে ফিরে এসেছে। এই রকম একটি আশ্চর্য গল্প 'শাস্তি'। দুখিরাম ও ছিদাম দুই চাষী। সন্ধ্যায় ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফিরে স্ত্রীর সঙ্গে বচসার ফলে দুখিরাম স্ত্রীর মাথায় দা বসিয়ে দিল। ইতিমধ্যে গ্রামের রামলোচন খুড়ো বাকি খাজনার খোঁজে দুখিরামের বাড়িতে হাজির। ছিদাম সমস্ত ব্যাপারটায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রামলোচনের কাছে ভাইর দোষস্খালনের জন্য বলল যে ছোটবৌ বড়বৌর মাথায় দা বসিয়ে দিয়েছে। ছিদাম নিজের স্ত্রীকে এই অপরাধ বহনের জন্য অনুরোধ করল। "সে স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল, তাহার কালো দুটি চক্ষু কালো অগ্নির ন্যায় নীরবে তাহার স্বামীকে দগ্ধ করিতে লাগিল।" ছিদাম আশ্বাস দিল ভয় নাই। সে শিখিয়ে দিল যে চন্দরা যেন বলে যে বড়বৌ তাকে বঁটি দিয়ে মারতে এসেছিল তাই আত্মরক্ষা করতে গিয়ে সে আঘাত করেছে। কিন্তু অভিমানক্ষুব্ধ চন্দরা আদালতে আত্ম-সমর্থন করল না। শুধু বলল সে খুন করেছে। তখন ছিদাম এবং দুখিরাম উভয়েই সাক্ষ্য দিতে এসে দুজনই বলল যে তারাই খুন করেছে। কিন্তু অন্যান্য সাক্ষ্য থেকে জজসাহেব বুঝলেন যে ঘরের স্ত্রীলোককে ফাঁসির অপমান থেকে বাঁচাবার জন্যই তারা অপরাধ স্বীকার করছে। চন্দরার ফাঁসির হুকুম হল। অভিমানিনী

নীরব চন্দরা বাক্যহীন দিনগুলি কাটাল। ফাঁসির পূর্বে ডাক্তার বলল, "তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব।"

"চন্দরা কহিল, মরণ '—"

—এই অভিমানের বেদনা নীরব কিন্তু ভয়াবহ। হতভাগ্য ছিদাম ভাই এবং স্ত্রী দুজনকে বাঁচাতে চেয়েছিল। কিন্তু অকারণে স্ত্রীর প্রতি অপরাধ দিয়ে তাকে সমগ্র গ্রামের কাছে অপমানিত করেছে। আজ স্ত্রী সেই অপমানের মুক্তি খুঁজছে মৃত্যুতে। সে অশিক্ষিতা, অমার্জিতা, গ্রাম্য কৃষকরমণী। কিন্তু তার যন্ত্রণাও মানুষের যন্ত্রণা।

রবীন্দ্রনাথের গল্পে যত অসম্মান, যত অপমান, যত বঞ্চনা—তার বেশীর ভাগই নারীর। এই যন্ত্রণার একটি অসামান্য উদাহরণ 'বিচারক'। ক্ষীরোদা বারনারী। আট-ত্রিশ বছরে সংসারে তার কেউ নেই, কেউ তার আপন নয়। সকলেই তাকে বঞ্চনা করেছে। তার শিশুপুত্র নিয়ে সে তাই কূপে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণত্যাগ করার চেষ্টা করেছে—কিন্তু হতভাগ্য সন্তানটি মারা গেছে, ক্ষীরোদা মরেনি। শিশুহত্যার দায়ে ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম দিয়েছেন বিচারক মোহিতমোহন।

এই মোহিতমোহন কঠিন বিচারক। তিনি হিন্দু সমাজ রক্ষা করতে সদা উন্মুখ। তিনি স্ত্রীজাতিকে দেবী আখ্যা দেন কিন্তু মনে করেন "রমণীগণ কুলবন্ধন ছেদন করিবার জন্য উন্মুখ।" তাই তিনি ক্ষীরোদাকে কঠিন শাস্তি দিলেন।

কিন্তু সংসারের বিচিত্র গতি। এই মোহিতমোহন একদা যৌবনাবস্থায় একটি বিধবা রমণীকে কুলভ্রষ্ট করেন। সেদিন রাত্রে সেই বিধবা নারীকে নিয়ে মোহিত-মোহন যখন বেরিয়ে পড়েছিল তখন সেই মেয়েটি বারবার কেঁদে কেঁদে বলেছিল, "এখনো রাত আছে, আমার মা, আমার দুটি ভাই, এখনো জাগে নাই, এখনো আমাকে ফিরাইয়া রাখিয়া আইস।" কিন্তু সেদিন মোহিতমোহন সেই নারীকে আকণ্ঠ পঙ্কের মধ্যে নিমজ্জিত করে চলে এসেছিলেন। সেই রমণীর কাছে তিনি পরিচয় গোপন করেছিলেন। নাম বলেছিলেন বিনোদচন্দ্র।

আজ বহুকাল কটে গেছে। ফাঁসির আসামী ক্ষীরোদা প্রহরীর সঙ্গে ঝগড়া করছে। জজ সাহেবকে দেখে বললে, "ওগো জজবাবু, দোহাই তোমার! উহাকে বলো, আমার আংটি ফিরাইয়া দেয়।"

মৃত্যুমুখী নারী এখনও গহনার মায়া ছাড়তে পারে না ভেবে তিনি হাসলেন। প্রহরীর কাছ থেকে আংটি নিলেন। "তিনি হঠাৎ যেন জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে লইলেন, এমনি চমকিয়া উঠিলেন।" এই আংটি একদা মোহিতমোহন দিয়াছিলেন সেই বিধবা রমণীকে। আজ এই নারী পতিতা কলঙ্কিনী। মোহিতমোহন তার বিচারক। এখনও সেই নির্বোধ নারী সেই প্রবঞ্চক মোহিতমোহনের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছে সমস্ত যন্ত্রণা, সমস্ত বেদনার বিনিময়ে। আজ মৃত্যু সেই যন্ত্রণার শেষ বার্তা নিয়ে আসছে।

৬

'ব্যক্তি ও সমাজ' গুচ্ছে এক ধরনের গল্প আছে যেখানে রবীন্দ্রনাথ সামাজিক প্রথা, আচার, ব্যবহারকে ব্যঙ্গ করেছেন। এইগুলির মধ্যে 'দেনাপাওনা' 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' 'সদর ও অন্দর' 'উলুখড়ের বিপদ' 'প্রায়শ্চিত্ত'—জাতীয় গল্প আছে। পণপ্রথা নিয়ে দেনাপাওনা ও যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ লিখিত। বৈবাহিকদের সম্পর্কের উজ্জ্বল চিত্র ফুটেছে গল্পদুটিতে। 'সদর ও অন্দরে'র মধ্যে মোসাহেবির প্রতি ব্যঙ্গ, 'উলুখড়ের বিপদ' গল্পে কামার্ত নায়েবের হাতে ন্যায়ের পরাজয়। আর 'প্রায়শ্চিত্ত' গল্পে হিন্দুসমাজের প্রায়শ্চিত্ত বিধির প্রতি রবীন্দ্রনাথের ধিক্কার ও ব্যঙ্গ। কিন্তু এর কোনটিই উৎকৃষ্ট গল্প নয়। এগুলির জন্য রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি নির্ভর করে না।

সমাজের অত্যাচার যেখানে ব্যক্তির সুখস্বাচ্ছন্দকে আঘাত করে, তাচ্ছিল্য করে সেইখানেই সমাজ ও ব্যক্তির সংঘর্ষ। হিন্দুবাঙালী সমাজে এই সমাজ ও ব্যক্তির দ্বন্দ্ব চিরাচরিত। এই দ্বন্দ্ব প্রেমের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রকাশিত। হেমন্ত কুসুমের স্বামী। হেমন্ত কুসুমকে ভালবাসে। সেই কুসুমের জাতি--নাকি নীচ। হেমন্তের পিতা হরিহর একথা শুনে বললেন "হেমন্ত, বউকে এখনি বাড়ি হইতে দূর করিয়া দাও।" সমাজের চোখে কুসুম নীচ জাতি, কাজেই তাকে ঘরে রাখা যেতে পারে না।

> "কুসুম ভূমিতলে দুইহাতে তাহার পা জড়াইয়া পায়ের উপর মুখ রাখিয়া পড়িয়া আছে। সময় যেন স্তম্ভিত সমুদ্রের মতো স্থির হইয়া আছে।"...
> হেমন্ত উঠিয়া গিয়া পিতাকে বলিল, "আমি স্ত্রীকে ত্যাগ করিব না।"
> হরিহর গর্জিয়া উঠিয়া কহিল, "জাত খোয়াইবি?"
> হেমন্ত কহিল, "আমি জাত মানি না।"
> "তবে তুই শুদ্ধ দূর হইয়া যা।"

এখানে সমাজের নিষেধ লঙ্ঘন করে ব্যক্তি তার প্রেমের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। আবার 'অপরিচিতা' গল্পে ব্যক্তি সমাজের আচারকে মেনে নিয়ে চিবকালের মত ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। 'স্ত্রীর চিঠি' গল্পে নারী সমাজের বন্ধনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। ইবসেনের নোরার মত তার প্রতিবাদ। তবে এতে যে পরিমাণ আবেগ আছে সে পরিমাণ গঠনসৌষ্ঠব নেই। 'নামঞ্জুর' গল্পে আবার রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্তঃসারশূন্যতা ও ভণ্ডামির প্রতি ব্যঙ্গ। 'একটি আষাঢ় গল্প'টি রূপক—এর মূল্যে লক্ষ্য সমাজের চিরাচরিত নিয়মপ্রীতি, আচারকে অন্ধভাবে মানার প্রতি ব্যঙ্গ। এই কাহিনীই পরে 'তাসের দেশ' নাটকে রূপান্তরিত হয়েছে। যান্ত্রিকতার মধ্যে, নিয়ম আর প্রাণহীনতার মধ্যে আবির্ভূত হল প্রেম, সেই প্রেম আনল চাঞ্চল্য, আনল প্রাণ। এই কাহিনীর মূল কথাই পরে "রক্তকরবী" নাটকেও দেখা গেছে।

এই পর্যায়ে আর দুটি গল্প উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি তরল ও মধুর। অন্যটি গভীর ও গম্ভীর। প্রথম গল্পটি ঠাকুরদাদা। লুপ্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠার গৌরব নিয়ে ঠাকুরদাদা আজো বেঁচে আছেন। তিনি যে সমাজের মানুষ ছিলেন সে সমাজ আজ লুপ্তপ্রায়। নয়নজোড়ের জমিদার ছিলেন তিনি। সেই গৌরবের শেষ রশ্মি তাঁর চেতনায়। একটি বিশেষ সমাজব্যবস্থার প্রতিভূ তিনি। বর্তমান সমাজের সঙ্গেই তাঁর বিরোধ। তিনি বর্তমান কালে বাস করেও সেই অতীত সমাজের সঙ্গে থাকতে চান। এখানেই গল্পের কৌতুক ও কারুণ্য। কিন্তু একটি নারীর মুহূর্তের আবির্ভাবে গল্পের মধ্যে কারুণ্য-লাবণ্য বিলসিত হয়েছে অতীত সমাজের সমস্ত গৌরব তখন বিলুপ্ত হয়ে বর্তমান সমাজের সঙ্গে মৈত্রী ঘোষণা করেছে। 'ঠাকুরদাদা'য় শুধু এই বার্তাটি আছে যে প্রাচীন আভিজাত্য লুপ্ত। বর্তমান সভ্যতার সঙ্গে দ্বন্দ্বে তার অবসান ঘটেছে।

ব্যক্তি ও সমাজের চরম দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে 'হালদার পরিবার' গল্পে। ব্যক্তির একটি নিজস্ব সত্তা আছে—সে যে একটি পরিবারের মধ্যেই সম্পূর্ণ অবলুপ্ত নয়—এই দাবীই বনোয়ারীর দাবী। এই দাবীই তাকে বিদ্রোহী করেছে। এই বিদ্রোহে তার সঙ্গী নেই। তার স্ত্রী কিরণলেখাও তার এই বিদ্রোহকে অন্যায় মনে করে। যুগ-যুগান্ত ধরে হিন্দু পরিবার যেভাবে চলে আসছে তা সত্য, তা চরম এবং তা ধ্রুব—এই হল কিরণলেখার বিশ্বাস। সে কিরণলেখা নয়—সে হালদারবাড়ির বড় বৌ। সে ব্যক্তি নয়—সে পরিবার বিশেষের একটি অংশমাত্র। তাই স্বামীর এই বিদ্রোহকে সে বুঝতে পারে না। হালদারবাড়ির ছেলে একদিন বেরিয়ে পড়ল বাড়ি ছেড়ে তার নিজের অস্তিত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে। ব্যক্তির নিজস্ব একটা মর্যাদা আছে, নিজস্ব সম্মান আছে। সেই সম্মান পেতে চায় ব্যক্তি। রবীন্দ্রনাথের গল্পে সেই নবজাগ্রত ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন।

৭

ব্যক্তি ও অতিপ্রাকৃত—এই স্তরের গল্পধারায় অনেকগুলি গল্প উল্লেখযোগ্য। সম্পত্তি সমর্পণ, কংকাল, নিশীথে, মণিহারা ও ক্ষুধিত পাষাণ—এই কয়েকটি গল্পকেই সাধারণত রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত গল্পের মধ্যে ফেলা হয়। এগুলির মধ্যে কোনটিতে অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস, কোনটিতে ভৌতিক আবির্ভাব, কোনটিতে প্রাচীন কালের নির্জন প্রাসাদ। এগুলিকে আমরা fantasy বলতে পারি। একজন ইংরেজ ছোটগল্পকার ও আলোচক বলেছেন—"It implies the supernatural, but need not express it. Often it does express it, and were that type of classification helpful, we could make a list of the devices

which writers of a fantastic turn have asked—such as the introduction of a god, ghost, angel, monkey, monster, midget, witch into ordinary life......."[১]

উপরিউক্ত বক্তব্যের নিরিখে দেখলে রবীন্দ্রনাথ বেশ কয়েকটি অতিপ্রাকৃত আবহাওয়াপূর্ণ গল্প লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'সম্পত্তি-সমর্পণ' গল্পটিকে অনেকে অতিপ্রাকৃত মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে গল্পটি আমাদের দেশের একটি সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোন একটি শিশুকে যদি কোন কোষাগারের মধ্যে হত্যা করা যায় তাহলে সে যক্ষ হয়ে সেই ধন পাহারা দেয়—এই বিশ্বাসে এক বৃদ্ধ একটি শিশুকে অন্ধকার ঘরে নিঃশ্বাসরুদ্ধ করে মারে। এই পর্যন্ত গল্পটি ভয়াবহ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই বৃদ্ধের অনুতাপে ও অন্তিম হাহাকারে গল্পটি পূর্ণ হয়েছে। গল্পটির মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে—কিন্তু সেই আতঙ্ক অর্থলোভী বৃদ্ধের নির্দয়তার ফল। কোন অতিপ্রাকৃত শিহরণ পাঠককে অভিভূত করে না। আর সেই শিহরণই অতিপ্রাকৃত গল্পের প্রাণ।

'গুপ্তধন' গল্পের মধ্যেও কিছুটা ভয়াবহ আবহাওয়া ও রহস্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। অর্থলোভে মৃত্যুঞ্জয় গুপ্তচরের সন্ধানে বেরিয়েছিল। এক জঙ্গলের মধ্যে এক সাংকেতিক লিপি পড়ে সে আবিষ্কার করেছিল এক অতুল ঐশ্বর্যের জগৎ। সেই ঘন জঙ্গল, ভয়াবহ অন্ধকার, নির্জন পরিত্যক্ত গুপ্তধন ও সন্ন্যাসীর আবির্ভাব—সব মিলে এক রহস্যপূর্ণ আবেশ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গল্পে প্রাধান্যলাভ করেছে মৃত্যুঞ্জয়ের অন্তিম মর্ত্যপ্রীতি। সে ফিরে আসতে চেয়েছে তার প্রতিদিনের সুখদুঃখভরা সংসারে। সে তুচ্ছ করেছে সেই অতুল বৈভব। সে পদাঘাত করেছে সেই সম্রাটকাম্য অনন্তস্বর্ণপুঞ্জ। স্বর্ণের চেয়ে বড় জীবন—এই সত্যে সে পৌঁছেছে। কাজেই এই উপলব্ধি গল্পের প্রথমাংশের অতিপ্রাকৃত ও রহস্যময়তাকে ছাপিয়ে উঠেছে। এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথের একটি সার্থক গল্প। চরিত্রসৃষ্টি ও ঘটনাপ্রবাহের ঐক্য এখানে অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে রক্ষা করা হয়েছে। আর মৃত্যুঞ্জয়ের দ্বন্দ্ব—সোনা বড় না তার ছোট জীবনের তুচ্ছতা বড়—মানুষের জীবনের চিরন্তন এক দ্বন্দ্বের প্রকাশ করেছে। এই চিরন্তন দ্বন্দ্বের সমাধানে মৃত্যুঞ্জয় জেনেছে জীবন অনেক বড়। এই উপলব্ধি গল্পটিকে বিশেষ মহিমা দান করেছে।

'নিশীথে' গল্পটিকেও কোন কোন সমালোচক অতিপ্রাকৃত গল্প বলেছেন দ্বিতীয় বিবাহের পর প্রথম স্ত্রীর স্মৃতি নায়ককে উদ্বেল ও উদ্‌ভ্রান্ত করেছে। সে

১। Forster, E. M.: পূর্বে উক্ত পৃঃ ১৪৬-৪৭

তার প্রথম পত্নীকে বঞ্চনা করেছিল। আজ সে মনে করে প্রথম স্ত্রী সেই বঞ্চনার কথা স্পষ্টভাবে জানতে পেরেছে। স্বামীর সেই অনুতাপ ও তার মর্মবেদনাই গল্পটির প্রধান কথা। তবে ওটিই রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প যেখানে তিনি এক অতিপ্রাকৃতিক শিহরণ এবং হিমশীতল অনুভূতির সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছেন। কবি কোলরিজ তাঁর বিখ্যাত কবিতা *The Rime of the Ancient Mariner*-এর মধ্যে এক আশ্চর্য শিহরণ সৃষ্টি করেছেন এক বৃদ্ধ নাবিকের জাদুকরী তীক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে, নিঃসঙ্গ সমুদ্রে ভৌতিক নৌকার আবির্ভাবে, বিরাট জাহাজে সঙ্গী নাবিকদের মৃতদেহের পাশে একটিমাত্র নাবিককে জীবিত থাকার অপরিসীম বেদনা দিয়ে। কবি কোলরিজের শ্রেষ্ঠত্ব এই হিমশীতল অনুভূতি সৃষ্টিতে। রবীন্দ্রনাথ এই গল্পটিতে সর্বপ্রথম সেই রকম অশরীরী ও ভৌতিক অনুভূতি সৃষ্টির প্রয়াস পান। অবশ্য তা কোলরিজের সঙ্গে তুলনীয় নয়। কোলরিজের সৃষ্টিক্ষমতা আরো প্রচণ্ড ও আরো বৃহৎ। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যে অতিপ্রাকৃত আবহাওয়া সৃষ্টির দিক থেকে 'নিশীথে' স্মরণীয়। দ্বিতীয় বিবাহের পর নায়ক যখনই তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ করতে গেছেন তখনই তিনি হঠাৎ আকাশে-বাতাসে একটি আর্তনাদ শুনেছেন। প্রথমা স্ত্রী যখন অসুস্থা ছিলেন তখন নায়ক তাঁর ভাবী দ্বিতীয় পত্নীর সঙ্গে মিলিত হন। একদিন অন্ধকারে সেই মেয়েটিকে দেখে অসুস্থা স্ত্রী প্রশ্ন করেছিলেন, "ও কে! ও কে গো!" আজও যখন তিনি তাঁর নবীনা পত্নীকে বলেন "আমি ভালোবাসি" সঙ্গে সঙ্গে তিনি অনুভব করেন "কৃষ্ণপক্ষের পীতবর্ণ ভাঙা চাঁদের নীচ দিয়া, গঙ্গার পূর্বপার হইতে গঙ্গার সুদূর পশ্চিম পার পর্যন্ত হাহা-হাহা-হাহা করিয়া অতি দ্রুতবেগে একটা হাসি বহিয়া গেল।" এই অশরীরী হাসি নায়ককে প্রায় উন্মাদ করে তুলল। "অন্ধকারে কে একজন আমার মশারির কাছে দাঁড়াইয়া সুষুপ্ত মনোরমার দিকে একটিমাত্র দীর্ঘ-শীর্ণ-অস্থিসার অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া যেন আমার কানে কানে অত্যন্ত চুপি চুপি অস্ফুটকণ্ঠে কেবলই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, "ওকে! ওকে! ওকে গো!"

প্রথমা স্ত্রীকে বঞ্চনার ফলে নায়কের মনের যে তীব্র জ্বালা তা কল্পনা করেছে প্রতি মুহূর্তে এক অদৃশ্য, অস্পৃশ্য সত্তার—যে প্রতি মুহূর্তে বলে চলেছে "ওকে, ওকে।" এই গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। গল্পটির গঠনভঙ্গিতে বৈচিত্র্য আছে। এক ডাক্তারকে এই গল্পের নায়ক গল্পটি বলছেন। গভীর রাত্রে হঠাৎ নায়ক এসে ডাক্তারকে তুলেছেন। ডাক্তার তাঁর চিকিৎসা করেন কিন্তু রোগ সারে না—রোজই তিনি রাত্রে এক অশরীরী শব্দ শোনেন। আজ নায়ক তাঁর জীবনের ঘটনা বললেন। কিন্তু পরদিন সকালে আবার তিনি স্বাভাবিক মানুষ। "কিন্তু আবার পরদিন অর্ধরাত্রে দ্বারে আসিয়া ঘা পড়িল, 'ডাক্তার' 'ডাক্তার'!"

'মণিহারা' গল্পটিতে অতিপ্রাকৃত পরিবেশ পরিপূর্ণভাবে উদ্ভাসিত। গল্পটি

আটপৌরে দাম্পত্যজীবনের পটভূমিতেই গঠিত। স্ত্রী স্বামীর বেদনা ও দুঃখ অনুভব করে না। ফণিভূষণের ব্যবসা যখন যায় যায় তখন ফণিভূষণ ভেবেছিল যে স্ত্রী মণিমালিকা বুঝি তাঁর গহনা দিয়ে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে। কিন্তু মণিমালিকার প্রাণের অধিক গহনাগুলি সে কিছুতেই দিতে রাজী হল না। মণি মালিকা মারা যায়। এইখান থেকেই গল্পেব আসল রহস্য অংশ শুরু।

রাত্রে হঠাৎ ফণিভূষণ শুনতে পেল একটা ঠক্‌ঠক্ শব্দের সঙ্গে গহনার ঝমঝম শব্দটা নদীর ঘাটের উপর থেকে উঠে আসছে। "শব্দটা ক্রমে ঘাটের সর্বোচ্চ সোপান তল ছাড়িয়া বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাড়িটার সম্মুখে আসিয়া থামিল।"

পরের দিন ফনিভূষণ আবার শুনতে পেল নদীর ঘাটে একটা ঝমঝম শব্দ সেই শব্দ "আজ ঘাট হইতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া মুক্তদ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিল। শুনা গেল, অন্দরমহলের গোলসিঁড়ি দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে শব্দ উপরে উঠিতেছে।" ফনিভূষণ দ্রুতবেগে ছুটে গেল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। পরদিন আবার প্রতীক্ষা। আজও সেই একই শব্দ। সেই শব্দ ঘরে প্রবেশ করল।

> "তখন ফণিভূষণ চোখ মেলিল এবং দেখিল ঘরে নবোদিত দশমীর চন্দ্রালোক আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহার চৌকির ঠিক সম্মুখে একটি কঙ্কাল দাঁড়াইয়া। সেই কঙ্কালের আট আঙুলে আংটি, করতলে রতনচক্র, প্রকোষ্ঠে বালা, বাহুতে বাজুবন্ধ, গলায় কণ্ঠি, মাথায় সিঁথি, তাহার আপাদ-মস্তকে অস্থিতে অস্থিতে এক একটি আভরণ সোনায় হীরায় ঝকমক করিতেছে। অলংকারগুলি ঢিলা, ঢলঢল করিতেছে, কিন্তু অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িতেছে না। সর্বাপেক্ষা ভয়ংকর তাহার অস্থিময় মুখে তাহার দুই চক্ষু ছিল সজীব; সেই কালো তারা, সেই ঘন দীর্ঘ পক্ষ্ম, সেই সজল উজ্জ্বলতা, সেই অবিচলিত দৃঢ়শান্ত দৃষ্টি।"

এই বর্ণনায় গল্পের ভৌতিক আবহাওয়া চরমে উঠেছে। গল্পের শেষে সমস্ত ব্যাপারটিকে ব্যঙ্গ করে, অসত্য বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টায় গল্পটি আরো রহস্যাকুল হয়েছে। একি মায়া না মতিভ্রম, একি সত্য না সত্যের ছদ্মবেশ--এই সংশয়ের মধ্যে কাহিনীর সমাপ্তি।

যদিও গল্পের ভৌতিক অংশ বিশেষ প্রশংসনীয় তবুও গল্প হিসেবে এটি নিখুঁত নয়। গল্পের একমুখিনতা নষ্ট হয়েছে। প্রথম অংশে মণিভূষণের ও মণি-মালার দাম্পত্যজীবনের বর্ণনা। এখানে এক নারী—যে স্বামীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতির প্রতি উদাসীন। এখানে একটি পুরুষ—যে তার স্ত্রীর কাছ থেকে কোন সহানুভূতি পায় না। এই দাম্পত্যজীবনের ভাষাও প্রধানত কৌতুক ও ব্যঙ্গপ্রধান। দ্বিতীয় অংশে মণিমালিকার প্রেতাত্মার আগমন। এখানে ভাষা কবিত্বময়, ব্যঞ্জনাধর্মী ও অলংকারময়। স্পষ্টতই দুটি অংশের মধ্যে বিভেদ আছে। কাহিনী যেন হঠাৎ তার লক্ষ্য পরিবর্তন করেছে। এ কারণেই গল্পটি নিখুঁত হতে পারেনি।

সর্বাঙ্গসুন্দর সার্থক গল্প হিসেবে 'ক্ষুধিত পাষাণ' অতি স্মরণীয়। কোলরিজ যেমন তাঁর Christabel কবিতায় মধ্যযুগের রহস্যময় দুর্গের অপরূপতা সৃষ্টি করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনই মোগল যুগের পরিত্যক্ত সৌধটিকে সৃষ্টি করেছেন। নীরব নিস্তব্ধ শীর্ণা শুস্তা নদীর তীরে নির্জনতর এক প্রাসাদে এক কাহিনীর জন্ম। আড়াইশ' বছর ধরে সেই পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদে বহু আনন্দের উৎসব, বহু ঐশ্বর্যচ্ছটা, বহু নারীর অব্যক্ত নিঃশ্বাস, বহু প্রেমিকের ব্যর্থ হৃদয়ের নিবিড় বেদনা সঞ্চিত হয়েছে। বেদনা ও অপূর্ণতা, আনন্দ ও মাদকতা—আজ ক্লান্ত মরীচিকার মত সেই হর্ম্যের কক্ষে কক্ষে লুব্ধ পথিককে অব্যর্থ মৃত্যুর দিকে আকর্ষণ করছে। বহু যুগের ওপার থেকে সেই গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ সব ফিরে ফিরে এসেছে। কোন এক পারশীতরুণীকে বেদুইন দস্যুরা লুণ্ঠন করে এনেছিল. কোন খর্জুর কুঞ্জ-ছায়ায় তার জন্মভূমি। সেই নারীর বিচিত্র জীবন। ক্রীতদাসিত্বের যন্ত্রণা সে পেয়েছে। আবার একদিন মদমত্ত আনন্দতরঙ্গিত রাজপ্রাসাদে সে আশ্রয় পেয়েছে। "সেখানে সে কী ইতিহাস! সেই সারঙ্গীর সঙ্গীত, নূপুরের নিক্কণ এবং সিরাজের সুবর্ণ-মদিরার মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক, বিষের জ্বালা, কটাক্ষের আঘাত। কী অসীম ঐশ্বর্য, কী অনন্ত কারাগার"! .

সেই প্রাসাদে আজ এক তুলার মাশুল সংগ্রহকারীর প্রবেশ। সে অনুভব করে এই নির্জন প্রাসাদে সেই শতাব্দী পারের কোন এক নারীর জীবন আজও অভিনীত হচ্ছে। কখনও সে আনন্দ বিহ্বল। কখনও সে মদির কটাক্ষে চঞ্চল। কখনও বহু-দিবসের লুপ্তাবশিষ্ট মাথাঘষা ও আতরের মৃদু গন্ধ নাসার মধ্যে প্রবেশ করে। দীপহীন জনহীন ঘরে শোনা যায় ঝর্ঝর শব্দে ফোয়ারার জল সাদা পাথরের উপরে এসে পড়ে। এমনকি স্পষ্ট মনে হয় কে যেন "আস্তে আস্তে ঠেলিতেছে।" এই শ্রবণ, দর্শন, গন্ধানুভব ও স্পর্শ—এই চারিটি ইন্দ্রিয়শক্তি এক হয়ে সেই সৌন্দর্যময়ী অতীত অহল্যাকে পাষাণশীতলতা থেকে মুক্তি দিয়েছে। এক নারীর স্পর্শ পাওয়া যায়. শব্দ পাওয়া যায়, কিন্তু সে অধরা। হঠাৎ আয়নায় দেখা যায় "সেই তরুণী ইরানীর ছায়া আসিয়া পড়িল—পলকের মধ্যে গ্রীবা বাঁকাইয়া, তাহার ঘনকৃষ্ণ বিপলচক্ষু-তারকায় সুগভীর আবেগতীব্র বেদনাপূর্ণ আগ্রহ কটাক্ষপাত করিয়া... দর্পণেই মিলাইয়া গেল।"

সে মানুষকে মুগ্ধ করে, চঞ্চল করে। সে রাগ করে, অভিমান করে। সে মানবী। কিন্তু অশরীরী। তার বেদনা অপ্রকাশ্য, অতলগভীর। নায়ক স্পষ্ট অনুভব করে।

> "একজন রমণী পালঙ্কের তলদেশে গালিচার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই দৃঢ়বন্ধ মুষ্টিতে আপনার আলুলায়িত কেশজাল টানিয়া ছিঁড়িতেছে, তাহার গৌরবর্ণ ললাট দিয়া রক্ত ফাটিয়া পড়িতেছে, কখনও সে তীব্র অট্টহাস্যে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে, কখনও ফুলিয়া ফুলিয়া

ফাটিয়া কাঁদিতেছে, দুই হস্তে বক্ষের কাঁচুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অনাবৃত বক্ষে আঘাত করিতেছে।”

এই ভয়াবহ আবহাওয়াকে আরো রহস্যজালপূর্ণ করেছে পাগল মেহেরআলী। মেহেরআলী এই প্রাসাদে একদা ছিল এবং এখানে থাকার ফলেই সে পাগল হয়েছে। এই প্রাসাদে যে থাকে সেই পাগল হয়। এই নায়ক শুধু হয়নি। কেন হয়নি এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই গল্প শেষ হয়েছে। এই গঠনভঙ্গিটি গল্পকে আরো সৌন্দর্য দিয়েছে। এক কোলাহলপূর্ণ রেলস্টেশনে ট্রেনের বিলম্বের অবসরে নায়ক এই গল্প শুরু করেছিলেন, ট্রেন এসে যাওয়ার ফলে গল্প তিনি শেষ করতে পারলেন না। এই যে অতর্কিত শেষ ও পাঠকের জাগ্রত কৌতূহলের অপরিতৃপ্তি—এখানেই গল্পটির গঠনভঙ্গির কুশলতা। কিন্তু শুধুই গঠনকুশলতা, শুধুই অতিপ্রাকৃত আবহাওয়া সৃষ্টির অসামন্যতা ও অবিচ্ছিন্ন কাব্যসংগীতময় ভাষাই এই গল্পের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ নয়। এর মধ্যে একটি বিশিষ্ট সৌন্দর্য আছে।

রবীন্দ্রনাথ বহুস্থানে বলেছেন মানুষ কর্মের বন্ধনে বন্দী কিন্তু তার একটি নিজস্ব সত্তা আছে—যেখানে সে একক, সেখানে সাধারণ কেরানী ও আকবর বাদশার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ সেই সম্পূর্ণ মুক্ত ব্যক্তিসত্তার কাহিনী। নায়ক বলেছে যে যখন সে এই প্রাসাদে আসত তখন তার মনে থাকত না যে সে “শ্রীযুক্ত অমুক, অমুকের জ্যেষ্ঠপুত্র, তুলার মাশুল সংগ্রহ করিয়া সাড়ে চারশো টাকা বেতন” পায়—তখন “শত শত বৎসর পূর্বেকার কোন এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত আর একটা অপূর্ব ব্যক্তি হইয়া উঠিতাম।” ব্যক্তি যেখানে মুক্ত সেখানে সে সম্রাটের মত ঐশ্বর্যবান। তখন সে বাস করে কল্পনার মুক্ত জগতে। তখন মনে হয় “অস্পৃশ্য অগম্য অবাস্তব ব্যাপারই জগতে একমাত্র সত্য”। ব্যক্তি যখন নিঃসঙ্গ সত্তা, তখন সমস্ত বন্ধনহীন গতি তার। চারদিকের সৌন্দর্যের ভাঙা টুকরো কুড়িয়ে সে পূর্ণতর সৌন্দর্যের অভিসারী হয়। নিশীথ স্বপ্নময়ী রাত্রি কখনও তাকে অতীত ইতিহাসের হতভাগ্য রমণীর প্রেমবিহ্বল ব্যর্থ জীবনের সঙ্গী করে। তখনই বাস্তব এসে আঘাত করে—“সব ঝুট হ্যায়।”

সব ব্যক্তির হৃদয়েই এই চিত্তদাহ, এই নিষ্ফল কামনার অভিশাপ। তাই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য অনেক দূরে। “কে দিয়েছে হেন শাপ কেন ব্যবধান”—এই আর্তি ও সেই সৌন্দর্যের অভিসার এই গল্পের প্রাণবস্তু। রূপোজ্জ্বল কল্পনা ও বাস্তবের এই দ্বন্দ্ব এই গল্পটিকে অসাধারণত্ব দিয়েছে।

৮

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে একটি প্রচলিত অভিযোগ আছে যে তিনি সাধারণ জীবনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ নিজেও দুঃখ করেছেন যে হয়ত একদিন তাঁর গল্প বুর্জোয়া লেখকের লেখা বলে পঠিত হবে না। আমাদের সৌভাগ্য

যে বাঙালী রবীন্দ্রনাথের গল্পে আনন্দ পেয়েছে এবং তাঁর লেখায় নিজের জীবনের রূপকে স্পষ্টভাবে ও গভীরভাবে দেখেছে। একথা সত্য যে তিনি সাধারণ মানুষের জীবনের সংগে অতি গভীরভাবে পরিচিত ছিলেন না। কিন্তুএ কথাও সত্য যে তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে পদক্ষেপও করেননি। তাঁর গল্পসাহিত্যে প্রধানত মধ্যবিত্ত বাঙালীসমাজ রূপ পেয়েছে। গ্রামের ও শহরের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তাঁর গল্পের প্রধান পাত্রপাত্রী। কিন্তু গ্রামের সাধারণ মানুষের হৃদয়বেদনাকে তিনি বাস্তববাদী লেখকদের চেয়ে কিছু কম অনুভব করেননি। তাঁর অসামান্য কল্পনাশক্তি দিয়ে সাধারণ গ্রাম্য নরনারীর জীবনের একটু টুকরোকে অসাধারণ মূল্যবান গল্পের উপাদানে পরিণত করেছেন। সাধারণত তিনি আধুনিককালের গল্প ও উপন্যাস লেখকদের মত খুঁটিনাটি বর্ণনা ভালবাসতেন না, কিন্তু গল্পগুচ্ছ তাঁর একমাত্র গ্রন্থ যেখানে তিনি খুঁটিনাটির ওপর অত্যন্ত দৃষ্টি দিয়েছেন। গল্পগুচ্ছের অজস্র বর্ণনায় বাংলার গ্রামজীবন যেমন সার্থকভাবে ফুটেছে তেমন আর কোথাও তিনি সমর্থ হয়েছেন বলে মনে হয় না। বাংলাদেশের প্রকৃতি যেমন বিচিত্র সৌন্দর্য নিয়ে গল্পগুচ্ছে আবির্ভূত হয়েছে, তেমনই বাঙালী জীবনের খুঁটিনাটিও ধরা পড়েছে তাঁর গল্পে।১

১। গল্পগুচ্ছে ব্যবহৃত বিভিন্ন বস্তুর একটি তালিকা প্রস্তুত করা গেল। এই তালিকা থেকে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির ব্যাপকতা ধরা পড়বে। তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর বলে তিনি কিছু বাদ দেন নি।

(ক) গাছ, ফুল ও শস্যাদি : অড়র, অশথ, আউস, আম, আমড়া, আমলকী, ইক্ষু, কচুবন, কদম, করবী, কলা, কলাই কাঞ্চন, কালমেঘ, কাশ, কাঁঠাল, কুল, কুমুদ, কৃষ্ণচূড়া, খেজুর, গন্ধরাজ, গাব, গোলপাতা, গোলাপ, গোলাপ, ঘৃতকুমারী, চাঁপা, ছাতিম, জবা, টগর, জুঁই, ঝাউ, ঝুমকোলতা, তাল, তিসি, তেঁতুল, দেবদারু, ধান, নারিকেল, নিম, নেবু, পদ্ম, পাট, বকুল, বট, বাবলা, বাঁশের ফুল, বাঁশ, বেল, মাকাল, মাধবী, মুচুকুন্দ, মেহেদী, রজনীগন্ধা, লিচু, শরবন, শাল, শিরীষ, শিউলি, শিমুল, শৈবাল, সরিষা, সূর্যমুখী।

(খ) ফল : আম, কালোজাম, কাঁচা তেঁতুল, কাঁচালঙ্কা- কুমড়ো, চালতা, জাম, জারকলেবু, ডাব, তালশাঁস, নারিকেল, পেয়ারা, বেগুন, মানকচু, সুপারি, হরিতকী।

(গ) অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য : অম্বল, আইসক্রিম, আখের গুড়, আচার, আমানি, আমসত্ব, ইলিশ, রুই, কই- কাঁচাগোল্লা, খিঁচুড়ি, ঘি, চা, চাটনি, চানামুঠ, চিঁড়া, চিংড়া, কুন, ছানা, ঝালচচ্চড়ি, ডাল, ডাঁটা, ডিমের কচুরী, তপসেমাছ, তরকারী, তামাক, দধি, দুধ, নুন, পান, পান্তাভাত, পায়েস, বাড়ি, ব্যঞ্জন, ভাত, মাছের ঝোল, মোহনভোগ, রুই, রুটি, লুচি, শাক, সন্দেশ, ক্ষীর।

(ঘ) ব্যবহার্য জিনিসপত্র : আতরদান, আয়না, ওয়াড়, কলম, কাচের, ডিক্যান্টার, কার্পেটের ব্যাগ, কাঁকই, কাঁথা, কাঁসার ঘটি, কেরোসিন ল্যাম্প, খেলনা, গামছা, গামলা, গুড়গুড়ি, গোলাপপাশ, ঘুনসি, চশমা, চিরুনী, পুতুল, চুপড়ি,

বস্তুমুখিতা গল্পগুচ্ছের একটি লক্ষণ এতে কোন সন্দেহ নেই। চরিত্রসৃষ্টির দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথ বাঙালী জীবনকে সর্বতোভাবে প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যখন সবাই ঐতিহাসিক এবং বড় বড় সম্ভ্রান্ত মানুষের চরিত্র সৃষ্টি করছিলেন তখন তিনিই সাধারণ বাঙালীর নিতান্ত সাধারণ সুখদুঃখের কথা বলতে চেয়েছিলেন। 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞে' কন্যাদায়গ্রস্ত বৃদ্ধ পিতা রামেন্দ্রসুন্দর, মেরুদণ্ডহীন বাঙালী সন্তান ও পণলোভী অভিভাবকের চিত্র 'অপরিচিতায়', বাংলাদেশের দুঃশাসন

ছাতা, ঝাঁটা, টিনের প্যাঁটরা, টোপর, ঠোঙা, তক্তাপোষ, তেলের বাটি, তোয়ালে, দা, দোয়াত, ধামা, পানের বাটা, পাশবালিশ, পেরেক, বড়শি, বঁটি, বালতি, বেতের কেদারা, ব্রুশ, বারকোষ, মই, মশলা, মশারী, মাদুর, রবার, রুপার আলবোলা, রেকাবি, লন্ঠন, লোটা, সতরঞ্চ, সাবানের বাক্স, সিন্দুক, হাতপাখা, হাঁড়ি, শিলনোড়া।

(ঙ) **পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গ :** কাক, কাঠঠোকরা, কাঠবেড়ালী, কুকুর, কেঁচো, গর্দভ, গাভী, গিরগিটি, ঘুঘু, ঘোড়া, চিতাবাঘ, চিল, ছাগল, জোনাকী, ঝিল্লী, পাপিয়া, পায়রা, পাঁঠা, ফিঙে, বিড়াল, বাদুড়, ভেক, ভ্রমর, মশক, মাছ, মাছি, মাছরাঙা, রাজহংস, রেশমের গুটি, শালিক, শুকর, শৃগাল, সাপ, হরিণ, হংসশ্রেণী, হস্তী।

(চ) **পরিধেয় :** কেম্বিসের জুতা, খদ্দর, গলবন্ধ, চটি, চাদর, চাপকান, ডুরে শাড়ি, ঢাকাই কাপড়, তসরের চায়না কোট, ধুতি, পারসী কোট, ফুলকাটা কাপড়, ফ্রক, বেনারসী শাড়ি, বুট, মেরজাই, ম্যাকিন্টশ, রুমাল, র‍্যাপার, শাড়ি, স্যাটিনের জামা।

(ছ) **অলংকার :** আসরফির মালা, এয়াররিং, কাঁচের চুড়ি, নোলক, বাজুবন্ধ, মল, লবঙ্গ ফুল, শাঁখা, সিঁথিহার।

(জ) **প্রসাধন দ্রব্য :** এসেন্সের শিশি, কুঙ্কুম, সিঁদুর।

(ঝ) **স্ত্রী-আচার :** আইবুড়োভাত, আড়িপাতা, গায়ে হলুদ, সইসাঙাতি, হুলু।

(ঞ) **ধর্ম, সংস্কার উৎসব সম্পর্কিত :** অগুরু, কালী, কোশাকুশি, কৃষ্ণ, গোড়ের মালা, গোপিনী, চন্দন, চেলি, জন্মাষ্টমী, দুর্গোৎসব, দেওয়ালি, ধুপধুনা, নবান্ন, নামাজ, নামাবলী, পাঁজী, পিঠালিগোলা, বৃন্দাবন, ভগবতগীত, ভাগবত, মঙ্গলঘট, মন্দির, মাদুলি, যক্ষ, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, শিব, শাঁখ।

(ট) **জাতি, বর্ণ, বৃত্তি, উপাধি ইত্যাদি :** অধ্যাপক, উকীল, এজেন্ট, কবিরাজ, কায়স্থ, কুলীন, কৈবর্ত, খাজাঞ্চী, খানসামা, খালাসী, গণক, গোমস্তা, গোয়ালা, ঘাসিয়াড়া, চাষী, জেলে, তাঁতি, দারোয়ান, দারোগা, দালাল, দেওয়ান, ধোপা, নাজীর, নাপিত, নায়েব, ডাক্তার, ডোম, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, পণ্ডিত-মশাই, পাইক, পুরাতন বোতল সংগ্রহকারী, পুলিশ, বরকন্দাজ, বাউল, ব্রাহ্ম, বেদে, বোষ্টুমী, বৈষ্ণব, ভালুক নাচওয়ালা, ভৈরবী, ময়রা, মাস্টার, ম্যাজিস্ট্রেট, ম্যানেজার, মেছুনী, মেথর, মুটে, মুদী, মুন্সেফ, যাত্রাওয়ালা, যোগী, রাখাল, রানার, রায়বাহাদুর, সিপাহী, সিরিস্তাদার, স্যাকরা, সোফার, হরকরা, হাঁড়ি।

গ্রাম্য দারোগা ও হাতুড়ে ডাক্তারের ছবি 'দুর্বুদ্ধি'তে, নির্মম নির্বিকার জমিদার নায়েব নীলকণ্ঠ ও চিরঅত্যাচারিত মধুকৈবর্ত 'হালদার গোষ্ঠি'তে, বিচারালয়ে অতি পরিচিত, অতি সত্যবাদী ভদ্রসাক্ষী রামলোচন 'শাস্তি' গল্পে—সবাই উজ্জ্বল চরিত্র। এই চরিত্রগুলি প্রতিনিধিমূলক চরিত্র বা type চরিত্র। ব্যক্তিচরিত্র সৃষ্টি-গুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা চলে, নারী, পুরুষ ও শিশু।

নারীচরিত্রগুলি সর্বাধিক পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল। তারাপ্রসন্নের কীর্তি' গল্পে তারাপ্রসন্নের স্ত্রী-চরিত্রটি অসাধারণ। তারাপ্রসন্ন গ্রন্থ লিখে চলেছেন কিন্তু তাঁর কোন সম্মান হচ্ছেনা, অর্থ হচ্ছেনা, বরং সংসারের দারিদ্র্য দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। তারাপ্রসন্ন 'বেদান্ত প্রভাকর' নামে গ্রন্থ লিখলেন। স্ত্রীর গহনা বন্ধক পড়ল। বইটির নানা সমালোচনা হল কিন্তু বই বিক্রি হলনা। দুঃখের মধ্যেও স্ত্রী দাক্ষায়নী অবিচলিত। স্বামীর প্রতি তার অটল ভক্তি। তাই মৃত্যুকালে স্বামীকে বলেছেন মেয়ের নাম দিও বেদান্তপ্রভা। সর্বস্বার্থহীন এই পতিপ্রেম দাক্ষায়নী-চরিত্রটিকে একটি বিশেষত্ব দিয়েছে। ভালবাসার জন্য যে সর্বস্ব ত্যাগ তা দেখা গেছে বদ্রাক্তন কুমারীর মধ্যে। নারী তার ধর্ম, তার সংসার সব বিসর্জন দিয়েছে প্রেমাস্পদের জন্যে। কিন্তু পরিশেষে জেনেছে তার প্রেমিকের ব্রাহ্মণ্যত্ব অভ্যাসমাত্র। এক অভ্যাসের পরিবর্তে সে অন্য অভ্যাস গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তবু এক জীবন ও এক যৌবনের পরিবর্তে কী পেতে পারে!

নারীচরিত্রের বিভিন্ন দিকগুলি রবীন্দ্রনাথের নানা গল্পে পূর্ণতা লাভ করেছে। তাঁর 'প্রতিহিংসা' গল্পটি একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ইন্দ্রাণীকে তার প্রভুপত্নী অপমান করেছিল। ইন্দ্রাণীর রূপ ছিল, ইন্দ্রাণীর অহংকার ছিল আর ছিল স্বাতন্ত্র্য। বলাই বাহুল্য প্রভুপত্নীর তা ভাল লাগেনি তাই নানাভাবে তাকে অপমান করেছিল। ইন্দ্রাণী সেই অপমানের প্রতিশোধ নিতে না পেরে মনে মনে আহত ছিল। অবশেষে এল প্রতিশোধ নেবার মুহূর্ত। প্রভু জমিদারী যখন ঋণে আকণ্ঠ মগ্ন, যখন তাদের কোথাও অর্থের সংগ্রহের পথ নেই তখন ইন্দ্রাণী তার সমস্ত অলংকার দিয়ে দিল। এই অলংকার দিয়ে জমিদারী উদ্ধার করে তারপর সে তার প্রভুবংশকে দান করে দিল। প্রতিহিংসা চরিতার্থ হবার পর আর কোন অপমান বেদনা রইল না তার মনে।

(ঠ) **গ্রাম্যবাড়ি, যানবাহন ও পারিপার্শ্বিক :** আটচালা, আঁতুড়ঘর, কলতলা, কাছারী, কুলুঙ্গী, খড়ের স্তূপ, খিড়কী, গোয়ালঘর, গোলা, গোরুর গাড়ি, চতুর্দোলা, চণ্ডীমণ্ডপ, ডোঙা, ঢেঁকিশাল, দালান, নালা, নৌকা, (–গুণ, -দাঁড়, নিশান, পাল, -মাল্লা, মাস্তুল, -হাল), পাঠশালা, পানাপুকুর, পালকী, বাজার, বারান্দা, বোট, বাঁখারির বেড়, ভাঁড়ার, রথতলা, সাঁকো, হাট, হেঁসেল।

(ড) **গান, ব্রত, বাদ্যযন্ত্র :** আগমনী, আলেয়ার রাগিনী, কবি, কাঁসরঘণ্টা, কীর্তন, কোমলগান্ধার, গড়ের বাদ্য, গুপিযন্ত্র, গোলাপ, ঠুংরী, তম্বুরা, দেহতত্ত্বের গান, নহবৎ, নলদময়ন্তী পালা, পাঁচালি, ব্রত, ভৈঁরো, মাদল, সানাই, যাত্রা-গান, বাথানের গান, শ্যামের গান, সাহানা।

নারীর অভিমান ও অপমানবোধের প্রস্তর-কাঠিন্য 'চন্দরা' চরিত্রে। স্বামীকে সে মৃত্যুমুহূর্ত পর্যন্ত ক্ষমা করেনি। 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পে জয়কালী আর একটি বিশিষ্ট চরিত্র। জয়কালী নিষ্ঠাবতী বিধবা। তাঁর মন্দির তাঁর প্রাণ। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র দুইটিই তাঁর সংসারে একমাত্র আত্মীয়। কিন্তু তিনি কঠিন শাসনে তাদের মানুষ করতেন। মন্দিরের কোন অংশে তাদের কোন অত্যাচার ও অনাচার তিনি সহ্য করতেন না। মন্দির প্রাঙ্গণের মাধবীমঞ্জরী চুরির অভিযোগে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে অতি কঠিন ও হৃদয়হীন শাস্তি দিয়েছিলেন। মন্দির ছিল সর্বস্ব। সেখানে কারও প্রবেশ নিষিদ্ধ। তাঁর "যবনকরপক্বকুক্কুটমাংসলোলুপ" ভগিনীপতিকেও তিনি মন্দিরঅঙ্গনে প্রবেশ করতে দেননি। কিন্তু একদিন সেখানে হঠাৎ একটি ভীত ও তাড়িত শূকর এসে আশ্রয় নিল। পশ্চাতে সুরাপানে উন্মত্ত ডোমের দল। পূজারী ব্রাহ্মণ শূকরটিকে তাড়াতে গেলেন। জয়কালী বাধা দিলেন। জয়কালী মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করে দিলেন। তিনি বললেন, "যা বেটারা ফিরে যা। আমার মন্দির অপবিত্র করিস নে।"

"ডোমের দল ফিরিয়া গেল। জয়কালী ঠাকুরানী যে তাঁহার রাধানাথজীউর মন্দিরের মধ্যে অশুচি জন্তুকে আশ্রয় দিবেন, ইহা তাহারা প্রায় প্রত্যক্ষ দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিল না।" এই সুকঠিন নারীর অন্তর হঠাৎ একটি মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সমাজের বিরুদ্ধে তিনি যে কাজ করলেন তাতে তাঁর অন্তরের নিহিত উদারতা ব্যক্ত হল।

নারীচরিত্রগুলির মধ্যে যে ব্যাপকতা, জটিলতা এবং আকর্ষণীয়তা দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের পুরুষচরিত্রগুলির মধ্যে তা অপেক্ষাকৃত কম। তাঁর প্রতিনিধিমূলক পুরুষচরিত্রগুলি স্বল্পকথায় চিত্রিত এবং উজ্জ্বল। তাঁর ব্যক্তি পুরুষচরিত্রগুলি তেমন উজ্জ্বল নয়। শিবনাথ পণ্ডিতের মধ্যে নির্দয়তা, ঠাকুরদাদার হাস্যোজ্জ্বল মূর্তি কিংবা 'মেঘ ও রৌদ্রে'র শশিভূষণের উদাসবিষাদ খুবই চমৎকারভাবে ফুটেছে তাঁর অনেক পুরুষচরিত্রের মধ্যে দেখা যায় চরিত্রের ভারসাম্যহীনতা। পুরুষেরা বিশ্বচিন্তায় মগ্ন, কাছের জিনিসকে অবহেলা করে, হাতের নিকটে যা আছে তার প্রতি উদাসীন। পরে হঠাৎ আবিষ্কার করে যে এই কাছের জিনিস জীবনে সবচেয়ে মূল্যবান। এই উদাসীনতার মূল্য দিতে হবে সারাজীবনেব বেদনায়। 'একরাত্রি' গল্পে নায়ক সেকেণ্ডমাষ্টার অনুভব করে সুরবালা আজ আর কেউ নয়, কিন্তু সুরবালা তার কীই-না হতে পারত। 'মেঘ ও রৌদ্রে'র শশিভূষণ হঠাৎ বুঝতে পারে তার জগৎ ছোট, তার আনন্দ বেদনা হাতের কাছেই—"সেই ক্ষুদ্র গরাদে-দেওয়া ঘর, সেই অসমতল গ্রাম্যপথ, সেই ডুরে-কাপড়-পরা ছোটো মেয়েটি। এবং সেই আপনার শান্তিময় নিশ্চিন্ত নিভৃত জীবনযাত্রা।"

'নষ্টনীড়ের' ভূপতি কিংবা 'মানভঞ্জনে'র গোপীনাথ উদাসীনতার ফলে তাদের

দাম্পত্যজীবনকে ব্যাহত করেছে। পুরুষচরিত্রের তিনটি বিশিষ্ট সৃষ্টি মোহিত-মোহন, কেশরলাল ও মাস্টারমশায়। বনোয়ারীলাল আর একটি অন্যতম চরিত্র, ব্যক্তিত্বের গৌরব ও বাধাপ্রাপ্ত যৌবনের সংগ্রামী চেতনার জন্য সে গল্পগুচ্ছের জন-সমুদ্রে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

গল্পগুচ্ছের চরিত্রগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করলে রবীন্দ্রনাথের চরিত্র-সৃষ্টির বৈচিত্র্য আরো স্পষ্ট হবে। গল্পগুচ্ছের মোট চরিত্রসংখ্যা আনুমানিক ঃ ২৩২। পুরুষচরিত্র ১৫০, নারীচরিত্র ৮২। যদিও নারীচরিত্র কম তবুও নারী-চরিত্রগুলি অধিক উজ্জ্বল। শিশুচরিত্র নারী ও পুরুষ উভয় শাখার মধ্যেই ব্যাপ্ত। শিশুচরিত্রেও বালিকাগুলি অধিক উজ্জ্বল। পোস্টমাস্টার গল্পের 'রতন' বা 'মেঘ ও রৌদ্রে' গিরিবালা, বা 'দুর্বুদ্ধি' গল্পে হাতুড়ে ডাক্তারের কন্যা—প্রত্যেকটিই অতি উজ্জ্বল চরিত্র। রবীন্দ্রসাহিত্যে দেখা-যায় শিশু বালিকার একটি-দুটি উক্তি মানুষের জীবনে বিরাট বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এসেছে।১ পাড়াগাঁয়ে হাতুড়ে ডাক্তার ও দারোগা দুজনে মিলে এক পাপচক্রের প্রতিষ্ঠা করেছিল। দয়া নেই, মায়া নেই, শুধু অর্থলোভ, শুধু অমানুষিক অত্যাচার। এক বুড়ো এসে যখন ডাক্তারকে ডাকল তখন ডাক্তার কিছুতেই যাবে না। দরিদ্র বৃদ্ধ পায়ে ধরে কাঁদতে লাগল। তখন ডাক্তারের মেয়ে সরলমনে প্রশ্ন করেছিল, "বাবা ঐ বুড়ো তোমার পায়ে ধরে কাঁদে কেন?" এই কথাটায় হঠাৎ সেই হাতুড়ের মনে ক্ষণিকের জন্য মনুষ্যত্ব অর্থাৎ "দুর্বুদ্ধি" হয়েছিল।

শিশুর যে বেদনা তাকে বয়স্ক অনুভব করতে পারে না। শিশুর যে অপমানবোধ তা বয়স্ক জানে না। 'গিন্নী' গল্পে তীক্ষ্ম বিদ্রূপশীল পণ্ডিতমশাই শিশুহৃদয়কে নির্মমভাবে আহত করেছে। বালকের হৃদয়ে যে গভীর অপমানবোধ ও জ্বালা তা বোঝার ক্ষমতা তার নেই। 'আপদ' গল্পে নীলকান্তের চরিত্রটি এই কারণেই অসাধারণ। সে সমবয়স্ক সতীশকে জব্দ করার জন্য তার দোয়াত চুরি করেছিল। তাকে তাই সবাই চোর ভাবল। "কেমন করিয়া বুঝাইবে। সে চোর নয়, সে চোর নয়! তবে সে কী। কেমন করিয়া বলিবে সে কী। সে চুরি করিয়াছে কিন্তু সে চোর নহে...।" এই বেদনাই বালকের বেদনা। 'বলাই' গল্পের মধ্যে "বলাই অনেকদিন থেকে বুঝতে পেরেছিল, কতগুলো ব্যথা আছে যা সম্পূর্ণ ওর, একলারই ওর চারিদিকের লোকের মধ্যে তার কোন সাড়া নেই।' 'চিত্রকর' গল্পের চুনিলালও ওই নীরব বেদনায় বেদনার্ত। রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের অধিকাংশ শিশুই ব্যথিত, বেদনার্ত এবং মানুষের কাছে তাদের হৃদয়ের বোধ অসমর্থিত। 'ইচ্ছাপূরণ' গল্পটি

১। দ্রষ্টব্য ঃ প্রমথনাথ বিশী ঃ পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬২।

এর উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বয়স্কদের স্থৈর্য ও শিশুর চাঞ্চল্য যে বয়োধর্ম এ কথা অনেক বয়স্ক বোঝেন না। সেইজন্যেই এই হাস্যোজ্জ্বল কৌতুক গল্পটির অবতারণা। পুত্র ভাবত সে যদি পিতার মত বড় হত তাহলে সে খেয়ালখুশি মত ঘুরত, ফিরত, ছুটত, খেলত। আর পিতা ভাবত সে যদি একবার বাল্যাবস্থা ফিরে যায় তাহলে খুব ভাল করে লেখাপড়া করত। ঈশ্বর তাদের প্রতি সদয় হলেন। কিন্তু তারা কেউই তাদের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারল না। শৈশবের চাঞ্চল্য ও বয়সের জড়তা দুজনকে যথাপথেই চালিত করল।

চরিত্রসৃষ্টির ব্যাপকতা ও কুশলতা এবং বস্তুনিষ্ঠার প্রমাণ গল্পগুচ্ছের সর্বত্র। রবীন্দ্রনাথের গল্পে যাঁরা বস্তুনিষ্ঠার অভাব দেখেন তাঁরা যে ভ্রান্ত তা স্পষ্টই বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষেত্রে অনেকগুলি গল্পে ব্যর্থ হয়েছেন তার কারণ তাঁর গীতিকবিজনোচিত মনোভাব নয়, তা গল্পের গঠনজনিত দোষ। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর কোন কোন গল্পে ভাবালুতা দোষ এসেছে, অনেকক্ষেত্রে কাহিনী যেখানে শেষ হওয়া উচিত ছিল তারপরেও কিছুক্ষণ লিখেছেন, কখনও কখনও তিনি কাহিনীর ঐক্য রচনা করত পারেন নি। তাঁর 'সদর ও অন্দর', 'উদ্ধার', 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ', 'দুর্বুদ্ধি' ইত্যাদি গল্প অপূর্ণাঙ্গ। 'পোস্টমাস্টার' বা 'সমস্যাপূরণ' গল্পের প্রকৃত শেষ হবার পরও তিনি একটি করে অনুচ্ছেদ সংযোজন করেছেন যা আরো সংক্ষিপ্ত হলে ভাল হত। 'কর্মফল' বা 'পণরক্ষা'র শেষে করুণরসের আধিক্য গল্পের কোন উন্নতি করতে পারেনি। আবার 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে গঠনের ঐক্য রচিত হয়নি। কিন্তু এই ত্রুটিগুলি দ্বারা তাঁর গল্পরচনার শক্তির কোন মূলে দুর্বলতা সূচিত হয় না। বহু গল্প যাঁরা রচনা করেছেন তাঁদের সব গল্প সমান সার্থক নাও হতে পারে। যেখানে তিনি সার্থক সেখানে লক্ষ্য করা যাবে তিনি কাহিনীর মধ্যে কোথাও কবিত্বের আতিশয্য প্রকাশ করেননি ও কাহিনীর একমুখিনতাকে ঘটনা বাহুল্যের দ্বারা ক্ষুণ্ণ করেননি।

৯

গল্পগুচ্ছের গল্পগুলির গঠনপ্রণালী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম সার্থকভাবে ছোটগল্পের গঠন বাংলায় আনেন। তাঁর একশ্রেণীর কাহিনী ঘটনাবিরল, চরিত্রবিরল—ও অনুভূতি বা আবেগ প্রধান। যেমন ক্ষুধিত পাষাণ বা পোস্টমাস্টার। দ্বিতীয় শ্রেণীর কাহিনীগুলি চরিত্রপ্রধান। চরিত্র-গুলির বৈশিষ্ট্য বা চরিত্রের কোন অজ্ঞাতপূর্ব আভাস গল্পগুলিকে উপভোগ্য করে। যেমন কাবুলিওয়ালা বা খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন। তৃতীয় শ্রেণীর কাহিনীগুলি পরিকল্পনা প্রধান। এই কাহিনীতে সমস্ত বিস্ময় ও রহস্য জমা থাকে কাহিনীর

শেষে। যেমন 'সমস্যাপূরণ', 'বিচারক' বা 'প্রায়শ্চিত্ত' বা 'অধ্যাপক'। চতুর্থ শ্রেণীর কাহিনীগুলিতে নিতান্তই গল্প (এবং তার সঙ্গে কিছু কিছু সমস্যা জড়িত থাকে)। ঠাকুরদাদা বা দালিয়া বা দেনাপাওয়া জাতীয় গল্প। এই চারটি ধরণের গঠন রবীন্দ্রনাথের গল্পে প্রধান।

প্রত্যেকটি শ্রেণীতেই রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু ভাল গল্প আছে। তবে সাধারণত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গঠনই তাঁর অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ গল্পের জন্ম দিয়েছে। কখনও গঠনের দুর্বলতা তাঁর অনেক সম্ভাব্য ভাল গল্পের ক্ষতি করেছে। তাঁর 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের মধ্যে দেখা যায় কখনও আবেগ ও অনুভূতি প্রাধান্যমূলক গঠন আবার কখনও চরিত্র ও ঘটনাসংঘাতমূলক গঠন—ফলে গল্পটি কেন্দ্র ভ্রষ্ট হয়েছে। 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' গল্পটি ধরা যেতে পারে। গল্পটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন একটি পত্রিকায় সমালোচনা হয়েছিল যে "আমরা রবীন্দ্রবাবুর খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন পড়িতে আরম্ভ করিয়া যেমন আমোদ পাইয়াছি, উপসংহারে তেমনই নিরাশ হইয়াছি। এই গল্পটির আরম্ভ ভাগ অতি মনোহর, বেশ স্বাভাবিক।... কিন্তু যখন রাইচরণ নিজের বুড়ো খোকাটিকে মুনসেফবাবুর সেই আদুরে খোকা বলিয়া আনিয়া দিতেছে, তখন আমাদের কেমন অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। মুনসেফবাবু যেন গল্পটি শেষ করিবার জন্যই সন্দেহ সংশয় জলাঞ্জলি দিয়া পরের ছেলেটিকে নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। এইজন্য গল্পটি...কষ্টকল্পিত বলিয়া বোধ হয়।"১

পরবর্তীকালেও কোন কোন সমালোচক এই একই অভিযোগ করেছেন। শ্রীযুক্ত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্যে ছোটগল্প' গ্রন্থেও গল্পটিকে অস্বাভাবিক বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে এই গল্পটি গঠনদোষের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গল্পটির চমৎকারিত্ব রাইচরণের আত্মত্যাগে। কিন্তু সেই চরিত্রটির মহানুভবতা দেখাবার জন্য লেখক কাহিনীর শেষে একটি চমক দিতে চেয়েছেন। অর্থাৎ শেষ অংশ পড়লে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর গঠন পূর্বকল্পিত অর্থাৎ কাহিনীর শেষ স্থির করে নিয়ে তারপর লেখা হয়েছে। শেষের ঘটনাটিকে মেলাবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে ঘটনার মধ্যে অনেক অস্বাভাবিকতাকে নিতে হয়েছে।

গঠনের সঙ্গে আঙ্গিকের প্রশ্ন ওঠে। রবীন্দ্রনাথ গল্প রচনা করায় অনেকগুলি আঙ্গিক অবলম্বন করেছেন। (১) কাহিনীটি তিনি বর্ণনা করেছেন (২) কাহিনীটির আরম্ভ করেছেন লেখক—পরে গল্পের নায়ক কাহিনীটি উত্তমপুরুষে বলে গেছেন; যেমন নিশীথে। (৩) পুরো কাহিনীটিই উত্তমপুরুষে বলা যেমন, অধ্যাপক

১। সাহিত্য, পৌষ, ১২৯৮ পৃঃ ৪৬২-৬৩

(৪) কাহিনীটি চিঠির আকারে লিখিত, যেমন স্ত্রীর পত্র (৫) কতকাংশ বর্ণনা ও কতকাংশ চিঠি, যেমন দর্পহরণ (৬) নাট্যাকারে বর্ণিত, যেমন কর্মফল (৭) রূপকথা বা রূপকথার ছলে কয়েকটি গল্প, যেমন একটি আষাঢ়ে গল্প।

এই আঙ্গিকের মধ্যে উত্তমপুরুষে গল্পবলার রীতি বাংলা সাহিত্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই রীতি রবীন্দ্রনাথের পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র ব্যবহার করেছেন। এই রীতির গুণ ও দোষ দুইই আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তত একটি গল্প এই আঙ্গিকে লিখতে গিয়ে সম্পূর্ণভাবে গল্পটিকে বিনষ্ট করেছেন। গল্পটির নাম 'অধ্যাপক'। নায়কের অপদার্থতা ও অপমান গল্পের কেন্দ্র—কিন্তু নায়ক যে ভাষায় নিজেকে ব্যঙ্গ করে ও যে ভাষায় নিজের মনের সূক্ষ্ম ভাবকে নিপুণভাবে প্রকাশ করে তাতে মনে হয় সে আর একটি অন্য ব্যক্তি। এই গল্প লেখকের বিবৃতি-মূলক হলে স্বাভাবিক হত। এই সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের গঠন ও আঙ্গিক প্রধানত সার্থক। তিনি কখনই পাঠককে চমক দিয়ে বিমূঢ় করতে চাননি, উচ্ছ্বাসে বিহ্বল করতে চাননি, স্বাভাবিকভাবে গল্পগুলি বিকশিত হয়েছে। (আমাদের জীবনের সুখদুঃখের পরিচিত কথা ও পরিচিত পৃথিবী বার বার তাঁর গল্পের উপাদান হয়ে এসেছে। অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত তাঁর গল্প সাহিত্যে বিরল। তাঁর গল্পের মূল সুর তাঁর কথায় বলা চলেঃ)

> ফাল্গুনের এ আলোয় এই গ্রাম ওই শূন্য মাঠ
> ওই খেয়াঘাট
> ওই নীল নদী রেখা, ওই দূর বালুকার কোলে
> নিভৃত জলের ধারে চখাচখী কাকলী-কল্লোলে
> যেখানে বসায় মেলা — এই সব ছবি
> কতদিন দেখিয়াছে কবি।
> শুধু এই চেয়ে দেখা, এই পথ বেয়ে চলে যাওয়া
> এই আলো, এই হাওয়া
> এই মত অস্ফুট ধ্বনির গুঞ্জরণ
> ভেসে যাওয়া মেঘ হতে
> অকস্মাৎ নদীস্রোতে
> ছায়ার নিঃশব্দ সঞ্চরণ,
> যে আনন্দ বেদনায় এ জীবন বারে বারে করেছে উদাস
> হৃদয় খুঁজিছে আজি তাহারি প্রকাশ॥

সপ্তম পরিচ্ছেদ

॥ বিদেশী গল্পের সঙ্গে যোগ ॥

বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্পের গঠনপর্বে বিদেশী সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল প্রত্যক্ষ।[১] প্রায় সকল সমকালীন ছোটগল্পকারদের সঙ্গেই বাঙালী লেখকদের পরিচয় ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত বাঙালীদের কাছে ইংরেজি সাহিত্যপাঠ নিত্যকর্মবিশেষ ছিল তাই তখনকার কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা তথা রাজনীতি ও সমাজনীতিও ইংরেজী চিন্তায় প্রভাবিত। মধুসূদন কবিতার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে ইউরোপীয় কাব্য থেকে ভাব ও রূপ দুই-ই গ্রহণ করেছিলেন। উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র সমকালীন ইংরেজ উপন্যাস-রচয়িতাদের কাছে বিশেষ ঋণী। বিশেষ করে স্কট, কলিন্স বা লর্ড লিটনের নাম তিনি নিজেই করেছেন। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রভাব সূক্ষ্মভাবে এসেছিল। উপন্যাস বা কবিতার মত এত প্রত্যক্ষ নয়।

ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় ইংরেজিতেও ছোটগল্প পূর্ণভাবে বিকশিত হয়নি। অষ্টাদশ শতক থেকেই অবশ্য স্টীল, অ্যাডিসন বা গোল্ডস্মিথের লেখার গল্পের আভাস সূচিত হয়েছে। ইংরেজী ছোটগল্পের ইতিহাস লেখকেরা গল্পের উৎস খুঁজতে গিয়ে চসারের Canterbury Tales-এও ছোটগল্পের সম্ভাবনা দেখেছেন। তাছাড়া ইংলণ্ডের প্রাচীন কথাসাহিত্যেও (A Hundred Merry Tales, Titus and Gisippus, The Fish wife of Strand-on-the Green ইত্যাদি) তার প্রেরণা জুগিয়েছিল। তবে ড্যানিয়েল ডিফোর (১৬৫৯-১৭৩১) হাত থেকে সমকালীন ইংলণ্ডবাসী গল্পরস পেয়েছিল। তাঁর *Journal of the Plague Year* এর মধ্যে অজস্র কাহিনী আছে। *The Apparition of Mrs. Veal* নামে একটি ভূতের গল্প এককালে ইংলণ্ডে আলোড়ন তুলেছিল। অষ্টাদশ শতকে কথাসাহিত্যের প্রবণতা আরো বেশীভাবে দেখা দিল। হেনরী ফিল্ডিং (১৭০৭-১৭৫৪)-এর *History of the Adventures of Joseph Andrews and his friend Abraham Adams* এবং রিচার্ডসন (১৬৮৯-১৭৬১)-এর *Pamela* (১৭৪০)র মধ্যে কথাসাহিত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে

১। এই পরিচ্ছেদে বিদেশী গল্পগুলির উৎস সম্পর্কে যদি কোন মন্তব্য না থাকে তাহলে *The Masterpiece Library of Short Stories* (২০ খণ্ড) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে মনে করতে হবে। অতঃপর এই গ্রন্থ *MLS* নামে উল্লেখ করা হবে।

কথাসাহিত্যের জয়যাত্রা শুরু হল। তার প্রধান নায়ক হলেন উইলিয়াম মেকারপিশ থ্যাকারে (১৮১১-১৮৬৩) আর চার্লস ডিকেন্স (১৮১২-১৮৭০) এ'রা দুজনেই উপন্যাসের ক্ষেত্রে যেমন দিক্‌পাল তেমনই ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও উৎসাহী অগ্রসূরী। এ'দের যখন মৃত্যু হয় তখনও বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্প আবির্ভূত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তখন বালকমাত্র।

ইংরেজি ছোটগল্প উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে পূর্ণতা লাভ করেছে। উনবিংশ শতকের গোড়ায় সমুদ্রের অপর পারে আমেরিকায় ছোটগল্প জন্মলাভ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে উনবিংশ শতাব্দীই ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকায় কথাসাহিত্যের জন্মকাল। ওয়াশিংটন আর্ভিং (১৭৮৩-১৮৫৯), অগাস্টাস বি লংস্ট্রিট (১৭৯০-১৮৬৪), ন্যাথানিয়েল হর্থোন (১৮০৪-১৮৬৪) আমেরিকান ছোটগল্পের প্রধান শিল্পীদের অন্যতম। ছোটগল্প সার্থক রূপ লাভ করে এডগার অ্যালান পো (১৮০৯-১৮৪৯)-র হাতে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর বিশ্ব-পরিচয় ইংরেজির মাধ্যমে। ইংরেজি অনুবাদেই কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের কথা বাঙালী জানতে পায়। ইংরেজি ছাড়া অন্য কোন ইউরোপীয় ভাষা জানতেন এমন বাঙালীর সংখ্যা তখন মুষ্টিমেয় ছিল। কাজেই ফরাসী বা রুশীয় ছোটগল্পের কথা বাঙালী ইংরেজির মাধ্যমেই জানতে পারে। ইংরেজি ও আমেরিকান সাহিত্যের মতই কন্টিনেন্টাল সাহিত্যেও উনবিংশ শতাব্দীই কথাসাহিত্যের স্বর্ণযুগ।

ফরাসীদেশে ছোটগল্পের আদিরূপ বহুকাল থেকেই পরিচিত। বহু লেখক ও শিল্পীর পরিচর্যায় এই সাহিত্যরূপটি ফরাসীদেশে বিশেষ মহিমা অর্জন করেছিল। স্তাঁধাল (১৭৮৩-১৮৪২), আলফ্রেড দ্য ভিনি (Alfred De Vigny) (১৭৯৭—১৮৬৩), অঁনরে দ্য বালজাক (১৭৯৯-১৮৫০), ভিক্‌তর উগো (১৮০২-১৮৮৫), প্রসপের মেরিমে (১৮০৩-১৮৭০) ছোটগল্পকে এক পরিণত শিল্পসৃষ্টিতে উন্নীত করেছিলেন। যদিও সাধারণত মপাঁসা ফরাসী গল্পের সঙ্গে প্রায় অচ্ছেদ্য নাম হয়েছেন তবুও ফরাসী সাহিত্যে মপাসাঁর আবির্ভাবের পূর্বেই বহু শক্তিমান শিল্পীর আবির্ভাব হয়েছে। আলেকজান্দ্র দুমা (১৮০৩-১৮৭০), আলফ্রেড দ্য মুসে (১৮১০-১৮৫৭), থিওফিল গতিএর (১৮১১-১৮৭২), আলফঁস দোদে (১৮৪০-১৮৯৭), এমিল জোলা (১৮৪০-১৯০২) ছোটগল্পের ক্ষেত্রে স্মরণীয় নাম। গি্য দ্য মপাসাঁ (১৮৫০-১৮৯৩) এ'দের সর্বকনিষ্ঠ যদিও ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব পৃথিবীব্যাপী।

ইংরেজি, আমেরিকান ও ফরাসী সাহিত্যের পাশেই স্থান দাবী করে রাশিয়ার ছোটগল্প লেখকরা। উনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ায় কথাসাহিত্যের স্বর্ণযুগ। এখানে তখন পুশকিন, ডস্টোয়েভস্কি বা টলস্টয় উপন্যাস রচনায় যেমন অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছেন ছোটগল্প রচনাতেও পুশকিন (১৭৯৯-১৮৩৭), গোগোল (১৮০৯-

১৮৫২), টুর্গেনিএফ্ (১৮১৮-১৮৮৩), টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০), চেখব (১৮৬০-১৯০৪) প্রভৃতি লেখকরা সিদ্ধ। উনবিংশ শতাব্দীতে এই চারটি সাহিত্যের ছোট-গল্পের প্রচেষ্টা ছিল বাংলা ছোটগল্পের পটভূমি। এই সাহিত্যগুলির ছোটগল্প শাখার আলোচনার স্থান এখানে নয়। এ'দের প্রভাবও সমান নয়। কিন্তু বাঙালী লেখকরা ধীরে ধীরে এইসকল লেখকের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিলেন ও এ'দের কাছ থেকে তাঁরা শিক্ষা করছিলেন। এই প্রভাব দু'ভাবে অনুসন্ধান করা যেতে পারে। যাঁরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল লেখক তাঁরা এইসব শক্তিশালী লেখকের গল্পের বিষয়বস্তু বা আঙ্গিকের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দিকটিকেই গ্রহণ বা অনুকরণ করেছেন। যাঁরা অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী লেখক তাঁরা আঙ্গিকের কৌশলকে লক্ষ্য করেছেন ও নিজের মধ্যে মিশিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু এই প্রভাব অনুসন্ধানের পূর্বে বাংলা ছোটগল্পের সঙ্গে তৎকালীন বহির্বিশ্বের ছোটগল্পের অর্থাৎ বাংলাগল্পের সঙ্গে তার বৃহত্তর পটভূমিকার যোগ ছিল কতটুকু তা দেখতে হবে।

নীচের এই তুলনামূলক 'চার্ট' থেকে সমকালীন ইউরোপীয় ছোটগল্পকারদের জানা যাবে।

ইংরেজী	আমেরিকান	ফরাসী	রাশিয়ান	বাংলা
ডিফো (১৬৫৯-১৭৩১)				
ফিল্ডিং (১৭০৭-১৭৫৪)	আর্ভিং (১৭৮৩-১৮৫৯)	স্তাঁধাল (১৭৮৩-১৮৪২)	পুশকিন (১৭৯৯-১৮৩৭)	
থ্যাকারে (১৮১১-১৮৬৩)	ন্যাথানিয়েল হথর্ন (১৮০৪-১৮৬৪)	বালজাক (১৭৯৯-১৮৫০)	গোগোল (১৮০৯-১৮৫২)	
ডিকেন্স (১৮১২-১৮৭০)	অ্যালানপো (১৮০৯-১৮৪৯)	মেরিমে (১৮০৩-১৮৭০)	লারমেন্টফ (১৮১৪-১৮৪১)	
কলিন্স (১৮২৪-১৮৮৯)	হ্যারিএট বীচারস্টো (১৮১২-১৮৯৬)	দ্যুমা (১৮০৩-১৮৭০)	তুর্গেনিয়েভ (১৮১৮-১৮৮৩)	
হার্ডি (১৮৪০-১৯২৮)	ব্রেট হার্ট (১৮৩৯-১৯০২)	জোলা (১৮৪০-১৯০২)	ডস্টয়েভস্কী (১৮২২-১৮৮১)	
ওয়াইল্ড (১৮৫৬-১৯০০)	হেনরী জেমস (১৮৪৩-১৯১৬)	মপাসাঁ (১৮৫০-১৮৯৩)	টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০)	
কোনানডয়েল (১৮৫৯-১৯৩০)	ও হেনরী (১৮৬২-১৯১০)	আনাতোল ফ্রাঁস (১৮৪৪-)	চেখব (১৮৬০-১৯০৪)	রবীন্দ্রনাথ (১৮৬০-১৯৪১)

বিদেশী ছোটগল্পকারদের প্রধানদেরই শুধু নাম করা হল। এর থেকে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে যখন ছোটগল্প লেখা শুরু হয়েছে তার পূর্বেই এই চারটি প্রধান সাহিত্যে ছোটগল্প রচনা পরিণতি লাভ করেছে। পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনে ঠাকুরবাড়ি ছিল সবচেয়ে অগ্রণী। বিদেশী ছোটগল্প অনুবাদের ক্ষেত্রেও তাই ঠাকুরবাড়ি এগিয়ে এসেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সমকালীন ইউরোপীয় গল্পধারার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ইংরেজি ও ফরাসী দুটি ভাষাই তিনি জানতেন। তিনি ফরাসী থেকে গতিয়ের-এর উপন্যাস অনুবাদ করেন। মলিয়ের-এর নাটক অনুবাদ করেন। আর করেছিলেন বহু ছোটগল্প। নিম্নলিখিত ছোটগল্প লেখকদের অনুবাদ তিনি করেন।

ইউজিন দোরিয়াক
ইউজিন মরে
এমিল গেবোরিয়ন
এমিল জোলা
কনস্ট্যান্ট গুরোস্ট
গ্যাব্রিয়েল মার্ক
শার্ল-গোলেট
আলফাঁস দোদে
গুর্দন দা জোনোনিলাক
দুমা
লিওলাপের
বালজাক
মপাসাঁ
পল ফেবেল
ভালোয়ারে
প য়্যুদেল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নানা গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। এই অনুবাদ থেকে বোঝা যায় বাঙালী লেখকেরা ক্রমে ক্রমে ইংরেজির মাধ্যমে অন্যান্য দেশের গল্পসাহিত্য সম্পর্কে কৌতূহলী হচ্ছিলেন। একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল ঃ

১। **তামাকের পাইপ : রাজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** ডিকেন্সের পিকউইক পেপারর্স অবলম্বনে	প্রদীপ	১৩০৬ শ্রাবণ পৃঃ ২৬৮-২৭৪
২। **আয়না :** হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ইংরেজি থেকে অনুবাদ	সাহিত্য	১২৯৮ অগ্রহায়ণ পৃঃ ৫৫০
৩। **আত্মদান :** (বিদেশী গল্প) অজ্ঞাত	ঐ	১৩০৬ আশ্বিন পৃঃ ৩০৯-৩১৫
৪। **নিয়ম এবং অনিয়ম** ইত্যাদি : উপেন্দ্রকিশোর রায় Parables from Nature অবলম্বনে	সখা	১৮৮৩ ১ম ভাগ ১ম সং পৃঃ ১৭৯-১৮৪
৫। **পাথরভাঙা কুলী :** হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ জাপানদেশীয় উপকথা	মুকুল	১৩০২ আষাঢ় ১ম বর্ষ, ১ম ভাগ পৃঃ ২৩
৬। **আবুকরিমের চটিজুতা :** হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তুরস্কদেশীয় গল্প	ঐ	পৃঃ ৯১
৭। **হাতকাটা মেয়ে :** সম্পাদক জার্মান দেশীয় উপকথা	ঐ	পৃঃ ১০৪
৮। **হংসরূপী রাজপুত্র** ডেনমার্কদেশীয় উপকথা	ঐ	পৃঃ ১৬৮
৯। **জীবনোপায় :** অপূর্বচন্দ্র দত্ত টলস্টয়ের গল্প	দাসী	১৮৯৫, এপ্রিল ৪র্থ বর্ষ
১০। **ফুলদানী :** প্রমথনাথ চৌধুরী প্রসপের মেরিমির গল্প	সাহিত্য	১২৯৮, আশ্বিন পৃঃ ২৫৩
১১। **সমুদ্রসলিলে :** উইনস্টন স্পেন্সার চার্চিল	ঐ	১৩০৬ বৈশাখ পৃঃ ৬৪-৬৬
১২। **একতাড়া চিঠি :** মন্মথ সেন মরিৎজ জোকিল রচিত হাঙ্গেরিয়ান গল্পের ইংরেজি অনুবাদ	ঐ	১৩০৭ কার্তিক পৃঃ ৪০৭-১৭
১৩। **যাত্রাপথে :** মপাসাঁর গল্প	সাহিত্য	১৩০৭ অগ্রহায়ণ পৃঃ ৫০২-০৯

এই সময়ের মধ্যে অনুবাদের পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করতে পারলে আরো স্পষ্ট-ভাবে বক্তব্য বলা যেতে পারত। উপন্যাস অনুবাদ হয়েছে বেশী। কিন্তু ছোট-গল্পের অনুবাদ খুব বেশী হয়নি। পরে টলস্টয়ের অনুবাদ হয়েছে যথেষ্ট।১ ভল্‌-টেয়ারের লেখাও অনুবাদ হয়েছে।২ পরবর্তীকালে কিছু আমেরিকান গল্প ও ফরাসী গল্প অনুবাদ হয়।৩

এই তথ্যগুলি অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণ করে যে বাংলা ছোটগল্পের লেখকরা গোড়া থেকেই বিদেশী ছোটগল্প সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। **সাহিত্য** পত্রিকায় সমকালীন ছোটগল্প তথা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হত। ১৩০৬ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে কিপলিং সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা প্রকাশিত হয়। কিপলিং-এর ভারতবর্ষের পটভূমিকায় লেখা গল্পগুলি সম্পর্কে লেখক আলোচনা করেছেন। এই সংখ্যাতেই বিলিতি পত্রিকা Harmsworth Magazine থেকে 'মহিলা ডিটেকটিভ' নামে একটি গল্প ছিল। আশ্বিন মাসের আলোচনার বিষয় ছিল জাপানী সাহিত্য। কার্তিকে টলস্টয় সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ফাল্গুনের প্রবন্ধটি আরো কৌতুহলোদ্দীপক। বর্তমান সময়ের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শার্লটি ব্রন্টি, জর্জ এলিয়ট ও হামফ্রে ওয়ার্ড এই আলোচনায় দীর্ঘস্থান অধিকার করেছে। ১৩০৬-এর বৈশাখে বর্তমানে বিখ্যাত স্যার উইনস্টন চার্চিলের

১। ১৯১৩ খৃঃ অব্দ টলস্টয়ের গল্পবিংশতি—চারুচন্দ্র গুহ, ঢাকা
১৯১৯ খৃঃ অব্দ টলস্টয়ের অল্প—দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা
১৯২৩ খৃঃ অব্দ সপ্তর্ষি—শিশিরকুমার মিত্র, শিশুতোষ সিরিজ
১৯২৪ খৃঃ অব্দ বোকা আইভান—............শিশুতোষ সিরিজ
১৯২৩ খৃঃ অব্দ লোভের উৎপত্তি—শিশিরকুমার মিত্র, শিশুতোষ সিরিজ
অন্নদাশঙ্কর রায় টলস্টয়ের গল্প অনুবাদ করেন প্রবাসীতে ১৩২৬-২৭ বঙ্গাব্দে

২। **'কতদূরে'**ঃ ভারতবর্ষ (১৩২২ আষাঢ়-অগ্রহায়ণ) ৩য় বর্ষ ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৭

৩। সুধাংশুকুমার রায়চৌধুরী ঃ মার্কটোয়েনের কিছু গল্প অনুবাদ করেন ও গল্পগুচ্ছ নামে প্রকাশিত হয়।
আইন কলেজের অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র বাগচী ফরাসী থেকে অনেক গল্প অনুবাদ করেন।

একটি গল্প ছিল—যদিও তখন তিনি বিখ্যাত হননি এবং স্যারও হননি।১ অর্থাৎ তখন শুধুই যে বিখ্যাত লেখকদের লেখাই বাঙালীসমাজে পঠিত হত তাই নয়, সাহিত্য ক্ষেত্রে নবাগত লেখকদের কথাও তাঁরা জানতেন। এমনকি ছোটগল্প সম্পর্কে যেখানে যেখানে আলোচনা প্রকাশিত হত তাও পড়তেন। তার একটি প্রমাণ নিম্নের উদ্ধৃতি। 'সাহিত্য' পত্রিকার একটি সংখ্যায় আমেরিকান গল্প লেখক ব্রেট হার্টের জীবনী বেরিয়েছিল। তাঁর গল্প সম্পর্কে সাহিত্য সম্পাদক মন্তব্য করেন যে "তাঁহার এক একটি ছোট গল্প ভাষার লালিত্যে, রচনার মাধুর্যে, কল্পনার প্রাখর্যে ও ঘটনার বৈচিত্র্যে হৃদয়ে বহুদিন স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া যায়।" এই লেখক "করন-হিল ম্যাগাজিন" নামক পত্রিকায় ছোটগল্পের সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার মর্মানুবাদ **সাহিত্যে** প্রকাশিত হয়েছিল।২

"অনেকে বলেন যে ব্রেটহার্ট স্বয়ং আমেরিকান ছোটগল্পের প্রথম পথ-প্রদর্শক। তিনি বলেন, একথা সত্য নহেঃ বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধেও আমেরিকান ছোটগল্প প্রচলিত ছিল। তবে তাহার আদর্শ ইংরাজী, প্রণালীও ইংরাজী। ইংরাজ লেখক জাজ হানিবার্টন প্রথম আমেরিকান গল্প লেখেন—তাহাতে খাঁটি আমেরিকান চরিত্র অপেক্ষা খাঁটি আমেরিকান ভাষাই অধিক ফুটিয়াছিল। আমেরিকান হাস্যরসের প্রভাবেই তদ্দেশের সাহিত্য হইতে ইংরাজী আদর্শের মোহবন্ধ ভিন্ন হইয়া যায়। এ হাস্যরস নূতন দেশে নূতন

১। যদিও সাহিত্যালোচনায় অবান্তর তবুও বিশেষ কৌতূহলপূর্ণ হল সুরেশ-চন্দ্র সমাজপতির মন্তব্যঃ "রাজনৈতিক ক্ষেত্রে লর্ড র‍্যান্ডলফ চার্চহিলের আবির্ভাব ও তিরোভাব একটি স্মরণীয় ঘটনা তাহা আজও অনেকেরই মনে আছে। তাঁহার উদয় অতর্কিত, তাঁহার ক্ষণস্থায়ী জ্যোতি অসাধারণ উজ্জ্বল, তাঁহার অস্তগমন অতি সহসা সংঘটিত। তাঁহার রাজনৈতিক জীবনের আদ্যোপান্ত অস্থির প্রতিভার চঞ্চলক্রীড়া। তাঁহার ক্রীড়া কৌতুকিনী প্রতিভার উজ্জ্বলতা ও মোহিনী শক্তি যথেষ্টই ছিল—কিন্তু গভীরতা ও গম্ভীরতা ছিল কিনা সন্দেহ। তিনি এখন মরণের মহাস্বপ্নে অভিভূত। তাঁহার পুত্র মিস্টার উইনস্টন স্পেনসার চার্চহিল সাহিত্য-সেবায় নবব্রতী। এই প্রতিভাবান পিতার তরুণবয়স্ক পুত্রের রচনা আশা-প্রদ। গত সীমান্ত সংগ্রামে তিনি সংবাদদাতা হইয়া ভারত সীমান্তে গমন করেন। এই অভিজ্ঞতার ফলে তিনি যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন (The Malakhand Field Force) তাহা অতি উপাদেয় হইয়াছে। তিনি এখনও সৈনিক ব্রতে ব্রতী। সম্প্রতি তিনি নবপ্রচারিত "হারমস্-ওয়ার্থ ম্যাগাজিন" পত্রে একটি ক্ষুদ্র গল্প লিখিয়াছেন, আমরা তাঁহার মর্মানুবাদ প্রদান করিলাম"—এই মন্তব্যটির পর 'সমুদ্রসলিলে' নামে গল্পটি প্রকাশিত হয়।

২। সাহিত্য ১৩০৬ ভাদ্র পৃঃ ৩১৫

সভ্যতার ফল—সম্পূর্ণ নূতন জিনিস। ব্যক্তিগত গল্প প্রভৃতিতেই ইহার প্রথম বিকাশ—গল্প মুখে মুখে চলিত। সাধারণ গল্পগুজবের বৈঠক প্রভৃতি হইতে সাধারণ সভায় ও ক্রমে ধর্মমন্দিরের বক্তৃতাতেও এইরূপ গল্প বলিবার প্রথা প্রচলিত হয়। কোন বিষয় বুঝাইবার জন্য একটা গল্প বলিলে বিষয়টিও চিত্তাকর্ষক হয়, রসও জমে ভাল। ক্রমে ইহা সংবাদপত্রে স্থানপ্রাপ্ত হয়। অসংস্কৃত চলিত গল্প সংবাদপত্রে সংস্কৃত হইয়া মণিকর গৃহপ্রত্যাগত উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের মত বোধ হইত। তাহার মৌলিকতা ও বিশেষত্ব বিস্ময়কর। আমেরিকান গল্প স্বল্পায়তন, জমাট ও ভাবপ্রণোদক। এ গল্পে আতিশয্য বা ন্যূনতার লক্ষণ প্রায়ই দৃষ্ট হইত; কিন্তু মধুরতার অভাব ছিল না। ইহাতে এক এক প্রদেশের লোকের ভাষা ও ভাব দেখা যাইত, সে সব এমনই স্বাভাবিক যে চিত্তাকর্ষক না হইয়া যাইত না। এই ছোটগল্পের কৃপায় ক্রমে চলিতকথা ভদ্র সাহিত্যে স্থান পাইতে লাগিল। দশবার ছত্রের 'প্যারা' হইতে ছোটগল্প 'অর্ধকলম' ব্যাপী হইয়া উঠিল। কিন্তু বড় হইয়াও ছোটগল্প পূর্ববৎ সংক্ষিপ্ত ও ভাবপ্রকাশ ব্যাপারে সরল রহিল। আসলে কোন পরিবর্তন হইল না। এ ছোটগল্পের রচনাপ্রাচুর্যতা কষ্টসৃষ্ট রচনা-প্রণালী লোকে সহ্য করিত না। লঘুবাণের মত এই বাহুল্যবর্জিত গল্প একেবারে মর্মস্থলে পহুঁছিত—পথে বাঁকিয়া চুরিয়া যাইত না। তাহার পথ সরল।...ক্রমে ছোটগল্পে ঘটনা সমাবেশ হইতে চরিত্র চিত্রণ আরম্ভ হইল। দুই চার ছত্রে সমাজের এক এক অংশের নিখুঁত চিত্র প্রদত্ত হইত। কিন্তু গল্পে একটি বাজে কথা থাকিত না। পূর্বের মত এখনও আমেরিকান ছোট-গল্প সংবাদপত্রের অংশ। তাহা হইতে আমেরিকান ছোটগল্পের উৎপত্তি।"১

২

বাংলায় ছোটগল্পের সূচনা থেকেই বিদেশী ছোটগল্পকারদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। তাঁদের প্রভাব অনুসন্ধান তাই নিতান্ত নিরর্থ নয়। কিন্তু এই প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারি কী ভাবে। বলাই বাহুল্য এই প্রভাব বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক উভয় পথেই সন্ধান করা বা আবিষ্কার করা চলে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তুর প্রভাব অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ও স্থূল। কোন কোন বিদেশী গল্পের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গল্পের মিল থাকতে পারে। সৎ লেখক সাধারণত সেখানে ঋণ স্বীকার করেন। অথবা দুর্বলতর লেখক নিজের অক্ষমতা গোপনের জন্য অন্য লেখকের কাহিনী আত্মসাৎ করতে পারেন। তবে কখনও কখনও একটি সৃষ্টি অন্য সৃষ্টিকে প্রভাবিত করতে পারে। তাজমহলের রূপ বহু শিল্পীকে ভাস্কর্য প্রেরণা দিয়েছে,

১। পূর্বে দ্রষ্টব্য : ৪র্থ পরিচ্ছেদ,

বহু চিত্রীর অসামান্য চিত্রকলার উৎস হয়েছে, বহু কবির কাব্যের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু সেইভাবে প্রভাব অনুসন্ধান করা প্রায়শই কঠিন। শক্তিমান শিল্পীর ক্ষেত্রে অন্যের গল্পের থেকে প্রেরণা পাওয়া অসম্ভব নয়, তবে সেই উৎস তখন দেহহীন লাবণ্যবিলাসের মতই সূক্ষ্মায়িত হয়ে যায়। এই অনুসন্ধান তাই ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন লেখকের ক্ষেত্রেই হতে পারে। তাঁদের বিশেষ বিশেষ গল্পের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ বিদেশী লেখার যোগ থাকতে পারে। তা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার যোগ্য। কিন্তু আঙ্গিকের ক্ষেত্রে সামান্য গুণ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। ছোটগল্পের আঙ্গিকে ইউরোপীয় গল্পে যাঁরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সেই মপাসাঁ এবং চেখব, যাঁরা ছোটগল্পকারদের অসামান্যভাবে প্রভাবিত করেছেন, তাঁরা ইংরেজ নন, একজন ফরাসী এবং অন্যজন রুশীয়। এবং বেদনার বিষয় যে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের হাওয়া আনার মত লোক ছিলেন না কেউ, এক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ছাড়া। মাইকেল যদিও ফরাসী জানতেন, যদিও তাঁর স্ত্রী ফরাসী এবং যদিও তিনি ফরাসী দেশে ছিলেন তবুও তিনি ফরাসী সাহিত্যের আধুনিক উপন্যাস তথা কথাসাহিত্যের খবর বাঙালীকে জানাননি, সম্ভবত নিজেও জানতে উৎসাহী হননি। বাঙালীর বিদেশের জানালা ইংরেজি ভাষা। এরই ফাঁক দিয়ে যতটুকু দেখা যায়। ইংরেজি সাহিত্যেও ফরাসী আধুনিক কথাসাহিত্যের দোলা লাগল ১৮৮০ নাগাদ।১ আর রাশিয়ান কথাসাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটল ১৮৭৯ নাগাদ।২ ১৮৯৯তেও তুর্গেনিভের সঙ্গে ইংরেজ পাঠকের ভাল পরিচয় হয়নি। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষে উৎসাহী বাঙালী পাঠক হয়ত কিছু কিছু কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের আস্বাদ পেতে লাগলেন। পূর্বের তথ্যগুলি থেকে বোঝা যায় ১৮৯০ নাগাদ ফরাসী গল্পের কথা বাঙালী পাঠক মোটামুটি জানতে পারছে। শুধু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নয়, অন্যান্য লেখকরাও ফরাসী লেখার অনুবাদ করছেন। তার ফলে মপাসাঁর গল্পের সঙ্গে পাঠক ও লেখক সমাজ ধীরে ধীরে পরিচিত হচ্ছেন।

মপাসাঁর গল্পের বিষয়ে ও আঙ্গিকে অতি স্পষ্ট, অতি পরিচ্ছন্ন স্বাতন্ত্র্য আছে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যেমন পৃথক তাঁর রচনাভঙ্গিও তেমনই স্বতন্ত্র। মপাসাঁর প্রখর, নৈর্ব্যক্তিক বাস্তববাদ ও তিক্ত ব্যঙ্গপ্রধান জীবনদৃষ্টি বাংলা সাহিত্যে নেই যেমন সত্য তেমনই সত্য যে তা তাঁর মাতৃভূমির সাহিত্যেও বিরল। তাঁর জীবনদৃষ্টির রুক্ষতা ও তীক্ষ্ম বাস্তবতা তাঁর আঙ্গিককেও তার উপযোগী করেছে। একজন

---

১ O' Faolain, Sean : The Short Story, p. 34.

২। ঐ, পৃঃ ৩৫

সমালোচক তাঁর সম্বন্ধে বলছেন "তিনি বহুদিক থেকে লেখকদের মধ্যে অসাধারণ সংযমী শিল্পী—তাঁর লেখায় নেই দীর্ঘ বর্ণনা, 'আবহ' সৃষ্টির আগ্রহ, মনস্তত্ত্ব বিচারের বাহুল্য, সহজ সহজ বিষয়, অতি স্বাভাবিক চরিত্রাবলী, ক্লাসিক সাহিত্যের মত কল্পনাভঙ্গি, যা অনাবশ্যক বাহুল্যকে পরিহার করে এবং মূল লক্ষ্যের তুলনায় অন্য সব কিছুকেই গৌন মনে করে; এবং অহংত্বকে এমন সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে যে মনে হয় যেন কোন কার্যবিবরণীর (procēs-verbal) অন্য পৃষ্ঠা। রচনারীতি এত সংক্ষিপ্ত যেন মনে হয় বিচারকের রায়। ক্লাসিক বাস্তবতার চরম সীমা তিনি স্পর্শ করেছিলেন।"১ সমালোচকের এই মন্তব্য মূলত সত্য। কিন্তু তাঁর রচনারীতির একটি গুণ বা ধর্ম, যা আপাত সহজসাধ্য ও পরিণামে দুর্লভ, তা বাংলাসাহিত্যে তথা বহু সাহিত্যেই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তাঁর গল্পে 'anecdote' প্রধান স্থান অধিকার করেছে। তিনি সেইসব ক্ষেত্রে গল্পে চরম-স্থলে প্রবল ধাক্কায় পাঠককে বজ্রাহত করে চমৎকৃত করেছেন। এডগ্যার অ্যালান পোর গল্পে যা বীজমাত্র তাই মপাসাঁর হাতে পরিণত ফল। তাঁর অতি বিখ্যাত গল্প *La Parure* তাঁর মাতৃভাষার সাহিত্যেও যেমন বিস্ময়, তেমনই বহু বিদেশী সাহিত্যে।

> স্বামী ও স্ত্রী। স্বামী সাধারণ চাকুরে; বউ তরুণী সুন্দরী, তার ইচ্ছে নাচের আসরে যাওয়া, লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করা। একদিন একটি জমকালো আসরে যাবার নিমন্ত্রণ পেল সে। কিন্তু কী পরে যাবে। সে ত গরীব। তার গহনা নেই। আর গহনা না থাকলে ঐরকম বড় সভায় নিজের দৈন্যই প্রকাশ পাবে। তখন সে তার ইস্কুলের ধনী বান্ধবীর কাছ থেকে একটি হীরের হার আনল। নাচের আসরে হৈচৈ হল। তারপরে রাত্রে আনন্দে খুশিমনে বাড়ি ফিরে এল।
>
> কিন্তু হায়, হার খুলতে গিয়ে দেখে গলায় হার নেই। সেই দামী হীরের হার হারিয়ে গেছে। আরম্ভ হল খোঁজা, চারিদিকে। কিন্তু পাওয়া গেলনা। একরাত্রির সুখের বদলে এল বহুরাত্রির দুঃখ, দুর্দশা। সেই হার ফিরিয়ে দিতে হবে। গরীব স্বামী, সামান্য চাকরী। দুজনে অমানুষিক পরিশ্রম করতে লাগল। স্ত্রীর সৌন্দর্য গেল হারিয়ে। তার চুলে পাক ধরল। মুখে ভাঁজ পড়ল। এইভাবে কাটল দশ বছর। দেখা হল সেই ধনী বান্ধবীর সঙ্গে—সে বলল তার এত সুন্দর চেহারা এমন হয়েছে কেন? সে উত্তর দিলেঃ
>
> "তোমার সঙ্গে সেই যে দেখা হল তারপর বহু দুঃখের ঝড় বয়ে গেছে আমার ওপর দিয়ে—আর সবই তোমার জন্য।
>
> "আমার জন্য? তার মানে?
>
> "মনে আছে, তুমি আমাকে মিনিস্টারের বলে যাবার জন্য সেই যে হীরের হার দিয়েছিলে?

১। ঐ, পৃঃ ১১০

"হ্যাঁ, তারপর ?

"তারপর, সেটা হারিয়ে ফেলি।

"হারিয়ে ফেল! কী ক'রে, তুমি ত' আমাকে ফেরত দিয়েছিলে ?

"তোমাকে ঠিক সেইরকম একটা ফিরিয়ে দিয়েছি, আর দশটি বছর ধরে আমরা তার দেনা শুধছি। তুমি জানোই ত', আমাদের মত গরীবের পক্ষে কী কঠিন কাজ—কিন্তু এখন চুকেছে, আজ আমি সুখী।

"মাদাম ফরোস্তিয়ে বললেন, "আমার হারটার বদলে তুমি হীরের হার কিনে দিয়েছিলে।

"হ্যাঁ, ধরতে পারোনি ত'! একেবারে একরকম। সে গর্বের হাসি হাসল।

মাদাম ফরেস্তিয়ের মন ব্যথিয়ে উঠল। তার করুণ কর্কশ হাত দুটি ধরলেন, স্নেহভরে নিজের কাছে এগিয়ে আনলেন, তাঁর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এল ঃ

"ওরে হতভাগী, মাথি ডে! আমারটা যে নকল। খুব বেশি হলে তার ৫০০ ফ্রাঙ্কও দাম নয়।"১

শুধু ছোটগল্পে নয়, সাহিত্যের ইতিহাসে চমকপ্রদ শেষ, whip-crack ending, হিসেবে এই গল্পটি অতিস্মরণীয়। এইসব গল্পের আঙ্গিকগত দুর্বলতা অতি স্পষ্ট। ডিটেকটিভ গল্পের শুরুর আগেই যদি শেষ জানা যায় তাহলে যেমন তার রস তরল হয়ে যায়, এই ধরণের গল্পের অন্তর্নিহিত ত্রুটি এখানেই। এখানে অবশ্য শিল্পীর ক্ষমতাই এই ধরণের গল্পকেও বার বার পড়ার উপযোগ্য করে তুলতে পারে। কাহিনীর নানা কুশলতা, চরিত্রসৃষ্টির সূক্ষ্মতা, ঘটনাসৃষ্টির নৈপুণ্য তখন বড় হয়ে ওঠে। মপাসাঁর এই গল্পটি যদিও সমস্ত কৌতূহল ও চমক শেষমুহূর্তের জন্যই পুঞ্জীভূত করে রেখেছেন তবুও তাঁর রচনার অসামান্য কুশলতায় গল্পটি বার বার পড়া যায়, কিন্তু স্বীকার করতেই হবে প্রথম পাঠের যে বিস্ময় তা দ্বিতীয় পাঠে আর থাকতে পারেনা। এই ধরণের চমকপ্রদ সমাপ্তি বাংলাতেও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথের গল্পেও তা প্রবেশলাভ করেছিল, যদিও মপাসাঁর মানসিকতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোন যোগাযোগ নেই। এই সমাপ্তি-কৌশল রবীন্দ্রনাথের সমস্যা-পূরণ গল্পে বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছে।

কৃষ্ণগোপাল সরকার জ্যেষ্ঠপুত্রের হাতে জমিদারির ভার দিয়ে কাশী চলে গেলেন। পুত্র বিপিনবিহারী, সচ্চরিত্র যুবক, কড়া জমিদার। অছিমদ্দি নামে একটি মুসলমান যুবক নিষ্কর জমি ভোগ করত। বিপিনবিহারী নিষ্কর ও ব্রহ্মাত্তর জমির বিরুদ্ধে। বিশেষত মুসলমান যুবকের এই নিষ্কর জমি উপ-ভোগের কোন কারণ তাঁর বোধগম্য হলনা। তিনি অছিমদ্দিকে জমি থেকে

১। এই গল্পটি বাংলায় বহুবার অনূদিত হয়েছে। জলধর সেন 'অন্ধ' গল্পটি এই কাহিনী অবলম্বনে লেখেন।

উচ্ছেদ করতে চাইলেন। অছিমদ্দিও উদ্ধত যুবক সে জমিদারে সঙ্গে লড়াই চালাল। ক্রমে মামলা চলল। অছিমদ্দির মা এসে বিপিনবিহারীর কাছে কৃপা ভিক্ষা করলেন। কিন্তু ফল হলনা, মামলা ধীরে ধীরে হাইকোর্ট পর্যন্ত চলল। অছিমদ্দি একদিন বিপিনবিহারীকে মারতে এল ফলে পুলিস অছিমদ্দিকে ধরল। এইভাবে তিনদিনেক কেটেছে। বিচারের দিন ধার্য হয়েছে। বিপিন কাছারিতে উপস্থিত। হঠাৎ দেখলেন তাঁর বৃদ্ধ পিতা দূরে দাঁড়িয়ে আছেন। বিপিন তাঁকে প্রণাম করলেন। কৃষ্ণগোপাল বললেন, 'অছিম যাহাতে খালাস পায় সেই চেষ্টা করিতে হইবে এবং উহার যে সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছ তাহা ফিরাইয়া দিবে।"

বিপিন বিস্মিত হলেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। পিতা প্রথমে কারণ দর্শাতে অস্বীকার করলেন। পরে বাধ্য হয়ে "কিঞ্চিৎ কম্পিত স্বরে কহিলেন, লোকের কাছে যদি সমস্ত খুলিয়া বলা আবশ্যক মনে কর তো বলিয়ো, অছিমদ্দিন তোমার ভাই হয়, আমার পুত্র।"

বিপিন চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "যবনীর গর্ভে" ?

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, "হাঁ, বাপু।"

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এখানে থামতে পারেননি। এর পরেও আরো কিছু অংশ আছে যা গল্পের পক্ষে অপরিহার্য ছিলনা। অর্থাৎ মপাসাঁর সমাপ্তির মধ্যে যে নিস্তব্ধ বাক্‌হীনতা আছে, যে নিষ্ঠুর নীরবতা আছে তা রবীন্দ্রনাথের গল্পে নেই। পাঠক-মনকে চমক দিয়েই ক্ষান্ত তিনি নন—আরো কিছুকাল তাকে সঙ্গ দিয়েছেন। ১৩০০ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে (১৮৯৩ খৃঃ অব্দে) এই গল্পটি প্রকাশিত হয়। এই গল্পটিকে বাংলাসাহিত্যে প্রথম মপাসাঁর সমাপ্তি সার্থক আঙ্গিকবাহী বলা চলতে পারে। অবশ্য এর একবছর আগে প্রকাশিত (সম্ভবত আরো কিছুকাল আগে লিখিত) নবকাহিনী গ্রন্থে স্বর্ণকুমারী দেবী এই আঙ্গিকের পরীক্ষা করেছিলেন বোঝা যায়। তাঁর আমার জীবন এবং গহনা গল্প দুটির মধ্যেই তার প্রমাণ।[১] আমার জীবনের মধ্যে এই চমক খুব তীক্ষ্ণ নয়, গহনাতে অপেক্ষাকৃত তীক্ষ্ণ—যদিও সমস্যাপূরণের তুলনায় অত্যন্ত ক্ষীণ।

সমালোচকদের মধ্যে অনেকেই বাংলা গল্পে মপাসাঁর প্রভাবের কথা বলেছেন। প্রমথ চৌধুরীই সর্বপ্রথম বলেন যে "এ যুগের বাঙলার ছোটগল্প Maupassant-র ছোটগল্পের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে।[২] কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় আঙ্গিকগত সামান্য প্রভাব ছাড়া আর কোন প্রভাবই বাংলা ছোটগল্পে মপাসাঁর নেই। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মপাসাঁর মানসিকতার পার্থক্য যোজন-

১। দ্রষ্টব্য, ৫ম অধ্যায়,

২। প্রমথ চৌধুরী—কথাগুচ্ছ (সুধীর সরকার সম্পাদিত)—ভূমিকা—পৃঃ ৪।

ব্যাপী। Old Judas জাতীয় গল্প রবীন্দ্রনাথের হাতে কল্পনাও করা যায় না। মপাসাঁর মানসিকতার যে কঠিন ও তিক্ত দিক তা বাংলা গল্পে কদাচিৎ দেখা দিয়েছে। মপাসাঁর গল্পে দেখা যায় ভাষার অসাধারণ সংযম ও প্রকৃতি বর্ণনার সংক্ষিপ্তি। কিন্তু আমাদের আলোচ্য পর্বে এমন কোন লেখক নেই যাঁর লেখায় সেই অসাধারণ সংযমও সংক্ষিপ্তি আছে বলে দাবী করা যেতে পারে। মপাসাঁর সম্বন্ধে এক সমালোচক তিনটি ধর্মকে প্রধান বলেছেন "ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সংশয়বাদ ও আদিম-শক্তিবাদ (elementalism)"১ বলাই বাহুল্য তাঁর আঙ্গিক তাঁর ব্যক্তিত্বেরই সৃষ্টি—শূন্যে আঙ্গিকের জন্ম হতে পারে না। এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য উৎকৃষ্ট লেখক মাত্রেরই থাকে—বাঙালী লেখকদেরও আছে। কিন্তু এই সংশয়বাদ ও আদিমতাবাদ অতি আধুনিক বাংলাসাহিত্য ছাড়া (অর্থাৎ ১৯৩০ খৃঃ অব্দের পর থেকে) অন্য পর্বের বাংলা-সাহিত্যে দুর্লক্ষ্য।

মপাসাঁর গল্পের একটি অসাধারণ ধর্ম তার বর্ণনাভঙ্গির ক্ষিপ্রতা অথচ সংক্ষিপ্তি। এই গুণ পরবর্তীকালে প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্পে আবিষ্কার করা কঠিন নয়। রবীন্দ্রনাথের গল্পে, এমনকি তাঁর পরবর্তী গল্পকারদের মধ্যে বিশেষত ভারতী-গোষ্ঠির লেখকের মধ্যে, বা প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে বর্ণনার জন্য বর্ণনা যথেষ্ট আছে। এটি অনেক লেখকেরই প্রিয়। কিন্তু মপাসাঁ তাঁর ঘোর বিরোধী। তিনি Miss Hariet গল্পে একটি সকালের বর্ণনা দিচ্ছেন—

> অবশেষে আমাদের সামনে সূর্য উঠল। দিক্‌চক্ররেখা রক্তিম হয়ে গেল। মুহূর্তে মুহূর্তে একটু একটু করে পরিষ্কার হতে লাগল। মনে হল গ্রাম যেন জেগে উঠল, হেসে উঠল, তরুণী মেয়ের মত বিছানা ছেড়ে উঠল, সাদা কুয়াশার আস্তরণ ছিঁড়ে।

দুঃখের বিষয় এই সংক্ষিপ্তি ও বাকসংযম বাঙালী লেখক মপাসাঁর কাছে শিক্ষা করেননি। আসলে মপাসাঁর গল্পে বাঙালী সাহিত্যিকেরা যেভাবে চমকিত হয়েছেন সেভাবে প্রভাবিত হননি। মপাসাঁর জীবনদর্শনের সঙ্গে ব্যবধান এত বেশী যে তাঁর প্রভাব তাই বাংলা গল্পে স্থায়ী হতে পারেনি। মপাসাঁর কাছে চমক ও অতিনাটকীয় শেষের ধাক্কা প্রত্যাশা করা হয়েছে বলেই হয়ত তাই তাঁর অপেক্ষাকৃত সহজ সরল শান্তরসের গল্পগুলি উপেক্ষিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'চন্দ্রালোকে' গল্পটির কথা স্মরণীয়। দুই তরুণতরুণীর ভালোবাসা, এক গীর্জার সন্ন্যাসীর বাধাদান ও শেষ পর্যন্ত সেই সন্ন্যাসী একদিন ভালবাসাকে ঈশ্বরের দান বলে বুঝতে শিখলেন। যখন জ্যোৎস্নার আলোয় সমস্ত পথঘাট মাঠনদী ঝলমল করছে তখন সেই নিভৃতি-সন্ধানী প্রেমিকপ্রেমিকা দুটি নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে আর সন্ন্যাসী তাঁদের

১। O'Fiolin, পূর্বোক্ত, p. 124,

অনুসরণ করতে করতে চলে এসেছে। হঠাৎ তার হৃদয়ে এল পরিবর্তন। মনে পড়ল বাইবেলের রূথ আর বোয়াজ-এর কথা। মনে হল ঈশ্বর এই রাত্রি তৈরী করেছেন "প্রেমের কাছে সব আদর্শের পরাজয়ের জন্য।" দূরে যখন সে দেখতে পেল প্রেমিক-প্রেমিকা আলিঙ্গনোদ্যত সে পালিয়ে গেল, বিস্ময়ে, লজ্জায়· আর তার মনে হল সে যেন এক মন্দিরে অনধিকার প্রবেশ করেছে। এক অপূর্ব সৌন্দর্য ও কোমলতায় এই কাহিনী শেষ। এই ধরণের সংযম ও শ্রী মপাসাঁর গল্পের স্বাভাবিক প্রকাশমাত্র। মপাসাঁর এই শান্তস্নিগ্ধ রূপটি অপেক্ষাকৃত অবহেলিত।

মপাসাঁর মতই, অন্যান্য বিদেশী লেখকদেরও প্রভাব. অনুসন্ধান করা কঠিন। প্রায়শই বৃথা। ইদানীং কোন কোন সমালোচক রুশীয় লেখক চেখবের প্রভাব বাংলা গল্পে পড়েছে বলে কল্পনা করেছেন। আমরা লক্ষ্য করেছি যে ইংরেজি সাহিত্যেই চেখবের লেখা অনুবাদ হতে হতে ঊনিশ শতকর শেষ হয়ে এসেছে। বাংলায়, বলাই বাহুল্য, রাশিয়ার লেখা ইংলন্ডের মারফৎ এসেছে। ঊনিশ শতকে বাংলায় চেখবের কোন অনুবাদ হয়েছিল বলে জানা নেই। বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে কণ্টিনেন্টাল সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ব্যাপক হতে থাকে। তখন বিভিন্ন প্রভাব দেখতে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় কোন রুশীয় লেখকের প্রত্যক্ষ প্রভাব অসম্ভব ছিল। রবীন্দ্রনাথের গল্পে যাঁরা চেখবের প্রভাব দেখেন তাঁরা, (নিতান্ত ঐতিহাসিক কারণেই প্রমাণ করা যায়) ভ্রান্ত। রবীন্দ্রনাথের গল্প চেখবের প্রভাব নেই—কিন্তু আঙ্গিকগত ঐক্য আছে। মপাসাঁর সঙ্গে চেখবের পার্থক্য আঙ্গিকগত, যেহেতু তার মূলে বিশ্বাসগত। মপাসাঁ প্রকৃতিবাদী লেখক-গোষ্ঠির একজন। চেখব তা নন। মপাসাঁর লেখায় যে নৈর্ব্যক্তিক চেতনা ফুটে ওঠে, চেখবে তার চিহ্নমাত্র নেই। চেখবও মপাসাঁর মতই anecdote নিয়ে কাহিনী রচনা করেছেন—কিন্তু সেখানে সমাপ্তিতে চমক নেই। তা স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দভাবে হয়। দ্বিতীয়ত, তার গল্পে 'প্লটে'র চেয়েও জোর দেওয়া হয় চরিত্রের বিশেষ কোন ভাবের প্রতি। মপাসাঁর 'হার' গল্পের পাশে চেখবের 'প্রিয়তমা' যদি রাখা যায় তাহলে দেখা যায় 'হার' গল্পটি অপেক্ষাকৃত দুর্বল লেখকও লিখে কিছুটা খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন—কিন্তু 'প্রিয়তমা'র গল্পত্ব তার প্লটের মধ্যে নেই—তার চরিত্রের বিশিষ্ট ভাবটির মধ্যে আছে। মপাসাঁ তার গল্পের প্লটের প্রতি মনোযোগী ছিলেন বলে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন, কিন্তু ব্যঙ্গ ও নৈর্ব্যক্তিক জ্বালাময়ী ইঙ্গিতের জন্য শিল্পী হিসেবেও বন্দিত হয়েছেন। চেখবের মত আরো দুর্গম। প্রথমত তিনি মপাসাঁর পরবর্তী শিল্পী—মপাসাঁর পথে গেলে হয়ত কয়েকটি জনপ্রিয় গল্প লিখে তিনিও বিদায় নিতে পারতেন কিন্তু পুরানো সঞ্চয় নিয়ে বেচাকেনার ইচ্ছা প্রতিভাবান শিল্পীর থাকে না। তাই তিনি বাছলেন ভিন্ন পথ। তিনি পরিত্যাগ করলেন নিটোল, পরিপূর্ণ গল্প। যেকোন

বিষয়, যে-কোন ঘটনা নিয়েই তিনি লিখতে পারলেন। তিনি বলেছিলেন ছাইদানী নিয়েও তিনি গল্প লিখতে পারেন। অর্থাৎ মপাসাঁ যেমন ছোটগল্পের আঙ্গিকের এক অসাধারণ স্থপতি, চেখব তেমনই অন্য এক রচনাকৌশলের পথ খুলে দিলেন। সাধারণ দুঃখ, তুচ্ছ ক্ষণমুহূর্তের বেদনা, প্রাত্যাহিক জীবনের শূন্যতাও গল্পের বিষয় হতে পারে এবং গল্প সার্থক হতে পারে—এই সত্য শেখালেন চেখব। অন্য কথায় বলা চলে মপাসাঁর গল্পে ঘটনাগুলি অ-সাধারণ, চেখবে ঘটনাগুলি সাধারণ। তিনিও ঘটনাপ্রধান গল্প লিখেছেন, যদিও সেগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা নয়; যেমন "শিল্প-কর্ম" গল্পটি।

> এক ডাক্তারকে তার কৃতজ্ঞ রোগী একটি অপূর্ব নগ্ন নারীমূর্তি উপহার দিয়েছিল। রোগীর ছিল প্রাচীন শিল্পনমুনার দোকান। ডাক্তার দ্বিধাভরে সেই উপহার গ্রহণ করলেন। তাকিয়ে মুগ্ধ হলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভয় হল কে কী বলবে। তিনি এটি নিয়ে গেলেন তাঁর বন্ধু উকীলের কাছে—তাকে উপহার দিলেন। তিনিও মূর্তির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলেন কিন্তু একই ভয়ে তিনিও সেই শিল্পকর্ম রাখতে রাজী হলেন না। ডাক্তারের ভয় ছিল তাঁর মা কী বলবেন। উকীলের শঙ্কা তাঁর প্রিয়তমা কী বলবেন। কাজেই উকীল বিক্রি করে দিলেন একটি পুরোনো শিল্প-নমুনার দোকানে। কয়েকদিন পরে ডাক্তারের চেম্বারে আবার সেই কৃতজ্ঞ রোগিণীর পুত্রের আবির্ভাব, হাতে সেই শিল্পমূর্তি। সে বলল, যে মা পাঠিয়ে দিয়েছেন। এতদিনে আপনার আগেকার মূর্তিটির জোড় পাওয়া গেল।

এখানে গল্পের প্লটই প্রধান সন্দেহ নেই। অবশ্য ডাক্তার ও উকীলের হাতে শিল্পের অপমাননার ছবিটি চেখব চমৎকারভাবে ফুটিয়েছেন। কিন্তু চেখবের আসল কৃতিত্ব বিষয়বস্তুর তুচ্ছতার মধ্য থেকে সৌন্দর্যসৃষ্টি। 'প্রতিশোধ' গল্পটি গ্রহণ করা যাক।[১] এখানে চেখব নিতান্ত কৌতুকের মধ্য দিয়ে একটি গল্প রচনা করেছেন।

> স্ত্রী অন্যের প্রতি আসক্ত জেনে জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে হতভাগ্য স্বামী সিগাএভ ঠিক করেছে আত্মহত্যা করবে। তাই সে বন্দুকের দোকানে এসে রিভলবার কিনতে চায়। তার মনের মধ্যে চলেছে চিন্তার স্রোত। আর তার সামনে দোকানী বকরবকর করে চলেছে। প্রথমে একটা ৪৫ রুবলের রিভল-বারের গুণ বর্ণনা করছে দোকানদার—তা দিয়ে নেকড়ে মারা যায়, ডাকাতও শায়েস্তা করা যায়, আত্মহত্যা করার পক্ষেও উপযুক্ত। ইতিমধ্যে সিগাএভ কল্পনা করছে তার শেষকৃত্য দৃশ্য। সবাই তার স্ত্রীকে ঘৃণা করছে। দোকানদার এবার তিরিশ রুবলের আর গোটাকতক রিভলবার দেখিয়ে বলছে খুব সস্তা। এই হল গরীব রাশিয়ানদের ব্যবহারের যথাযোগ্য জিনিস। সিগাএভ-এর চিন্তাস্রোত বদলে গেছে। আত্মহত্যা করে লাভ কি—আগে স্ত্রীর প্রেমিককে

১। MLS. Vol. 12. P. 727-731.

খুন করতে হবে—তারপর আত্মহত্যা। দোকানদার বলে চলেছে—এই রিভলবার দিয়ে এই সেদিন এক ভদ্রলোক তার স্ত্রীর প্রেমিককে খুন করেছিল—কাগজে দেখেছেন নিশ্চয়ই, প্রথমে বুলেট তার বুক ভেদ করে, একটা ব্রোঞ্জের আলো ভেদ করে, পিয়ানো ফুটো করে, পিয়ানো থেকে ছিটকে বৌকে আহত করেছে। ভদ্রলোককে সেজন্য সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়েছে। কিন্তু দোষ কার—

সিগাএভ ভাবল মরে লাভ নেই, সাইবেরিয়ায় গিয়েও লাভ নেই, অতএব আমি আত্মহত্যা করব না, তাকেও মারব না। আমি অন্যপথে প্রতিহিংসা নেব।

ইতিমধ্যে দোকানদার আরো নতুন রিভলবার দেখাচ্ছে। সিগাএভ ভাবছে কী করা যায়। দোকানদার উৎসাহের সঙ্গে গুণগান করছে তার জিনিসের। কী করে দোকান থেকে বেরোনো যায়। শেষে সে জিজ্ঞাসা করল:

"এটা—এটা কি ?"

"ওটা শামুক ধরার জাল।"

"দাম কত ওটার।"

"আট রুবল।"

"আমি নোব।" অভিমানী স্বামী আট রুবল দিয়ে জাল কিনে দোকান থেকে বেরুলেন।"

এই সহজ কৌতুক সামান্য ঘটনাকে মূল্যবান করেছে। এর মধ্যে কোন ঘটনা নেই। কয়েক মুহূর্ত একটি চরিত্র ও পারিপার্শ্বিক ও চরিত্রের মন। কৌতুক যেমন এখানে উচ্ছ্বসিত, নীরব ব্যঙ্গ তেমনই স্পষ্ট The Chameleon গল্পে।[১] কৌতুক ও ব্যঙ্গ ছাড়িয়ে মনের কোমল, গভীর সূক্ষ্ম রূপগুলি ধরেছেন যেখানে সেখানে আরো প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর "প্রিয়তমা" গল্পটি তাঁর অসামান্য গল্পরচনার প্রমাণ।

এক অসামান্য চরিত্র এই অলিভ্রঙ্কা। নাট্যপ্রযোজকের স্ত্রী যখন সে তখন নাট্যচিন্তাই তার জগৎ। আর কাঠের ব্যবসাদার যখন তার স্বামী—তখন কাঠের চিন্তাই তার একমাত্র চিন্তা। ডাক্তারের প্রিয়তমা যখন সে তখন ডাক্তারের কথাই তার কথা। তার কোন নিজস্ব সত্তা নেই, সে পুরোপুরি অন্যনির্ভর। ডাক্তার তাকে ছেড়ে চলে গেল। আবার দীর্ঘদিন পরে ডাক্তার ফিরে এল। সঙ্গে তার বৌ আর ছেলে সাশা। অলিভ্রঙ্কা তাদের নিজের ঘরে রাখল। এতদিন পরে অলিভ্রঙ্কা আবার তার জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পেল। এবার আর বয়স্কদের মধ্যে নয়—বালকের মধ্যে। বালকের চিন্তাই তার চিন্তা। স্কুলে পড়াশুনোর সমস্যা এখন তার একমাত্র চিন্তার বিষয়। সে বালকটিকে ভালবেসে ফেলল। "আঃ সে তাকে কী ভালবাসে! তার আগের কোন ভালবাসাই এত গভীর ছিল না, তার হৃদয় এত তৃপ্তি, এত উদারতায় কখনও ভরেনি, আজ ধীরে ধীরে তার মধ্যে জেগে উঠছে

১। MLS. Vol. 12. P736-38

মাতৃত্ব। এই পাগল-করা ছেলেটার জন্য সে তার প্রাণ দিয়ে দিতে পারে, স্বচ্ছন্দে, আনন্দে।"

ছেলে স্কুলে যায়। ফিরে আসে। খাওয়ার পর ঘুমোয়। অলিত্রঙ্কা বসে বসে ভাবে ভবিষ্যতের কথা। ছেলে একদিন বড় হবে। বাড়ি করবে বিয়ে হবে। তারপর তারও চোখে ঘুম আসে—স্বপ্ন দেখে। ভয় হয় সাশা চলে যাবে। আবার মন শান্ত হয়। শুয়ে শুয়ে সাশার কথা ভাবে। সাশা পাশের ঘরে শুয়ে ঘুমের মধ্যে কথা বলে।

এই যে সহজ পরিণতি, সরল বিবৃতি ও বর্ণনার মৃদুস্নিগ্ধভাব—এখানেই চেখবের কুশলতা। এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আঙ্গিকের ঐক্য আছে। পরবর্তী বাঙালী লেখকদেরও আছে। এক ইংরেজি ছোটগল্পের সংকলয়িতা লেখিকা ইংরেজি সাহিত্যে এই দুই লেখকের প্রভাব বা সম্পর্ক সম্বন্ধে বলেছেন যে এই দুটি বিদেশী শিল্পীর কাছে ইংরেজি গল্পের ঋণ অনেক। বলেছেন "চেখব অনুভূতির মুক্তি দিয়েছেন, ফর্মের প্রতি রোম্যাণ্টিক মনোভাববশত অসহিষ্ণু ও তার ফলে অস্পষ্টতা বা আকারহীনতায় ফর্মের পরিণতি। (অন্যপক্ষে) মপাসাঁর দৃষ্টি ঘনপিনবদ্ধতার প্রতি, কঠিন আনুগত্যের প্রতি। চেখব লেখকদের সামনে অনুভূতির দৃশ্যপট মেলে ধরেছেন..."[১] বাঙালী লেখকেরা কেউই মপাসাঁর কাছে কঠিন বন্ধনের আনুগত্য, অতি মিতভাষণের দীক্ষা গ্রহণ করেননি। যদিও তাঁর আঙ্গিকের মোহ ও চমককে গ্রহণ করতে চেয়েছেন। অন্যপক্ষে চেখবের ভারাবনত আবেগময় গল্প বাঙালী লেখকের মনকে অপেক্ষাকৃত দোলা দিয়েছে। বিদেশী লেখকদের প্রভাব বাংলা ছোট-গল্পের প্রথমস্তরে বাঙালী লেখকদের বিশেষভাবে চিহ্নিত করেনি। এই গল্পগুলির উপাদান বাঙালী লেখকেরা নিজেদের জীবনের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন—তাই তাকে রূপ দিয়েছেন স্বতস্ফূর্ত আনন্দে। প্রথম যুগের ঔপন্যাসিক লেখকেরা যেমন ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের ধারা অনুসরণ করেছিলেন—ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তা হয়নি। পরবর্তী যুগে ধীরে ধীরে আঙ্গিকের প্রভাব পড়তে শুরু করে। আর আধুনিক বাংলা ছোটগল্প, যার সূচনা 'কল্লোল' থেকে, তার ওপর বহু রকম প্রভাব পড়তে থাকে। কিন্তু আমাদের আলোচ্যকালে বাংলা গল্পের সঙ্গে বিদেশী (অর্থাৎ ইংরেজি এবং ইংরেজি ভাষায় অনূদিত ইউরোপীয় ভাষার গল্প) গল্পের যোগ ঘনিষ্ঠ ছিল কিন্তু বাংলা গল্পের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য তৈরী হয়েছিল।

১। Bowen, Elizabeth, (edited), *The Faber Book of Modern Stories*, London, 1942 P. 9

অষ্টম পরিচ্ছেদ

॥ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ॥

১৮৪৭—১৯১৯

ত্রৈলোক্যনাথ বাংলাসাহিত্যের একজন অসাধারণ শক্তিমান লেখক হওয়া সত্ত্বেও তিনি এখন বিস্মৃত। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের নাম সম্পূর্ণ বিস্মৃতির অতলে চলে গেছে। ত্রৈলোক্যনাথের নাম কিংবদন্তীর মত শোনা যায়—বিশেষ করে তাঁর 'কঙ্কাবতী' গ্রন্থটির কথা। কিন্তু তাঁর অন্যান্য গ্রন্থরাজি অপঠিত ও অচলিত। আশ্চর্য এই যে তাঁর মত শিল্পী সম্পর্কে বাংলা ভাষায় এক-আধখানি গ্রন্থও রচিত হয়নি। অথচ যথার্থ বিচারে ত্রৈলোক্যনাথ বাংলাসাহিত্যের একজন প্রধান শিল্পী।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সেই যুগের বহু লক্ষণ তাঁর মধ্যে পূর্ণভাবে প্রকাশলাভ করেছিল। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম ও অনমনীয় আত্ম-সম্মানবোধ তাঁর প্রথম জীবনকে মহিমান্বিত করেছিল। আর তৎকালীন যে দেশাত্ম-বোধ শিক্ষিত হৃদয়কে অহরহ উদ্বেলিত করত ত্রৈলোক্যনাথের জীবনেও সেই বোধ প্রবেশ করেছিল। ত্রৈলোক্যনাথের সমস্ত জীবনে 'দেশ' একটি বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। দেশীয় শিল্প সম্প্রসারের প্রয়াস, দেশীয় শিল্পের কথা রচনা, দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম—এই সমস্ত ঘটনাগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর যেসব গুণগুলি তা তাঁর মধ্যে অসাধারণভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর কর্মজীবন ও সাহিত্যজীবনে একটি বিরাট যোগ আছে। কর্মজীবনে তিনি দেশীয় উন্নতি, দেশীয় ঐক্য নিয়ে চিন্তা করেছেন—তাঁর সাহিত্যজীবনেও তিনি সেই সংস্কারকের ব্রত গ্রহণ করেছিলেন।

সাহিত্যিক-বিশেষের দৃষ্টিভঙ্গী এক এক ধরণের। একদল সাহিত্যিক মনে করেন সাহিত্য কারো প্রত্যক্ষ উপকারের জন্য নয়। সামাজিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নয়—সাহিত্য এক অনন্যসৃষ্টি—সেই সৃষ্টি জগতের যে-কোন উপকরণকে অবলম্বন করে হতে পারে—তার শ্রেষ্ঠত্ব বা সার্থকতা তার রূপের মধ্যে; কোন সামাজিক প্রয়োজনের মূল্যে নয়। দ্বিতীয় ধরণের সাহিত্যিক আছেন যাঁরা সাহিত্যের সঙ্গে সামাজিক প্রয়োজনকে মিলিয়ে নিয়েছেন। সমাজকল্যাণের সঙ্গে, মানুষকে উদ্বোধিত করার জন্য সাহিত্যকে ব্যবহার করেন। এঁরাও শক্তিমান স্রষ্টা। কিন্তু এঁদের সৃষ্টির মধ্যে একটি বিশেষ সামাজিক উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। প্রথম স্তরের শিল্পী রবীন্দ্রনাথ। দ্বিতীয় স্তরের শিল্পী বার্নাড শ'। ত্রৈলোক্যনাথ এই দ্বিতীয় স্তরের সাহিত্যিক। যাঁরা সাহিত্যিক সংস্কারক তাঁদের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র

ব্যঙ্গ। ত্রৈলোক্যনাথের তূণে শ্রেষ্ঠ বাণগুলি হাসির। মৃদু হাসি অধরের কোণে ফুটতে না ফুটতে হঠাৎ দমকা হাসিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে। পরক্ষণেই সেই হাসিই আবার মিলিয়ে যায় এবং বজ্রের আগে বিদ্যুতের মত প্রবল ব্যঙ্গের আগে হাসির স্পর্শ লাগে।) ত্রৈলোক্যনাথের সমকালেই অনেকেই এই ব্যঙ্গের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বাংলাদেশে সব শ্রেষ্ঠ প্রতিভাই ব্যঙ্গে অল্প-বিস্তর হাত দিয়েছেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নববাবু বিলাসের মধ্যে কোথাও কোথাও ব্যঙ্গের ঝাঁজ আছে। ব্যঙ্গের প্রাবল্য অনুভব করা গেল মাইকেলের প্রহসন দুটিতে। দীনবন্ধুর কোন কোন অংশে। বঙ্কিমে। ইন্দ্রনাথে। কালীপ্রসন্ন সিংহের রচনায়। এই বাংলা ব্যঙ্গ-রচনার ধারায় ত্রৈলোক্যনাথ অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক।

এই ব্যঙ্গের উৎস কোথায়? পৃথিবীর সব দেশেই যে কারণে ও যে সময়ে ব্যঙ্গ-শিল্পীর আবির্ভাব হয় ত্রৈলোক্যনাথ সেই কারণেই সেই সময়ে আবির্ভূত হয়েছেন। ব্যঙ্গ-শিল্পীর দৃষ্টি অতি তীক্ষ্ন—তিনি মানুষের সমাজের অসঙ্গতিগুলিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখান, তিনি সমাজের দুর্নীতিগুলির বিরুদ্ধে আক্রমণ করেন, তাঁর কথা কখনও জ্বালাময়ী, কখনও হাসিতে ছুরির ধার। 'মর্মে যবে মত্ত আশা সর্প সম ফোঁসে', তখন 'শিষ্টতার বাণী' পাওয়া কঠিন। যুগে যুগে জাতির প্রয়োজনে এই ব্যঙ্গ-শিল্পীর আবির্ভাব।) আমাদের সাহিত্যে ব্যঙ্গ-শিল্পীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। ব্যঙ্গ আমাদের জাতীয় স্বভাবের কিছুটা অন্তরায়।(হাসির অন্তরালে দুঃখ জমে জমে কখনও বিদ্যুতের মত জ্বলে ওঠে কখনও সেই দুঃখ অসহ্যভার পীড়িত লতার মত নুয়ে যায়—প্রথমটিতে হয় ব্যঙ্গের জন্ম, দ্বিতীয়টিতে করুণ রস।) বাংলা-সাহিত্যে দ্বিতীয়টির প্রাধান্য। এই (ব্যঙ্গের নানা রূপ—কিন্তু হাসির মধ্য দিয়েই তার প্রকাশ সবচেয়ে বেশী। বাংলাসাহিত্যে রসিক লেখকের অভাব নেই কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর আগের বাংলাদেশে হাস্যরস গবেষণার বস্তু। মুকুন্দরামের মধ্যে হাসির স্পর্শ আছে, তারপরেই ভারতচন্দ্র।) ভারতচন্দ্র আগাগোড়াই হাসতে হাসতে লিখেছেন—সেই হাসিই আবার বক্র হয়ে ব্যঙ্গের পথ নিয়েছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলাসাহিত্যে হাস্যরস ও ব্যঙ্গের বিশেষ কোন ঐতিহ্য ছিল না। (সমাজের যখন ভাঙন আরম্ভ হয়, যখন স্থির অবিচলিত সত্যগুলি পরি-বর্তনের স্রোতে ভেসে যেতে থাকে, অভিজ্ঞতা যখন বিপরীত হতে থাকে তখনই ব্যঙ্গের সূচনা। এই যুগের দু-একজন মঙ্গলকাব্যের কবি পূর্ববর্তী লেখকদের ঠাট্টা করেছেন। কারণ তাঁরা যে স্বপ্নে দেবীর আদেশের কথা বলেছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বিশ্বাস যখন মানুষের কমেছে তখনই সেই জীর্ণ অতীতের বিশ্বাস নিয়ে ব্যঙ্গ করা সম্ভব হয়েছে, ভারতচন্দ্রের পক্ষে লেখা সম্ভব হয়েছে। 'নগর পুড়িলে দেবালয় কী এড়ায়'। আজু গোঁসাই আর রামপ্রসাদের সম্পর্কটিও স্মরণীয়। আজু গোঁসাই যে রামপ্রসাদকে ব্যঙ্গ করেছেন তার মূলে

আছে তাঁর সেই যুগের সংশয়পীড়িত আলোবাতাস। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ-শিল্পীদিগের মধ্যেও দেখা যায় এই যুগাবসানের সময়ে ঐতিহ্য, সংস্কার; ধর্মবিশ্বাস —এগুলিকে ব্যঙ্গ করার প্রবৃত্তি।

ইতিহাসে দেখা গেছে কতকগুলি সময় এক ধরনের রচনার অনুকূল। গ্রীসে পেরিক্লিসের রাজত্ব। ভারতবর্ষে সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল, ইংলণ্ডে এলিজাবেথের রাজত্বকাল সাহিত্যের পক্ষেও স্বর্ণযুগ—বিশেষ করে নাটক বা কবিতার ক্ষেত্রে। আবার এই ব্যঙ্গ রচনারও সময় দেখা গেছে—যুগাবসানে। বলাই বাহুল্য সাহিত্যে কোন রকম 'সাধারণ মন্তব্য' করা কঠিন। তবু দেখা যায় গ্রীসের ট্রাজিডির যুগন্ধরদের মৃত্যুর পরই ব্যঙ্গশিল্পী অ্যারিষ্টোফিনিসের আবির্ভাব, রোমে ওভিডের 'আর্ট অফ লাভে'র মধ্যেও ব্যঙ্গ। ইংলণ্ড ও ফরাসীদেশে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ব্যঙ্গ শিল্পের চরম বিকাশ—জোনাথন সুইফট ও ভলটেয়ারে।

ব্যঙ্গের বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। ব্যঙ্গ-শিল্পীরা সোজাসুজি, স্পষ্টভাবে, তীক্ষ্ণ-ভাবে তাঁদের শর নিক্ষেপ করেন, তার মধ্যে জ্বালা আছে, তার মধ্যে প্রাবল্য আছে। সুইফট, ভলটেয়ার বা বার্নার্ডশ সকলেই তীক্ষ্ণভাবে তাঁদের সেই শর নিক্ষেপ করেছেন। লিলিপুট ও ব্রবডিংনাগ-এর মধ্যদিয়ে সুইফট ব্যঙ্গ করতে চেয়েছেন। সমকালীন ফরাসীদের জীবন নিয়ে তীক্ষ্ণ আঘাত করেছেন ভলটেয়ার। রাশিয়ান শিল্পীর 'ইন্সপেক্টার জেনারেল' সেই সামাজিক তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের নিদর্শন। আবার বার্নার্ডশ ব্যঙ্গ করেন সৈনিকের সাহস, সতীর সতীত্ব, ধর্মের মূঢ়তা। বৈজ্ঞানিক কুসংস্কার নিয়ে। অর্থাৎ সুইফট বা ভলটেয়ার বা গোগোল বা বার্নার্ডশ সকলেই একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চেয়েছেন। উদ্দেশ্যমূলক শিল্পী আরেক স্তরের আছেন তাঁরা ব্যঙ্গ করতে চান না—চিৎকার করে প্রচার করতে চান না কিন্তু সত্যকে ব্যক্ত করতে চান—তাতেই তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। বানার্ডশর ব্যঙ্গের সঙ্গে গলসওয়াদীর নাটকগুলি তুলনা করলে স্পষ্ট হবে। ধরা যাক্ গলসওয়াদীর 'জাষ্টিস'। এই বইটি প্রকাশের পর সারা ইংলণ্ডে জেল আইন সংস্কার হয়েছিল। কিন্তু নাটকে কোথাও ব্যঙ্গ নেই। নীলদর্পণ সারা দেশে আন্দোলন এনেছিল। 'আংকল টমস কেবিন' সারা আমেরিকায় সাড়া এনে ফেলেছিল। অথচ এর মধ্যে ব্যঙ্গ ছিল না। এইগুলি 'Naturalistic' রচনা—'Propagandist' রচনার সঙ্গে এদের তফাৎ এইখানে যে এরা সে সত্যকে নিরপেক্ষভাবে দেখাতে চান, অতিরঞ্জন করতে চান না—নিজের কথাকে বলার জন্য বেশী চেঁচিয়ে বলেন না। কিন্তু ত্রৈলোক্য-নাথ কোন স্পষ্ট সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যঙ্গ করেন নি—তিনি সমাজের বহু জিনিস, বহু প্রথাকেই আক্রমণ করেছেন। সে সব স্থানে তিনি সর্বদাই উচ্চ-কণ্ঠ। কারণ তাঁর উদ্দেশ্য স্পষ্ট। কিন্তু ব্যঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সমবেদনার অভাব থাকলে সাহিত্যিক হওয়া যায় না। মানুষের প্রতি অসীম সহানুভূতি আছে বলেই

ত' শিল্পী মানুষের জন্যই ব্যঙ্গ করেন। মানুষের শুভ চেতনাকে জাগ্রত করার জন্যই তাঁর ব্যঙ্গ। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গগুলি যেমন ক্ষুরধার; যেমন বিদ্যুৎদীপ্তির মত তীক্ষ্ম তেমনই সমবেদনায় সজল। এই দুটি গুণ না থাকলে যথার্থ ব্যঙ্গশিল্পী হওয়া যায় না—শুধু ব্যঙ্গ করাই চলে।

ঊনবিংশ শতাব্দী বাংলা সাহিত্যের দিক পরিবর্তনের সময়। নূতন সভ্যতা ও সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হয়ে বাংলাদেশে বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। একদিকে প্রাচীনের অন্ধতা, ধর্মের মূঢ়তা, অন্যদিকে নূতন শিক্ষিত বাংলাদেশের যুবক সম্প্রদায়, ইংরেজি সভ্যতার প্রতি অন্ধ মোহ। একদিকে দেশভক্তির ভণ্ডামী, অন্য দিকে নানা সামাজিক নোংরামি। এরই মধ্য থেকে উদ্ভূত হয়েছিল বিদ্যাসাগরের ব্যঙ্গ রচনা, মাইকেলের প্রহসন আর হুতোমের তীক্ষ্ম নক্সাগুলি। বঙ্কিমের লোক-রহস্য, মুচিরামগুড় ও কমলাকান্তের দপ্তর সেই যুগের প্রতি ব্যঙ্গ। আর সেই তীক্ষ্ম ব্যঙ্গ ইন্দ্রনাথে। ইন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে আমি হাসাবার জন্য কলম ধরি নি—দেশের ভণ্ডামী ও অন্তঃসারশূন্যতাকে আক্রমণ করার জন্যই তিনি লিখেছেন। ইন্দ্রনাথের সেই অসাধারণ ব্যঙ্গঃ

নিতান্তই যাবে যদি হৃদয়বল্লভ
নিতান্ত দাসীর কথা না রাখিবে যদি
(ফুকারি কান্দিয়া এবে উঠিলা বিপিন)
আলুভাতে ভাত তবে দিই চড়াইযা
খাইয়া যাইবে যুদ্ধে।

এই সময়ে প্রধানত ধর্মে ধর্মে ব্যঙ্গ ছিল নিত্যকার ব্যাপার। ত্রৈলোক্যনাথ অবশ্য ব্যঙ্গের ক্ষেত্রে সাধারণত অবলম্বন করেছিলেন মানুষের নির্দয়তা, মানুষের অভদ্রতা—সংক্ষেপে মনুষ্যত্বের অপমানের বিরুদ্ধেই ছিল তাঁর ব্যঙ্গ। সেই সঙ্গে অন্ধ গোঁড়ামি ও সমাজের ধার্মিকতার বিরুদ্ধে ছিল তাঁর আঘাত।

কিন্তু তাঁর কোন রচনাই এই উদ্দেশ্যমূলকতার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি—কোন রচনাই বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। বরং প্রত্যেক রচনাই তাঁর রচনার গুণে আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের জন্য তিনি বিলাসী দেশসেবকের মত চিন্তা করতেন না—করতেন প্রকৃত মানুষের মতই। তাই তাঁর সাহিত্যে একটি নিরুদ্ধ বেদনা স্তব্ধ হয়ে আছে। তিনি একদা ভেবেছিলেন যে "এই স্বর্ণভূমি ভারতভূমিতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত না হইতে পারে এইরূপ কার্যে আমার মনকে নিয়োজিত করিব।"—কিন্তু একথাও জানতেন "সকলেই আপনার নিজের স্বার্থের জন্য ব্যস্ত"। ত্রৈলোক্যনাথের বেদনা এই বৃহৎ দেশের অসংখ্য মানুষের প্রতি, আঘাত ঐ "নিজের স্বার্থের জন্য ব্যস্ত" মহাত্মাদিগের প্রতি।

ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্যজীবন তাঁর কর্মজীবনের অতি স্বল্পাংশ। অর্থাৎ তিনি

সমগ্র জীবন সাহিত্যে উৎসর্গ করেন নি। এদিক থেকে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর ঐক্য। তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ ইংরাজিতে লেখা। সাহিত্যসাধক চরিতমালায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সে বর্ণনা দিয়েছেন। ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ—বিজ্ঞান ইত্যাদিও তিনি লেখেন। এছাড়া একটি অভিধান প্রণয়নে তিনি উৎসাহী হন।

ত্রৈলোক্যনাথ বাংলাসাহিত্যে যেমন ঐতিহ্যবহির্ভূত নন—তেমনই তিনি এ সাহিত্যে একক নন—বর্তমান বাংলা সাহিত্যেও তাঁর শিষ্য রয়েছেন। গড্ডলিকা কজ্জলীর শিল্পী যে ত্রৈলোক্যনাথের উত্তরসাধক সে কথা অতি স্পষ্ট।

ত্রৈলোক্যনাথ বিস্মৃতপ্রায় শিল্পী। তাই তাঁর জীবন ও তাঁর পরিবেশের এই কয়েকটি কথা বলার দরকার ছিল। তাঁর ছোটগল্পের আলোচনায় তাঁর মনোভঙ্গীটি আমাদের প্রয়োজনীয়।

ত্রৈলোক্যনাথের প্রথম সাহিত্য গ্রন্থ 'কঙ্কাবতী' ১২৯৯ সালে (১৮৯২ খৃঃ) রচিত। এর চার বছর পরে তিনি সরকারী কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তখন তাঁর বয়স ৪৯। তাঁর অন্যান্য সমস্ত গ্রন্থ এই অবসরকালীন রচনা।

তাঁর এই ছোটগল্পগুলি বইতে সংকলিত হয়েছে—

(১) ভূত ও মানুষ ১৮৯৭

বাঙাল নিধিরাম১; বীরবালা২; লুল্লু, নয়নচাঁদের ব্যবসা৩

(২) মুক্তমালা ১৯০১

(৩) মজার গল্প ১৯০৫

(৪) ডমরু চরিত ১৯২৩

মুক্তমালা, মজারগল্প ও ডমরু চরিতে যথাক্রমে পাঁচটি, আটটি ও সাতটি গল্প আছে। অর্থাৎ তাঁর গল্প সংখ্যা ২৪টি। এই ২৪টি গল্প ১৮৯৭ থেকে ১৯২৩ অর্থাৎ পঁচিশ বৎসরে লিখিত হয়েছে। তাঁর কর্মজীবনের শেষে তিনি সাহিত্যে যেমন আনন্দ খুঁজেছিলেন ও দিয়েছিলেন তেমনই তাঁর সমগ্র জীবনের অনুভূতি যা লাভ করেছিলেন তাকে ব্যঙ্গের আকারে প্রকাশও করেছেন।

তাঁর সমস্ত রচনার সুর বলা চলে দুটি—রঙ্গ ও ব্যঙ্গ। এই দুটিই সর্বত্র মিশে আছে২ এই কথা মনে রেখে তবে তাঁর সাহিত্য বিচারে প্রবৃত্ত হতে হবে।

বাংলাদেশের যে গল্পের ঐতিহ্য তা এক অর্থে ত্রৈলোক্যনাথের মধ্যে পরিপূর্ণ প্রকাশ লাভ করেছে। বাঙালী শিশু ঠাকুরদাদা ঠাকুরমার কাছে যে গল্প শুনেছে; মধুমালা, কাঞ্চনমালার কাহিনী; বাঙালী বৈঠকখানায় বসে যে সমস্ত গল্প করেছে

১। প্রথম প্রকাশ জন্মভূমি ১২৯৯-১৩০০
২। প্রথম প্রকাশ জন্মভূমি ১২৯৯-১৩০০
৩। প্রথম প্রকাশ জন্মভূমি ১৩০১-১৩০২

কখনও ভূতের কখনও বাঘের—সেই ধারাটি সম্পূর্ণ মৌখিক। এই গল্পগুলি কখনও লিখিত হয়নি—লিখিত হলে তাদের স্বাদ যায় হারিয়ে। রূপকথার অর্ধেক কলা বক্তৃীর উচ্চারণে, বক্তৃীর কণ্ঠস্বরে। রাত্রির অন্ধকারে, ম্লানদীপের আলোয়, ঠাকুরমার ভাঙাকণ্ঠে রূপকথার দেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সাত সমুদ্র তের নদীর পারে যে অবাক দেশ—যেখানে রাজকন্যা পালঙ্কে ঘুমায়—সেই দেশ কল্পনার সোনারকাঠির স্পর্শে জেগে ওঠে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশত এই আশ্চর্য মৌখিক গল্প-ধারাকে আমরা ধরে রাখতে পারিনি।

একদিকে যেমন রূপকথার ধারা অন্যদিকে তেমনই বৈঠকী গল্পের ধারা ছিল। বৈঠকী গল্পেরও দুটি ধারা। একটি চূর্ণক অন্যটি আখ্যানক। চূর্ণক অর্থাৎ অতি ছোট ছোট কাহিনী। বিদ্যুৎ চমকের মত একবার দেখা দেয় আর সেইখানেই গল্প শেষ হয়। যেমন কালিদাস নিয়ে অজস্র কাহিনী চলিত আছে, যেমন বিক্রমাদিত্য নিয়ে কাহিনী চলিত আছে। আমাদের দেশেও অতি ছোট ছোট গল্প চলিত আছে। সেগুলি কেউ কোনদিন লিপিবদ্ধ করেনি কিন্তু সেগুলি বৈঠকী গল্প। কোনটি বিশুদ্ধ রঙ্গ কৌতুকের জন্য, কোনটি বা ব্যঙ্গ, কোনটি বা একটু বুদ্ধি মিশ্রিত চমক। কোন কোনটি গ্রাম্য। যেমন গোপাল ভাঁড়ের গল্প ধরা যেতে পারে।

বৈঠকী গল্পের দ্বিতীয় ধারা হল বড় গল্প। দীর্ঘ কাহিনী। এবং কাহিনীই তার প্রধান অংশ। কোন ভাব গভীরতা বা ব্যঞ্জনা সৃষ্টি নয়। ছোটগল্পে যেমন অতর্কিত শেষের আভাস তেমন নয়। এই গল্পগুলি সাধারণত ভূতের, বাঘের, শিকারের, সন্ন্যাসীর, কোন কোন ঘটনা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে—বেশীর ভাগ ঘটনাই আজগুবি ও অতিরঞ্জিত। আজগুবি ও অতিরঞ্জন এই সমস্ত গল্পের প্রাণ। বাংলাদেশের কথক যেমন নিজের খুশিতে রামায়ণ মহাভারত কাহিনীগুলিকেও নিজের মত করে বলেন, মহাকাব্যের নায়কদেরও বাংলাদের পারিবারিক জীবনের ফ্রেমে ফেলে—তেমনইভাবে এই বৈঠকী গল্পের কথকেরাও সম্ভব অসম্ভবের জগতে বিচরণ করেন। ত্রৈলোক্যনাথ বাংলাগল্পে এই বৈঠকী গল্পের ধারা প্রবর্তন করেন। অর্থাৎ বলা চলে যে মৌখিক গল্পধারা এতদিন নানাভাবে ছড়িয়েছিল তিনি সেই গল্পধারাকে লিখিত সাহিত্যে এনেছেন। ত্রৈলোক্যনাথের এইটিই সবচেয়ে বড় দান।

ত্রৈলোক্যনাথকে গল্প লেখক অপেক্ষা গল্প কথক বলা বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর গল্পগুলি পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি এক অদৃশ্য বৈঠক কল্পনা করেছেন এবং তাদেরই উদ্দেশ্যে তিনি গল্প বলে চলেছেন। কথোপকথনের ভঙ্গীটি কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। যে সময় তিনি এই গল্পগুলি লিখেছেন তখন বঙ্কিমচন্দ্র অস্তমিত। রবীন্দ্রনাথের বয়স সাঁইত্রিশ। অর্থাৎ গল্পগুচ্ছের গল্পগুলি ত্রৈলোক্য-নাথের সমসাময়িক। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হননি। বিশেষত তাঁর ভাষাশৈলী সম্পূর্ণ পৃথক। মনে হয় এর পেছনে শুধুই

ত্রৈলোক্যনাথের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য তা নয়—ত্রৈলোক্যনাথ ঐতিহ্যের যে অংশকে অনুসরণ করেছেন তারই ফল। সে হল আমাদের সনাতন মৌখিক ধারাকে অনুসরণ। এই কথা বলার ভঙ্গী অনেক পরিমাণে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বেনের মেয়ে বা বাল্মীকির জয়ের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়।

ত্রৈলোক্যনাথ এই মৌখিক ধারাটি যে শুধু অনুসরণ করেছিলেন তাই নয়, তাকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করেছিলেন। তাঁর চরিত্রগুলির কথাবার্তা সাধুভাষায় (অর্থাৎ হইতেছে, যাইতেছে প্রভৃতি ক্রিয়াযুক্ত বাক্যে) কিন্তু সেগুলি এত জীবন্ত যে কোথাও আমাদের মনে কোন ধাক্কা দেয় না. দুই একটি উদাহরণই যথেষ্ট হবে।

(১) এই কথা শুনিয়া মাছেরা সব বলিল, "ওহো বুঝেছি বুঝেছি? রাজপোষাক না পাইলে কঙ্কাবতী রাণী হইবে না। রাঙা কাপড় চাই, মেঘের মত পোষাক চাই, তবে কঙ্কাবতী রাণী হইবে।" কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—'না গো না' রাঙা কাপড়ের জন্য নয়। সাজিবার গুজিবার সাধ আমার নাই। একেলা বসিয়া কেবল কাঁদি, এখন আমার এই সাধ।'১

(২) মেয়েকে কিনারায় রাখিয়া সাপটি আস্তে আস্তে তাহার গলার পাক খুলিয়া দিল। তখন মেয়ে নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিল। নিঃশ্বাস ফেলিয়া মেয়ে ভূমি হইতে উঠিল। তখন সাপটি কুলোপানা চক্র ধরিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। আমার মেয়ে সেই ফণার উপর স্নেহের সহিত ধীরে ধীরে চাপড়াইয়া তাহাকে অনেক আদর করিল। আহ্লাদে আটখানা হইয়া সাপটি হাসিতে লাগিল। এইরূপে আমোদ আহ্লাদ করিয়া সেদিন বনে চলিয়া গেল। তাহার পরদিন সকালবেলা দেখি যে. সেই সাপটি পুনরায় আবার আমার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। আমার মেয়ে তখন ধামি করিয়া মুড়ি খাইতেছিল। সুড়-সুড়, সুড়-সুড় করিয়া সাপটি তাহার নিকট গিয়া বসিল। চিনিতে পারিয়া ধামি হইতে আমার মেয়ে তাহাকে দুই গাল মুড়ি দিল। কুড়-কুড় কুড়-কুড় করিয়া সাপ বসিয়া বসিয়া সেই মুড়িগুলি খাইয়া সে পুনরায় বনে চলিয়া গেল। এইরূপে প্রতিদিন সকালবেলা আমার মেয়ের কাছে সে মুড়ি খাইতে আসে। বিশ্বাস না করেন, চলুন আমার বাড়ী গিয়া দেখিয়া আসিবেন।২

ত্রৈলোক্যনাথের সমস্ত রচনারীতিকেই তাই বৈঠকীরীতি বা মৌখিক গল্পধারার অনুসৃতি বলা চলে। কঙ্কাবতী ছেড়ে দিলাম, 'মুক্তমালাতে' প্রতিটি গল্পেই আসর জমানো ভাব, ডমরু চরিতেও তাই। এবং এই মৌখিক রীতির অনুসৃতির ফলেই তাঁকে যেমন অদৃশ্য বৈঠকের কল্পনা করতে হয়েছে তেমনই এই মৌখিক রীতির টানেই তাঁর গল্পের মধ্যেও তিনি বৈঠকের সৃষ্টি করেছেন—ডমরু বা নয়নচাঁদ বা সুবল গড়গাড়ি এ'রাই আসরের মধ্যমণি—এবং তাঁদের ঘিরে কয়েকটি শ্রোতা বসে

১। কঙ্কাবতীঃ দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, জলে
২। মুক্তামালাঃ দ্বিতীয় অধ্যায়, মূল্যবান তামাক ও জ্ঞানবান সর্প

ছেন। (বক্তারা যেমন সম্ভব অসম্ভবের জগতে বিচরণ করেন তেমনই আবার কোন কোন অতি বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন শ্রোতা আবার গল্পের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ করেন —কিন্তু তবু সবাই গল্প শোনেন। বাংলাদেশের এই ধারাটি লিখিত সাহিত্যের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথের হাতেই প্রথম চরম মর্যাদা পেল এবং তাঁর সাহিত্যরীতি বিচারের প্রথম সূত্রই হল এই বৈঠকী রীতি। তাঁর সমস্ত গল্পই মৌখিক ধারার অনুসরণ বা এক নূতন ধরনের কথকতা।)

ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের রীতি কথকতার। সেই সূত্রেই তিনি আরেকটি জিনিষ অর্জন করেছেন। সেটি হল গল্পের অনিঃশেষিত দৈর্ঘ্য। একটি গল্প যেখানেই শেষ হয় সেখানেই আরেকটি আরম্ভ হয়। বাংলাদেশের কোন প্রধান লেখকের রেখায় এই ধর্মটি আগে দেখা যায়নি। যদিও আমাদের সাহিত্যে এর নজীর ছিল অজস্র। ধরা যাক রামায়ণ মহাভারত। যেখানেই রাম সীতা লক্ষ্মণ কোন ঋষির সঙ্গে দেখা করলেন তিনিই একটি গল্প বললেন, সেই গল্পের সূত্রে আবার একটি গল্প মনে পড়ল। গল্পের পরে গল্প। একটি বৃক্ষকে ঘিরে যেমন অজস্র লতা মঞ্জরিত হতে পারে তেমনিই রামায়ণ মহাভারতের মূল মেরুদণ্ডের ওপরে হাজার হাজার গল্প পুষ্পিত হয়েছে। আরো উদাহরণ আছে বত্রিশ সিংহাসন বা বেতাল পঞ্চবিংশতি। বত্রিশটি পুতুল বিক্রমাদিত্যের বত্রিশটি কাহিনী বলল। বেতাল পঁচিশটি কাহিনী শোনাল বিক্রমাদিত্যকে। কাহিনীর পরে আবার কাহিনী। কিংবা এই জিনিষ পেয়েছি আরব্য উপন্যাসে, এক হাজার রাত্রি ধরে এক হাজার কাহিনী। ইউরোপেও বোকাশিওর ডেকামেরন কিংবা চসারের ক্যান্টারবেরি টেলস্-এর মধ্যেও এই অনিঃশেষ গল্পধারা। বাংলাদেশে বত্রিশসিংহাসন ও বেতাল পঞ্চবিংশতি এবং আরব্যোপন্যাস ঊনবিংশ শতাব্দীতে অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ ছিল। তার অনুবাদ হয়েছে অনেক। ত্রৈলোক্যনাথ সেই গল্পধারার রীতিটিকে গ্রহণ করলেন।

আগেই বলেছি এই গল্পধারার বা গল্পশৃংখলের দুটি রীতি বাংলা সাহিত্যে দেখেছি :

(১) মূল গল্পটি চলতে চলতে হঠাৎ থেমে যায় ও মাঝখানে একটি গল্প হয়ে যায়। বাক্যের মাঝখানে 'Parenthesis'-এর মত।
মহাভারতে দুষ্মন্ত শকুন্তলার কাহিনী প্রথম স্তরের উদাহরণ। অন্য-পক্ষের বত্রিশসিংহাসন বা বেতাল পঞ্চবিংশতি দ্বিতীয় স্তরের উদাহরণ। ত্রৈলোক্যনাথ দুটি রীতিকেই অনুসরণ করেছেন।

(২) একটি একটি গল্প শৃংখলের মত লেগে থাকে—একটি যেখানে শেষ হয় হয়—আরেকটি সেখানে আরম্ভ হয়। উদাহরণ দিয়ে স্পষ্ট করি। যেমন লল্লু কাহিনীতে তৃতীয় অধ্যায় 'তাঁতি' অংশটি এই ধরনের একটি গল্প—মূল গল্পের সঙ্গে তার যোগ সামান্য—কিন্তু যোগ আছে এবং অংশটি একটি গল্প।

আবার ডমরু চরিতের গল্পগুলি শৃঙ্খলিত। প্রথমটি প্রথম রীতির উদাহরণ. দ্বিতীয়টি দ্বিতীয় রীতির উদাহরণ।

নয়নচাঁদের ব্যবসা প্রথম রীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে মূল গল্প 'নয়নচাঁদের ব্যবসা'। কিন্তু মাঝে মাঝে অনেকগুলি গল্প হঠাৎ এসেছে—যেমন কথায় কথা ওঠে—তেমনিই গল্পের স্রোতে এগুলি বুদ্বুদ। এই গল্পটিতে এইরূপ কয়েকটি গল্প আছে। যেমন

(১) আঠারোর গল্প
(২) সুবল ঘোষের গল্প
(৩) কর্তাভূতের গল্প
(৪) নেই আঁকুড়ে দাদা
(৫) এঁড়ে গরু

অর্থাৎ মূল গল্পটির ভেতরে এই পাঁচটি গল্পের স্পষ্টভাগ আছে। সেগুলি আলাদা করে দেখালাম। এই গল্পগুলি বাদ দিলে মূল গল্পের কোন ক্ষতি হত না। কিন্তু এই রীতিটিই ত্রৈলোক্যনাথের বৈশিষ্ট্য। এই প্রবণতা তাঁর তথাকথিত উপন্যাসগুলিতেও স্পষ্ট। তাঁর কঙ্কাবতীও এই গল্পের শতদল।

রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের মধ্যে যেমন গ্রামবাংলা তার রূপ, তার সমাজ ও তার নরনারী নিয়ে পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশ করেছে—ত্রৈলোক্যনাথের রচনায় বাংলাদেশের আর একটি রূপ প্রকাশিত। সেখানে সৌন্দর্য কম, প্রত্যক্ষতা কম নয়। তাঁর গল্পগুলির প্রধান চরিত্রগুলি অত্যন্ত ধড়িবাজ ও ঠক্। তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা ভাঁড়ু দত্তের বা ঠক্চাচার। তাঁর গল্পগুলি নরনারীর চেয়েও ভূতপ্রেতের সংখ্যা বেশী। এবং দুই-একটি ভূত অত্যন্ত জীবন্ত—বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

ভূত প্রেত ডাকিনী শাকচুন্নি তাঁর গল্পগুলিতে পরিপূর্ণ। অর্থাৎ আমরা যাঁদের তথাকথিত বাস্তবপন্থী লেখক বলি ত্রৈলোক্যনাথ তাঁদের অন্তর্ভুক্ত নন। কারণ শুধুই যে তিনি ভূত প্রেত ইত্যাদি অপ্রাকৃত লোকের অধিবাসীদের সাহিত্যে আমন্ত্রণ করেছেন তাই নয় তিনি বিচিত্র উদ্ভট কল্পনা করতে ভালবাসেন; ভূতকে কলে ফেলে তার তেল নিষ্কাষণ করেন এবং কলুও তাতে বিস্মিত হয় না বরং সরিষা বা তিলের মত ভূতকে পেষার সময় সে উদাসীন থাকে। হঠাৎ বাঘের ছাল থেকে দেহটা বেরিয়ে যায়, কিংবা সাপ এসে ছোটদের চুলের ফিতা হয়, কখনও বা গরুর দড়ি হয়। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পলোকে এক টাকায় কিছু ভূমিকম্প কিনতে পাওয়া যায়, কলকাতার গীর্জার শিখরে তিন চার দিন ধরে একটি লোক বায়ুযোগে চারিদিক ঘোরে এবং ক্ষুধার্ত অবস্থায় যে কাক ধরে খায়। কোথা থেকে কয়েকজন সন্ন্যাসী আবির্ভূত হয় এবং পরে দেখা যায় সমস্ত সিন্দুক বাক্স, যাবতীয় লোহার

জিনিষ রাস্তা দিয়ে চলে যায় কারণ সন্ন্যাসীদের কালীমূর্তির মধ্যে বিরাট চুম্বক থাকে। তাঁর রাজ্যে স্বর্গমর্ত্য পাতালে বিশেষ ব্যবধান নেই, কারণ তাঁর কাহিনীর নায়কেরা কয়েকবার যমরাজের সঙ্গে দেখা করেছে—কেউ কেউ আবার যমরাজার পশ্চাতে গরু লেলিয়ে দেয়। কেউ বাঘের পেটের ভিতরে বসে চিঠি লেখে এবং সেই চিঠি পেয়ে তাঁকে লোকে উদ্ধার করে। কুমীরের পেটে বসে কেউ কেউ বেগুণ বিক্রি করে। ঝিনুকের পেটে শুয়ে কেউ কেউ সমুদ্র পাড়ি দেয়।

অর্থাৎ ত্রৈলোক্যনাথের গল্পলোকের আকাশ 'আবোল তাবোলের' আকাশ। Fantasy-র আকাশ। সেখানে প্রশ্ন নেই, সেখানে অবান্তর জিজ্ঞাসা নেই—সেখানে শুধু গল্প, শুধু গল্প। বৈঠকীর রীতির চরম সার্থকতা এইখানে। এখানে দুই-একটি উদ্ধৃতি দিয়ে কথাটিকে ব্যাখ্যা করি। উদ্ধৃতি দেওয়া খুবই কঠিন কাজ কারণ উদ্ধৃতি দেবার লোভ সংবরণ করাই কঠিন।

> (১) কলুর বাড়িতে উপস্থিত হইয়া আমির কলুকে বলিলেন, "কলু ভায়া, আমার একটি বিশেষ উপকার করিতে হইবে। এই বাঁশের নলটির ভিতর আমি একটি ভূত ধরিয়া আনিয়াছি, যদি অনুগ্রহ করিয়া ভূতটিকে ঘানিতে মাড়িয়া তেল বাহির করিয়া দেন, তাহা হইলে আমার বড়ই উপকার হয়।"
>
> কলু বলিল—তার আটক কি। এখনই দিব। তিল সরিষা তিসি পোস্ত কত কি পিষিয়া তেল বাহির করিলাম, আজ একটু ভূতের তেল বাহির করিয়া দিব। সে আর কি বড় কথা।

'ভূতের তেল' বস্তুটি আবিষ্কারের মধ্যে যে অসাধারণ উদ্ভট কল্পনার শক্তি আছে তার সঙ্গে পরিবেশ রচনার শক্তিটিও মিশেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখক হলে দেখা যেত যে কলু এই প্রস্তাবে বিস্মিত হত। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথের কলুর ভাব দেখে মনে হয় সে ইতিপূর্বে যে কত ভূতের তেল বের করেছে।

> (২) প্রাণের দায়ে ঘোরতর বলে বাঘ শেষকালে যেমন এক হেঁচকা টান মারিল, আর চামড়া হইতে তাহার আস্ত শরীরটা বাহির হইয়া পড়িল। অস্থি-মাংসের দগদগে গোটা শরীর, কিন্তু উপরে চর্ম নেই। পাকা আমের নিচের দিকটা সবলে টিপিয়া ধরিয়া যেরূপ আঁটিটা হড়াৎ করিয়া বাহির হইয়া পড়ে বাঘের ছাল হইতে শরীরটি সেইরূপ বাহির হইয়া পড়িল।
>
> (৩) বলিব কি ভাই, দুঃখের কথা, কুমীরের পেটের ভিতর দেখি না যে, সেই সাঁওতালী মাগী, চারদিন পূর্বে কুমীর যাহাকে আস্ত ভক্ষণ করিয়াছিল, সেই মাগী পূর্বদেশীয় সেই ভদ্রমহিলার সমুদয় গহনাগুলি আপনার সর্বাঙ্গে পরিয়াছে, তাহার পর নিজের বেগুনের ঝুড়িটি সে উপুড় করিতেছে, সেই বেগুনগুলি সম্মুখে ডাঁই করিয়া রাখিয়াছে। ঝুড়ির উপর বসিয়া মাগী বেগুন বেচিতেছে।
>
> (৪) ক্রমে যাহা ভয় করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিল। সেই ভূত গাছের

> মাথার নিকট গিয়া উঠিল, আর সেই সময় পাতাগুলি সোজা উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল ভূতের সর্ব শরীর ঢাকিয়া ফেলিল, ভূতের কৃষ্ণবর্ণ রক্ত গাছের গা দিয়া দরদর ধারায় বহিয়া পড়িল। অবশেষে ভূতের খোসাটি নিম্নে পতিত হইল।

ত্রৈলোক্যনাথের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে তিনি এই উদ্ভট গল্পগুলিকে কোথাও দ্বিধাসংশায়িত করেননি। অনুরূপ স্থানে অনেক লেখক এতটা স্বাধীনতা নিতে সাহসী হতে পারতেন না—সমস্ত বাস্তব বুদ্ধিতে উড়িয়ে দেওয়া উদ্ভট অসম্ভবের জগতেও বাস্তব পৃথিবীর সংস্কার এসে কল্পনাকে খাটো করে কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবিচলিত। বরং যেখানেই বাস্তব পৃথিবী সেই কল্পনা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছে ত্রৈলোক্যনাথ সেখানে মৃদু ধমক দিয়েছেন। একটি উদাহরণ দিয়ে সেই কথাটি শেষ করব।

> (৫) বাঘের পেটের ভিতর এককোণে বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতেছি। এমন সময় হঠাৎ কে যেন আমাকে বলিয়া দিল—তোমার পকেটে কাগজ ও পেনসিল রহিয়াছে, আবাদের কর্মচারীকে পত্র লেখ না কেন? আমার তখন ভরসা হইল। পকেট হইতে কাগজ পেনসিল বাহির করিয়া আমি আমার কর্মচারীকে এইরূপ এক চিঠি লিখিলাম—পীর গোরচাঁদের কোপে আমি পড়িয়াছি। তাঁহার ব্যাঘ্র আমায় গ্রাস করিয়াছে। সেই ব্যাঘ্রের উপরে আমি আছি। যদি কোনরূপে আমাকে উদ্ধার করিতে পার, তাহার চেষ্টা কর।...লম্বোদর বলিলেন, তাত' সব হইল। কিন্তু একটা কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি। ব্যাঘ্রের পেটের ভিতর হইতে তোমার কর্মচারীর নিকট সে চিঠি তুমি কি করিয়া পাঠাইলে? কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত নীরব থাকিয়া ডমরুধর উত্তর করিলেন, দেখ লম্বোদর! সকল কথার খোঁচ করিও না। এইমাত্র তোমাকে আমি বলিতে পারি যে, বাঘের পেটের ভিতর ডাকঘর নাই, সে স্থানে টিকিট বিক্রয় হয় না, সে স্থানে মণি-অর্ডার হয় না। তিরিক্ষি মেজাজ ডাকবাবু সেখানে বসিয়া নাই। পত্র প্রেরণের সমস্যা এইরূপে হেলায় মীমাংসা করিয়া ডমরুধর পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—

এই উদাহরণ থেকে ত্রৈলোক্যনাথের সেই উদ্ভট কল্পনা সৃষ্টি ও হেলায় সমস্ত উড়িয়ে দেবার যে মনোভঙ্গি তা রয়েছে। তাই ত্রৈলোক্যনাথ উদ্ভট সৃষ্টির জগতে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। এ বিষয়ে সুকুমার রায়েরও তিনি অগ্রণী। লুইস কারল বা সুকুমার রায় বা এডওয়ার্ড লিয়ার যেমন স্বচ্ছন্দে উদ্ভটের স্রোতে ভেসে যেতে চেয়েছেন—ত্রৈলোক্যনাথও বহুক্ষেত্রে তাই করেছেন এবং ত্রৈলোক্যনাথ সেদিক থেকে শ্রেষ্ঠ। বাংলাসাহিত্যে এ বিষয়ে তাঁকে কেউ অতিক্রম করতে পারে নি। এই উদ্ভট সৃষ্টির আরেকটি নিদর্শন 'সে'। রবীন্দ্রনাথের উচ্চতর কল্পনা মায়া সৃষ্টি করে। কিন্তু যথার্থ উদ্ভট সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। তাই রবীন্দ্রনাথের 'সে'র ভূতের গল্প ও ত্রৈলোক্যনাথের নাকেশ্বরী বা নারিকেলমুখীর গল্প পাশাপাশি রাখলে স্পষ্টই বোঝা যায় ত্রৈলোক্যনাথ এ-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। কারণ রবীন্দ্রনাথের কল্পনা বস্তুকে ভাবের

আকাশে নিয়ে যায়, দূরকে নিকটে আনে—সে এক দৈবী মায়া। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ সেই কল্পনার অধিকারী নন। কিন্তু তিনি অধিকারী উদ্ভট রাজ্যের—যেখানে তিনি একক ও অদ্বিতীয়।

ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্যলোকের আকাশ উদ্ভট কল্পনার কিন্তু ভূমি সামাজিক। তাঁর এই চরিত্রগুলি বা তাঁর পদ্ধতিগুলি (যেমন স্বপ্ন, ভূতপ্রেতের কথাবার্তা, জীবজন্তুর পরিচয়) এইগুলি ব্যঙ্গের উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। সুইফট বা সার্ভেন্টিস এইভাবেই ব্যঙ্গের পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। গ্যালিভারস ট্রাভেল্স রূপক কাহিনী—ডনকুইকসোটও তাই। ডনকুইকসোট ও গ্যালিভারস ট্রাভেল দুটি গ্রন্থেই বিদ্রূপ ও শ্লেষ আছে। ত্রৈলোক্যনাথের ভূতপ্রেত, স্বপ্ন ইত্যাদি অবাস্তব ব্যাপারগুলিও তাঁর ব্যঙ্গের পথ। তাঁর ব্যঙ্গ দুটি পথ নিয়েছে। কখনও ভূতপ্রেত বা জীবজন্তুর মধ্যে--কখনও স্বয়ং, মানব-চরিত্রের মধ্য দিয়ে। দুটি দিকই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা যাক।

কঙ্কাবতীর মিস্টার গামিশ চরিত্রটি এক স্পষ্ট উদাহরণ। ব্যঙ্গ এখানে সেকালের শিক্ষিত বাঙালীর প্রতি, যাদের কথোপকথনকালে "মাতৃভাষাকে ঘৃণা"। বঙ্কিমচন্দ্র বাবুতে, লোকরহস্যের আরো দু-একটি স্থানে এই সব মহাত্মাদের আক্রমণ করেছেন। লুল্লুর মধ্যে গোঁ গোঁ ভূতটির মধ্যে তৎকালীন সংবাদপত্রের নিম্নমান ও ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক কথাবার্তার মধ্যে যে নোংরামি থাকত তাকে ব্যঙ্গ করেছেন— 'এতদিনে লোকে মানুষ ধরিয়া সম্পাদক করিতেছিল, কিন্তু মানুষে যা-কিছু গালি জানে, মায় অশ্লীলভাষা পর্যন্ত সব খরচ হইয়া গিয়েছে; সব বাসি হইয়া গিয়াছে। এখন দেশশুদ্ধ লোককে ভূতের গালি দিব।'

আবার হিন্দুধর্মের পুরোধাদের প্রতি তীক্ষ্ম বিদ্রূপ। সমুদ্র যাত্রায় পাপ হয়। ভূতের মুখে সেই কথাটি ত্রৈলোক্যনাথ বসিয়েছেন।

> "ভারতীয় ভূত, ভারতের বাহিরে আমরা যাইতে পারি না। সমুদ্রের অপর পারে পদক্ষেপ করিলে আমরা জাতিকুল ভ্রষ্ট হইল। আমাদের ধর্ম কিঞ্চিৎ কাঁচা। যেরূপ অপক্ব মৃত্তিকা ভাপ জল স্পর্শে গলিয়া যায়, সেইরূপ সমুদ্রপারের বায়ু লাগিলেই আমাদের ধর্ম ফুস করিয়া গলিয়া যায়, তাহার আর চিহ্নমাত্র থাকে না। ধর্মের গন্ধটি পর্যন্ত আমাদের গায়ে লাগিয়া থাকে না। কেবল তাহা নহে, পরে আমাদের বাতাস যাঁহার গায়ে লাগিবে, দেবতা হউন কি ভূত হউন, নর হউন কি বানর হউন তিনিও জাতিভ্রষ্ট হইবেন।"

ত্রৈলোক্যনাথের তীক্ষ্ম দৃষ্টি সমাজের সবার ওপরেই পড়েছে। বিশেষত সহানুভূতির চোখে দেখেছেন যারা অসহায়—তাদের। সে শিশুই হোক অথবা পশুই হোক। তাঁর মুক্তমালায় "গুরুদেব" চরিত্রটি অসাধারণ। তাঁর অসামান্য নিষ্ঠুরতা ও দুষ্ট প্রকৃতির জন্য তিনি বাংলাসাহিত্যে নির্মম সৃষ্টিগুলির একটি।

'আমি বলিলাম,—'ঠাকুর মহাশয়! আপনার ছাগলগুলির বোধহয় বড় জল পিপাসা পাইয়াছে।" গুরুদেব উত্তর করিলেন,—"দুই-এক দিনে সমুদয় শেষ হইয়া যাইবে। জল দিবার আর আবশ্যক নাই।"

আমাদের দেশে ও শাস্ত্রে জীবজন্তুর প্রতি প্রীতি দেখানোব ঐতিহ্য আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দেশে জীবজন্তুর প্রতি যে পরিমাণে অনাদর ও অমানুষিকতা দেখানো হয় তাতে আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির কলঙ্কিত হবার কথা। সমস্ত দেশে পশুবধের মধ্যেও নিষ্ঠুরতা জিনিসটিকে ক্রমশ লুপ্ত করার চেষ্টা করা হয়। শুধু পুণ্য ভারতবর্ষে এই ভয়াবহ প্রথা। অবশ্যই গুরুদেব একটি ব্যতিক্রম। কিন্তু ব্যঙ্গ করার সময় গুরুদেবকেই গ্রহণ করতে হয়। টয়েনবী একটি লেখায় বলেছেন যে পরজন্মে যদি গরু হয়ে জন্মাই যেন ভারতীয় গরু না হই—যেন ইউরোপীয় গরু হই। কারণ ভারতবর্ষ শুধু না মারার অধিকার দেবে—কিন্তু বাঁচবার অধিকার নেই। ইউরোপে হয়ত আমাকে মারা হবে কিন্তু বেঁচে থাকার সময় ঠিক ভাবেই বাঁচব। ত্রৈলোক্যনাথও সেই কথাটি বলতে চেয়েছেন। যে কদিন বেঁচে আছে সে কদিনের অন্নজল দাও। অনেক প্রাচীন সমাজের সেই ভয়াবহ প্রথাকে ব্যঙ্গ করেছেন—যেখানে একাদশীর দিন অল্পবয়সী বিধবা মেয়েকে ঘরের মধ্যে আটকে রাখা হয়েছিল এবং সে ঘরের মেঝে চেটে চেটে পরদিন মারা গেছে। মৃত্যুর পূর্বে একবিন্দু জলও তাকে দেওয়া হয়নি। এবং তার মৃত্যুতে সবাই ধন্য ধন্য করল।

কিংবা যম যখন শুনলেন ডমরু একাদশীর দিন কখনও পুঁইশাক খায়নি তখন তিনি ধন্য ধন্য করলেন। বললেন আজ এই মহাত্মার আগমনে যমলোক পবিত্র হল—ওরে 'বাজা শঙ্খ বাজা'।

আজ হয়ত এই সমস্ত প্রথা দেশ থেকে উঠে গেছে। তাই সেই বীভৎস প্রথার রূপ কল্পনা করেই আমরা শিউরে উঠি। আজ হয়ত তাই এই ব্যঙ্গের রং কিছুটা ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে। সমস্ত ব্যঙ্গেরই তাই বৈশিষ্ট্য। কারণ নিকট ও সাময়িককে নিয়েই ব্যঙ্গ চলে। স্বদেশীয় হিড়িকে যে কত অসাধু লোক নিজেদের পকেট ভারী করেছে তা নিয়েও ত্রৈলোক্যনাথ তাই আঘাত করেছেন।

> (১) আমি এক স্বদেশী কম্পানী খুলিলাম। পূর্বদেশের এক ছোকরাকে চারিদিকে বক্তৃতা করিতে পাঠাইলাম; তার বক্তৃতার ধমকে শত শত গরীব কেরাণী স্ত্রীর গহনা বেচিয়া শেয়ার কিনিল; শত শত দীন দরিদ্র লোকও ঘটিবাটি বেচিয়া আমার নিকট পাঠাইল। তারপর —এ°—এ°—এ°—এ°—গলায় কিরূপ কফ বসিয়াছে। লম্বোদর বলিলেন—কফ কাশিতে আবশ্যক কি স্পষ্ট বল না কেন যে সমুদয় টাকাগুলি তুমি হজম করিয়াছ।
>
> (২) স্বদেশী বক্তাঃ কানে আঙুল দিয়া ইঁহার নিকটে গমন করিলাম। ইঁহার অপর কেহ শ্রোতা ছিল না। কিন্তু একখণ্ড অন্ধকারের উপর দাঁড়াইয়া রাত্রিদিন ইনি বক্তৃতা করেন। শুনিলাম যে, পাতালে অসুরদিগের কানের পোকা হইলে, তাহারা ইঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আগমন করে। পাঁচ মিনিট-কাল ইঁহার বক্তৃতা তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলেই কানের পোকা ধড়পড় করিয়া বাহির হইয়া যায়।

এই ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মধ্যে আছে তাঁর সদা জাগ্রত কল্যাণবোধ। এই উদ্ভট কল্পনা

ও কল্যাণবোধের থেকে জাত ব্যঙ্গ ও সহানুভূতি তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির দুটি পর্যায়।
দিয়েছে।

ত্রৈলোক্যনাথের চরিত্র সৃষ্টির প্রসঙ্গটি এইবার অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাঁর নয়নচাঁদ ও ডমরু বাংলাসাহিত্যের দুটি শ্রেষ্ঠ চরিত্র। ডমরু প্রায় মহাপুরুষ কল্প। এইরূপ একটি চরিত্র সৃষ্টি করলেই যে-কোন সাহিত্যিক অমর হতে পারেন। নয়নচাঁদ ও ডমরু দুজনেই কর্মী পুরুষ—দুজনেই সুযোগ বুঝে লোক ঠকিয়ে কাজকর্ম করায় ওস্তাদ। নয়নচাঁদের সঙ্গে ভূতের দেখা হয়েছে। তিনি যমরাজকেও বিপর্যস্ত করেছেন। এঁড়ে গরু বিতাড়িত যমরাজ স্বয়ং বিষ্ণুর কাছে ছুটেছেন। ভাঁড়ু দত্ত, হীরা বা ঠক চাচা যে শ্রেণীতে বিরাজিত নয়নচাঁদ তাঁদেরই সমগোত্রীয়। কিন্তু ডমরুধরের কোন তুলনা নেই। কারণ তার প্রতিভা বহুমুখী।

ডমরুধর প্রথম বয়সে অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। পরে কৌশলে অন্যকে ঠকিয়ে প্রচুর পয়সা করেছেন। অত্যন্ত কৃপণ কিন্তু মামলা মোকদ্দমায় প্রচুর ব্যয় করেন। তিনি করেন নি এমন কর্ম নেই। স্বর্গমর্ত্য সর্বত্রই তিনি বিচরণ করেছেন, বহু বিপজ্জনক কাজের মধ্যে তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে। তিনি স্বয়ং মা দুর্গার সন্তান। দুর্গা প্রায়ই তাঁর বিপদের দিনে এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। তিনি তিনটি বিবাহ করেছেন। যমরাজের সঙ্গে তাঁর দুবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। বাঘের লেজ ধরে টানাটানির ফলে যে বাঘটির চামড়া খসে গিয়েছিল তিনি তার ছালের মধ্যে আত্মাটি ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন। পাশের বাড়ির লোকের টাকা চুরি করে আত্মসাৎ করেছিলেন। একদিন আড়াই হাজার মশা মেরেছিলেন। ভূতের হাতে কামড় দেবার মত ভয়াবহ কাজও তিনি করেছিলেন। তাঁর একটি পোষা ভূত ছিল, সে রোজ মাছভাজা খেত। ডমরুধরের চরম দাবী হল তিনিই আসলে মাইকেল বা বঙ্কিমচন্দ্রের বইগুলির লেখক। শুধু তাই নয় মাইকেল তাঁকে বেশী পারিশ্রমিক দিতেন না—তবে বঙ্কিম নাকি দুর্গেশনন্দিনী লিখে দেওয়ার জন্য অনেক টাকা দিয়েছিলেন। ডমরুধরের মত চরিত্র যে-কোন সাহিত্যেই সুলভ নয়, বাংলাসাহিত্যেও বিরল। ভাঁড়ু দত্ত, ঠকচাচা, হীরা প্রভৃতি সকলের গুণই তিনি আত্মসাৎ করেছেন। কতলোকের টাকা যে তিনি মেরেছেন তাহার ঠিক নাই, কখনও সন্ন্যাসীর হুজুগে, কখনও স্বদেশীর হিড়িকে। কুমীর একটি সালঙ্কারা মেয়েকে গিলে ফেলেছিল—ডমরুর তখন চিন্তা হ'ল ঐ কুমীরটিকে ধরতে পারলে ঐ অলংকারগুলি পাওয়া যেতে পারে। জাল তাম্রফলক তৈয়ারী করার মত দুষ্টবুদ্ধি তার মাথায় অনবরত ঘুরছে।

এহেন ডমরুর আবার একটু রসবোধও আছে। এবং তাঁর লক্ষ্য নিতান্ত

নিরামিষ নয়। গ্রামপ্রান্তে দুর্লভী বাগদী তাঁর লক্ষ্য। অবশ্য পত্নী এলোকেশীও সম্মার্জনী নিয়ে সদা প্রস্তুত।

ডমরুধর ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্য সৃষ্টির প্রতীক। অর্থাৎ তাঁর উদ্ভট কল্পনা ও সামাজিক ব্যঙ্গের মূর্তিমান বিগ্রহ। ডমরুধর সমাজের বেশ উচ্চপদস্থ পুরুষ। টাকার জন্য যারা করতে পারে না এমন কাজ নেই, ডমরুধর তাঁদেরই প্রতীক। তিনি দুর্গোৎসব করেন কারণ ভক্তি নয়—কারণ ভয়, দেবতার প্রসাদে তাঁর চুরি জুয়াচুরির সুবিধা। প্রজাদের কাছ থেকে চাউল, ঘৃত, মধু, মৎস্য আদায় করার জন্য তিনি সদা প্রস্তুত। ডাক্তারকে তার প্রাপ্য দিতে গররাজি। স্বদেশী কম্পানীর নামে ভয়াবহ, নির্বিকার জুয়াচুরি এবং পরিশেষে নিজের পাপের সঙ্গীদের বঞ্চনা—অর্থাৎ বড় 'ভিলেনের' গুণগুলিও ডমরুধর আয়ত্ত করেছেন। ডমরুধরে শুধু যে ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে যে গলদ তারই প্রতি ব্যঙ্গ আছে তাই নয়—চিরন্তন বাংলাদেশের সার্বজনীন পূজা, স্বদেশী বা ঐ জাতীয় রাজনৈতিক হুজুগ প্রভৃতির অন্তসারশূন্যতা ও কয়েকটি লোকের আপন স্বার্থসিদ্ধির প্রতি কটাক্ষ। ডমরুধরের একটি সৎগুণ বোধহয় অকপটতা—সে তাই আপন মনে সমস্ত কথা খুলে বলে। অবশ্য এটিই তাঁর নৈতিক চরিত্রের সম্পূর্ণ অভাবের ইঙ্গিতবাহী; কারণ সে এই সমস্ত কাজগুলিকে পাপ মনে করে না। অবশ্য তাঁর ধর্মবোধ অন্য—সে পাপ করে বটে—কিন্তু একাদশীর দিন 'পুঁইশাক' ত খায় না। অর্থাৎ সমাজের সর্বত্রই ধর্ম ও জীবনের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তার প্রতি ত্রৈলোক্যনাথের ব্যঙ্গ চিরকালের জন্য। সকাল সন্ধ্যা আহ্নিক করা ও মধ্যাহ্নে কালোবাজারি করা। দেয়ালে গণেশমূর্তি টাঙিয়ে চালে কাঁকর মিশানো বা সেই পরমহংসের বিখ্যাত গল্প 'কেশব কেশব গোপাল গোপাল হরি হরি হর হর' নাম করা—পৃথিবীর সব দেশেই আছে। 'কাঙাল নিধিরাম' গল্পটির মধ্যেও এই ধর্ম ও জীবনের বিরোধের প্রতি তাঁর তীব্র আঘাত। শ্রদ্ধাস্পদ পিতৃদেব বগলে এক বোতল মদ নিয়ে টল্‌তে টল্‌তে আসছেন। পুত্রের সঙ্গে দেখা। পিতার কপালে অবশ্য ফোঁটা তিলকও আছে। একজন বললেন এ কী আপনার হাতে কী। তিনি ক্ষেপে উঠে উত্তর করলেন—হাতে কী—কেন কপালে কী সেটা দেখলে হয় না।

ত্রৈলোক্যনাথের তীক্ষ্ম ব্যঙ্গ এইখানে। ডমরুধর ও নয়নচাঁদ—দুজনেই ঠক ও নৈতিক চরিত্রহীন। এদের মধ্যে দিয়ে সমাজ যেমন আত্মপ্রকাশ করেছে তেমনই লেখকের সমাজ চরিত্র জ্ঞানের প্রকাশও হয়েছে।

সর্বশেষ প্রসঙ্গ হচ্ছে ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের বিচার। প্রকৃতপক্ষে ত্রৈলোক্যনাথ কোন ঠিক ছোটগল্প লেখেন নি—তিনি প্রকৃতপক্ষে "আখ্যানক" লিখেছেন। তিনি গল্প বলতে চেয়েছেন—গল্পের মধ্যে খণ্ড খণ্ড মুহূর্তকে ধরে রাখতে চাননি—বা অনিঃশেষ ব্যঞ্জনার মধ্যে গল্প শেষ করেন নি। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের গল্পের মত

আরম্ভ বা শেষ এখানে আশা করলে অন্যায় হবে। কিন্তু ছোটগল্পের রূপকে একটি নির্দিষ্ট বন্ধনে বেঁধে দেওয়া চলে না। ছোটগল্পে জীবনের রূপ প্রকাশিত হচ্ছে। জীবনের বিচিত্র ঘটনা সমান ব্যঞ্জনাময় নয়। তাছাড়া সব ছোটগল্পই সমানভাবে খন্ড হয়েও অখন্ডতার স্বাদবাহী হতে পারে না। ত্রৈলোক্যনাথেরও হয়নি। তাঁর 'বাঙাল নিধিরাম' গল্পটি একমাত্র গল্প যেখানে একটি গল্প আছে। কিন্তু অন্য গল্পগুলি গল্পশৃঙ্খল। এই গল্পটিকে একটি ভালো গল্প বা ভালো ছোটগল্প বলা চলে না। একটি সুদীর্ঘ কাহিনী—এবং পড়তে মোটামুটি খারাপ লাগে না। হুগোর *'Toilers of the sea'* উপন্যাসের সঙ্গে কাহিনীর আখ্যান কোন কোন স্থানে মিল আছে. 'বীরবালা' কাহিনীটি চলনসই। নয়নচাঁদ, লুল্লু, ডমরুচরিত, মজার গল্প এবং মুক্তামালা সমস্তই বত্রিশ সিংহাসন বা আরব্য উপন্যাসের মত। এগুলিকে তাই পুরোপুরি ছোটগল্প বলা চলে না—এগুলি সমস্তই আখ্যানক।

কিন্তু পৃথিবীর ছোটগল্পের ইতিহাসে দেখা যায় ছোটগল্প কখনও কখনও anecdote বা চূর্ণক মাত্র, কখনও বা আখ্যানক বা Tale ধর্মী, কখনও বা দীর্ঘ কাহিনী। যখন বনফুলের ছোটগল্প পড়ি তখন এই 'চূর্ণকের' স্বাদ, আবার তারাশঙ্করের বা প্রভাতকুমারের ছোটগল্পে 'আখ্যানকের' স্বাদ। দেখা যায় ব্যঙ্গ-শিল্পী ও হাস্যপ্রধান গল্প লেখকদের সাধারণত আখ্যানধর্মী—কারণ আখ্যান ছাড়া ব্যঙ্গ বা হাসি দাঁড়াতে পারে না। অনুরূপ কারণেই ত্রৈলোক্যনাথের গল্প আখ্যানপ্রধান।

কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ যে রবীন্দ্রনাথের ধরণের ছোটগল্প লিখতে পারেন নি তার কারণ অবশ্যই দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য। সেইসঙ্গে লক্ষণীয় যে ত্রৈলোক্যনাথের প্রকৃতিতে 'উদ্ভট সৃষ্টির ক্ষমতা যে পরিমাণে ছিল—কল্পনা সে পরিমাণে ছিল না। উদ্ভট সৃষ্টির জন্যও কল্পনা প্রয়োজন কিন্তু সে কল্পনার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সত্যকার কল্পনা অতীত থেকে ভবিষ্যতে প্রসারিত, খন্ডতার মধ্যেও অখন্ডের আভাস আনে। পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষের মধ্যে সেতু রচনা করে। সেই কল্পনাশক্তি ত্রৈলোক্যনাথের ছিল না। সেইজন্যেই রবীন্দ্রনাথের রীতিতে যে ছোটগল্প চলিত হচ্ছিল তিনি তা গ্রহণ করেন নি।

কিন্তু বাংলাদেশে যে গল্পধারা রবীন্দ্রনাথের আগে প্রচলিত ছিল ত্রৈলোক্যনাথ তারই ধারক। ত্রৈলোক্যনাথের সৃষ্টি নির্জীব নয়। তাঁর ধারা আমরা পরে পরশুরাম ও কখনও কখনও প্রমথনাথ বিশীর মধ্যে লক্ষ্য করেছি। এই দুজনও ব্যঙ্গশিল্পী। ফলে ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে তাঁদের আত্মীয়তা খুবই ঘনিষ্ঠ। প্রমথ চৌধুরীর নীল লোহিত ও ঘোষালের বৈঠকী গল্পে মেজাজ ডমরুকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য প্রমথ চৌধুরী নাগরিক অর্থাৎ বেশী জৌলুষময়। ত্রৈলোক্যনাথের ছোটগল্পগুলি বাংলাসাহিত্যে এই সমস্ত ঐতিহাসিক কারণে স্মরণীয়।

নবম পরিচ্ছেদ

॥ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ॥

১৮৭৩—১৯৩২

রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা ছোটগল্পের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান লেখক ছিলেন প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁকে একসময় বাংলার মপাসাঁ বলা হত। কিন্তু ইদানীং তিনি প্রায় অবহেলিত এবং পাঠকের স্মৃতিতে এখন ধূসর জ্যোতিষ্কের মত শোভা পাচ্ছেন। শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবে তাঁর জনপ্রিয়তা অনেক পরিমাণেই হ্রাস পেয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে সেই জনপ্রিয়তা আরো কমতে থাকে। অথচ একথা সত্য যে প্রভাত-কুমার বাংলা সাহিত্যের শুধুই জনপ্রিয় লেখক নন—একজন শক্তিমান লেখকও।

১৮৯৬ খৃঃ অব্দে প্রভাতকুমারের প্রথম গল্প 'একটি রৌপ্যমুদ্রার জীবনচরিত' প্রকাশিত হয়।১ দ্বিতীয় ছোটগল্প 'ভূত না চোর'। এই দুটি গল্পই বিদেশী গল্পের ছায়ায় লিখিত। কখনও কখনও 'রাধামণি দেবী' ছদ্মনামেও তিনি গল্প লিখেছেন।২ তাঁর ছোটগল্পের গ্রন্থ সংখ্যা বারো।৩

'নবকথা' (১৩০৬) প্রভাতকুমারের প্রথম গল্পের বই। এই বইর ভূমিকায় লিখেছেন, "নবকথার একাদশটি গল্পের মধ্যে 'অঙ্গহীনা', 'হিমানী' ও 'বেনামী চিঠি' প্রদীপ হইতে, 'একটি রৌপ্যমুদ্রার জীবনচরিত' দাসী হইতে পুনর্মুদ্রিত হইল। বঙ্কিম-

১। দাসী (১৮৯৬)

২। 'পূজার চিঠি'—কুন্তলীন পুরস্কার (১৩০৪) গ্রন্থে; প্রদীপ (১৩০৫)এ 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি', 'বেনামি চিঠি', 'অঙ্গহীনা'; প্রদীপ (১৩০৬)-এ 'হিমানী'। 'অঙ্গহীনা' ও 'হিমানী' গল্প দুইটি সচিত্র প্রকাশিত।

৩। 'নবকথা' ১৯০০, 'ষোড়শী' ১৯০৬, 'দেশী ও বিলাতী' ১৯১০, 'গল্পাঞ্জলি' ১৯১৩, 'গল্পবীথি' ১৯১৬, 'পত্রপুষ্প' ১৯১৭, 'গহনার বাক্স' ১৯২১, 'হতাশপ্রেমিক' ১৯২৩, 'বিলাসিনী' ১৯২৭, যুবকের প্রেম' ১৯২৮, 'নূতন বৌ' ১৯২৯, 'জামাতা বাবাজী' ১৯৩১।
গল্পসংখ্যা মোট=১০৯। 'নবকথা'র দ্বিতীয় সংস্করণে আরো ৫টি গল্প ছিল। অতএব মোট গল্পসংখ্যা=১০৯+৫=১১৪টি। এছাড়া ছেলেদের গল্প ৪টি। কোন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়নি।
সাম্প্রতিক কালে 'প্রভাতকুমারের শ্রেষ্ঠ গল্প' (জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত) প্রকাশিত হয়েছে।

বাবুর কাজীর বিচার লেখাটি আমার নহে।" দ্বিতীয় সংস্করণে লিখেছেন 'দেবী' গল্পটির আখ্যানভাগ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমায় দান করিয়াছিলেন'।

এই গ্রন্থের বেশীর ভাগ গল্পই কাঁচা। দেবী ও কুড়ানো মেয়ে ছাড়া অন্যান্য সব-গুলিই অত্যন্ত দুর্বল। সমসাময়িক পত্রিকায় অতি কঠোর সমালোচনাও হয়েছিল। যেমন

> 'হিমানী' শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি রাবিশ গল্প। নামটিতে কবিত্ব আছে, কিন্তু হায় লেখক যদি নাম ফাঁদিয়াই নিরস্ত হইতেন, তাহা হইলে আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইবার অবকাশ পাইতাম।১

দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ষোড়শী'। এই গ্রন্থে কয়েকটি আরো ভাল গল্প পাওয়া গেল। কিন্তু 'নবকথা'র মতই এখানেও বেশীর ভাগ গল্প কাঁচা। কিন্তু মধ্যবিত্ত সমাজে ও দাম্পত্য জীবনের রোমান্স নিয়ে প্রভাতকুমারের যে গল্প আছে—তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন এখানে আছে। 'বউচুরি', 'প্রিয়তম' প্রভৃতি গল্পে তারই নিদর্শন। 'সারদার কীর্তি' গল্পটি রবীন্দ্রনাথের দেওয়া কাহিনীভিত্তিক। কয়েকটি ছোট ছোট নক্সা-জাতীয় লেখাও আছে। সেগুলি যেন একটু অমনোযোগের সৃষ্টি। যেমন 'বাস্তু-সাপ'। কিন্তু এই গ্রন্থেই প্রভাতকুমারের প্রতিভার বিভিন্ন দিকগুলির স্ফুরণ হয়েছে। হাসি বা কৌতুকের সৃষ্টি তিনি অতি সার্থকভাবে করেছেন। তাঁর 'বলবান জামাতা', 'প্রণয় পরিণাম' প্রভৃতি গল্পে। আবার ঈষৎ ব্যঙ্গ 'সচ্চরিত্র' বা 'ধর্মের কল' গল্পে। আবার অতি সার্থক ছোটগল্প সৃষ্টি করেছেন—যেমন 'কাশীবাসিনী' বা 'ভুলশিক্ষার বিপদ' এবং 'অযোধ্যার উপহারে'। 'খুড়ামহাশয়' ও 'গুরুজনের কথা' গল্প দুটিও উপভোগ্য। প্রভাতকুমারের সকল গল্পেরই প্রধান গুণ সুখপাঠ্যতা।

তৃতীয় গ্রন্থ 'দেশী ও বিলাতী'তে প্রথম দুটি গ্রন্থে প্রভাতকুমারের প্রতিভা যে ধারায় স্ফুরিত হয়েছিল তা আরো পরিণতি পেয়েছে। 'আমার উপন্যাস', 'বিবাহের বিজ্ঞাপন', 'প্রতিজ্ঞা পূরণ' প্রভৃতি তার উদাহরণ। ডাক্তারি পাশ করে ছেলে প্রেমের জন্য রাঁধুনি হয়, পুরানো কাগজে বিয়ের বিজ্ঞাপন দেখে রাম আওতারের কাশী যাত্রা করে, কালো মেয়ে বিবাহ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বাঙালী যুবকের অন্তিম অবস্থা কিংবা একদাগ ওষুধের নামে মদ খাওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলি এইসব গল্পের বিষয়বস্তু। উকীলের বুদ্ধি ও খালাস দুটিই ভালো গল্প। ঈষৎ ব্যঙ্গ গল্প দুটিকে প্রাণবন্ত করেছে। 'হাতে হাতে ফল' গল্পটি 'Poetic Justice'-এর চমৎকার দৃষ্টান্ত। এই গ্রন্থের মধ্যে 'প্রত্যাবর্তন' গল্পটি অত্যন্ত সার্থক গল্প। এই গল্পটি পড়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন।

১। সাহিত্য । ১৩০৬ । জ্যৈষ্ঠ । পৃঃ ১৩০

এই গ্রন্থের দ্বিতীয়ার্ধে চারটি গল্প আছে।১ এই চারটি গল্পই বিদেশের পট-ভূমিতে লিখিত। প্রথম গল্পটি বাঙালী ছেলের বিলাতে আগমন ও ক্রমশ তার আচরণ পরিবর্তনের নানা কৌতুকজনক বর্ণনা। শেষ গল্পটি একটি মধুর প্রেমের গল্প। তৃতীয় গল্পটি অসাধারণ ব্যঙ্গোক্তি ও হাস্যরসে পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় গল্পটি সহজ সরল সার্থক ছোটগল্প। এই গল্পগুলি বাংলা গল্প সাহিত্যের নূতন দিগন্ত উন্মোধন করল। বাংলা সাহিত্যে বিদেশী চরিত্র ও পরিবেশ এইবার অতি প্রত্যক্ষ ও সার্থকভাবে এল। এই গ্রন্থটিতে প্রভাতকুমারের প্রায় প্রত্যেকটি গল্পই একটি বিশেষ মান রক্ষা করেছে।

চতুর্থ গল্পগ্রন্থ 'গল্পাঞ্জলি'তে ৬টি গল্প আছে। 'বাল্যবন্ধু' গল্পটি একটু দুর্বল—কিন্তু অন্য সবকটি গল্পই ভালো। 'বিলাত ফেরতের বিপদ' একটি অতি কৌতুককর ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত। 'মাদুলী' গল্পটি সমকালীন স্বদেশীয়ানার প্রতি তীক্ষ্ম ব্যঙ্গ। 'রসময়ীর রসিকতা' আখ্যান রচনার কৌশলে একটি অসাধারণ সৃষ্টি। 'মাতৃহীন' গল্পটিতে লেখকের পিতার সঙ্গে একটি বিলাতী মহিলার প্রেম —ও সেই প্রেম-মহিমার শুভ্রতায় সমগ্র গল্পটি উজ্জ্বল। 'আদরিনী' প্রভাতকুমারের করুণ গল্পগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

পঞ্চম গল্পগ্রন্থ 'গল্পবীথি'তে ৮টি গল্প আছে। এই গ্রন্থটি প্রভাতকুমারের একটি ব্যর্থ সৃষ্টি। 'যুগল সাহিত্যিক' গল্পটিই একমাত্র ভালো গল্প। অন্যান্য গল্পগুলি চলনসই। তাঁর 'লেডি ডাক্তার' গল্পটি প্রথমে 'মানসী'তে প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে সম্ভবত কিছু আপত্তি উঠে। প্রভাতকুমার তাই এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লেখেন যে—

> "সুরবালাকে আমি অসচ্চরিত্রা করিয়া আঁকি নাই। আমি কেবল দেখাইয়াছি যে সে একটি স্বামী সংগ্রহের জন্য ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'husband hunting' বিশেষ রূপ চেষ্টা করিতেছে।......একজন লেডি ডাক্তারকে আমি একটু হীনতর রঙে আঁকিয়াছি বলিয়া সকল লেডি ডাক্তারই ঐরূপ চরিত্রের একথা আমি বলিতেছি না।"

সুবোধ ঘোষের 'সকলি গরল ভেল' কাহিনীটির সঙ্গে এর ক্ষীণ যোগ আছে। ষষ্ঠ গ্রন্থ 'পত্রপুষ্প'। মোট ৬টি গল্প আছে।

'নিষিদ্ধ ফল', 'সখের ডিটেকটিভ', 'অদ্বৈতবাদ' ইত্যাদি অত্যন্ত উপভোগ্য গল্প। 'কুকুরছানা' গল্পটি তাঁর পশুপ্রীতির উজ্জ্বল নিদর্শন।

'গহনার বাক্স' তাঁর সপ্তম গ্রন্থ। এতে মোট ৭টি গল্প আছে। গল্পগুলি চলনসই। 'মাষ্টারমহাশয়' গল্পটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থে 'কালিদাসের বিবাহ' গল্পটি উপভোগ্য।

১। মুক্তি, ফুলের মূল্য, পুনর্মূষিক, প্রবাসিনী।

'হতাশ প্রেমিক' গ্রন্থে ন'টি গল্প আছে। এই গ্রন্থটিতে প্রভাতকুমার কোন উল্লেখ-যোগ্য সৃষ্টি করেন নি। তবে তাঁর কৌতুকরসের অনাবিল ধারা এই গ্রন্থে প্রবাহিত। 'বিলাসিনী' গ্রন্থে ন'টি গল্প আছে। এই গল্পগ্রন্থে 'সতী' নামক গল্পটি আশ্চর্য। এক বিদেশী মহিলা স্বামীর সঙ্গে একই চিতায় প্রাণ বিসর্জন দিলেন—কাহিনীটি মর্মস্পর্শীভাবে প্রভাতকুমার বর্ণনা করেছেন। 'রেলে কলিসন' গল্পটি এক বিচিত্র 'situation'-এর গল্প। রেলে কলিশন হওয়ায় অটলবিহারী কাঞ্জিলাল ও বিহারী মেয়ে সরস্বতী এক কামরায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিল। তারা সেই অবস্থায় বিবাহ প্রস্তাব করে ও শেষ পর্যন্ত তাদের বিয়ে হয়। 'গুণীর আদর' নামক গল্পটি যথেষ্ট ব্যঙ্গভরা অর্থাৎ প্রভাতকুমারের স্বভাব বিরোধী।

'যুবকের প্রেম' গ্রন্থে সাতটি গল্প আছে। বিংশ শতকের প্রথম পাদে বাঙালীর জীবনে রোমান্সের যে ধারাটি ছিল—বিবাহিত জীবনে ও কলেজ ছাত্রের জীবনে, মেসে—সেই সম্ভাবনাগুলি প্রভাতকুমার বিচিত্রভাবে ব্যবহার করেছেন। 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের পোষ্টমাষ্টারের স্মৃতি এই গল্পটিকে আরো উপভোগ্য করেছে।

'নূতন বউ' ও 'জামাতা বাবাজী'—এই দুটি তাঁর শেষ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের গল্প-গুলিতে প্রভাতকুমারের গল্প বলার কৌশলটি আসল—কিন্তু গল্পের মধ্যে অন্য কোন প্রতিভার স্ফুরণ নেই। যদিও গল্পগুলি সুখপাঠ্য ও সুরচিত তবুও তাঁর প্রথম পর্যায়ের প্রতিভার দীপ্তি এখানে নেই। 'মাতঙ্গিনীর কাহিনী' গল্পটি উল্লেখযোগ্য। এই গল্পের কাহিনী 'হতাশ প্রেমিকের' অন্য একটি গল্পের অনুরূপ—বা সেই গল্পটির ভিত্তিভূমি বলা চলে।

সংক্ষেপে প্রভাতকুমারের গল্পধারার একটি ঐতিহাসিক পরিচয় নেওয়া গেল। তাঁর প্রথম গল্প-বইর প্রকাশকাল ১৯০০ এবং শেষ বইটির প্রকাশকাল ১৯৩১—অর্থাৎ তিরিশ বছরেরও বেশী সময়ে তিনি গল্প রচনা করেছেন। তাছাড়া তিনি নিজে ছোটগল্প সম্পর্কে বিশেষ সুস্পষ্ট মত পোষণ করতেন।১ বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থায়ী দান এই ছোট গল্পগুলি। তাঁর উপন্যাসগুলি হয়ত শেষ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে কোন স্থায়ী আসন লাভ করবে না। কিন্তু ছোটগল্পের আসরে একজন প্রধান শিল্পী বলে তিনি চিরকাল অভিনন্দিত হবেন।

২

প্রভাতকুমারের গল্প সংখ্যা শতাধিক। জীবনের বহু বৈচিত্র্যই এই গল্পলোকের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। এই বিশালব্যাপ্ত গল্পলোকের সর্বপ্রধান গুণই হল রমণীয়তা।

১। চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

কালিদাস গ্রীষ্মের বর্ণনায় বলেছেন যে, দিবসগুলির পরিণাম বড়ই রমণীয়। প্রভাত-কুমারের গল্পগুলির সম্পর্কেও পরিণাম রমণীয়তার কথা বলা চলে। তাঁর যে গল্প বড় নিষ্ঠুর বা করুণ—সাধারণত সে গল্পও শেষ পর্যন্ত মধুর। তাঁর সাহিত্যে তাই 'ট্র্যাজেডি' বা কোন গভীর বেদনা ও দুঃখ নেই। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এইখানে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি যেমন ডুব দিয়েছে হৃদয় রহস্যের অতলে, প্রভাতকুমার হৃদয়কে দূর থেকেই দেখেছেন। 'মুখের মধ্যে যেটুকু পাই, যে হাসি আর যে ছলনাই তাই নেরে মন তাই নে'—এটিই প্রভাতকুমারের কথা। তিনি বলতে পারতেন।

আকাশ পানে হাত বাড়িয়ে চাইনে রে ভাই আশাতীত
ভাষার মধ্যে তলিয়ে গিয়ে খুঁজিনে ভাই ভাষাতীত।

তাই ছোট হাসি, ছোট দুঃখ, ছোট কান্নার যে কাহিনী তিনি লিখেছেন—তার মধ্যে কোথাও কোন জীবনের অতলস্পর্শ অনুভূতির সন্ধান নেই। সে যেন আমাদের প্রতি-দিনের ঘরকন্নার কথা। রবীন্দ্রনাথের হাতে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের গায়ে এক বিচিত্র সোনালি আভা লাগে। ছোট ছোট দুঃখগুলি জগতের বিরাট দুঃখের প্রবাহের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। নিখিল বিশ্বের উদাসীনতা ও বৈরাগ্য এসে চরিত্রগুলিকে এক বৃহৎ ব্যাপ্তি দেয়। অতি সাধারণ ঘটনাই এক অসাধারণের ব্যঞ্জনা বয়ে আনে। কিন্তু প্রভাতকুমারের মধ্যে এই ধরনের কোন বৃহত্তর বা মহত্তর ব্যঞ্জনা নেই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তিনি জীবনকে ভাসা-ভাসা দেখেছেন। তিনিও জীবনসিন্ধুর রসপান করেছেন।—কিন্তু জীবনের অতি জটিলতা ও গভীরতা দুইকে এড়িয়ে গেছেন। জীবনের আনন্দ নিয়েছেন, দুঃখে দুঃখ পেয়েছেন, বেদনায় বেদনা পেয়েছেন।—কিন্তু তার বেশী কিছু নয়। অগভীরতা ও অতিগভীরতার মাঝখানে তিনি সন্তরণ করেছেন। প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যবর্তী সাহিত্যিক —এই কথাটি শুধু ঐতিহাসিক দিক থেকেই সত্য নয়, সাহিত্যরসের দিক থেকেও সত্য। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে আছে নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যের প্রতি বন্দনা, বিশ্বব্যাপী আনন্দের বিস্তৃতি—আর শরৎচন্দ্রের মধ্যে আছে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন জিজ্ঞাসা ও তার জটিলতা, ভাবালুতা, কাঠিন্য ও অশ্রুসজলতা। প্রভাতকুমারের সাহিত্যে কোন চিরন্তন সৌন্দর্য সন্ধান নেই—তেমনই শরৎচন্দ্রের মত সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টা বা অশ্রুসজলতা নেই। অতুল ঐশ্বর্য প্রভাতকুমারের নেই· আবার জীবনের জটিলতায় তিনি উৎসাহী নন—তিনি মধ্যপন্থী।

রবীন্দ্রনাথ যেখানে জীবনের নানা সমস্যার কথা তুলেছেন সেখানে তিনি নানা সূক্ষ্মভাবে সেই সমস্যাকে দেখেছেন, নাড়া দিয়েছেন। নরনারীর জীবনের সমস্যাই হোক, ধর্ম বা রাজনীতিই হোক—নষ্টনীড়—চোখের বালি—গোরা—ঘরে-বাইরে সর্বত্র রবীন্দ্রনাথ সাহসী। প্রভাতকুমারের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন হওয়ার ফলে তিনি এই সমস্যাগুলিকে অন্য চোখে দেখেছেন। জীবনের কোন বৃহৎ তাৎপর্য আরোপ করেন নি তিনি নরনারীর যৌন সমস্যা, ধর্মচিন্তা বা রাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে প্রবল চিন্তা করেন নি—এবং তারই ফলে নষ্টনীড় বা ঘরে-বাইরে তিনি লিখতে পারতেন না। অন

দিকে শরৎচন্দ্রের সঙ্গেও তাঁর বিরোধ স্পষ্ট। শরৎচন্দ্র সমস্যাপীড়িত মধ্যবিত্ত সমাজের বা পল্লীসমাজের, চিত্র এঁকেছেন। "সংসারে যারা দিলে কিন্তু পেলে না কিছুই" তারাই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যপ্রেরণার উৎস।

তবুও শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কিছু ঐক্য আছে। দুজনেরই বাংলাদেশের পরিবারের বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল খুব বেশী। দুজনেরই জীবন অভিজ্ঞতা বিচিত্র। রাজা-মহারাজা থেকে অতি সামান্য অজ্ঞাতকুলশীল মানব তাঁদের নায়ক-নায়িকা। দুজনেই দরদী ও সহানুভূতিশীল লেখক। দুজনেই মনে মনে রক্ষণশীল—এই সমাজ ও ধর্মকে দুজনেই গভীরভাবে ভালোবাসেন। শরৎসাহিত্যের অনেক পূর্বাভাস তাই প্রভাত-কুমারের লেখায় মেলে। কিন্তু দুজনের পথ ভিন্ন। একজনের উদ্দেশ্য জীবনের জটিলতার প্রকাশ, অন্যজনের উদ্দেশ্য জীবনের উপর যে ইন্দ্রধনুর রং পড়ে—সেই রঙীন মুহূর্তগুলির প্রকাশ। একজনের পথ তাই বেদনার—আঘাতে আঘাতে অশ্রুবাষ্পাকুল। অন্যজনের পথ কৌতুকের ও হাসির—অশ্রুও সেখানে হাসিতে ঝিকমিক করে।

প্রভাতকুমার বিচিত্র অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক। তাঁর পিতা বিহারে অঞ্চলে রেল বিভাগে কাজ করতেন। ফলে তিনি বিহারের বিভিন্ন স্থানে কাটিয়েছেন। বিশেষত জামালপুর পাটনা তাঁর শিক্ষাস্থল। বি-এ পরীক্ষার পর সিমলায় কাজ করেছেন। কলকাতার টেলিগ্রাফ অফিসেও তিনি কাজ করেছেন। তারপর তিনি বিলাত যান। এবং গয়ায় তাঁর কর্মজীবন অনেকদিনের জন্য ছিল। গয়া থেকে তিনি কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আইনের অধ্যাপক হন। তাঁর সাহিত্যে এই ঘটনাগুলি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। তিনি এই বহু স্থানের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে জীবনকে দেখেছেন। কলেজের ছাত্র ও ডাক্তার, রেল স্টেশনের কর্মচারী, বিলাতে আগত ভারতীয় ছাত্র—নানা মানুষের ভীড় তাঁর সাহিত্যে। তাঁর সাহিত্যের ভূগোলও বিস্তৃত —তা কখনও বাংলাদেশে, কখনও বিহার বা কাশীতে, কখনও বিলাতে।

গঠনের দিক থেকে প্রভাতকুমারের গল্পগুলি অতি সুগঠিত। তাঁর সমস্ত গল্পই আখ্যানপ্রধান। তিনি যেন গল্পটি লেখার আগেই তার প্রত্যেকটি স্তর ভেবে রাখেন। সম্ভবত তাঁর গল্পাংশের সুগঠিত রূপের জন্যই তাঁকে মপাসাঁর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, 'বড় বড় ফরাসী গল্প-লেখকদের গল্প অপেক্ষা তোমার গল্প কোন অংশে হীন নহে।' বলাই বাহুল্য, এ তুলনা ঠিক নয়। প্রভাতকুমারের প্রতি তাতে সুবিচারের আশা কম। রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে বলেছেন ......তোমার গল্পগুলি ভারি ভাল। হাসির হাওয়ায়, কল্পনার ঝোঁকে পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও যে কিছুমাত্র ভার আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই।' এই স্বাচ্ছন্দ্য ও মাধুর্য তার গল্পের প্রধান গুণ। তারই জোরে তিনি জনপ্রিয়তা ও বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন।

'কুড়ানো মেয়ে' প্রভাতকুমারের রচনার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রটি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। সতীনাথের চরিত্রটিকে লেখক নির্মম উদাসীনতার সঙ্গে এ'কেছেন—তারপরে তার চরিত্রের পরিণামটি গল্পকে একটি স্নিগ্ধ রূপ দান করেছে। তাঁর সমস্ত গল্পেরই মূল লক্ষণ স্নিগ্ধতা—আঘাত সাধারণত কোথাও নেই। 'রসময়ীর রসিকতা' আর একটি উৎকৃষ্ট গল্প। এই গল্পে যে ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে তা অপূর্ব। স্তরে স্তরে এই ভৌতিক পরিবেশ এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে তা পাঠককে রীতিমত বিহ্বল করে তোলে। এই সময় হঠাৎ যখন লেখক তার সমাধান করেন তখন সেই ভৌতিক আবহাওয়া হাসির হিল্লোলে ভেসে যায় এবং এক নির্মল কৌতুকের আলোয় সমস্ত কুয়াশা কেটে যায়। ছোট ছোট ভ্রান্তি কিভাবে মানুষের মনে প্রবল অস্বস্তি ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে তার উদাহরণ 'বিলাত ফেরতের বিপদ' গল্পটি। প্রকাশের সঙ্গে প্রতিভার বিবাহের সব ঠিক। এমন সময় খবর পাওয়া গেল যে প্রকাশ বিলাত থেকে বিবাহ করে এসেছে। প্রমাণ অকাট্য। তার বই থেকে একটি লণ্ড্রীর বিল পাওয়া গেছে—এবং তার মধ্যে মিসেস প্রকাশের সন্ধান আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রকাশ যখন বুঝিয়ে দিল যে এটি সম্পূর্ণ ভুল, তখন আবার সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। 'বলবান জামাতা আর একটি নিদর্শন। নলিনীর নাম এবং দেহ নিয়ে শ্যালিকারা উপহাস করেছিল—তাই নলিনী রীতিমত ব্যায়াম করে, প্রবল পালোয়ানের মত শরীর তৈরী করে বন্দুক হাতে শ্বশুরবাড়িতে পেণছালেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার। তাকে নানা কারণে সবাই কোন ডাকাত ভাবল—ফলে শ্বশুরবাড়িতে জুটল তার লাঞ্ছনা।

কোথায় সে শ্যালিকার উপহাসের প্রতিশোধ নেবে তার বদলে সে অপমানিত হয়ে স্টেশনে ফিরে এল। কিন্তু এই সময় জানা গেল যে ডাকাত নয়—সে জামাই। তখন পাঠকের স্মিতহাসি উচ্চ হাসিতে পরিণতি পায় এবং বলবান জামাতার করুণ মুখের কথা স্মরণ করে দুঃখের চেয়ে কৌতুকই বেশী ফুটে ওঠে। 'বিবাহের বিজ্ঞাপনে' এই কৌতুকরস আরো প্রবল। এই গল্প পড়তে পড়তে দীনবন্ধু মিত্রের কথা বারবার মনে পড়ে। মানুষের কোন একটি বাতিক সাধারণত রঙ্গের বা ব্যঙ্গের বিষয় বস্তু হয়। হতভাগ্য রামঅওতার পুরোণো কাগজে বিয়ের বিজ্ঞাপন দেখেছিল। এবং তার বিবাহ করার ইচ্ছা এত প্রবল যে সে কাগজটির প্রকাশকাল না দেখেই সেখানে চিঠি লিখল। যাদের হাতে চিঠি পড়ল তারা কাশীর বিখ্যাত ঠক। সাজসজ্জা করে রামঅওতার কাশী পেণছল মেয়ে দেখতে। কিন্তু সর্বস্ব হারিয়ে, দিগম্বর সন্ন্যাসীর বেশে তাকে কাশীর পথে ঘুরতে হল। এখানেও রামঅওতারের প্রতি গুণ্ডাদের এই নির্মমতা পাঠকদের যে পরিমাণ দুঃখিত করে, তার বেশী হাসির উদ্রেক করে। প্রভাতকুমার কোথাও কৌতুকের সীমা লঙ্ঘন করেন না—নির্মমতার পর্যায়ে গেলে কৌতুক থাকে না। এই গল্পে তবুও রামঅওতারের প্রতি

খন একটু বেশী অত্যাচার হয়ে গেছে। কিন্তু 'প্রতিজ্ঞা পূরণ' গল্পে ভবতোষ চরিত্রটি কৌতুকের দিক থেকে আরো সার্থক। সে একদা প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছিল কালো মেয়ে ছাড়া বিয়ে করবে না। বাংলাদেশের নবশিক্ষিত যুবক যারা সামাজিক সমস্যার প্রতিকারে রত হয়েছিল, তাদের মাথায় নানা চরম খেয়াল চাপত। ভবতোষের প্রতিজ্ঞা সেই ধরনের। অবশেষে যখন তার জন্য কালো মেয়ে ঠিক হল তখন তার বুকের অস্বস্তি, মনের মধ্যে অসুখ ও মুখে মুখে বীরত্ব প্রকাশ অত্যন্ত কৌতুকাবহ। অবশেষে সে যখন জানতে পারল যে মেয়েটি আসলে সুন্দরী কিন্তু তার প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্যই তাকে মিথ্যে করে বলা হয়েছে, তখন তার মানসিক অশান্তি শেষ হল। পাঠকের ওষ্ঠাধরে তখন স্মিতহাসি ক্রমশই আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়তে চায়। প্রজাপতির পরিহাস এই ধরনের আরেকটি গল্প। শ্যামাচরণ-বাবু ছেলের বিয়ে দিয়ে পণ নিয়ে ঋণমুক্ত হতে চান। কিন্তু ছেলে সুরেন্দ্র পণ গ্রহণ বিরোধী সভার সম্পাদক। কাজেই সে পিতার কথায় রাজী না হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। অবশেষে সেই ছেলেই যে মেয়েটিকে ভালোবাসল সেই পিতার মনোনীত কন্যা। অবশেষে উভয়ের বিবাহ হল এবং শেষ পর্যন্ত পণ নিতেও হল।

'পুলিনবাবুর পুত্রলাভ' এই ধরনের আরেকটি গল্প। পুলিনবাবু পুত্রহীন। স্ত্রী সুশীলাকে বন্ধ্যা বলে সবাই ঠাট্টা করে। তাই সুশীলাও পুলিনবাবুকে বিবাহ করতে অনুরোধ করে। পুলিনবাবু রাজী হন না। অবশেষে পুলিনবাবু স্ত্রীকে শান্ত করার জন্য থিয়েটারের হিরোইনের একটি ফটো দেখিয়ে বললেন এঁকে বিয়ে করেছি। তখন স্ত্রীর মনে ঈর্ষা উপস্থিত হল এবং তিনি যথারীতি বাপের বাড়ি যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। তখন পুলিন সব কথা খুলে বললেন, স্ত্রীও শান্ত হলেন। অবশ্য প্রভাতকুমারের গল্পের শেষ সর্বদা রমণীয়। কাজেই পুলিনবাবু হঠাৎ সন্তান লাভ করলেন।

'প্রণয় পরিণাম' গল্পটি উচ্চহাস্যের কলরোলে অভিনন্দিত হবে। হিন্দুস্কুলের ছাত্র সে প্রেমে পড়েছে এবং শেষ পর্যন্ত পিতার প্রহারে তার প্রেম ঘুচেছে। শুধু তাই নয় প্রেমিকার বিবাহে প্রচুর লুচি খেয়ে বালক প্রেমিক অসুস্থ হয়ে পড়ল। 'খুড়ামহাশয়' ও 'ধর্মের কল' গল্পদুটিও প্রভাতকুমারের কৌতুক পরায়ণতার অতি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। খুড়ামহাশয় ভাইপোর প্রাপ্য দশ হাজার টাকা আত্মসাৎ করেন। ইতিমধ্যে খবর পাওয়া গেল ভাইপো রেল কলিসনে মারা গেছে। ভাইপোর শ্রাদ্ধ হয়ে গেল। কিন্তু কদিন পরেই গ্রামের লোকে নবকুমারের ভূত দেখতে লাগল। এবং একদিন

> "রাত্রি আন্দাজ বারোটার সময়, গাত্রে কাহার অতি শীতল হস্তস্পর্শে খুড়া-মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। খুড়ামহাশয় চমকিয়া ঘুমের ঘোরে বলিলেন, 'কে—ও?'
> অন্ধকারের মধ্য হইতে শব্দ হইল, 'আমি ন'বকু'মার।'

শুনিবামাত্র খুড়ামহাশয়ের ঘুমের ঘোর চট করিয়া ছাড়িয়া গেল। ভূত বলিল, সে'—দশহাজার টাকা আমার ব'উকে য'তদিন না দি'চ্ছ; ত'তদিন রোঁজ আঁসব তাঁগাদা ক'রতে—রোঁজ আসব—"

বলাবাহুল্য নবকুমার টাকা ফেরত পেল। নবকুমার আসলে মরেনি। সে তার মৃত্যু সংবাদ রটিয়ে নিজেই ভূত সেজে টাকা উদ্ধার করতে এসেছিল।

এই পর্যায়ের আরেকটি গল্প উল্লেখ করি—সেটি 'মাস্টার মহাশয়'। দুটি গ্রামের রেষারেষি গল্পটির সবচেয়ে উপভোগ্য বিষয়। শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্যভাবে দুই গ্রামের ইংরেজির মাস্টারমহাশয়ের বিদ্যা পরীক্ষা কাহিনীটির চরম ঘটনা। শেষে কৌতুককর ঘটনাটি কাহিনীকে চরম পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এই ধরনের রঙ্গে প্রভাতকুমারের সহজ পারদর্শিতা।

'বাল্যবন্ধু', 'আমার উপন্যাস', 'স্বর্ণসিংহ', 'খালাস', 'অঙ্গহীনা', 'হিমানী', 'পত্নীহারা', 'বিলাসিনী', 'চিরায়ুষ্মতী', 'রেলে কলিসন', 'বউ চুরি', 'কলির মেয়ে', 'বাস্তুসাপ', 'অযোধ্যার উপহার', 'গুরুজনের কথা' ইত্যাদি গল্পগুলিকে গার্হস্থ্য রসের গল্প বলা চলে। এগুলির মধ্যে উপভোগ্যতা ছাড়া অন্য কোন গুণ নেই। তবে 'রেলে কলিসন' গল্পটি 'situation' রচনার জন্য প্রশংসার যোগ্য এবং 'অযোধ্যার উপহারে' 'অযোধ্যার' চরিত্রটি বড় সুন্দর। প্রভাতকুমার রূপকথা জাতীয় কয়েকটি গল্পও লিখেছেন।১

আরেকস্তরের গল্পে প্রভাতকুমারের কিছুটা ব্যঙ্গ প্রবণতা আছে। এই ধরনের একটি সার্থক গল্প 'মাদুলি'। এতে একদিকে ব্যঙ্গ আছে সৌখীন স্বদেশীয়ানার প্রতি, আর অন্যদিকে সহানুভূতি রয়েছে দেশের সেই সব মানুষদের প্রতি যারা ধর্ম মানে, সত্য মানে, ভগবান মানে, আপন সরলবিশ্বাস যাদের একমাত্র মূলধন। এখানে সৌখীন স্বদেশীয়ানার 'End justifies the means' মূলমন্ত্রকে আঘাত, অন্যত্র পণপ্রথা বা বিবাহে কন্যা নির্বাচন জাতীয় সামাজিক প্রথাগুলির বিরুদ্ধে সৌখীন অভিযানকেও মৃদু ব্যঙ্গ করেছেন। 'ধর্মের কল' গল্পে এক জায়গায় বিদ্যাসাগর সম্পর্কে সাধারণ গোঁড়া ব্যক্তিদের ধারণার উদাহরণ প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার উল্লেখ করেছেন,

১। কালিদাসের বিবাহ (১৩২৫, আশ্বিন): (২) কালিদাসের গল্প (১৩২৫, ভাদ্র); (৩) ভোজরাজের গল্প (১৩৩১, আশ্বিন); (৪) রাণী অম্বালিকা (১৩৩১, ফাল্গুন)।

রানী অ-ম্বালিকা গল্পটি চমৎকার। ভোজরাজের গল্পটিও সুন্দর। স্বর্গ বৈদ্য মানুষকে উপদেশ দিয়েছেন ঃ

অশীতেনাম্ভসি স্নানং পয়ঃ পানং, বরাঃ স্ত্রিয়ঃ।
এতদ বো মানুষাঃ পথ্যং মুক্ষং চ ভোজনম্ ॥

"একবার কোথাকার স্টেশনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত এক পণ্ডিতের দেখা হয়। পণ্ডিত জানিত না যে ইনিই বিদ্যাসাগর। সে তর্কের মুখে বলিয়াছিল বিদ্যাসাগর হ্যাটকোট পরে, হোটেলে খায়। আমি স্বচক্ষে দেখেছি।"

বিদ্যাসাগর মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, বিদ্যাসাগরকে চেন তা হলে? সে উত্তর করিল চিনি না? বিলক্ষণ চিনি।"১

আমাদের দেশের 'চরিত্রবান্' ছেলেদের প্রতি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ 'সচ্চরিত্র' গল্পে। সুরেনকে বেশ্যার মেয়েকে পড়াতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সে মেয়েটিকে ভালোবেসেছিল। কিন্তু যেদিন প্রেমের কর্তব্য এল—নলিনী যখন তাকে উদ্ধার করার জন্য ডেকে পাঠাল—সেদিন সচ্চরিত্র যুবক কলকাতা থেকে পালাল। প্রভাতকুমার অল্প কথায় এই ব্যঙ্গ করেছেন—তাই তা অতি মর্মঘাতী হয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আক্রমণ ও ব্যঙ্গের অন্যতম বিষয় ছিল হিন্দুয়ানী· অন্যটি ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজ। প্রভাতকুমারও তার ব্যতিক্রম নন। 'খোকার কাণ্ড' গল্পটিতে ব্রাহ্মদের প্রতি আক্রমণ। রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাবার পর বহু কবি ও লেখকই ঈর্ষাতুর হয়ে উঠেছিলেন। সেই ছবিটি 'যুগল সাহিত্যিক' গল্পে আছে।

রাজেন্দ্রের ভক্তগণ তাহাকে ধরিয়া বসিল—"আপনি রবিবাবুর চেয়ে কিসে কম? আপনার নবগীতিখানি অনুবাদ করে যদি বিলাতে পাঠিয়ে দেন, তবে আপনারও জয়জয়কার পড়ে যায়।"

প্রভাতকুমার ব্যঙ্গ করতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন না—তেমনই অপ্রিয় বা রূঢ় চরিত্র অঙ্কনও বেশী করেননি। 'আধুনিক সন্ন্যাসী' গল্পের জালিয়াত সন্ন্যাসী, 'উকীলের বুদ্ধি' গল্পে উকীলের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হওয়ার কাহিনী উল্লেখযোগ্য। 'হাতে হাতে ফল' গল্পের দারোগা স্মরণীয় চরিত্র। অবশ্য প্রভাতকুমার নিজেই দারোগাকে শাস্তি দেবার ভার নিয়েছেন—ডাক্তারের ছেলেকে ধরার পরই দারোগার অসুখ করল। 'বায়ুপরিবর্তন' এই শ্রেণীর একটি কাহিনী। অকৃতজ্ঞতা যাদের চরিত্রের মেরুদণ্ড এই গল্পের হরিধন তাদেরই একজন। 'হীরালাল' গল্পটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন "হীরালাল গল্পটি বোধকরি প্রভাতকুমারের একমাত্র নির্মম গল্প। এ গল্পটির প্লট স্বচ্ছন্দে শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের অথবা জগদীশচন্দ্র গুপ্তের হইতে পারিত।"২

প্রভাতকুমারের একগুচ্ছ গল্প আছে যাদের বিষয়বস্তু বিলাতের জীবন অথবা বিলাতে ভারতীয়। প্রকৃতপক্ষে প্রভাতকুমারেরই এই বিষয়ে গল্প লেখার প্রথম

১। ধর্মের কল গল্পের পাদটীকা। ষোড়শী। ৫ম সংস্করণ। পৃঃ ১৩০

২। বাসাই। ৪র্থ খণ্ড। পৃঃ ৫১।

কৃতিত্ব। তাঁর পরে ও আগে অনেকেই বিলেত সম্পর্কে লিখেছেন কিন্তু আজও প্রভাতকুমার উপভোগ্য।

ইংলন্ডে ভারতীয় ছাত্রের বিচিত্র জীবন এই গল্পগুলিতে জীবন্ত। বৃটিশ মিউজিয়ামে অধ্যয়নরত ভারতীয় ছাত্র, ভারতীয় নবাবের চিত্র-সন্ধানে ব্যাপৃত ইংরেজ মহিলা, শনিবারে সস্তায় লাঞ্চ খাবার জন্য আসা এক গরীব মেয়ে, যথার্থ হিন্দু হবার অভিলাষ সম্পন্না ইংরেজ নারী—ছবিগুলি অতি সুস্পষ্ট ও নিখুঁত। ইংরেজ মধ্যবিত্ত পরিবারের সেই ছোট মেয়েটি, তাদের 'Basement-এর রান্নাঘর, কেকের গন্ধ, 'Alice in the wonderland' বই উপহার দেওয়া, লন্ডনের তুষার বৃষ্টি, সদ্য আগত ভারতীয় ছাত্রের অস্বস্তি ও পরে উদ্গত পক্ষ পতঙ্গের মত আচরণ—সমস্ত বর্ণনাই সার্থক। বিলাতের এত নিখুঁত ও জীবন্ত বর্ণনা অন্যকোন বাংলা গ্রন্থে এত সার্থকভাবে নেই। বেজওয়াটারের রুমস্, লাডগেট সার্কাসে টমাস কুকের অফিস, হাইড পার্কে বেঞ্চির ভাড়া, মার্বল আর্চ, সার্পেনটাইন দিঘি, ভিক্টোরিয়া স্টেশন—সমস্তই যেন স্বাভাবিকভাবে কাহিনীর মধ্যে এসেছে—কোথাও আরোপিত মনে হয় না।

এই গল্পগুলির মধ্যে পুনর্মূষিক, প্রবাসিনী এবং মুক্তি তিনটি লঘুরসের কাহিনী। প্রথমটি প্রভাতকুমারের স্বাভাবিক প্রবণতার সার্থক নিদর্শন। শেষ দুটি পরিণাম মধুর গল্প। কিন্তু সতী,১ ফুলের মূল্য,২ মাতৃহীন৩ এবং কুমুদের বন্ধু৪ চারিটি গল্প অন্যস্তরের। 'সতী' গল্পটির ঘটনাটি অস্বাভাবিক। ইংরেজ মহিলার সতী হওয়ার কাহিনী। 'ফুলের মূল্য' গল্পটি তুলনাহীন। প্রভাতকুমার সাধারণ ইংরেজের জীবন এঁকেছেন। তিনি অবাক হয়ে গেছেন যখন শুনেছেন যে 'Alice in the wonderland'-এর নাম শোনেনি এমন ইংরেজ মেয়ে আছে, যারা থিয়েটারে যাবার পয়সা পায় না। 'কুমুদের বন্ধু' গল্পে আছে এক ইংরেজ মেয়ে, হোটেলে কাজ করে সে শেলির শোনেনি।

> 'কুমুদ বলিল তুমি শেলির নাম শুনিয়াছ ?
> কে ? তোমার কোন বন্ধু বুঝি ?
> 'Goosie !' তিনি বিগত শতাব্দীর একজন মহাকবি ছিলেন।
> বটে—'তা জানতাম না।'

এই ধরণের সাধারণ ইংরেজ চরিত্র প্রভাতকুমার অসাধারণভাবে এঁকেছেন। তাঁর 'ফুলের মূল্য' গল্পটিতে সেই চিত্র অতি উজ্জ্বল। 'মাতৃহীন' গল্পটি অতি শান্ত ও

১। বিলাসিনী
২। দেশী ও বিলাতী
৩। গল্পাঞ্জলি
৪। গল্পবীথি

প্রেমের গভীরতায় উদ্দীপ্ত। 'কুমুদের বন্ধু' গল্পটি বন্ধুত্বের এক উজ্জ্বল স্মৃতি।

ইংরেজ ও ভারতবাসীর সংযোগের ফলে বহু কাহিনী, বহু কবিতা ও কিছু উপন্যাসের সৃষ্টি হয়েছে। ইংরেজ জাতিকে জানার ও বোঝার এক নিদর্শন তাঁর সাহিত্যে। বিদেশী জীবনের ঘরোয়া ও অন্তরঙ্গ রূপটিকে স্বদেশী ভাষায় ধরে রেখে দুই জাতির প্রাণের সেতুবন্ধ রচনা করে গেলেন প্রভাতকুমার তাঁর এই তিনটি চারটি গল্পে।

প্রভাতকুমারের উল্লেখযোগ্য গল্পগুচ্ছের আরেকটি হল বেদনার্দ্র গল্পগুলি। এই গল্পগুলির জন্য প্রভাতকুমার বাংলাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের পাশে বসেছেন। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'কাশীবাসিনী'। পদস্খলিত মাতা বহুদিন পরে কন্যাকে দেখতে এসেছেন। পরিমিত বোধের দ্বারা লেখক এই কাহিনীর ভাবালুতাকে দমন করেছেন। 'মাতৃহীন' বা 'ফুলের মূল্য' ও 'আদরিণী' এই শ্রেণীর। আদরিণী প্রভাতকুমারের একটি শ্রেষ্ঠ রচনা। গল্প বলার কৌশল, চরিত্রচিত্রণ, অশ্রু ছলছল সমাপ্তি ও পশু ও মানুষের পারিবারিক সম্পর্ক রচনার সার্থকতায়—এটি একটি চমৎকার শিল্প-সৃষ্টি। এই সমস্ত গল্পগুলির মধ্যেই শরৎ-সাহিত্যের আগমনী ধ্বনিত হয়েছে! এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প 'দেবী'। কুসংস্কারের পদমূলে ব্যক্তির যে ট্রাজেডি বা বিরাট অপচয় তাই এই গল্পের সুর। এই গল্পেই প্রভাতকুমার অনন্যসাধারণ দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর লেখনী এখানে নির্মমভাবে বলিষ্ঠ। ব্যক্তিহৃদয়ের অপচয় যে কত বিরাট, ধর্মের অন্ধতার রথচক্রের তলায় মানুষ যে কীভাবে পিষে মরে তারই ভয়াবহ কাহিনী 'দেবী'। সার্থক ট্রাজিডিতে অশ্রু আসে না—আসে বিস্ময় ও এক শূন্যতাবোধ। অপচয়জনিত বেদনা। 'দেবী' একটি সার্থক ট্রাজিডি।

দশম পরিচ্ছেদ

॥ হাস্য ও ব্যঙ্গ ॥

এককালে সুরেন্দ্রনাথ সাহিত্য পত্রিকায় মাসের পর মাস গল্প লিখেছেন। বিংশ শতকের প্রথম পাদেই তাঁর দুখানি গল্পের বই প্রকাশিত হয়েছিল।১ কিন্তু আধুনিক পাঠকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় অল্প। আমাদের সাহিত্যে ছোটগল্পের সংকলন বেশী নেই তাই অপেক্ষাকৃত অপ্রধান লেখকদের পাঠকদের বিশ্বাসঘাতক স্মৃতি থেকে ধীরে ধীরে বিদায় নিতে হয়।

সুরেন্দ্রনাথ বাংলাদেশের রঙ্গব্যঙ্গ ধারার এক শক্তিশালী লেখক। তাঁর লেখার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল একটি স্পষ্ট রচনাভঙ্গী। তাঁর রচনার অতি প্রথম থেকেই সেই ভঙ্গীর নিজস্বতা ও অব্যর্থতার চিহ্ন ফুটে ওঠে। বাক্যগুলি ছোট ছোট কিন্তু শাণিত বাণের মত। কখনও কখনও নিরীহ ভালোমানুষের মত কথাগুলি ভদ্রভাবে ব্যঙ্গের গুম্ফিত আঘাত করে। তাঁর ব্যঙ্গ কোন সামাজিক বৃহত্তর প্রয়োজন বোধের সঙ্গে যুক্ত নয়—বরং হাসির গল্পের দুধারে একটু শক্ত করে বাঁধা ব্যঙ্গের বেড়া। সেই ব্যঙ্গে উপজীব্য কখনও যৌবনের প্রেম, কখনও ধর্মচর্চা, কখনও অন্যান্য কিছু। প্রেমকে যে তিনি সর্বত্র ব্যঙ্গ করেছেন তা নয়, মাঝে মাঝে একটু কটাক্ষের দ্বারা যুবকের প্রেম দেখে যেন আনন্দিত হচ্ছেন—বৃদ্ধ যেভাবে যৌবনকে দেখে

১। কর্মযোগের টীকাঃ (১৯১৬) — কর্মযোগের টীকা, দীক্ষা, গোলাপজাম, পিয়াসী, আত্মহত্যা, আনন্দপর্যটন, ডিটেক-টিভের স্ত্রীলাভ, মুশকিলআসান। পূজার আসর, মন্ত্রীর স্বয়ংবর, দীর্ঘনিঃশ্বাস, আনন্দ লাড়ু।

ছোট ছোট গল্পঃ (১৯১৫) — চিত্র ও চরিত্র, সবিরাম জ্বর, দুইবন্ধু, বাজে খরচ, শেষ ক'টা দিন, শারদীয় দুর্ঘটনা, যেহেতু ও সেহেতু।

সাহিত্য পত্রিকায় ১৩০৯-১০ বঙ্গাব্দে ৯টি গল্প ও ১৩১০-১১ বঙ্গাব্দে ৯টি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল।

অনেকটা সেভাবেই দেখেছেন। তাঁর 'আমি সুখী কেন' গল্পটিতে[১] দেখা যাবে প্রেমিকের যে মূলগত বোধ সেখানে তিনি শ্রদ্ধাশীল কিন্তু সেই শ্রদ্ধার চারপাশে যে চক্রটি ঘিরে তুলেছেন তা অতিভাবালুতার নয়—যুক্তি ও বুদ্ধির। এদিক থেকে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর মিল। 'দুইবন্ধু' গল্পটি আরেকটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বিপিন ও বিহারীর ঐতিহাসিক বন্ধুত্বের মধ্যে হঠাৎ কিভাবে যে ঝোড়ো হাওয়ার আঘাত এল তার মধ্যে যেন লেখকের কৌতুক কটাক্ষ স্পষ্ট। এ যেন অনেকটা পরিকল্পনা করেই মজা করা। শেষ পর্যন্ত সমস্ত ঠিক হবে—তবে মাঝখানে এমন একটি জট পাকিয়ে তোলা চাই—যে জট কিছুক্ষণের জন্য সবাইকে ভাবায়।

যে বিপিন ও বিহারী পরস্পরকে না বলে কোন কাজ করত না এবং সেইকারণেই তারা একটি বাড়ি পছন্দ হওয়া সত্ত্বেও নিল না—সেই তারাই যখন পরস্পরের অজান্তে কাজ আরম্ভ করল তখন তা অতি কৌতুককর। এবং পাশের বাড়ির নায়িকা সুলোচনার সঙ্গসুখধন্য বিড়াল যখন বিপিনের দুধের খুরীর স্বাদ লাভ করল এবং বিহারী স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে চিংড়িমাছ খাওয়াল তখন বন্ধুদ্বয়ের এই অপূর্ব প্রতিযোগিতা পাঠকের মন কৌতুকে ভরিয়ে তোলে। তেইশ নং বাড়ির সেই বিড়ালটি একদিন মারা গেল। সুলোচনা ওই বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। আবার তাদের বন্ধুত্ব ফিরে এল। কিন্তু মাঝের এই কয়েকটা দিন ২৩নং বাড়ির এই অপূর্ব স্মৃতি তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের মাঝখানে হয়ত কোন একটি ফাটল ধরিয়ে গেল। সুরেন্দ্রনাথের বর্ণনাভঙ্গী এই রচনার স্বাদ বাড়িয়েছেঃ

> "বিপিন নিরামিষাহারী, কিন্তু মদ্যপায়ী, এবং বিহারী মাংসাশী, কিন্তু তামাক পর্যন্ত খায় না। দ্বিতীয়তঃ বিহারী প্রায় সারারাত্রি জাগিয়া গ্রন্থ পাঠ করে এবং মধ্যে মধ্যে কবিতা লেখে। বিপিন আপিস হইতে আসিয়াই ঘুমাইয়া পড়ে।...উভয়েরই সুখদুঃখের কথা প্রায় এক রকম এবং একই কথায় উভয়ে হাসিত, কাঁদিত, কোন হাসির কথা থাকিলে বিপিন বিহারীকে না বলিয়া হাসিত না, এবং কোন কান্নার কথা থাকিলে বিপিন বিহারীকে না বলিয়া কাঁদিত না।"

'সবিরাম জ্বর' গল্পটিতে তাঁর রচনা কুশলতার আর একটি দিক বিকশিত। এই গল্পটিকে 'Comedy of situation' বলা চলে। কোন একটা বিশেষ প্লটের উপর ঘটনাটি প্রতিষ্ঠিত নয়, কিন্তু ঘটনাটিতে এমন সমস্ত অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যা স্বভাবতই পাঠককে হাসিতে ভরিয়ে তোলে। 'সন্ধ্যা' গল্পটি আবার অন্য ধরণের। সেখানে মাঝে মাঝে দংশনমধুর বাক্যবাণ থাকা সত্ত্বেও গল্পটি যেন প্রভাতকুমারের ধারাবাহী। বিশেষত ঐ যুগে বাঙ্গালী যুবকের যে রোমান্স তার শিহরণ যেন

১। সাহিত্য (১৩০৯) পৃঃ ২১৯।

গল্পের মধ্যে বিচ্ছুরিত। 'দীক্ষা' গল্পটির প্লট স্বচ্ছন্দে প্রভাতকুমারের হতে পারত। তিনি এই প্রেমকে লজ্জায় আরো অরুণ করে তুলতেন ও হাসিতে ভরাতেন। আর সুরেন্দ্রনাথ নিস্পৃহ আগ্রহে গল্পটি বলে গেলেন। 'স্বর্গারোহণ' গল্পটিতে প্রেত-তাত্ত্বিকদের বিরুদ্ধে লেখকদের হাস্যরস সিঞ্চিত ঠাট্টা আছে। একটি প্রশ্ন উদাহরণের পক্ষে যথেষ্ট "যদি কেহ তোমাকে পৃথিবীতে শালা বলিয়া গালাগালি দেয়, তবে কি করিয়া জানিতে পার?" নিরীহভাবে এই বাক্যটি উপস্থাপিত করা হয়েছে কিন্তু যার প্রতি নিক্ষিপ্ত তার বুকে কী পরিমাণ আঘাত করে তা অনুমাণ করা কঠিন নয়।

'কর্মযোগের টীকা' একটি উৎকৃষ্ট হাসির গল্প। প্রতি মুহূর্তে ছোট ছোট তীক্ষ্ণ অথচ আপাত উদাসীন মন্তব্যগুলির মধ্যে তাঁর নিজস্ব রীতি ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

> " 'গীতার প্রথম অধ্যায় পাঠ করিয়াই বুঝিতে পারিলাম যে, গ্রন্থখানি সারবান', 'ভগবানের সহিত আমার ঘোর তর্ক বাধিয়া গেল। কারণ অর্জুনের মত সব কথা মানিয়া লওয়া আমার স্বভাবসিদ্ধ নহে।' 'গৃহকর্তা ভগবদ্গীতা পাঠে নিযুক্ত থাকিলে স্ত্রীলোকেরা মারামারি খুনোখুনি করিবার বিলক্ষণ সুযোগ পায়' [ইহা তাহাদিগের ধর্ম। শঙ্করের টীকা]"

ভাষার ওপর এই অধিকারের ফলে অনেক গল্পেরই বিষয়বস্তুর কোন বিষয়-বৈচিত্র্য না থাকা সত্ত্বেও গল্পটি পাঠ্য। যেমন তাঁর 'কন্যা' বা 'চিত্র চরিত্র' বা 'প্রত্যাগত' গল্প। 'কন্যা'তে কথোপকথন ভালো। 'প্রত্যাগত'ও সুখপাঠ্য। 'চিত্র বা চরিত্র' অবশ্য একটু খাপছাড়া। গল্পটির মধ্যে নূতনত্বের আভাস থাকা সত্ত্বেও গল্পটি যেন নিরাবয়ব। কোন কারণে গল্পটি যেন জমাট বাঁধতে পারেনি। সমস্ত আয়োজন থাকা সত্ত্বেও গল্পের ব্যর্থতা বড় স্পষ্ট। এই সব ক্ষেত্রে তিনি প্রায়ই স্বকীয় পদ্ধতিতে চলতে পারেন না। 'গোলাপজাম' গল্পটি এর উদাহরণ। গল্পটি তুচ্ছ মানাভিমানের গল্প। তাই এখানে তাঁর প্রতিভা যথেষ্ট স্ফূর্তিলাভ করতে পায়নি। তিনি নরনারীর হৃদয়বৃত্তির প্রতি সহানুভূতিশীল কিন্তু অঙ্কনে ক্ষমতা-শীল নন। 'পিয়াসী' গল্পে তিনি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে পদার্পণ করেছেন। এখানে তিনি একটি প্রেমকাহিনী বলেছেন ইতিহাসের পটভূমিকায়। এই কার্য পরে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আরো দক্ষতার সঙ্গে করেছেন। সমুদ্রগুপ্তের আবির্ভাবের পূর্বের সুন্দর ঘটনা—লিচ্ছবিবংশের রাজকুমারী ও মগধবংশের রাজপুত্রের পরিণয়। গল্পের গঠন বঙ্কিমী-রীতির। ভাষা সুন্দর ও পরিবেশ রচনা সক্ষম।

> "কুমার আদিত্য ধীরে ধীরে উত্তরীয় বন্ধন করিলেন। তখন অন্ধকার। সেই তারকাখচিত আকাশতলে ঈষৎকৃষ্ণ—শুভ্র মর্ত্যবাহিনী গঙ্গা ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস নূতন অঙ্কে বহিয়া আনিল।"

'মন্দ্রার স্বয়ংবর' গল্পে আর একবার তিনি ঐতিহাসিক পরিবেশ রচনার চেষ্টা করেছেন। তাঁর ভাষা ব্যঙ্গে যতটা উপযোগী, বর্ণাঢ্য বর্ণনার পক্ষে সেইরকম

উপযোগী ছিল না। যখন 'একদিকে বৌদ্ধধর্ম অন্যদিকে নির্বাণোন্মুখ বৈদিকধর্মের সংঘর্ষণ' চলেছে তখনকার কালের পটভূমিতে এই গল্প। এই গল্পের কল্পনা অনেকাংশে মণীন্দ্রনাল বসুকে স্মরণ করায় ঃ

"আমি তাহাকে স্বপ্নে দেখি। গঙ্গানদীর উত্তরে, হিমালয়ের পদপ্রান্তে একটা অরণ্য আছে কি? সেখানে সীতার জন্ম হইয়াছিল। উজ্জ্বল বন। সোনার পাখী বৃক্ষে বৃক্ষে উড়িয়া বেড়ায়। ঋষির মত সরল মানুষ সেখানে আশ্রমে বাস করে। সেই বনে আমার 'শরণ' ভাই থাকে।"

এই কাহিনীটি নিঃসন্দেহে বাংলা গল্পে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধ পরিবেশের গল্পের সূচনা। রচনাকৌশল ঘটনাসংস্থান ও ভাষা সমস্ত বঙ্কিম-ধরণের। একটি উদাহরণ দিই ঃ

"তমিস্রা ভেদ করিয়া মন্দ্রার চক্ষু ভিক্ষুর অনুসরণ করিতেছিল। নায়ক সিংহকে দেখিয়া মন্দ্রা জিজ্ঞাসা করিল, 'কুমার, ভিক্ষু কোথায় গেল?'

ধীরে ধীরে নায়ক সিংহ কহিলেন, 'কেন মন্দ্রা?'

মন্দ্রা। নায়কসিংহ তুমি কখনও ভালোবাসিয়াছ?

ঈষৎ হাসিয়া নায়কসিংহ কহিলেন, 'বোধহয় ভালবাসার পরিচয় দিবার এ স্থল নহে, সময়ও নহে। সাত বৎসর ধরিয়া যে কথা হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিয়াছি অভিনয়ের শেষ অঙ্কে সে কথা প্রচার করা কত দূর সংগত কিংবা অসংগত।'

মন্দ্রা। কুমার, আমি তোমার প্রণয়ের যোগ্য নহি। ভাই মার্জনা করিও। আমার নির্মম পাষাণহৃদয় চূর্ণ হইয়াছে।"

এই গল্পগুলিকে বাদ দিলে 'অদৃষ্ট', 'বাজে খরচ' প্রভৃতি তাঁর ভালো গল্প। 'অদৃষ্ট' গল্পটি বাংলাদেশের একটি শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ গল্প। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে 'সদাশিবের জ্ঞান' গল্পটিতে তাঁর কটাক্ষ লেখকদের প্রতি। এই সমস্ত গল্পে তাঁর তির্যকদৃষ্টি ও রচনারীতি প্রমথ চৌধুরীকে স্মরণ করায়। 'যেহেতু ও সেহেতু' গল্পের মধ্যে এই তির্যক রচনাভঙ্গি বিশেষ পরিণতি লাভ করেছে। দীনু সরকারের জীবনের ঘটনা একদিকে যেমন আমাদের দয়া ও করুণা উদ্রেক করে অন্যদিকে তেমনই লেখকের ব্যঙ্গ মর্মভেদ করে। তাঁর রচনা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি তাঁর বাক্-রীতির পরিচায়ক হিসেবে এখানে উদ্ধৃত করছি।

(১) নিভৃতে আসিয়া পত্রখানি আবার পড়িলাম। ডাউডেন সেক্ষপীয়ারের 'ম্যাকবেথ' যেমন তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা হইতেও অধিক অধ্যবসায় সহকারে পাঠ করিলাম।

('আমি সুখী কেন')

(২) সুলোচনা বিধবা হইলেও বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করিবার বিশেষ আধ্যাত্মিক লালসা ছিল না।

('দুই বন্ধু')

(৩) প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়া সংসারের বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রের সহিত

আত্মসম্বন্ধ স্থাপনের নিমিত্ত ব্যাকুল মনে ইতস্তত চাহিতেছিলাম, এমন সময় আমার বিবাহের প্রস্তাব লইয়া পিসীমা আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

('সবিরাম জ্বর')

(৪) আমার বক্তৃতা দীর্ঘ হইলে লাঙুলে একটা বাঃ (ধ্বন্যাত্মক এবং ভাবাত্মক শব্দ) দ্বারা শেষরক্ষা করিতাম।

('সবিরাম জ্বর')

(৫) এই দুর্লভ মানবজীবনে বিবাহের পূর্বে একটি তের বৎসরের ভুবনমোহিনী বালিকার আরক্তিম কপোলের চুম্বনলাভ প্রজাপতির নির্বন্ধ না থাকিলে সচরাচর ঘটিয়া উঠে না। স্নায়বিক তাড়নাতেই হউক, কিংবা অন্য কোন কারণেই হউক আমার জ্বর হইল।

('সন্ধ্যা')

(৬) জ্ঞানমার্গের জনকতক জীবাত্মা সেখানে ব্যাসিলির ন্যায় কিলমিল করিতেছে।

('স্বর্গারোহণ')

(৭) উপযুক্তা স্ত্রী থাকিতেও বিবাহ করা কৌলীন্য প্রথার বাহাদুরি। বল্লাল সেনের মত এই ছিল যে বহুগুণান্বিতা সহধর্মিণী সত্ত্বেও আবার বিবাহ করা উচিত। গুণ অসীম। একটি স্ত্রীতে সর্বগুণের লক্ষণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ দিবসেই কলহ করে, অতএব রাত্রিকালেও যাহারা কলহ করিতে পারে, এমন আর একটি চাই।

('অদৃষ্ট')

(৮) জীবনের প্রসারতার নিমিত্ত তাসখেলা দরকার।

('অদৃষ্ট')

(৯) একটা বিবাহের দোষ এই যে, তাহাতে 'ব্যালান্স' থাকে না। বংশ-দণ্ডের উপর কেবল একটিমাত্র ঝোলা স্কন্ধে স্থাপনপূর্বক ভবনদী পার হওয়া বড়ই কষ্টকর। সুতরাং সম্মুখে আর একটি ভার ঝুলাইয়া দিলে স্থিরভাবে সমতল ও বন্ধুর ভূমিতে বিচরণ করা যায়।

('অদৃষ্ট')

(১০) কোন গূঢ় সত্য হৃদয়ঙ্গম হইলে, জীব শরীরে একটা না একটা লক্ষণ প্রকাশ পায়। হরিহরেরও তাহাই ঘটিল। অর্থাৎ হরিহর সামান্য কারণেই চটিতে আরম্ভ করিলেন।

('বাজে খরচ')

(১১) 'যেহেতু তুমি নিরেট মূর্খ অথচ সৎ সেহেতু তোমাকে আমার হাউসের মুৎসুদ্দি করিয়া দিলাম।'

('যেহেতু ও সেহেতু')

(১২) প্রায় বিশজন লোক প্রত্যহ দীনুর বাটিতে চা খায়—যেহেতু উদার চরিত্র সৎ ও সহৃদয় লোকের বাটিতেই সকলে চা খাইয়া থাকে।

('যেহেতু ও সেহেতু')

এই উদ্ধৃতিগুলিতে তাঁর রচনার শাণিত ও তির্যকভঙ্গি যেমনভাবে প্রকাশ পেয়েছে তেমনই তাঁর মনোভঙ্গিও স্পষ্টভাবেই প্রকটিত। প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর এক

দিকে যেমন যোগ তেমনই ত্রৈলোক্যনাথ বা প্রভাতকুমারের সঙ্গে তাঁর যোগ। দুর্ভাগ্য যে তাঁর প্রতিভা বাংলাদেশে অপরিচিত। কিন্তু নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক ও সাহিত্য-সমালোচক তাঁকে বাংলাদেশের একজন উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গশিল্পী হিসেবে সম্মান দেবেন এতে কোন সন্দেহ নেই।

২

বাংলা সাহিত্যের রঙ্গব্যঙ্গ ধারায় আর একজন খ্যাতনামা লেখক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ হয়েছিল দেরীতে কিন্তু বাংলাদেশ তাঁকে সানন্দে বরণ করে নিয়েছিল। তাঁর 'আইহ্যাজ' ও 'ভাদুড়িমশাই' তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। 'দুর্গেশনন্দিনীর দুর্গতি' গল্পটি যিনিই পড়েছেন তিনি কখনও ভুলবেন না এই হাস্যরসিক লেখকটিকে। বাংলাদেশে "দাদামহাশয়" নামে তাঁর সার্থক পরিচয়।

আমাদের আলোচনার কাল পরিধির মধ্যে তিনি ঠিক পড়েন না। তবু ভাবানুষঙ্গ ও এই ধারার পূর্ণতার প্রতি ইঙ্গিত করার জন্য তাঁর ১৯২৭ খৃঃ অব্দে 'আমরা কি ও কে' গ্রন্থটি অবলম্বন করে আলোচনা করব। এই গল্পগুলি যে সব কৌতুকের তা নয়, সবই যে গল্প তাও নয়। কিন্তু কৌতুকের সঙ্গে ব্যঙ্গ, ব্যঙ্গের সঙ্গে সমবেদনা ও গল্পের সঙ্গে আলোচনা মিশে আছে। সেই সঙ্গে আমাদের প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার বিশেষ প্রীতি তাঁর নানা লেখার বৈশিষ্ট্য। যেখানে কৌতুক এবং ব্যঙ্গ সেখানেও কিন্তু তাঁর ভাষা মোলায়েম। ত্রৈলোক্যনাথ, সুরেন্দ্রনাথ বা প্রমথ চৌধুরীর ভাষা শাণিত। কেদারনাথের ভাষা আটপৌরে ও সাদাসিধে। সহজ সরল আমুদে লোকটি মাঝে মাঝে যেন আঙুল তুলে আমাদের ত্রুটি ও কলঙ্কগুলি দেখিয়েছেন, কিন্তু কারো গায়ে আঘাত করছেন না। 'আমরা কি ও কে' গল্পটি এই প্রসঙ্গের ভালো উদাহরণ। স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগ এসেছে। চারিদিকে বক্তৃতা, বাগ্মিতা, বাঙালীর অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার। যখন বক্তৃতামঞ্চে বক্তাদের মুখ 'ভিসুভিয়াসের ফাটলের' মত হয়ে উঠেছে—সেই সময়ের কথা। যখন বক্তারা বাঙালীর ছেলেদের ব্যায়ামের উপদেশ দিয়ে বলছেন" দ্বাদশ বর্ষ বনবাস কালে, কখনই পাণ্ডবদের ঘি-দুধ জোটে নি, আর তাঁরা যেরূপ কৃষ্ণভক্ত ছিলেন নিশ্চয়ই পাঁঠা খেতেন না" তখনকার গল্প। বাঙালী ছেলেরা ট্রেনে বাড়ি ফিরছে হঠাৎ ঝড় এল। রাস্তায় একটা বাঙালী ছেলে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল—তাকে নিয়ে সবাই জটলা করছিল কিন্তু সাহায্য করছিল না। শেষ পর্যন্ত এক বিদেশী নাবিক এগিয়ে এল। তখন বাঙালীর পাল বললে, "ইস্ বেটা যেন কত বড় কাজই করেছে—আ-মর্-ব্যাটা

আর ত' কেউ পারে না।—বাহাদুরীর জায়গা পাওনি।" কেদারনাথ সেই ইংরেজ নাবিককে বলেছেন "বিলাতী 'binding'-এর জীবন্ত বেদান্ত।"

'আনন্দময়ী দর্শন' গল্পটির মধ্যে আমাদের জাতীয় চরিত্রের দিকে ইঙ্গিত আরো তীক্ষ্ণ। যদিও গল্প হিসেবে এটি খুব উন্নত নয়, অনেক ক্ষেত্রেই যান্ত্রিকতা ও ভাবালুতাদুষ্ট—তবুও এর মধ্যে দুটি শ্রেণী-চরিত্র প্রকাশিত হয়েছে। বিদেশীয় টিকিট চেকার হয়ত তার কর্তব্য ব্যাপারে অতিশয় কঠোর, মানবিক নয়—কিন্তু আমাদের দেশীয় চরিত্রগুলির অপদার্থতা ও অলস নিষ্ক্রিয়তাই সেখানে অনেক বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'দেবীমাহাত্ম্য' গল্পটিও আমাদের চরিত্রের আর একটি দিক। তিনটি গল্পে কেদারনাথ আমাদের কাপুরুষতা ও দায়িত্ব অস্বীকারের মনোভাব; কর্তব্য অবহেলা ও স্ত্রীজাতির প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনটিই চরিত্র-প্রধান গল্প। একটি বিদেশী নাবিক। একটি বিদেশী চেকার। এবং খুড়ো মহাশয়। তিনটিই জীবন্ত সৃষ্টি। 'আনন্দময়ী দর্শনে'র মধ্যে হয়ত আবেগ অনেক বেশী কিন্তু তা সত্ত্বেও টিকিট চেকারের কঠিন ব্যবহারের অন্তরালে যে মানবিক হৃদয় তা অতি নিখুঁত ও সুন্দর। 'দেবীমাহাত্ম্যে'র মধ্যে পুরুষের যে চারিত্র্যতামসিকতা ও অক্ষমের নিষ্ঠুরতার চিহ্ন দেওয়া হয়েছে তা অসাধারণ। এমন শান্তভাবে সেই নিষ্ঠুরতার বর্ণনা করা হয়েছে যে, বর্ণনাভঙ্গি হিসেবে এটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। আর একটি গল্পে এক স্মরণীয় চরিত্র আছেন তাঁর নাম কেদারনাথ দেন নি—কারণ

> "তার নাম কি ক্ষেপে বদলাতো! সাধারণত তিনি দিগ্বিজয়ী বলেই খ্যাত ছিলেন। নেপাল বিজয় করে এসে হল জং বাহাদুর, ব্রহ্মদেশ থেকে ফুঙ্গিলাল ইত্যাদি। বিকট বিকট নামের উপর তাঁর একটা উৎকট টান ছিল। সেবার এসে বললেন জাহানাবাদে তোদের বঙ্কিমের তিলোত্তমার বাড়ী দেখে এলুম রে! এটার স্মরণার্থে কি নাম নিলে fitting হয় বলতে পারিস? দুর্গেশ-নন্দিনীখানা আমার টাটকা পড়া, ফস্ করে বলে ফেললুম—গড়মান্দারণ গাঙ্গুলী।"

তারপর "মণ্ডন মিশ্রের" ধাপ্পা ত্রৈলোক্যনাথের নয়নচাঁদকে অবশ্যই মনে করায়। 'ভগবতীর পলায়ন' গল্পে এই মহাত্মার দ্বিতীয় আবির্ভাব। সেখানে উপরওলার ভয়ভীত পুলিশ কর্মচারীর যে ছবি ও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের যে অভিনয় তা প্রতি মুহূর্তে হাসির সৃষ্টি করে। ছোকরাদের হৈ-চৈ ভুলচুক হাসির মধ্যে যে জীবনরস তা কেদারনাথ উপভোগ করেছেন ও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের পূর্বসূত্র সৃষ্টি করেছেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

এক পুকুরের ধারে ছেলেরা 'পলাশীর যুদ্ধে'র 'Rehearshal' দিতে আরম্ভ করেছে। মোহনলাল অর্ধোত্থিত অবস্থায়, পশ্চিমদিকে দুহাত জোড় করে আরম্ভ করে দিলে—কোথা যাও ফিরে চাও সহস্র কিরণ ইত্যাদি। যখন 'feeling' এসেছে

তখন দুটি তরুণী বধূ জল নিতে এসেছিল। এদের আবৃত্তির মধ্যে আছে "ওগো দিনমণি"। সেই শুনে গ্রামের সেই দুটি বউ ত' ভয়ে অস্থির—একজন অন্যজনকে বলছে "ওরে দিনমণি দৌড়ে আয়।" কলসীটি দিনমণির কক্ষচ্যুত হয়ে যাবার পর এদের খেয়াল হল। এই ধরনের 'situation' সৃষ্টি কেদারনাথ সহজেই করতেন।

ছোটগল্প ও উপন্যাসের তফাত বোঝাতে গিয়ে খুড়ো কালাচাঁদ বলছেন মনে করা যাক একটি গল্পের শেষ—

> "লতিকা সেই গভীর নিশীথ অন্ধকারে লোকনয়নের অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে গঙ্গাবক্ষে ডুবিল। দেখিল কেবল তারকা, ডাকিল কেবল ঝিঁ ঝিঁ। বেশ, এতে কোন ভদ্রলোকের আপত্তি থাকতে পারে না; কিন্তু বাবাজী লতিকা কি আর ভাসতে পারে না? হাওড়ার বৃদ্ধ বহুদর্শী পোলটিতে দাঁড়ালে দেখতে পাবে লোহা ভাসছে, আর এক মণ সাত সের ওজনের ক্ষীণাঙ্গী লতিকার ভেসে ওঠাই কি বড় কথা। এবং যেই লতিকার ভাসা, 'Mind' মনে রেখো—অমনি উপন্যাসের আরম্ভ।"

প্রাচীনের প্রতি ভালোবাসার পরিচয় তাঁর 'থাকো' গল্পে। সেই বাংলা এখন নেই কাজেই 'থাকো'র চরিত্রও আর নেই। সে প্রাচীন বাংলার এক প্রতিচ্ছবি। বিবর্তন গল্পটির মধ্যে তিনটি ভাগ। তিনটি ভাগের তিনটি গল্পই কৌতুকের; কিন্তু শেষ গল্পের মধ্যে কৌতুক ও অশ্রু একই সঙ্গে ঝলমল করছে। দ্বিতীয় গল্পটিতে সেকালের ব্রাহ্মণের এক বিচিত্র ছবি ফুটে উঠেছে। এই চরিত্র চিত্রণে কেদারনাথের স্বাভাবিক স্ফূর্তি।

৩

ব্যঙ্গশিল্পের এই ধারায় অসামান্য লেখকরূপে যাঁর অধিষ্ঠান তিনি সার্থকনামা পরশুরাম। পরশুরামের কুঠার একদা ক্ষত্রিয় নিধনে ব্যস্ত ছিল।। এ যুগের পরশু-রামের কুঠার আবার নিয়োজিত ছিল অন্যায়, অসত্য, কলুষের নিধনে। তাঁর কর্ম-জীবন কেটেছে বিজ্ঞানশালায়। শুধু কর্মসূত্রে নয়, মর্মে মর্মে তিনি বৈজ্ঞানিক চেতনাসম্পন্ন। সংস্কৃত সাহিত্যে ছিল তাঁর দৃঢ় আসক্তি। বৈজ্ঞানিক মানসিকতার ফলে একদিকে যেমন তিনি মূঢ়তাকে বিদ্ধ করেছেন কঠিন তীক্ষ্ণ বাণে, অন্যদিকে বৈজ্ঞানিকতা ও চিন্তাশীলতার ছদ্মবেশকে ছিঁড়ে দিয়েছেন শাণিত পরশু আঘাতে। আর প্রাচীন সাহিত্যের রুচি তাঁর সাহিত্যবোধে দিয়েছে সংযম এবং ভাষা ব্যবহারে, শব্দ প্রয়োগে অপরিসীম কুশলতা ও অব্যর্থতা।

'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় সর্বপ্রথম তাঁর যে আবির্ভাব হল তাতেই তাঁর শক্তি সূচিত হয়েছে। এবং এই প্রকাশিত গল্পটি "বিরিঞ্চিবাবা" তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্পসমূহের অন্তর্গত। এই গল্পের মধ্যে তাঁর যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, মননশীলতা ও ব্যঙ্গ দৃষ্টির

পরিচয় প্রথম ফুটে উঠল এবং ক্রমশ তা নানা গল্পেই নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রথম গল্পের মধ্যে ধর্মীয় মূঢ়তার ছদ্মবেশ ও তার নির্লজ্জ জুয়াচুরির মর্মমূলে এই যে আঘাত এটি ভারতবর্ষের ধর্মান্ধতা সম্পর্কে তাঁর বহুচিন্তার ফল। এই দৃষ্টি অন্য গল্পে সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সমপরিমাণেই ব্যবহৃত। তাঁর প্রথম বই "গড্ডলিকা" (১৯২৪) তাই সমস্ত চিন্তাশীল ও হৃদয়বান মানুষের কাছে সানন্দে অভিনন্দিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে ব্যঙ্গ শিল্পের ধারা বিশেষ রূপ লাভ করেছিল। মানুষের বুদ্ধি ও হৃদয়ের কাছেই মানুষেরই অন্ধতার জন্য আঘাত ব্যঙ্গ শিল্পের বিশিষ্ট রূপ। ত্রৈলোক্যনাথের হাতেই তারই পরিপূর্ণতা। সুরেন্দ্র-নাথ মজুমদারের মধ্যে 'wit'-এর দীপ্তি প্রচুর কিন্তু ব্যঙ্গ সে তুলনায় কম। প্রভাত-কুমার প্রধানত হাস্যরসিক। তাঁর ব্যঙ্গের মধ্যেও তাই হৃদয়ের কোমলতা উঁকি মারে। এদিক থেকে রাজশেখর বসুর পরশুরাম নাম সার্থক এবং ব্যঙ্গে তিনি নির্মম। এই হিসাবে তিনি ত্রৈলোক্যনাথের সার্থক উত্তরাধিকারী।

ত্রৈলোক্যনাথের মতই পরশুরাম মানুষের ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তিগত জীবনের সর্বজনশ্রদ্ধেয় মূল্যগুলিতে বিশ্বাসী। অর্থাৎ জীবনের সৌন্দর্য ও সুষমা, সত্য ও আদর্শবোধ, সামাজিকতা ও পারিবারিকতার বন্ধনগুলির প্রতি তাঁদের অসীম শ্রদ্ধা। তাঁদের অশ্রদ্ধা যা কিছু অসুন্দর, অসত্য ও সর্বোপরি যা কিছু ছদ্মবেশী --তার প্রতি। এই সমস্যার ক্ষেত্রে তাঁরা উভয়েই বৃহত্তরভাবে সমাজ ও রাষ্ট্রকে আক্রমণ করেন নি। তাঁদের লক্ষ্য ছদ্মবেশী কয়েকটি মানুষ বা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ওপর। এদিক থেকে অন্যান্য বহু ব্যঙ্গ-শিল্পী, যেমন বানার্ডশর সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য খুব স্পষ্ট। কোন বিশেষ ধরনের আর্থিক কাঠামো বা সামাজিক কাঠামোর প্রতি বা শ্রেণী বিশেষের প্রতি তিনি ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ করেছেন—কিন্তু বাংলাদেশের ব্যঙ্গশিল্পীরা তা করেন নি। অবশ্য এই করা-না-করার ওপর সাহিত্যসৃষ্টি নির্ভর করে না—এটি শুধু দৃষ্টিভঙ্গীর কথা।

ত্রৈলোক্যনাথের মতই পরশুরাম চরিত্র স্রষ্টা। বাংলাসাহিত্যে ভাঁড়ু দত্ত, হীরা. যে স্থানে সেই আসরেই নয়নচাঁদ ও ডমরুধর অনায়াসে জায়গা দখল করতে পারে। তারই পাশে যে পরশুরামের চরিত্রগুলি যে গোল হয়ে ঘিরে বসতে পারে এতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর বিরিঞ্চিবাবা এই দুর্লভ ভাগ্যের অধিকারী।

কিন্তু তাঁর অন্যান্য চরিত্রগুলি সেই দুর্লভ স্বর্গের চিরজীবী অধিবাসী না হ'ক তারা যে এই বাংলাদেশে বহুকালের জন্য বেঁচে থাকবে এতে দ্বিমত হবার কোন অবকাশ নেই। 'বিরিঞ্চিবাবা'র বরদা মুখুজ্যে, 'কচি সংসদে'র নকুড়মামা, 'রাতারাতি' সুষুম্নাদেবী ও লালিমা পাল (পুং) এত জীবন্ত, এত সহজ ও স্বচ্ছন্দ যে তাদের কথাবার্তা তাই প্রবাদে পরিণত হওয়া কিছুই অসম্ভব নয়। চিকিৎসা-সংকটের কবিরাজের একটি বচন অন্তত ইতিমধ্যেই সেই মর্যাদা লাভ করেছে।

এই পর্যন্ত ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে সহমর্মিতা। এইবার আসে ব্যবধানের প্রসঙ্গ। সে ব্যবধান প্রধানত দুটি ক্ষেত্রে। প্রথমত কল্পনায়, দ্বিতীয়ত সাহিত্যরূপে। আমরা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি ত্রৈলোক্যনাথের কল্পনা সেই ধরনের কল্পনা নয়—যা প্রত্যক্ষকে অবলম্বন করে অপ্রত্যক্ষে ধাবিত হয়, নিকট থেকে দূরে অভিযাত্রা করে, বস্তু থেকে ভাবে উধাও হয়, খণ্ডকে অখণ্ড করে দেখে। তাঁর কল্পনাকে বলা চলে উদ্ভট। যেখানেই তিনি এই সামাজিক সমস্যা থেকে মুক্তি নিতে চেয়েছেন সেখানেই বিশুদ্ধ আজগুবির জগতে বিশ্রাম করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন উদ্ভট শ্লোকের ধারা আছে, বাংলা গল্পেও যেমন উদ্ভট ও গুলিখোরের গল্প আছে—ত্রৈলোক্যনাথ তাদেরই সমন্বয় করে একটি নূতন পথ দেখিয়েছেন। রাজশেখরের কল্পনা সর্বদাই প্রত্যক্ষ ও ঋজু। যথেষ্ট পরিমাণে ক্লাসিকাল। মুহূর্তের জন্যও তাঁর কণ্ঠ কোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনায় বিহ্বল নয়। নরনারীর হৃদয় রহস্যের উদ্ঘাটনে কখনও তিনি দ্বিধা ও আবেগাতুর নন। এই দৃষ্টিই তাঁর সাহিত্যরূপটিকে করেছে প্রত্যক্ষগ্রাহ্য কিন্তু সুন্দর। ভাষা ও শব্দ চয়নে তাঁর লক্ষ্যই হল সরলতা এবং সরলতার সৌন্দর্য। ত্রৈলোক্যনাথ ভাষা সম্বন্ধে যত্নশীল নন। তাঁর মধ্যে সরলতা আছে কিন্তু সৌন্দর্য নেই। তা যেন বহুল পরিমাণে রিক্ত। কিন্তু তবুও পরশুরাম যে ত্রৈলোক্যনাথের শিষ্য এতে কোন সন্দেহ নেই।

'সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পটির মধ্যে এই আত্মীয়তা অত্যন্ত স্পষ্ট। ধর্মের ভণ্ডামির প্রতি যে তীক্ষ্ন ইঙ্গিত পরশুরাম করেছেন সেই ইঙ্গিতই বার বার করেছেন ত্রৈলোক্যনাথ। পাপবোধ সম্বন্ধে যে আলোচনা এখানে আছে তার মধ্য দিয়েই বিত্তশালী কিন্তু চরিত্রহীন মানুষদের স্বরূপ ফুটে উঠেছে। মুনাফাখোর গণ্ডেরি ভেজালের ব্যবসা করে কিন্তু তার ধারণা যে এই ভেজালের জন্য কোন পাপ তার নেই। এ পাপ হল কাসেম আলির—কারণ সে স্বয়ং এই ভেজাল মেশায়, সুদ খায়। আর গণ্ডেরি শুধু টাকা দেয়, সে হাতেও স্পর্শ করে না, চোখেও দেখে না। তা ছাড়া—"হামার পুন্ভি থোড়া—বহুত জমা আছে। একাদশী, শিউরাত, রামনওমীমে উপবাস। দান—খয়রাত ভি কুছু করি।" এই যে আঘাত, এ কোন সমসাময়িক সমস্যা নয়—এ হল মানুষের চিরকালীন সমস্যা। আনুষ্ঠানিকতার বিরোধ, মন ও কর্মের বিরোধ। এই বিরোধই নানাভাবে মানুষের ইতিহাসে যুগে যুগে আত্মপ্রকাশ করেছে। যীশুখৃষ্টের কাছে মানুষ যখন যুদ্ধজয়ের জন্য প্রার্থনা করে তখন তার মধ্যে যে অসঙ্গতি, গণ্ডেরির কর্ম ও ধর্মের মধ্যে সেই অসঙ্গতি। পরশুরাম ইঙ্গিত করেছেন এই ভাবের ঘরে চুরির প্রতি। অর্থাৎ সত্যের সঙ্গেও সন্ধি, অসত্যের সঙ্গেও সন্ধি—দুই একসঙ্গে চলে না। কিন্তু জগতে এই সেতুবন্ধ করতে পারলে সবচেয়ে সুবিধে হয়। যদি সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় বোধগুলিকে মরা পুতুলের মত সামাজিক আলমারিতে রাখা যায় তাহলে সুবিধে—কারণ তারা

আলমারির শোভা হয় কিন্তু নীতিহীনতার প্রতিবন্ধক হয় না। এইখানেই ব্যঙ্গ-শিল্পীর আঘাত।

পরশুরামের কৃতিত্ব চরিত্র সৃষ্টিতে। তাই কয়েকটি চরিত্র আলোচনা করে তাঁর এই রীতি বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করার চেষ্টা করব। 'সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড'-এর শ্যাম ও গণ্ডেরি দুটি বিশিষ্ট চরিত্র। গণ্ডেরি "বহুত বাঙ্গালীর সঙে......মিলামিশা" করেছেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি লেখকদের অনুহেক কিতাব্ পড়েছেন। তিনি হলেন পাকা ব্যবসাদার। আর শ্যাম উচ্চস্তরের ঠক। একটি গ্রামে দেবীর স্বপ্নাদেশে মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা রটিয়ে তিনি শেয়ার বিক্রির ব্যবস্থা করেছেন। অজস্র লোককে ঠকাতে যে গণ্ডেরির কোন আপত্তি নেই—তার কিন্তু বকাঁড় বলিতে মহা আপত্তি—রামনাম শপথ করে সে এই কাজের বিরোধিতা করে। একদিকে এই অমানবিক ধর্মবোধ অন্যদিকে সে "ভেড়ার পাল" মনে করে সংসারের লোককে। তাদের ঠকাবার সমস্ত কৌশলই তার কাছে পবিত্র। ঠিক এই ধরনের চরিত্র এই শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী। একটি বর্ণনাতেই তার চরিত্রের সমস্ত ভণ্ডামি ধরা পড়ে। খেতে বসে তিনি বলছেন,

> "এঁচোড়ের ঘণ্ট ? বেশ; বেশ ? শোধন করে নিতে হবে। সুপক্ক কদলী কদলী আর গব্যঘৃত বাড়িতে হবে কি ? আয়ুর্বেদে আছে—পনসে কদলং কদলে ঘৃতম। কদলী ভক্ষণে পনসের দোষ নষ্ট হয়, আবার ঘৃতের দ্বারা কদলীর শৈত্য গুণ দূর হয়।...ওটা কিসের অম্বল বললে—কামরাঙা ? সর্বনাশ, তুলে নিয়ে যাও। গতবৎসর শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে ঐ ফলটি জগন্নাথ প্রভুকে দান করেছি।"

অন্য জায়গায় শ্যামানন্দের সংস্কৃত জ্ঞান স্পষ্টতই বঙ্কিমের লোকরহস্যে ইংরেজ পণ্ডিতের ভারতবর্ষ সম্পর্কে জ্ঞান প্রকাশ ও সংস্কৃত জ্ঞানকেই স্মরণ করায়।

> "তিনকড়ি। আচ্ছা ঠাকুরমশায়, আপনাদের তন্ত্রশাস্ত্রে এমন কোন প্রক্রিয়া নেই যার দ্বারা লোকের—ইয়ে—মানমর্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে।
>
> শ্যাম। অবশ্য আছে। যথা কুলার্ণব—অমানিনা মানদেন। অর্থাৎ কুল কুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে অমানী ব্যক্তিকে মান দেন।"

ভিলেন চরিত্রের বর্ণনায় পরশুরাম ত্রৈলোক্যনাথের সার্থক শিষ্য। তাঁর অন্য অনেক গল্পেই তিনি কতকগুলি চরিত্রও তাদের বাকরীতি অবলম্বন করে হাস্য-রসের সৃষ্টি করেছেন। 'চিকিৎসা সঙ্কট' গল্পটি তাদেরই অন্যতম। নন্দবাবু হঠাৎ মাথাঘুরে পড়ে যাওয়ার পর থেকে বন্ধু-বান্ধবের পরামর্শে অনবরত ডাক্তার—বদ্যির কাছে যাচ্ছেন। বিভিন্ন ডাক্তারের বিভিন্নরূপ তথা বাংলাদেশে এ্যালোপাথ, হোমিওপাথ ও কবিরাজের চিরন্তন দ্বন্দ্বই এই গল্পের হাসির উৎস স্থান। তার মধ্যেই অবশ্য ডাক্তারদের প্রতি ঈষৎ ব্যঙ্গ নানাস্থানেই আছে। ডাক্তার তফাদার 'M,D,M,R,A,S' স্পষ্টতই পরশুরামের ব্যঙ্গের বিষয়। তাঁর সমস্ত কিছুই বড়

বড়। তাঁর ডিগ্রি বড়, তাঁর ফিস্ অনেক, তাঁর প্রেসক্রিপসন সুস্থ ব্যক্তিকেও অসুস্থ করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। এই গল্পের তারিণী কবিরাজ বাংলা গল্পের অতি স্মরণীয় চরিত্র। বিশেষত তাঁর কথাবার্তা, তাঁর কবিরাজীর অলৌকিক শক্তি এবং তাঁর অতি বিখ্যাত উক্তি ঢান্‌তি পার না তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। সব শেষে চিকিৎসা সংকটের মুক্তি হল বিবাহে—এই মধুর পরিণতি এই গল্পটিকে অতি উপভোগ্য করেছে।

এই ধরনের উপভোগ্য গল্প 'লম্বকর্ণ'। একটি ছাগল নিয়ে যে দাম্পত্য কলহ ও নানা ঝঞ্ঝাট তাই গল্পটিকে উপভোগ্য দিয়েছে। এই দুটি গল্পেই একটি আসর লক্ষ্য করা যায়। এবং আসরের কথাবার্তা ও চরিত্রগুলির হাবভাবের মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথের আসরের ভঙ্গী অতি স্পষ্ট। ত্রৈলোক্যনাথ আসরের প্রাধান্য দিয়েছেন ফলে তাঁর গল্প আসলে গল্পশৃঙ্খলের একটি অংশ। পরশুরাম এই আসরকে প্রাধান্য দেননি—কিন্তু তার মর্যাদা দিয়েছেন। তাই চাটুজ্যেমশাই, খগেন বা উদয়-এর আবির্ভাব আমাদের অত্যন্ত তৃপ্তি দেয়। মাঝে মাঝে লাটুবাবুর মত চরিত্র এসে গল্পের মধ্যে রুদ্ধ হাস্যের সৃষ্টি করে—মনে হয় যেন লোকটি দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

গড্ডলিকার 'মহাবিদ্যা' গল্পটি পরশুরামেব তীক্ষ্ম ব্যঙ্গের আর একটি নিদর্শন। শ্রেণী নির্বিশেষে চুরি যে শ্রেষ্ঠবিদ্যা এই মর্মে বক্তৃতা দিতে এসেছেন জগদ্‌গুরু। এইটিই হল গল্পের প্রাণবস্তু। এই মহাবিদ্যা অর্থাৎ চুরি করতে গেলে সংঘবদ্ধ হতে হয়—অর্থাৎ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই কথাটি সত্য। এই গল্পে পরশুরামের তীক্ষ্ম বিদ্রূপ সমাজের সমস্ত দিককেই বিদ্ধ করেছে: পাশ্চাত্য দেশের জুয়াচুরি, চোমচাও আলির নির্বোধ সম্প্রদায় প্রীতি, অভিজাত সমাজের মূঢ় শূন্যগর্ভ দম্ভ। এর কয়েকটি কথার উদ্ধৃতি দিলেই স্পষ্ট হবে:

(১) দেশের জন্য যে ডাকাতি তার নাম বীরত্ব।

(২) যাতে ঢাক পিটিয়ে কেড়ে নেওয়া যায়, অথচ শেষ পর্যন্ত নিজের মানসম্ভ্রম বজায় থাকে, লোকে জয়জয়কার করে—সেটা মহাবিদ্যা।

(৩) মহাবিদ্বান অপরকে তুকতাক শেখায় নিজে ওসবে বিশ্বাস করে না।

এই গল্পে শ্রেণীচেতনার স্পষ্টরূপটি পরশুরাম ফুটিয়েছেন। পরশুরাম নিজে মার্কসীয় দর্শনে অথবা সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু এই গল্পে তিনি ধনিক শ্রেণীর চৌর্যবৃত্তি ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পরান্নজীবী মনোবৃত্তির ইঙ্গিত দিয়েছেন। আর শ্রমিক শ্রেণীর পাঁচু মিয়াকে লক্ষ্য করে জগদগুরু বলেছেন, "তোমার গুরু রুশিয়া থেকে আসবেন; এখন ধৈর্য ধরে থাক।" এই গল্পটি পরশুরামের মর্মভেদী ব্যঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

গড্ডলিকার শেষ গল্প 'ভুশণ্ডীর মাঠে'। এই গল্পের মধ্যেও ত্রৈলোক্যনাথের ক্ষীণ প্রভাব অনুভব করা যায়। ভূতপ্রেত নিয়ে গল্প রচনার যে কুশলতা ও তার

মধ্যদিয়ে মানব সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি ব্যঙ্গ—ত্রৈলোক্যনাথের তাতে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। পরশুরামের এই গল্পটি এই ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা।

"নাস্তিকদের আত্মা নাই। তাঁহারা মরিলে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাসে পরিণত হন"—এই কথাগুলি স্পষ্টই ত্রৈলোক্যনাথের রচনাভঙ্গি স্মরণ করায়। এই গল্পের মধ্যেই অনেক সূক্ষ্ম ব্যঙ্গই আছে—তার কিছুটা প্রেততত্ত্ব-বাদীদের—কিছুটা সমকালীন সাহিত্যে পরকীয়া প্রেমের। যতীন্দ্রমোহন সিংহ এই সময় "সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি সমকালীন লেখকদের বিরুদ্ধে বিধবার প্রেম, সধবার প্রেম ও গণিকার প্রেম ইত্যাদি মর্মে কতকগুলি অভিযোগ করেন। এই প্রবন্ধটি যে পরশুরামের হাস্যোদ্রেক করে-ছিল তাতে সন্দেহ নেই—তাই শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামীর দাম্পত্য সমস্যা নিয়ে তিনি 'ভুশণ্ডীর মাঠে' গল্পটি লিখেছেন। "শ্রীযুক্ত শরৎ চাটুজ্যে, চারু বাঁড়ুজ্যে, নরেশ সেন এবং যতীন সিংহ মহাশয়গণ যুক্তি করিয়া একটা বিলি-ব্যবস্থা করিয়া দিন"—এই ছত্রেই তার ইঙ্গিত। কিন্তু সমস্যা ছেড়ে দিলেও এর অন্তর্নিহিত কৌশলটি গল্পকে স্মরণীয় করে রাখবে। এই সমস্যা আজ মূল্যহীন ও ইতিহাসের বিষয় কিন্তু গল্পটি আজও একটি উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের মত দ্যুতিমান।

পরশুরামের পরিচয় সমাপ্ত হল না। কারণ এইমাত্র তাঁর শুভারম্ভ। যে হাস্য ও ব্যঙ্গের গল্পধারার আলোচনা আমরা করেছি তার ধারায় তাঁর পরিচয়টুকু মাত্র দিলাম কিন্তু সামনে যে বিরাট সমস্যাকীর্ণ, জীবনের শঙ্কিল পঙ্কিল দিনগুলি পড়ে আছে তার আলোচনায় তাঁর প্রতিভার পরিধি ও মহিমা আরো বিস্তারিতভাবে ফুটে উঠবে। কিন্তু তা আমাদের আলোচনার বাইরে। এই ধারার তিনি একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী এবং বাংলা গল্পের ইতিহাসে তিনি একজন শক্তিমান ব্যক্তিত্ব এই কথা স্মরণ করে এই আলোচনা সমাপ্ত করি।

একাদশ পরিচ্ছেদ

॥ বাংলা ছোটগল্পের বিষয়বৈচিত্র্য ॥

বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই বাংলা ছোটগল্প জীবনের বিচিত্র রস প্রকাশের বাহন হয়ে উঠেছিল। এই সময় থেকে ছোটগল্পের বিষয় বৈচিত্র্য প্রচুর। লেখকেরা এই শিল্পরূপটিকে নিয়ে নানা পরীক্ষা করছিলেন। জীবনের বহু সমস্যা, সমাজের নানা সমস্যা তখন ছোটগল্পের ক্ষুদ্র পানপাত্রে প্রতিবিম্বিত হচ্ছিল। প্রাক্-রবীন্দ্র-গল্পধারায় বৈচিত্র্য ছিল না। সাধারণভাবে তখন কাহিনী গঠন করার চেষ্টা ছিল। হাসির গল্প, ভূতের গল্প, প্রেমের গল্প ইত্যাদি কয়েকটি ধারায় সেই গল্পগুলিকে বিভক্ত করা যায়। কোন কোন গল্পে পতিতাদের প্রতি সহানুভূতি, কোন গল্পে ব্রাহ্ম ও হিন্দুসমাজের বাহ্যিক দ্বন্দ্ব, কোন গল্পে সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতি। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প বাংলাগল্পের প্রত্যেকটি শাখাকে পল্লবিত করল। বর্তমানকাল ও অতীতকাল নিয়ে গল্প লিখলেন। রাজার কাহিনী ও চাষীর কাহিনী লিখলেন। কখনও প্রেমের গল্প, কখনও হাসির, কখনও ভূতের, কখনও ব্যঙ্গের। কখনও গ্রামের ছবি কখনও নগরের। কখনও সহজ সরল জীবনের কখনও জীবনের জটিলতার কথার গল্প। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে বাংলা গল্পের আরো সমৃদ্ধি বাড়ল। তাঁর গল্প কখনও ব্যঙ্গপ্রধান, কখনও উদ্ভটরসের কখনও বা ভৌতিক। প্রভাতকুমারের হাতে বাংলা ছোটগল্প ভরে উঠল নব্যশিক্ষিত বাবুসম্প্রদায়ের জীবনের নানা তরল ও সরল উপাদানে। তাঁর বহুদর্শী মন কখনও কাহিনীর পটভূমিকা করেছে কলকাতায়, কখনও বিহারে, কখনও লন্ডনে। তাঁর চরিত্রগুলি কখনও বাঙালীবাবু, কখনও দরিদ্র জননী, কখনও স্নেহময়ী ইংরেজ মহিলা, কখনও কাশীর নির্বোধ বিবাহপাগল যুবক। তবুও বিশেষ করে বাংলাদেশের সামাজিক জীবনের ও পারিবারিক জীবনের ছোট ছোট ঘটনাগুলিকেই তিনি কাহিনীর উপাদান করেছেন। তাঁর পরবর্তী লেখকেরাও তাঁর লেখার রমণীয়তা গুণ থেকে প্রেরণা পেয়েছেন ও তাঁর ধারাকে বহন করে নিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ, ত্রৈলোক্যনাথ ও প্রভাতকুমার বাংলা গল্পের প্রথম যুগের তিনটি প্রধান নায়ক। বাংলা গল্পের বিচিত্র পথ এঁরাই খুলে দিলেন। সেই পথে তারপর বহু লেখকের আগমন হল। 'কল্লোল' প্রকাশিত হবার আগে পর্যন্ত এই তিনজনের চেয়ে উৎকৃষ্ট গল্প লেখক আর আসেননি। রাজশেখর বসুকে বাদ দিলে (যাঁর প্রথম গ্রন্থ ১৯২৪-এ প্রকাশিত) এই পর্বের অধিকাংশ লেখকই মধ্যম শ্রেণীর ও অনেকেই ইতিমধ্যে বিস্মৃতপ্রায়। অনেকেরই বই আজ দুষ্প্রাপ্য, মলিন জীর্ণ। এঁরা ব্যক্তিগতভাবে কেউই বাংলা-

সাহিত্যে কোন নতুন শক্তি সঞ্চয় করেননি—কিন্তু তাঁদের সম্মিলিত শক্তি বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে তথা সাহিত্যের ইতিহাসে শক্তি সঞ্চার করেছে। তাঁদের নাম আজ শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়। এই অধ্যায়ে তাঁদের সম্মিলিত গল্পধারার সাধারণ আলোচনা করা হবে। বিশেষ বিশেষ বিষয় অনুসারে এই গল্পগুলিকে ভাগ করা হল। এর দ্বারা এই পর্বের বাংলা গল্পের বিষয় বৈচিত্র্য স্পষ্ট হবে।

১

॥ সহজ জীবন ও পল্লীকথা ॥

বাঙালী জীবনের, বিশেষত ঘরোয়া ও পল্লীজীবনের ছবি, বাঙালী লেখকদের নিত্য আকর্ষণের বিষয়। রবীন্দ্রনাথ তার অগ্রণী। তিনি তাঁর স্নেহভাজন সাহিত্যিকদের সেইদিকে দৃষ্টি ফেরাতেও অনুরোধ করেছিলেন। একটি চিঠিতে তিনি বাংলার নিভৃত শান্ত পারিবারিক জীবনের রূপ ফোটাতে বলেছিলেন।১ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এই কথা পালন করেছিলেন। শ্রীশচন্দ্রের (১৮৬০-১৯০৮) অনেকগুলি গল্পে বাঙালী জীবনের ছবি খুবই বিশ্বস্ত ও জীবন্ত।২ তাঁর 'স্বয়ম্বর' গল্পটি তাঁর প্রতিনিধিমূলক রচনা। পাঁচ বৎসরের কন্যা সুহাসিনীকে নিয়ে গল্প শুরু। সে মাতৃহীনা। পিতা শশাঙ্কশেখরের সঙ্গে সে কাশীতে থাকে। চৌধুরাণী মহাশয়া এই মেয়েটিকে নিজের পুত্রবধূরূপে মনোনীত করেছিলেন। যখন বড় হল তখন সুহাসিনী মধ্যে মধ্যে চৌধুরাণীর নকল করত—তার কথাবার্তা ও ভাবভঙ্গির অনুকরণ করে মজা করত। সেই খবর যখন চৌধুরাণীর কানে উঠল তখন রাগ করে তিনি পুত্রের সঙ্গে তার বিবাহ দিলেন না। পরে হঠাৎ একদিন ঝড়ে একটি নৌকাডুবি হয় ও সেই নৌকাডুবিতে এই সুহাসিনীই চৌধুরাণীর পুত্রকে উদ্ধার করে। শেষ পর্যন্ত তাদের বিয়ে হয়।

এই গল্পটি শ্রীশচন্দ্রকে বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। এই গল্পের মূল কথাই হল সারল্য। মৃদু অভিমান এই গল্পের প্রাণ। সেই অভিমান ঝড়ের ঝাপটায় সরে গেল। মধুর হাসিতে এই গল্পের সমাপ্তি। এই মাধুর্য তাঁর 'ভট্টাচার্য মহাশয়' গল্পে। এই গল্প গত শতকের পল্লী বাংলার গল্প। আধুনিক মনে সেই সহজ-সারল্য অবিশ্বাস্য ঠেকে। এক ব্রাহ্মণ ভিনগাঁয়ে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেই গ্রামে

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: ছিন্নপত্র, পৃ: ১২-১৪
২। গ্রন্থাবলীর প্রকাশকাল ১৯১৯ খৃ: ২০শে অক্টোবর।

ভীষণ জলকষ্ট। পল্লীবধূদের সেই কষ্ট দেখে ব্রাহ্মণের মন ভরে উঠল ব্যথায়। তিনি নিজের জীবনের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ দিয়ে সেই গ্রামে একটি দীঘি প্রস্তুত করালেন। তাঁর ব্রাহ্মণী সানন্দে এগিয়ে এলেন এই কাজে। অতীত কালের এক হৃদয়বান ব্রাহ্মণের ছবি—তাঁর অপূর্ব করুণা ও পরিশ্রম গল্পটিকে অতি রমণীয় করেছে। এই রকম আর একটি ছবি 'সদানন্দ' গল্পে। সদানন্দ দরিদ্র কিন্তু নিষ্ঠাবান ও চরিত্রবান বৈষ্ণব। কত অত্যাচার, কত আঘাত তাঁর ওপরে হয়েছে তবুও তৃণের মত তাঁর সুনীচতা ও তরুর মত সহিষ্ণুতা।

শ্রীশচন্দ্রের মতই সুবোধচন্দ্র মজুমদার গ্রামবাংলার জীবন নিয়ে গল্প লিখেছিলেন। 'আমাদের গ্রাম' নামে একটি গ্রন্থে সাতটি গল্পে[৩] গ্রামবাংলার বিভিন্ন রূপ প্রকাশ করেছেন। বাংলার পল্লীজীবনের প্রতি লেখকের দরদ খুবই স্পষ্ট। কখনও কখনও গল্পে গ্রামের শান্ত তৃপ্ত জীবন—কখনও বা তার ক্ষুদ্রতা ও নীচতা। তবে গল্প হিসেবে কোনটিই উচ্চশ্রেণীর নয়। অত্যন্ত বেশী তথ্যাক্রান্ত—documentary মনে হয়। সেই কারণেই সাহিত্য হিসেবে তার মূল্য না থাকলেও বাংলাদেশের ছবি হিসেবে তার মূল্য আছে। এই রকম আর একটি documentary চিত্র লিখেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। তাঁর আনন্দ পর্যটন" কাহিনীটি মেদিনীপুর জেলার তেরপেখিয়া অঞ্চলের একটি ছবি।

কিন্তু এইসব বর্ণনায় পল্লীজীবনের আনন্দ বেদনা স্পষ্ট নয়। পল্লীজীবন কবিকল্পিত স্বর্গভূমিও নয়—আবার অত্যাচার, অনাচার ও কুসংস্কারেই তার সমস্ত প্রাণ আচ্ছন্ন নয়। আজও পর্যন্ত বাংলাদেশের সাহিত্যিকরা এই দুটি চরম পন্থায় পল্লীকে চিত্রিত করেন। শরৎচন্দ্র ও বিভূতিভূষণের লেখাতেই একটি ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু সাধারণত তখন, (এবং এখনও) পল্লীজীবনকে নগরজীবনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা হত। কারণ অনেকের কুসংস্কার যে পল্লীর মানুষ সহজ সরল। আসলে পল্লীজীবনে নাগরিক সভ্যতার উপাদান কম। কিন্তু মানব-উপাদান নগরে এবং পল্লীতে একই। তবুও বাঙালী লেখকেরা চিরকালই পল্লীকে আদর্শায়িত করেছেন। শরৎচন্দ্র, যদিও নিজেও পল্লীকে আদর্শায়িত করেছেন, সর্বপ্রথম পল্লীর জীবনের নীচতা ও অন্তসারশূন্য জীবনযাত্রার প্রতি ইঙ্গিত করেন ও পল্লীমানুষের আনন্দ-বেদনাকে প্রকাশ করেন। তাঁর পূর্বে শ্রীশচন্দ্র লিখেছেন। তাঁর 'জামাইষষ্ঠী' গল্পে পণপ্রথার বেদনা ও 'রায়গৃহিণী' গল্পে পল্লীজীবনের মাধুর্য।

৩। আমাদের গ্রাম, দাসমশাই, শ্যামা মা, গ্রাম্যবিবাদ, রায়-গিন্নি, হলধর মণ্ডল ও ছোঁয়াচ পড়া—এই সাতটি গল্প। সুবোধচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থের নাম গল্প (১৩১৩) পঞ্চপ্রদীপ, অনুবাদ।

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য তাঁর 'কৃষক-কুমারী'১ গল্পে নায়েবের কামার্ত-চরিত্র ও এক পল্লীবালার করুণ কাহিনী লিখেছেন। কিন্তু প্রাক্‌-শরৎচন্দ্র পল্লীকথার ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় শিল্পী হলেন দীনেন্দ্রকুমার রায় (১৮৯৬-১৯৪৩)। তিনি শরৎচন্দ্রের পূর্বেই লেখা শুরু করেন এবং পল্লীজীবন সম্পর্কে তাঁর লেখাগুলি শরৎচন্দ্রের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অপরিণত ও আদিম।২

দীনেন্দ্রকুমারের তিনখানি গ্রন্থ বিশেষ স্মরণীয় পল্লীবৈচিত্র্য (১৯০৫), পল্লী-কথা (১৯১৭), পল্লীচরিত্র (১৯২২, ৩য় সং)। 'ভারতী' পত্রিকায় তিনি প্রথম পল্লীকাহিনীগুলি রচনা আরম্ভ করেন। তাঁর ডিটেকটিভ গল্পের পাশে পাশে এই গল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর দৃষ্টি অতি সহানুভূতিশীল। অনেক পরি-মাণেই তিনি বাস্তবানুগ। খুঁটিনাটি তথ্যের প্রতি তাঁর আসক্তি। অত্যধিক ভাবালুতা তাঁর দোষ। কিন্তু বাস্তব বর্ণনায় তিনি অনেক ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের শুধু পূর্বসূরীই নন—শরৎচন্দ্রের চেয়ে উৎকৃষ্ট। পল্লীকথার৩ ভূমিকায় তিনি লিখেছেন "এগুলি যাহাদের চিত্র, তাহারা দোষগুণে বঙ্গপল্লীরই জীবন্ত মানুষ পল্লীগ্রামের প্রাণ এবং পল্লীসমাজের মেরুদণ্ড।" এই কথা থেকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ধরা পড়ে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তার মিল ও অমিলও স্পষ্ট। বঞ্চিত ও লাঞ্ছিতের যে ফরিয়াদ সেটুকু নেই দীনেন্দ্রনাথে। কিন্তু শরৎচন্দ্রের মত তিনিও এই মানুষগুলিকে ভাল-বাসেন ও তাদের পল্লীসমাজের মেরুদণ্ড বলে শ্রদ্ধা করেন। দীনেন্দ্রনাথের ঘটনা-গুলি অতি তুচ্ছ অতি সাধারণ।৪ এ বিষয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ব-সূরী তিনি। বিভূতিভূষণের পল্লীজীবনের ঘটনাগুলিতে যেমন অতি তুচ্ছ ঘটনাকে আশ্রয় করে গভীর অনুভূতি ব্যাপ্ত হয়ে ওঠে—তেমনই দীনেন্দ্রকুমারে। কিন্তু দীনেন্দ্রকুমারের কল্পনাশক্তি দুর্বল—বিভূতিভূষণের কল্পনা সুদূরচারী।

১। রত্নঝাঁপি (১৩২২/১৯১৫)

২। ইতিপূর্বে হারাণচন্দ্র রক্ষিত পল্লীজীবন নিয়ে লিখেছেন। দ্রষ্টব্য জন্ম-ভূমি ১২৯৯। চৈত্র, পৃঃ ২২৪-৩১ 'পল্লীগ্রামে একদিন'।

৩। আগমনী, পরিত্যক্তা, প্রত্যাখ্যান, দাদা, মা, নববধূ, বিপত্নীক, বিজয়ার মিলন—এই নটি গল্পের সংকলন। প্রত্যেকটি গল্পের পটভূমি দুর্গা-পূজা। সম্ভবত তার কারণ এটি 'রহস্যলহরী সিরিজ'এর শারদীয়া সংখ্যা।

৪। পল্লীজীবনের সাধারণ বিষয় নিয়েও দীনেন্দ্রকুমার নানা প্রবন্ধ লিখেছেন।
একটি পল্লীকাহিনী, ভারতী, ১৩০০ আষাঢ়, পৃঃ ১৬৮-৭১
শীতের দিনে পল্লীগ্রামে, ভারতবর্ষ, ১৩২০-২১ পৃঃ ৩৭৪

কখনও কখনও দীনেন্দ্রকুমার পল্লীবর্ণনায় লঘুরসিকতার ভঙ্গি গ্রহণ করেছেন ঠিকই, যেমন :

> "হরিশপুরে শ্রীদাস বাঁড়ুয্যে গ্রাম্য জমীদার গাঙ্গুলীদের ঘরজামাই হইয়া সর্বপ্রথম কোন সালে কোন তারিখে শ্রীধাম হরিশপুরে পদার্পণ করিয়াছিলেন তাহা প্রাচ্য বিদ্যার্ণবের বিশ্বকোষে যখন পাওয়া যায় না তখন আমাদিগকে তাহার আবিষ্কার চেষ্টায় অগত্যা বিরত হইতে হইল।"

কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তিনি বেদনার্দ্রকণ্ঠ, দরদভরাতুর ও সহানুভূতিশীল ভাবেই সমস্ত কাহিনী বলেন। পরিত্যক্ত গ্রামের নিরানন্দ শ্রীই তাঁর গল্পের প্রাণ। তিনি বাংলাদেশের গ্রামের যে রূপ প্রস্ফুটিত করেছেন তা ইংরেজ কবি গোল্ড-স্মিথের পরিত্যক্ত গ্রামবর্ণনার সঙ্গে বিশেষভাবে তুলনীয়। তাঁর বর্ণনাগুলি সুন্দর ও সহজ।

> "তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। ভাদ্র মাসের সন্ধ্যা। গ্রামের গর্ত ডোবা, পুষ্করিণীগুলি জলে পরিপূর্ণ......গৃহস্থের গোশালায় 'সাঁজালের' ধোঁয়া উঠিয়া যেন কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করিতেছে। মঙ্গলচণ্ডীর মন্দিরে কাঁশরঘণ্টা বাজিতেছে।...একটা জলপূর্ণ ডোবার উপর অবস্থিত বাঁশবনের পাশে কতক-গুলি শৃগাল ঊর্ধ্বমুখে সমস্বরে সন্ধ্যার আগমনবার্তা ঘোষণা করিতেছে।"

'পরিত্যক্তা' গল্পটি অত্যন্ত ভাবালুতাযুক্ত। দাদা, দিদি, মা, নববধূ প্রভৃতি তথ্যাক্রান্তির ভাব বেশী। 'বিপত্নীক' গল্পটিতে পল্লীশ্মশানের নিখুঁত ছবি। 'বিজয়ার মিলন' গল্পটি পারিবারিক কলহ ও ভাগবাঁটোয়ারার গল্প। কাকা ও ভাইপোর মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা হল। তাদের এই ব্যবধান ঘোচাল একটি শিশু। শরৎচন্দ্রের বহু গল্পেই এই কৌশলটি বারবার অবলম্বিত হয়েছে। 'বিন্দুর ছেলে' গল্পের সঙ্গে এর যোগ নিতান্ত আকস্মিক নাও হতে পারে।

দীনেন্দ্রকুমারের একটি গল্প উৎকৃষ্ট। 'প্রত্যাখ্যান'। নটবর মেয়ের বিয়ে দিয়েছিল কিন্তু দাবীমত গহনা দিতে পারেনি। তাই বাপ যখন মেয়ে আনতে গেল তখন শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়ে পাঠাল না। বাপ একা ফিরে এল। মা

> 'মেয়ের জন্য ভাত রাঁধিয়া পাথরের খোরায় ঢালিয়া রাখিল, দুধটুকু জ্বাল দিয়া ক্ষীর করিল। জটাধারীকে দিয়া বাজার হইতে একপোয়া সন্দেশ আনাইয়া রাখিল......ব্যাকুলস্বরে নটবরকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এলে, কৈ আমার হারানী কৈ। নটবর সেইখানে বসিয়া পড়িল...হতাশভাবে অস্ফুট স্বরে বলিল, তাকে পাঠালে না, মাকে আনতে পারলাম না। পাতানী ধীরে ধীরে স্বামীর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল, ব্যথিত হৃদয়ে কাতরস্বরে বলিল, মাগো, তুই আসচিস ভেবে তোর জন্য ভাত রেঁধে তোর আশায় পথ চেয়ে বসে আছি।"

এই গল্প 'পুঁইমাচা'র (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়) কথা স্মরণ করায়।

পল্লীকাহিনীগুলিতে বর্ণনাভঙ্গী কখনও কখনও বাস্তব ও কিছুপরিমাণে তথ্যাক্রান্ত ও সর্বোপরি অনেকাংশে ভাবালু। দীনেন্দ্রকুমার ছোটদের জন্য 'ঢেঁকির

কীর্তি' (১৯২৫) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এখানেও পল্লীবাংলার ছবি—তবে অতীত কালের। ভূমিকায় লিখেছেন 'ইহাতে সেকালের উদ্দাম পল্লীজীবনের কতকটা আভাস পাওয়া যায়; এবং ভাল হউক, মন্দ হউক, দোষেগুণে খাঁটি মানুষটিকে ইহার মধ্যে দেখিতে পাই।' এই গ্রন্থের গল্পগুলিতে[১] দীনেন্দ্রকুমারের ভাষা বিশেষ প্রশংসনীয়। দীন-দরিদ্র সাধারণ লোকের ভাষা—গোয়ালা, মাঝি, বুড়ি প্রত্যেকের কথা কী জীবন্ত। বাংলাদেশের অতীতকালের শক্তির রূপ প্রকাশ পেয়েছে দুটি ডাকাতের গল্পে—

এক, আশানন্দ ঢেঁকী আর দুই, বিশু সর্দারের কাহিনীতে। শেষ কাহিনীতে বাগ্দী বলরামের চরিত্রকল্পনা চমৎকার। আর এই গ্রন্থে দীনেন্দ্রনাথের নিসর্গ বর্ণনাও বিশেষ স্ফূর্তিলাভ করেছে:

> "সে দেখতে পেল, তাদের মাথার উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে বুনো হাঁস পূর্ব-দিক থেকে উড়তে উড়তে পশ্চিমের দিকে কোন্ বিলে চরতে যাচ্ছে। বছরের এই সময় প্রায় প্রতিবারই বুনো হাঁস নারিয়েল প্রভৃতি নানা রকম জলার পক্ষী ঝাঁক বেঁধে দূরবর্তী জলাশয়ে চরতে যায়। এক এক ঝাঁকে অনেক পাখী থাকে। তারা যখন একটির পাশে একটি, তার পাশে আর একটি এইভাবে পাখা মেলে আকাশের অনেক উপর দিয়ে উড়ে চলে, চাঁদের আলোতে সে দৃশ্য বড়ই সুন্দর দেখায়, মনে হয় নিস্তরঙ্গ শান্তিপূর্ণ আলোকসমুদ্রে তারা সাঁতার দিচ্ছে।"

পল্লীজীবনের আরো নানা ছবি যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিভিন্ন গল্পে 'সমাজচিত্র' ও 'সংসারচিত্র' তাঁর প্রধান দুটি গ্রন্থ।[২] এই দুটি গ্রন্থের নামেই পরিচয় যে গল্পগুলি পারিবারিক ও সামাজিক চিত্রবহুল। তাঁর 'আগন্তুক' গল্পটি কৌতুকরসের একটি ভাল উদাহরণ। এই গল্পে প্রভাতকুমারের ছায়া অত্যন্ত স্পষ্ট। দুপুরবেলা ভাবী জামাই শ্বশুরবাড়ি এসেছে। দুর্ভাগ্যবশত শ্বশুর তখন বাড়ি নেই। আর বাড়ির অন্য কেউ তাকে চেনে না। ফলে কেউ তার আদরযত্ন করছে না। বরং যথেষ্ট অবহেলা করছে। ঈঙ্গিত করেছে যে চলে গেলেই ভাল হয়। ভাল করে খেতে দেওয়াও হয়নি। বাইরে কলাপাতায় খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। শাশুড়ি উচ্চকণ্ঠে দুচারটে বেশ গ্রাম্য গালাগালিও শুনিয়ে দিয়েছে। তারপর শ্বশুর এসে উপস্থিত। তিনি এসে বললেন সর্বনাশ, করেছ

১। 'ঢেঁকির কীর্তি, শিয়াল মোক্তার, মানুষ বাঘ, বিয়েপাগলা বুড়োর দুর্গতি ভুঁইফোঁড় শিব ও মরদ-কা-বাত।

২। যোগেন্দ্র-গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয় ১৯১৪ খৃঃ অব্দে

কি। যাই হোক তারপর গল্পের পরিণতি মধুর। এই কাহিনীর মধ্যে গ্রাম্য হাস্যপরিহাস, মেয়েদের সখীত্ব সম্পর্ক, অপরিচিত যুবকের প্রতি আশঙ্কা সব মিলিয়ে গ্রাম্য জীবনের চমৎকার ছবি।

দীনেশচন্দ্র সেনের (১৮৬৬-১৯৩৯) কয়েকটি গল্প পল্লী জীবন নিয়ে তাঁর সমস্ত লেখার বড় গুণ সমবেদনা ও মমতা। তিনি বর্তমান সমস্যা নিয়ে চিন্তিত নন—বরং তার প্রতি বিরূপ। প্রাচীন জীবনের আদর্শগুলি তাঁর কাছে মূল্যবান। তাঁর 'পুত্রস্নেহ' গল্পটি তার প্রমাণ।১ "দেশমঙ্গল" কাহিনীটি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও গল্প রচনার কুশলতার প্রমাণ হিসেবে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এই কাহিনীটি প্রচারমূলক।২ ফলে গল্পটি উৎকৃষ্ট নয়। গ্রাম ও শহরের জীবনের তুলনাই এর মূল লক্ষ্য। এই তুলনায় গ্রাম বড় এই প্রমাণিত হয়েছে।
পল্লী, পল্লীবাসী ও সহজ সরল জীবনের কথাকার জলধর সেন (১৮৬০-১৯৩৯)। জলধর সেনের হাতে আমাদের পল্লীপ্রকৃতি ধরা পড়েনি—কিন্তু ধরা পড়েছে পল্লীর মানুষ। তাঁর পল্লী দীনেন্দ্রকুমারের পল্লীর মতই। শরৎচন্দ্রের মত তিনি কোন সমস্যায় পীড়িত হন নি, সমস্যা নিয়ে চিন্তাও করেন নি। তবে নাগরিক জীবনের জটিলতার চেয়ে পল্লীজীবনের মধ্যে অনেক শান্তি পেয়েছেন। এ বিষয়ে যোগেন্দ্র-নাথ বা দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর চিন্তার ঐক্য আছে। 'আশীর্বাদ' গ্রন্থের গল্পগুলি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। প্রথম গল্পটি 'আশীর্বাদ'। দুই ভাই নৌকা চালায়। একদিন বিকেলে লেখক পদ্মার তীরে এসে উপস্থিত। তাঁকে বাড়ি যেতেই হবে। অথচ সেদিন কোন মাঝিই নৌকা ছাড়তে চায় না, যে-কোন মুহূর্তে ঝড় আসতে পারে। শেষে দুই ভাই রাজী হল। তারা নৌকা ছেড়ে দিল। তার আগে লেখক একটি ঘটনায় দেখিয়েছেন যে আগের দিন এক শহুরে ভদ্রলোক এদের এক-জনকে একটি অচল টাকা দিয়ে গেছে। শহরের মানুষের প্রবঞ্চনা ও গ্রামের অশিক্ষিত মানুষের সরল উদারতা লেখক প্রবলভাবে নাড়া দিল। তারপর হঠাৎ ঝড় উঠল। পদ্মার প্রবল ঝড়ে নৌকোডুবি হল। দুই ভাই তারাও জলের মধ্যে পড়ল। নফর নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে লেখককে বাঁচাল—কিন্তু সে নিজের ভাইকে হারাল। মনুষ্যত্বের যে বিরাট রূপ, স্বার্থত্যাগের যে মহিমা লেখক তথাকথিত নীচ মানুষের মধ্যে দেখলেন তা তাঁকে বিস্ময়ে ভরিয়ে দিল।

কিন্তু এই চারিত্রিক মহানতাকে অঙ্কন করা সত্ত্বেও গল্পের কোন কুশলতা নেই। প্রথমত জলধর সেন অত্যন্ত রকম ভাবালুতাপ্রিয়। এই ভাবালুতা পরে শরৎচন্দ্রের

১। বঙ্গবাণী ১৩৩২ ফাল্গুন

২। প্রথম পৃষ্ঠায় ছিল : খাঁটি দেশী, সুললিত গল্প- শ্রীদীনেশচন্দ্র প্রণীত ও প্রকাশিত—দেয় ভিক্ষা তিন আনা।

মধ্যেও দেখা গেছে—কিন্তু শরৎচন্দ্রের হাতে তা অনেক মার্জিত। ভাবালুতার জন্যই জলধর সেনের কোন গল্পই দানা বাঁধতে পারে নি। এমনকি অনেক সময় তিনি বিদেশী গল্প থেকে কাহিনী নিয়েও তাকে ভাবালুতাযুক্ত করে নষ্ট করেছেন। মপাসাঁর বিখ্যাত 'হার' গল্পটিকে জলধর কী ভয়াবহ ভাবালুতায় সিক্ত করেছেন—তা দেখলে অবাক হতে হয়।১ এই ভাবালুতার আর একটি দোষ হল কোন গল্পেরই ঐক্য থাকে না। লেখক নিজে ভক্ত। ফলে তাঁর ভক্তিরস মাঝে মাঝে প্রবল ভাবে প্রবাহিত হয়ে গল্পকে নষ্ট করে দিয়েছে।

'বিচার' গল্পের মধ্যে এক গ্রাম্য নায়েবের উচ্ছৃংখল আচরণ কীভাবে অন্তপুর-চারিণীর প্রতি পড়েছে তার করুণ ঘটনা। বড় ভাই এই ঘটনায় মর্মাহত কিন্তু কিছু করতে পারবে শক্তি নেই তার। ছোট ভাই শুনেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। সে চলল নায়েবকে শিক্ষা দিতে। শেষে দুই ভাই মিলে গেল জমিদার কন্যার কাছে. জমিদারকন্যা আদর্শ সতী নারী। তিনি এই ঘটনায় ক্রোধে বিচলিত হলেন নায়েবের যথোচিত শাস্তির ব্যবস্থা হল। এই গল্পের গল্পত্ব দুর্বল। কিন্তু এখানেও গ্রাম্যজীবনের প্রতি জলধর সেনের দৃষ্টিভঙ্গিটি লক্ষণীয়। সমস্ত অনাচার ও দুর্বলতার মধ্যেও এখনও সত্য বেঁচে আছে, কল্যাণ ও ধর্মের এখনও জয়। তাই একদিকে যেমন লোভী পাপাত্মা নায়েব অন্য দিকে তেমনই আদর্শ সতীত্ব ও কল্যাণ-বুদ্ধির প্রতীক জমিদারকন্যা। এই আমাদের পল্লীসমাজ।

এই সমাজ কতকগুলি বিশেষ মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেই মূল্যবোধ-গুলিকে তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায় অনেক সময়ই অপমান করে। সেই অপমানের কাহিনী 'নিয়তি' গল্পে।

বিনয়বাবু তাঁর ভাইয়ের বিবাহ স্থির করলেন হরিহরবাবুর মেয়ের সঙ্গে। হরিহরবাবু একদা অতি ধনী লোক ছিলেন। শুধু ধনী নয়, মানীও ছিলেন। কিন্তু আজ তাঁদের কিছু নেই। বিনয় চাইত চরিত্র, সম্মান ও মনুষ্যত্ব। সে ভাইকেও সেইভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু ভাই তা হয়নি। বিবাহের দিন বিনয়ের ভাই ও তার একদল তথাকথিত শিক্ষিত বন্ধু বরযাত্রী হিসেবে বিবাহ আসরে গিয়ে হরিহরবাবুকে তাঁর দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে অপমান করে। সেই অপমানে তথাকথিত নীচ শ্রেণীর লোকেরাও ব্যথিত ও লজ্জিত বোধ করে। কিন্তু এই শিক্ষিত ব্যক্তিরা

১। 'নৈবেদ্য' গ্রন্থে 'অন্ধ' গল্পটি দ্রষ্টব্য। তিনি লিখেছেন কোন ইংরিজি গল্পের ছায়ায় লিখিত। প্রকৃতপক্ষে গল্পটি মপাসাঁর 'হার' অবলম্বনে লিখিত।

বিন্দুমাত্র বেদনাবোধ করে নি। বিনয় এই দুঃখে ও বেদনায় শয্যা গ্রহণ করে।[১] অর্থাৎ জলধর সেনের গল্পে বোঝা যায় যে তিনি যে আদর্শের জন্য গ্রাম্য জীবন ও সহজ-সরল জীবনকে ভালবাসেন তা ক্রমশই লুপ্ত হচ্ছে। তা শুধু টিঁকে আছে নীচ, হীন, সমাজের তলাকার মানুষের মধ্যে। তাই তাঁর মনে রাখার মত চরিত্রগুলি কেউই উচ্চমধ্যবিত্ত শ্রেণীর নয়। তারা সবাই নীচ শ্রেণীর মানুষ। 'বাতাসী' একটি অসামান্য চরিত্র। প্রেমের জন্য স্বার্থত্যাগ, জীবনের সবকিছুকে প্রেমের কেন্দ্রে চালিত করার দুর্জয় শক্তিতে এই গল্পটি সার্থক হয়েছে। তাঁর 'পরাণ মণ্ডল'কে মনে থাকে। মনে থাকে তাঁর 'নফর'কে। মনে থাকে 'মা কোথায়' গল্পের রামকুমার মাঝিকে।

জলধর সেন ও দীনেন্দ্রকুমার উভয়েই পল্লীজীবনের কথা লিখেছেন। উভয়েই পল্লীমানুষের দুঃখ-বেদনার কাহিনী বাঙালীকে উপহার দিয়েছেন। দীনেন্দ্রকুমারের লেখার ত্রুটি তথ্যাক্রান্তি, জলধরের লেখার ত্রুটি ভাবালুতা। দীনেন্দ্রকুমারের অধিকাংশ চরিত্রই প্রতিনিধিমূলক। তাঁর হারানী বা নটবর—বাংলাদেশের হতভাগ্য মাতা বা পিতা। ব্যক্তি-পরিচয় তাদের শ্রেণী-পরিচয়ের মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু জলধর সেনের অধিকাংশ চরিত্রই ব্যক্তি-চরিত্র। এখানেই তিনি দীনেন্দ্রকুমারের চেয়ে একপদ অগ্রসর।

পল্লীজীবনের কাহিনীগুলিতে মুসলমান জীবন ও চরিত্র কদাচিৎ ফুটেছে। জলধর সেনের একটি গল্পে (পাগল) একটি প্রেমোন্মাদ মুসলমান যুবকের কাহিনী আছে। সে একটি হিন্দু মেয়েকে দেখে ভালোবেসেছিল। কিন্তু এই ভালোবাসায় কোন প্রাপ্তি নেই। তাই শেষ পর্যন্ত সে উন্মাদ হয়ে মারা গেল। কাহিনীটির মধ্যে কোন গঠনসুষমা নেই। চরিত্র সৃষ্টিতে কোন প্রধান কুশলতা নেই। বিভিন্ন পত্রিকাতে বিভিন্ন লেখকেরা মুসলমান জীবন ও সমাজ নিয়ে লেখার প্রচেষ্টা কর-ছিলেন মাত্র—কিন্তু কোন সার্থক সৃষ্টি তখনও হয় নি। কাজী আবদুল ওদুদের 'মীর পরিবার' (১৯১৮) গ্রন্থটি সেই দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাজী আবদুল চিন্তাশীল লেখক হিসেবে আজ পরিচিত—যদি তিনি গল্পচর্চা করতেন তাহলে আশা করা যায় তিনি উৎকৃষ্ট গল্পলেখক হতে পারতেন। তাঁর 'আবদুর রহিম' একটি স্মরণীয় গল্প। 'হামিদ' গল্পটিতে গীতিধর্মিতাই প্রবল—একটি ছোট্ট ছবি ও অভিমান ও চাপা কান্নামেশা কথাই এই গল্পের প্রাণ। 'আশরাফ হোসেন' গল্পের নায়িকা শাহেদা নামে এক পাড়াগাঁর মুখ্যু মেয়ে। আর গোলাবী ও পাগল নিয়ে 'করিম পাগল' গল্প।

১। 'এক পেয়ালা চা' গ্রন্থে 'নিয়তি' গল্প।

এইসব চরিত্রগুলি বাস্তবজীবনানুগই শুধু নয়। মুসলমান চরিত্রগুলি বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে এত স্পষ্টরেখায় আঁকা হয় নি। তাঁর 'মীর পরিবার' দীর্ঘ গল্প। একটি পরিবারের পরিবর্তনের কাহিনী। একাল ও সেকাল দুটি অংশে কাহিনীটি বিভক্ত। এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবোধের পরিবর্তন। প্রথম অংশে সেকালের পারিবারিক আদর্শ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একালের কাহিনীটি ছোট কিন্তু যুগ পরিবর্তনের সূচনা লেখককে কিঞ্চিৎ ব্যথিত করেছে সন্দেহ নেই। গল্পটির বলিষ্ঠতা আছে কিন্তু কাহিনী দীর্ঘ ও বিস্তৃত হওয়া সর্বত্র সমান জমাট ও উপভোগ্য হতে পারে নি।

পল্লীজীবনের কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সামাজিক আদর্শের গল্প নিবিড় ভাবে জড়িত। কীভাবে যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীজীবনের প্রতি লেখকের দৃষ্টি পরিবর্তিত হচ্ছে এবং প্রাচীন সামাজিক আদর্শ বিচলিত হচ্ছে তা এই গল্প-গুলির মধ্যে দেখা কৌতুহলোদ্দীপক। পরবর্তী অধ্যায়ে লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গির এই দ্বন্দ্ব আরো বিশদভাবে আলোচিত হবে। এখন শুধু পল্লীজীবনের কথার পরিচয় দেওয়া হল।

২

জীবনের জটিলতা

বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে যদিও অধিকাংশ সাহিত্যিক বাংলাদেশের প্রাচীন আদর্শ মহিমা কীর্তন করছিলেন ও পল্লীকেন্দ্রিক উপাদান রচনা করছিলেন—ক্রমশই তাঁরা দেখছিলেন সহজ সরল জীবন বন্দনীয় হলেও স্বাভাবিক নয়। জীবনের জটিলতাকে অস্বীকার করা চলে না। সমাজ সংসারে বহু শক্তি, বহু তাড়না আছে যা জীবনকে জটিল করে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে গতিশীল হয়। রবীন্দ্র-নাথ ছোটগল্পে জীবনের সেই জটিলতার বিভিন্ন রূপ দেখিয়েছেন। তাঁর পথ ধরে পরবর্তী ছোটগল্পকারেরা সেই পথে এগিয়েছেন। শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের একটি গল্প 'ইন্দু'।১ নরনারীর সম্পর্কের সূক্ষ্মতা ও জটিলতাই এই গল্পের সঙ্গে

১। ইন্দু (১৩০৯, ১লা শ্রাবণ)। ভূমিকায় বলেছেন, "কয়েক বৎসর অতীত হইল ইন্দুর শেষের কয়েকটি পরিচ্ছেদ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতভাবে ছোট গল্পের আকারে সাহিত্যে দিয়াছিলাম। শেষে ভিন্ন নামে এই গ্রন্থ 'উৎসাহে' শেষ হয়।"

উপাদান। প্রভাত ও ইন্দুমুখী স্বামী-স্ত্রী। ইন্দুর বোন চারুর সঙ্গে মন্মথর বিয়ে হয়েছিল। আগে মন্মথর সঙ্গে ইন্দুর বিয়ের কথা ছিল। তারপর যখন তাদের পরিচয় ঘটল তারা পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হল। চারু সরল প্রকৃতির মেয়ে। সেই সরলতার সুযোগ নিয়ে দুজনে দুজনের ঘনিষ্ঠ হল। ইন্দু বারবার নিজেকে সংযত করতে চেয়েছে। কিন্তু এক অন্ধ আবেগ তাকে বারবার প্রলুব্ধ করেছে। ছোট ছোট ঘটনায় সে ক্রমশই মন্মথর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। একটি বর্ণনায় বোঝা যাবে লেখকের বর্ণনা খুব মিতভাষী :

> "মন্মথ ক্ষিপ্রহস্তে চিঠিখানি লইতে গেল, ইন্দু সেই অবকাশে পলাই-বার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু পারিল না, মন্মথ তার হাত ধরিল। সহসা ইন্দুর হাসি-তামাসা সব বন্ধ হইয়া গেল। সে প্রফুল্ল মুখখানি গম্ভীর হইয়া উঠিল। খুব বিরক্তি ও দৃঢ়তার সহিত ইন্দু বলিয়া ফেলিল, ওকি মন্মথ, হাত ছাড়। মন্মথ অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়া বাহিরে চলিয়া গেল।"১

চোখের বালির ঘটনা সংস্থানের সঙ্গে এর মিল যথেষ্ট। অসামাজিক প্রেমের যে দুর্দম সাহস ও সমাজের যে বন্ধন এবং তার মধ্যে জীবনের যে দ্বন্দ্ব তাই এই কাহিনীর রস। পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের বিষয় বহু সাহিত্যিকের হাতে বিচিত্র গল্পের আকার ধারণ করেছে। 'ভারতী' গোষ্ঠির সাহিত্যিকেরাও অবৈধ প্রেম নিয়ে বহুবিধ গল্প রচনা করেছেন ও সমকালীন সাহিত্য-সমালোচকদের হাতে ধিক্কৃত হয়েছেন।

'সাহিত্য' সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি (১৮৭০-১৯২১) স্বয়ং যে কয়েকটি গল্প লিখেছেন২ তার মধ্যে জীবনের এই গূঢ় সমস্যাগুলি প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ছোট গল্পের নানা সমস্যায় কৌতূহলী ছিলেন এবং বিদেশী ছোটগল্পের প্রতি তাঁর বিশেষ ঔৎসুক্য ছিল। তাঁর গল্পগুলি তাই গতানুগতিক গল্প হয় নি। তার মধ্যে সাহস এবং সহানুভূতি দুইই ছিল। তাঁর 'প্রভা' গল্পটিতে তিনি আধুনিক গল্পপ্রবাহের নিকটবর্তী। 'প্রভা' প্রেমের গল্প ও প্রেমের ব্যর্থতাই এর কেন্দ্রভূমি। যে প্রেম জন্মমুহূর্তেই অভিশপ্ত সেই প্রেমের কাহিনী প্রভা। এই উদ্ধৃতিতেই গল্পের মূলবিন্দু ধরা পড়েছে।

১। পৃঃ ৮০ (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

২। 'সাজি' গ্রন্থে তাঁর গল্পগুলি সংকলিত। অনেকগুলিই প্রথমে 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। যেমন কমলা ১৩০৩ জ্যৈষ্ঠ, প্রভা ১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ, তীর্থের পথে ১৩০৬ মাঘ।

"আমি এই সর্বপ্রথম প্রভাকে চুম্বন করিলাম। এই প্রথম ও শেষ চুম্বন। উষ্ণ নিঃশ্বাসে আমি মলয়স্পর্শ অনুভব করিলাম। কিন্তু এক মুহূর্ত। প্রভা নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের মত স্থির আর তাহার সেই আয়ত কোমল লোচনে অশ্রুকণা।"

প্রেমের তপ্ততা ও কামনার তীব্রতা আরো স্পষ্ট তাঁর 'প্রাইভেট টিউটর' ও 'কমলা' গল্পে। আর 'বাঘের নখ' গল্পটি প্রেমের সুরভিমধুর। একটি শান্ত স্নিগ্ধ ভাব প্রেমের অতীত স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—

"ঘনঘোর বর্ষা। মেদুর অম্বরে মেঘের মালা, অজস্র ধারায় ধরা প্লাবিত হইয়া যাইতেছে। শীতল উগ্র পবনে কদম্বকেশর মিশ্র সৌরভ বহিয়া আনিতেছে। বৃষ্টিস্নাত তরুলতা উজ্জ্বল হরিৎ, দূরে বনমধ্যে কেতকী ফুটিয়া রেণু ও গন্ধ ছড়াইতেছে।"

কিন্তু এই শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশের চারিদিকে জুড়ে রয়েছে এই তীব্র বেদনা ও বিরহের জ্বালা। 'প্রভা' গল্পে বঙ্কিমের অনুসরণ ও শরৎচন্দ্রের পূর্বাভাস দুইই আছে। এই গল্পের বিষয় বাল্যকালের হেম ও প্রভার প্রণয়। কিন্তু তারা জীবনে কোনদিন মিলিত হয় নি। তাই বঙ্কিমের 'প্রতাপের' মতই সে প্রেমের যন্ত্রণাকে সারা জীবন বহন করেছে। শরৎচন্দ্রেও দেবদাস কিংবা শ্রীকান্তের 'রাজলক্ষ্মী' ও 'শ্রীকান্তের' প্রেমের সঙ্গে এর যোগ নিতান্ত কম নয়। প্রেমের এই ব্যর্থতাই 'বাঘের নখ' গল্পে আরো সূক্ষ্ম ও সুন্দর রূপ ধারণ করেছে।

'তীর্থের পথে' কাহিনীটিতে তাঁর বিষয়বস্তু বিধবার প্রেম। স্বামী-স্ত্রী রামদয়াল ও মহামায়া। তাদের সুখের সংসারে হঠাৎ দেখা দিল প্রলয়ের সংকেত। বিধবা যোগমায়া এল তাদের সংসারে। যোগমায়াকে আকর্ষণ করল রামদয়াল। যোগমায়ার উপস্থিতি রামদয়ালের জীবনেও আনল এক দুর্নিবার আকর্ষণ। এই দুর্নিবার প্রলোভনে রামদয়ালের সুখের সংসার ছারখার হয়ে গেল। এইটি হল প্রথম অংশ। দ্বিতীয় অংশে প্রলোভন নয়। মহামায়া তীর্থে চলেছে। আজ এগার বছর সে স্বামী পরিত্যক্তা। সেই তীর্থপথে হঠাৎ তার স্বামী ও যোগমায়ার সঙ্গে দেখা। স্বামী মরণাপন্ন। এই মরণের আসন্ন আলোয় সে স্ত্রীকে চিনতে পারল। নিজের অপরাধের অনুতাপে দগ্ধ হয়ে সে মারা গেল। আর যোগমায়া হল পাগল। যদিও গল্পের এই শেষ সন্তোষজনক নয়—যদিও পাপের পরিণতি বেদনাদায়ক হওয়া উচিত এই মনোভাব গল্পের মধ্যে প্রকাশিত তবুও পাপ বা প্রলোভন নিয়ে মানুষের জীবনের যে পতন ও অনুতাপ তা এই গল্পের উপাদান হয়েছে এবং সেই পাপের আহ্বান যে মধুর ও দুর্নিবার তা স্পষ্টভাবে চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

পাপ বা প্রলোভন এ যুগের লেখকদের একটি প্রিয় বিষয়। কিন্তু পরবর্তী লেখকেরা যেমন এই প্রলোভনের লীলা দেখেই তৃপ্ত হয়েছেন, পাপ বা প্রলোভন বা

অবৈধ প্রেমের অন্ধ আকর্ষণের টানে মানবহৃদয় কীভাবে উদ্বেলিত ও যন্ত্রণার্ত হয় তাই নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন—বর্তমান লেখকেরা তা করতে পারে নি। তাঁরা জীবনের এই জটিলতাকে গল্পে ধরতে চেয়েছেন কিন্তু সেই সঙ্গে প্রলোভন জয়ের আকাঙ্ক্ষা করেছেন। আবার জলধর সেনের লেখা থেকে তার উদাহরণ দিই। 'আমার মাষ্টারী'১ গল্পে একটি আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ছেলে নায়ক। সে মেদিনীপুরে একটি স্কুলে মাষ্টারী করতে গেল। সেখানে একটি গ্রাম্য বৈষ্ণবের বাড়িতে সে থাকত বৈষ্ণবের বাড়িতে রোজ সন্ধ্যেবেলা বিভিন্ন বৈষ্ণব গ্রন্থ থেকে সে পাঠ করে শোনাত। বৈষ্ণবের স্ত্রীও তাকে খুব যত্ন করত। ধীরে ধীরে ছেলেটি বুঝতে পারল সে স্ত্রীলোকটি তার প্রতি আসক্ত। এই প্রলোভন ছেলেটির সামনে' সে যদি এই প্রলোভনে পা দেয় তাহলে তার বৈষয়িক লাভ। সে চাকরিতে চিরকালের মত স্থায়িত্ব পাবে, অর্থ পাবে। বৈষ্ণব কিছুই জানতে পারবে না। কিন্তু ছেলেটি প্রলোভন জয় করল। তখন মেয়েটিই তার নামে খারাপ কথা বলল। শেষ পর্যন্ত তার চাকরি গেল।

এই 'পাপে'র কাহিনী জলধর সেনের 'কূপের কথা'২ গল্পে। মোহন দুশ্চরিত্র। তার ভ্রাতৃবধূর প্রতি সে লুব্ধ এবং একদিন অসহায়ভাবে তাকে পেয়ে তার কাছে সে অতি নির্লজ্জের মত তার মনের এই লালসার কথা জানায়। মেয়েটি শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে। এই লোভ ও লোভ থেকে জনিত যে দুঃখ তা কোন সমাজ বা রাষ্ট্রের সৃষ্টি নয়—তা মানুষের অন্তর্নিহিত জটিল রিপুর তাড়নায়। এরাই মানুষকে জটিল করে, বিচিত্র করে। পারিবারিক জীবনের ও সামাজিক জীবনের নৈতিক, আর্থিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিপর্যয় ধীরে ধীরে বাংলা ছোটগল্পের বিষয়বস্তু হচ্ছিল। এইখান থেকেই আধুনিক বাংলা ছোটগল্পকাররা দীক্ষা নিয়েছেন। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৯৯-১৯২৯) যদিও সচরাচর সহজ সরল জীবনের মধ্যে ছোটগল্পের উপাদান খুঁজেছেন তবুও তিনিও এই জটিলতাকে বর্জন করতে পারেন নি। তাঁর গল্পসংখ্যা যথেষ্ট।৩ তিনি তাঁর গল্পের মধ্যে বৈচিত্র্যও সৃষ্টি করেছেন অনেক। সেই বৈচিত্র্যের একটি হল জীবনের জটিল রহস্যময়তা।

'মঞ্জুষা'র অধিকাংশ কাহিনীই গার্হস্থ্য জীবনের। তিনি অধিকাংশ গল্পেই চরিত্রগুলির অন্তর্নিহিত বেদনার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এই বেদনা সর্বদা বাইরের নয়, অন্তরের মধ্যেই তার জন্ম। 'রসভঙ্গ' গল্পটিকে ধরা

১। 'একপেয়ালা চা'
২। ঐ
৩। মঞ্জুষা (১৯০৩), চিত্ররেখা (১৯১০), করঙ্ক (১৯১২) ও চিত্রালী (১৯১৬)। 'চিত্রালী' প্রকৃতপক্ষে মঞ্জুষার পরিবর্ধিত সংস্করণ।

যেতে পারে। দাসী লক্ষ্মীর হৃদয়ের দ্বন্দ্বই এই গল্পের প্রাণ। তার চরিত্রের মধ্যে যে টানাপোড়েন চলেছে আধুনিক মনের কাছে তাঁর আবেদন সেখানে। দাসী লক্ষ্মী তার অতীত জীবনের কথা বলতে বলতে তার প্রেমের অপমানের কথা বলেছে। তার প্রণয়ী তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে পতিতালয়ে। ধীরে ধীরে সে পাপের মধ্যে ডুবে গেল। তারপর একদিন তাকে সেই প্রণয়ী অপমান করে তাড়াল।

তাঁর 'খৃীষ্টানের আত্মকথা' গল্পটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক সুখী বিবাহিত ভদ্রলোক এক পাদ্রীর চরিত্রে আকর্ষিত হয়ে খৃীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁকে তাঁর স্ত্রী পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। এমনকি তাঁর পুত্রের উপনয়নের দিন তিনি যখন গেলেন তখন বুঝতে পারলেন সবাই তাঁকে ব্যঙ্গ করছে। তিনি সেখানে অনধিকার প্রবেশ করেছেন। ধর্মপরিত্যাগীর ভয়াবহশূন্যতা এই গল্পের প্রাণ। কখনও কখনও মানুষ নিতান্ত বাইরের মোহে এক ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে। তখন তার পক্ষে সেই নবধর্ম এক বিড়ম্বনা। একদিকে সে তার নিজের ধর্মের কাছেও ফিরে যেতে পারে না, অন্য দিকে সে নবধর্মের আশ্রয়েও সান্ত্বনা পায় না। কিন্তু তার অন্তরে চলে এক অব্যক্ত যন্ত্রণা। খৃীষ্টানের আত্মকথা সেই যন্ত্রণার কাহিনী। সুধীন্দ্রনাথ 'সহধর্মিণী' গল্পটির মধ্যেও ধর্মকে অবলম্বন করেছেন। এখানে ধর্ম ও জীবনের দ্বন্দ্ব। খৃীষ্টানের আত্মকথায় ধর্ম ও সমাজ শেষ পর্যন্ত ধর্ম ও ব্যক্তির দ্বন্দ্ব। এই গল্পে বন্ধুর পরামর্শে উপেন একদা কামিনীকাঞ্চন থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেছিল। এই মতে সবই মায়া, অনিত্য। অতএব নিজের স্ত্রীকে ভালবাসাও এই মায়াবাদী মতে অপ্রয়োজনীয়। স্ত্রী স্বামীর অবহেলা পেতে পেতে স্থির করল তারও গতি ধর্মে, তার শরণ ঈশ্বর। অতএব সেও নিজেকে তৃপ্ত করতে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ধর্মাচারে আত্মনিয়োগ করল। যে নারী স্বামীকে তার জীবন দিতে চেয়েছিল সে আজ সেই জীবন দেবতার পায়ে আত্মোৎসর্গ করল। কিন্তু জীবনের পথ অতি বিচিত্র। তাই একদিন উপেন দেখতে পেল তার গুরু হঠাৎ মায়াবাদ ত্যাগ করে একটি স্ত্রীলোকের মায়াবন্ধ। উপেনের কাছে তখন সহসা গীতা-পাঠ, কামিনীকাঞ্চন সম্পর্কে উপদেশ নিরর্থক বলে বোধ হল সে বুভুক্ষু হয়ে উঠল তার হারানো জীবন ফিরে পেতে। আবার সহজ সরল জীবন পেতে। কিন্তু একদিন সে অবহেলায় যে সম্পদ ফিরিয়ে দিয়েছে আজ আর তা ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। এতদিন উদাসীনতা ও ধর্মান্ধতার বেদীতে সে তার সহজ জীবন, স্বাভাবিক জীবনকে বলি দিয়েছে। যে নারীকে সে এতদিন অবহেলা করেছে আজ তার কাছ থেকে নতুন করে ভালবাসা পাওয়া সম্ভব নয়। এই অপ্রাপ্য সম্পদের বেদনায় ঐ গল্প ভরা।

'সন্তোষিণী'র ডায়ারি' গল্পটিতে ডায়ারির আকারে কাহিনীটি বর্ণিত হয়েছে। কাহিনীর মধ্যে একটি গৃহস্থ বধূর কয়েকটি দিনের তুচ্ছ ঘটনা সুন্দরভাবে বর্ণনা

করা হয়েছে। তার মধ্যে গল্পরস নেই—কিন্তু সহজ সরল কাহিনী। 'অনুতাপ' গল্পটিও সুধীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য গল্প। বিনয় ও শান্তি স্বামী-স্ত্রী। শান্তি খুব শান্তশিষ্ট মেয়ে। বিনয় অদ্ভুত ধরনের লোক—পাপ-পুণ্যের কোন প্রভেদ তার জীবনে ছিল না। সেই বিনয়ের হঠাৎ বিলাত যাত্রার ব্যবস্থা হল। শান্তি বিনয়কে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে কিন্তু বিনয়ের কোন কিছুতেই আসে যায় না। বিনয় প্রথম প্রথম বিলেত থেকে চিঠি লিখত, শেষে চিঠি লেখা বন্ধ হল। হঠাৎ একদিন টেলিগ্রাম এল বিনয় ব্যারিস্টারী পাশ করে ফিরে আসছে। বাড়িতে হৈ-চৈ আরম্ভ হল। বাড়ির মেয়েরা শান্তিকে সাজাল। বিনয় যখন এসে পৌঁছল তখন সে বাঙ্গালী ভদ্রতাগুলি ভুলে গেছে—সে সকলের সামনে শান্তিকে চুমু খেল। সে ধীরে ধীরে সমাজ সম্পর্কে তার মতামত ব্যক্ত করতে লাগল। স্ত্রীলোকদের গাউন পরা উচিত, কাঁটা-চামচে খাওয়া উচিত ইত্যাদি। ধীরে ধীরে সে শান্তিকে তার কথা মত চলতে বাধ্য করল। শান্তি তার সব অত্যাচার জীবনে সহ্য করত। বিনয় পানাসক্ত ছিল। মধ্যে মধ্যে মত্ত অবস্থায় সে শান্তিকে অকথ্য কথা বলত। এই সময় শান্তির দেবর সুরেশের বিবাহ। শান্তি সুরেশকে নিজের ভাইয়ের মত স্নেহ করত। বিবাহের দিনে মত্তাবস্থায় বিনয় শান্তি ও সুরেশ সম্পর্কে একটি তীব্র মন্তব্য করল। এই ঘটনার পর শান্তির অসুখ হল এবং সেই অসুখে শান্তির মৃত্যু হল। এই মৃত্যু বিনয়ের মনে অবশ্য কোন অনুভূতির সৃষ্টি করল না। সে মদ ও বারবণিতা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকল। একদিন এক জ্যোৎস্নারাত্রে এক বার-বণিতালয়ে গিয়ে সে দেখল এক বারবিলাসিনী ঠিক শান্তির মত দেখতে। হঠাৎ তার মনের মধ্যে এক তীব্র ধিক্কার এল। সে পাগলের মত বাড়ির বাইরে ছুটে গেল। গল্পটির মধ্যে করুণরস সৃষ্টি বেশী। ঘটনার মধ্যে আতিশয্যও আছে। বিনয়-চরিত্রও একটু আতিশয্যভরা। তবুও গল্পটি সুধীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য বহন করছে। নারীর বেদনা ও স্নেহ এই গল্পের সর্বাঙ্গে সুরভির মত বিস্তার করে আছে। নারীর প্রেমের মহিমা তাঁর 'অগ্নিপরীক্ষা' কাহিনীটির মধ্যে। এখানে পিতার নিষেধের ফলে নির্মলা তার প্রণয়ীকে পায় নি। সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে সে বিবাহ করবে না। কিন্তু নায়ক বিবাহ করল। আর নির্মলা তার প্রতিজ্ঞা রাখল নিজের প্রাণের বিনিময়ে।

সুধীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্পেই নারীর সেবাপরায়ণতা, শান্তশ্রী সদাবন্দিত। 'পাগল' গল্পটিতে বৌ-এর চরিত্রটি তার উজ্জ্বল প্রমাণ। সেই বৌটিকে সবাই লাঞ্ছিত করে। তাকে মারে ধরে। সেখানেই লেখকের সহানুভূতি। 'সেবিকা' গল্পেও বিনোদিনীর চরিত্রের সেবাপরায়ণতা ও পাতিব্রত্যের উপরেই লেখকের শ্রদ্ধা। সুধীন্দ্রনাথের গল্পগুলিতে প্রায়ই দেখা যায় নারীর প্রতি সহানুভূতি ও পুরুষের অবিচার ও অনুভূতিহীনতার প্রতি তীব্র

ধিক্কার। 'ঠাকুর দেখা' গল্পটি এর একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। নায়িকা মঞ্জুভাষিণী সুন্দরী—কিন্তু মঞ্জুভাষিণী নয়—'এই সুন্দর ফুলটিকে ঘেরিয়া...পরুষভাবের কণ্টকলতা বেড়িয়া উঠিয়াছিল।" স্বামী মহেন্দ্র তা চেষ্টা করেও উৎপাটিত করতে পারেন নি। সে স্বামীর নিষেধ না শুনে মহেশের পিসতুত ভাই সতীশের সঙ্গে মেলামেশা করত। এই নিয়ে মহেশ স্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেন না ও একসঙ্গে থাকেন না। মহেন্দ্রের গুরুর অনুরোধে মহেন্দ্র মঞ্জুকে ডেকে পাঠাল। কিন্তু মঞ্জু এল না। তখন গুরুর আদেশে মহেন্দ্র নিজেই শ্বশুরবাড়ি গেলেন। স্ত্রী এল না। তখন গুরুদেব আবার বললেন, স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে বল আমার আজ্ঞা। এবারও মঞ্জু স্বামীকে ফিরিয়ে দিল।

মহেন্দ্রের জীবনে আর কোন কাজ নেই। তার জীবন অসম্পূর্ণ। তাই সে গুরুর সঙ্গে যোগ দিল। প্রাণপণে দীনদুঃখীর সেবা করতে লাগল। বিপন্নকে আশ্রয়, হতাশ্বাসকে সান্ত্বনা দেওয়াই হল তার কাজ। লোকে তাকে "বাবাঠাকুর" বলে ডাকতে লাগল।

একদিন প্রাতে মহেন্দ্র গৈরিক বসন পরে স্নানশেষে মন্দিরের দিকে চলেছে। পথের লোকেরা তার সাধুবাদ করছে। হঠাৎ ভীড়ের মধ্য থেকে একটি নারী ঠেলে মহেন্দ্রের সামনে এগিয়ে এল। অন্যরা চেঁচিয়ে তাকে ভর্ৎসনা করল। তখন ভীড়ের মধ্যে সেই মেয়েটি আস্তে আস্তে মিশে গেল। মেয়েটি যে মঞ্জু তা বলাই বাহুল্য। মঞ্জু পুরীতে এসেছিল। এক বৃদ্ধা তাকে জিজ্ঞাসা করল কাঁদচ যে। সে কোন উত্তর দিল না। চরিত্রের পরিণতি সুধীন্দ্রনাথের অন্যান্য গল্পের মত। কিন্তু চরিত্রটির মূল কাঠামোটি বিশিষ্ট।

সুধীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে নারী ও শিশু দুটি বিষয়েই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর গল্পে যে সমস্যা তা মূলত হৃদয়ের। নারী বাস করে তার ক্ষুদ্র সংসারে। পুরুষের জগৎ কর্মভারব্যস্ত বৃহৎ পৃথিবী। নারী পুরুষকে চায় তার নিজের মত করে পেতে—পুরুষ চায় নিজেকে বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দিতে। এই দুটি প্রবল শক্তিই তাঁর চরিত্রগুলির ভুল বোঝাবুঝির পেছনে। তিনি এই সত্যটির ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করেছেন কোন কোন গল্পে।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় বিভিন্ন লেখক তাঁদের ছোট গল্পের মধ্য দিয়ে জীবনের এই জটিলতাকে রূপ দিতে চেয়েছিলেন। জ্ঞানেন্দ্র গুপ্ত, চন্দ্রশেখর কর, মন্মথ সেন প্রভৃতি লেখকেরা উল্লেখযোগ্য। জ্ঞানেন্দ্র গুপ্ত১ বা

১। **শিল্পী**। সাহিত্য ১৩০২ বৈশাখ
ভাঙাকাচ। সাহিত্য ১৩০৩ আষাঢ়

চন্দ্রশেখর কর১ দু-একটি গল্পে বিশেষ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এই সঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (১৮৭৬)। হেমেন্দ্রপ্রসাদ দীর্ঘকাল ধরে বাংলা সাহিত্যের সেবা করে আসছেন। তাঁর গ্রন্থসংখ্যাও যথেষ্ট, বসুমতী থেকে তাঁর গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছিল তবুও তিনি পাঠকসমাজে যথেষ্ট আগ্রহ সঞ্চার করতে পারেন নি। তিনি অবশ্য বহুকালই গল্প লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর রচনার মূল বিষয়ই রোম্যান্টিক্ প্রেম ও গার্হস্থ্য জীবন। সমকালীন লেখকদের মধ্যে তিনি একটি বিশেষ উপাদানের চর্চা করেছিলেন—তাকে 'স্বদেশী' গল্প বলা যেতে পারে। কিছুটা রোম্যান্টিকতা ও কিছুটা স্বদেশপ্রেম এই দুয়ের মিশ্রণ তাঁর এই ধরনের গল্পে। কিন্তু তাঁর গল্পে সমস্যা প্রাধান্য বেশী নয়। হেমেন্দ্রপ্রসাদের আগে জ্ঞানেন্দ্র গুপ্তের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে। 'সাহিত্যে'র প্রথম বর্ষের পর পর তিন সংখ্যা ধরে "বিষবল্লরী না সঞ্জীবনী"২ নামে একটি দীর্ঘ গল্প লেখেন। গল্পটি সংক্ষেপে বলা চলে, এক সন্ন্যাসীর ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী। এক সন্ন্যাসী একটি মেয়েকে ভালবাসতেন। তাঁর এক ভাইও এই মেয়েটিকে ভালবাসতেন। ভাইটি সন্ন্যাসীর সমস্ত সম্পদ আত্মসাৎ করেন। এবং এই মেয়েটিকে নিয়ে সমস্যা হয়। ভাই এই মেয়েটিকে বিয়ে করে কিন্তু মেয়েটি ভালবাসত সন্ন্যাসীকে। ভাইটির চরিত্র ভাল ছিল না। এই মেয়েটিকে সে বিবাহ করেছিল বটে কিন্তু সে তার ভোগ্য-সামগ্রী মাত্র ছিল। যাই হোক, এই কারণেই দুই ভাইয়ের মধ্যে ঝগড়া হয়। ছোট ভাই (হরিদাস) মেয়েটিকে খুন করে ও মিথ্যা সাক্ষী-সাবুদের দ্বারা বড় ভাইকে খুনী সাব্যস্ত করতে চায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হরিদাস ধরা পড়ে। তখন বড় ভাই সন্ন্যাসী হয়ে যায়। গল্পটি অকারণে দীর্ঘ ও অনর্থক উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। কিন্তু গল্পটির মধ্যে দুটি জিনিষ এই যুগের পক্ষে লক্ষণীয়। এক, পাপের যন্ত্রণাবোধ—বা লেখকের পাপের প্রতি বোধ। এই বোধ আমরা জলধর সেন প্রভৃতি লেখকের মধ্যে ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি। আর একটি জিনিষ তা নারীর অসাধারণ মুক্ত মন্তব্য। লীলা বলেছে, "এ পৃথিবী ত' আমাদের ইচ্ছাধীন নয়, এখানে আমাদের কে কথা শোনে।" অন্যত্র সে হরিদাসকে লিখেছে, "আপনি আমার দেহকে বিবাহ করিলেন। আজ বিধির কৃপায় আমার হৃদয়ের স্বামীকে পাইয়াছি।" এই মন্তব্যের মধ্যে যে স্বাধীনতার অভিলাষ, সমাজের বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে নারীর অভিমান তা মূর্ত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের গল্প-সাহিত্যে মুক্তির সন্ধান খোঁজা হয়েছে বার বার। সামাজিক বন্ধন ও আর্থিক বন্ধন থেকে মানুষ কী করে তার ব্যক্তিগত স্বাধীন মনোভাবগুলিকে বিকশিত করতে

১। **কমলা**। সাহিত্য, ১৩০৭ জ্যৈষ্ঠ
২। **সাহিত্য**। ১২৯৭, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়

পারে। লেখকেরা দেখেছেন যে, এই বন্ধন অস্বীকার করে নারী বা ব্যক্তি তার পূর্ণতা পাচ্ছে না—তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে আত্মহত্যা করেছে কিংবা সংসার ত্যাগ করেছে। নিত্যকৃষ্ণ বসু 'সাহিত্যে' 'ভবানী' নামে একটি দীর্ঘ গল্প লেখেন। সেই গল্পে কুলীনের মেয়ে ও কায়স্থের ছেলের ভালবাসা। অথচ বিয়ের উপায় নেই। আবার কুলীনের মেয়ের বিয়েও হয় না। শেষ পর্যন্ত সে মেয়েটি সন্ন্যাস নিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মানসিক সমস্যা ছিল এইগুলি। তাই গল্পের মধ্যে তারা ফিরে ফিরে এসেছে।

হেমেন্দ্রপ্রসাদের 'মুক্তার মালা' (১৩২৩/১৯১৬ খৃঃ) তাঁর একটি প্রতিনিধিমূলক গ্রন্থ। হেমেন্দ্রপ্রসাদের অধিকাংশ রচনাই 'সাহিত্য' বা 'বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়েছিল। হেমেন্দ্রপ্রসাদের রচনা যে বিশেষ জনপ্রিয় হয় নি তার কারণ তাঁর লেখা অত্যন্ত নীরস। একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন যে, "তাঁহার অধিকাংশ গল্পে খানিকটা সাংবাদিকতার ছোঁয়াচ লাগিয়া থাকে।"১ একথা সত্য। তাঁর গল্প কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্যাপ্রধান। 'শূন্য ও পূর্ণ'২ গল্পটিতে ব্রাহ্ম ও হিন্দু দ্বন্দ্বের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। সুরেশচন্দ্র তাঁর কন্যা মালতীকে ব্রাহ্ম অমলেন্দুর সঙ্গে বিবাহ দিলেন। হিন্দুমতে বিবাহ করার ফলে অমলেন্দুর ব্রাহ্মমহলে সম্মান কিছুটা কমল। তিনি একটি ব্রাহ্মকন্যা মনীষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। মনীষার পিতাও এই বিবাহে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। অমলের স্ত্রী মালতী তার স্বামীকে মনীষার সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহ করতে শুরু করল। ঘটনাচক্রে একদিন অমল উলুবেরিয়ায় এক ব্রাহ্মপল্লীতে বেড়াতে গেছেন। সেখানে মনীষাও ছিলেন। মনীষার মাসিমা অমলের সঙ্গে মনীষাকে কলকাতা পাঠালেন। স্টীমারের মধ্যে অমল হঠাৎ প্রশ্ন করল "মনীষা, তুমি আজও বিবাহ করিল না কেন? সুখী হইতে পারিতে।" মনীষা তার উত্তর দিল "অমল তুমি কি সুখী হইয়াছে?" তারপর "মুহূর্তে যেন কালের ও অবস্থার সব ব্যবধান মুছিয়া গেল।"

মালতী সব জানতে পারল না। কিন্তু উলুবেড়িয়ায মনীষার সঙ্গে যে তার দেখা হয়েছিল একথা জানল। অমলের মনে এক প্রবল দ্বন্দ্ব এল। যে সে স্ত্রীকে বঞ্চনা করছে এই যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে স্ত্রীকে ও মনীষাকে দুজনকে দুখানি চিঠি লিখে তার মানসিক দোটানার কথা জানিয়ে বিদায় নিল। স্ত্রীকে লিখল, "আমার অতীত আমার বর্তমানকে অভিভূত করিতেছে।...কিন্তু আমি ভ্রান্ত—পাপী নহি।" আর মনীষাকে লিখল, "আমি দুর্বল, আমি ভ্রান্ত, আমি কাপুরুষ।"

১। নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : বাংলা ছোটগল্প, পৃঃ ১০৪।
২। প্রথম প্রকাশ : **আগমনী** (১৩২৬, ১ম বর্ষ) **সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত।**

তারপর তিন বছর কেটে গেছে। আজ মালতী স্বামীর জন্য শূন্যতা অনুভব করে। সে বার বার বোঝে সে স্বামীর প্রতি অবিচার করেছে। স্বামী যাকে ভুলতে চেয়েছে তাকেই সে প্রতিমুহূর্ত স্বামীর কাছে মনে করিয়ে দিয়েছে। তার মেয়ে সলিলার বিয়ে হয়েছে। সলিলার মেয়ে পুষ্পর বিবাহ হয়েছে। পুষ্পর জন্য একজন শিক্ষয়িত্রী রাখা হয়েছে। শিক্ষয়িত্রী হন মনীষা। এই মনীষার প্রতি হিংসায় মালতী জ্বলে উঠল। কিন্তু মনীষার ঘরে গিয়ে দেখল অমলেন্দুর চিত্রের তলায় মনীষা চিরশয্যায় শায়িতা। মৃত্যুর মুহূর্তে, মালতীর মনে হল, "যে যাহাকে পাইয়া হারাইয়াছে, মনীষা তাহাকে হারাইয়া পাইয়াছে। সে হৃদয় পূর্ণ করিবার সব উপাদান পাইয়াও তাহা শূন্য করিয়াছে; আর মনীষা সে উপাদান না পাইয়াও কেবল ভালবাসার ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে হৃদয় পূর্ণ করিয়াছে!" এই গল্পটি হেমেন্দ্রকুমারের একটি শ্রেষ্ঠ গল্প। তাঁর 'মুক্তারমালা' বা 'স্নেহের ব্যথা' অত্যন্ত করুণ ও ভাবালু গল্প। 'পাগলিনী' গল্পটিতে নীলকর অত্যাচার। 'পোস্টমাস্টার' গল্পটি কৌতুককর। 'বন্ধ্যা' গল্পটি চমৎকার। এক সমুদ্রতীরে করিম ও মিরিয়ম বাস করত। মিরিয়ম 'বন্ধ্যা'। একদিন এক নৌকাডুবিতে এক মৃতজননী ও তার শিশু সেই তীরে ভেসে আসে। শিশুটি তখনও জীবিত ছিল। "করিম শিশুকে জননীর স্নেহবন্ধন-চ্যুত করিল; রমণীর দুইহস্ত দুইপার্শ্বে সৈকতরাশির উপর পড়িয়া গেল; যেন আর একজনের হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিয়া জননী চিন্তামুক্ত হইলেন।" এইদিন থেকে করিম ও মিরিয়মের জীবনে এল নতুন পর্ব। তারপর আবার কয়েক বছর পরে আবার একদিন ঝড় এল, বন্যা এল। এই বন্যায় "মিরিয়াম পড়িয়া আছে। মিরিয়মের পক্ষে শিশুর মৃতদেহ।...যেন বৃন্তচ্যুত কোমল কোরক।"

এই প্রসঙ্গে হারাণচন্দ্র রক্ষিত ও বিপিনচন্দ্র রক্ষিতের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা দুজনেই সুখপাঠ্য ছোটগল্প লিখেছেন যদিও রচনাকৌশল উচ্চস্তরের নয়। বিপিন-চন্দ্রের 'মহাশ্বেতা', 'মলিনা', 'প্রেমের পরীক্ষা' ইত্যাদি গল্প পাঠযোগ্য। হারাণচন্দ্রের গল্পরাশির মধ্যে 'অশোকা', 'যমুনা', 'স্বপ্ন' প্রভৃতি গল্পগুলি স্মরণীয়। এইসঙ্গে অনিবার্যভাবে নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের নাম আসে। নারায়ণচন্দ্র নানা পত্র-পত্রিকায় গল্প লিখতেন। প্রবাহ পত্রিকায় তাঁর বহু গল্প প্রকাশিত হয়।[১] তাঁর দৃষ্টি যথেষ্ট

---

১ প্রবাহ ১৩১১।১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা: উন্মাদিনী (পৃঃ ১৩৮) ঋণশোধ (পৃঃ ২৪১) কাহিনী (পৃঃ ৪২৫, ৪৪৪) গঙ্গারাম (পৃঃ ১৮২) দুইভাই (৩২৩) দুঃখীর জীবন (পৃঃ ২৭) প্রতিদান (২০১) ভূতের বোঝা (পৃঃ ৮৩) মধুসূদনের দুর্গোৎসব (৩৭১) মহামায়া (৬০)।

পরিমাণে প্রাচীনপন্থী কিন্তু কোথাও তিনি মানুষের স্খলন পতনকে ব্যঙ্গ করেননি বা নীতিবাদীর মত ক্ষমাহীন দৃষ্টিতে বিচার করেন নি। তাঁর 'কথাকুঞ্জ' (?)-এর মধ্যের গল্পগুলিতে তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও আন্তরিকতার স্পষ্ট প্রমাণ রেখে গেছেন। 'মহামায়া' গল্পের সন্ন্যাসী মহামায়াকে দেখে সন্ন্যাসভ্রষ্ট হয়, সেইজন্য মহামায়ার তীব্র বেদনা হয়। 'কুড়ুনী' গল্পে গদাই কুড়ুনীকে অপমান করে—তারজন্য গদাইকে হত্যা করতে কুড়ুনী প্রস্তুত হয়। শক্তি বা রিপুর আদিমতা তাঁর চরিত্রগুলিতে। 'কৃতজ্ঞতা' গল্পটি নেওয়া যাক। তেঁতুলবেড়ে গ্রামে রামধন কৈবর্তের একমাত্র পুত্রবধূ কেতকী বিধবা। একদিন ঝড়জলের রাত্রে একজন হ্যারিংটন সাহেবকে সে তার ঘরে আশ্রয় দিল। তার ফলে তার চরিত্রে অপবাদ এল। এইসময়ে একদিন জন রবার্টসন নামে এক সাহেব কেতকীকে চুরি করল। (কেতকীকে চুরি করার দৃশ্য বঙ্কিমের চন্দ্রশেখরে শৈবলিনীকে চুরি করার কথা স্মরণ করায় এবং জনের বাড়িতে কেতকীর অবস্থা 'নীলদর্পণের' ক্ষেত্রমণির মত।) যাই হোক হ্যারিংটন সাহেব নিজের প্রাণ দিয়ে কেতকীকে বাঁচালেন। এক গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ এই গল্পের মূলকেন্দ্র। মানুষের প্রবল আবেগগুলিকে নারায়ণচন্দ্র নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। মানুষের আদিম রিপুগুলি যেমন সত্য তেমনই সত্য মানুষের উন্নতবৃত্তিগুলি। সেই উন্নত-বৃত্তির বিচিত্র রূপ নারায়ণচন্দ্রের গল্পে। 'ঋণশোধ' গল্পটি ধরা যেতে পারে। রহমতের ছেলে হানিফ। পরপর দুবছর অজন্মা হওয়ায় রহমত জমিদারের প্রাপ্য দিতে পারলনা। তাই নায়েব রহমতকে অপমান করল ও তাকে প্রহার করল। হানিফ বাপের এই অপমান সহ্য করতে পারল না—তাই সে নায়েবের গায়ে জুতো ছুঁড়ে মারল। তখন নায়েব রেগে রহমতের ঘরে আগুন লাগাল। স্ত্রী পুড়ে মরল। হানিফ পুড়ে মরল। সে মৃত্যুকালে বাপকে বলে গেল এর প্রতিশোধ নিও। কিন্তু বিচিত্র এই মানবহৃদয়। রহমত নায়েবের ছেলেকে হত্যা করার সুযোগ পেয়েও হত্যা করল না বরং সে নায়েবকে তার পুত্র ফিরিয়ে দিল। তার বদলে নিজের প্রাণ দিল বিসর্জন।

মানুষের বিচিত্র মনকে নারায়ণচন্দ্র গল্পের উপজীব্য করেছেন। 'ঠাকুরের অদৃষ্ট' গল্পে একটি সুন্দর চরিত্র এঁকেছেন—তার নাম মহেশঠাকুর। মহেশঠাকুরকে সবাই ভালবাসে। তাকে না হলে গ্রামের কারো এক মুহূর্ত চলে না। অথচ সেই

প্রবাহ ১৩১২।**২য় সংখ্যা** : নীরবপূজা (পৃঃ ৪৬)
প্রবাহ ১৩১৩।**৪র্থ সংখ্যা** : কৃতজ্ঞতা (পৃঃ ১৩৩)
৫ম সংখ্যা ঃ জগন্নাথদর্শন (২০১)
গঙ্গাস্নান (১৭৪)
প্রতিশোধ (২৪৭)
শাপেবর (৩৩৭)

ঠাকুরের নামেও লোকে অপবাদ দিল। যে শ্যামাকে সে মানুষ করেছে সেই শ্যামাকে নিয়ে অপবাদ। মানুষের এই নীচতা ও কলঙ্কপ্রিয়তার এক জ্বলন্ত ছবি। আবার নারায়ণচন্দ্রেরই হাতে মানুষের উন্নত ও কোমল বৃত্তিগুলিও মর্যাদা পেয়েছে। তিনি যখন ধার্মিক চরিত্রগুলি এঁকেছেন তখন তিনি বিশেষ সার্থক। কখনও কখনও তিনি মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্বের ছবি আঁকার চেষ্টা করেছেন—তখন তিনি বিশেষ সার্থক হন নি। তাঁর ছোটগল্পগুলি এক একটি ঘটনাপ্রধান—চরিত্রপ্রধান নয়। বহু ক্ষেত্রেই তাঁর ঘটনা সংস্থান বঙ্কিমের উপন্যাসের মত অতিনাটকীয়—যেমন

> "রাত্রি প্রায় এক প্রহরের সময় সশব্দে দ্বার মুক্ত করিয়া রবার্ট সাহেব কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চরণদ্বয় ঈষৎ চঞ্চল, স্বরটা একটু জড়িত, চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ। সাহেব আসিয়াই "O my darling' বলিয়া কেতকীকে ধরিতে গেলেন......
>
> অনেক অন্বেষণ করিয়া হ্যারিংটন মধ্যাহ্নকালে সেই নদীতীরস্থ জংগল ও মন্দির পাইলেন। তখন তিনি জংগল ঠেলিয়া অনেক কষ্টে মন্দিরের সম্মুখে আসিলেন। মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত ছিল। সেই মুক্তদ্বারপথে সাহেব যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। দেখিলেন সেই মন্দিরের একদিকে ভিত্তিগাত্রে পৃষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া আড়ষ্টভাবে কেতকী দাঁড়াইয়া আছে তাহার সম্মুখে দুই তিন হাত দূরে রবার্ট সাহেব তাহার বক্ষ লক্ষ্য করিয়া পিস্তল হস্তে দণ্ডায়মান রবার্ট বলিতেছে, "হয় সম্মত হও, নতুবা এখনই গুলি করিব।"

আলোচ্য উপরিউক্ত লেখকগোষ্ঠির সকলেই বাংলা সাহিত্যের অপ্রধান লেখক। এঁরা সমস্যাপ্রধান ও মানবমনের জটিলতা নিয়ে গল্প লিখেছেন কিন্তু সেই গল্পধারা বিশেষ উন্নত নয়। পরবর্তী বাংলা গল্পে এবং রবীন্দ্রনাথের গল্পে যে সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ ও জীবনের বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছিল তা এঁদের গল্পে নেই কারণ এঁদের সেই শক্তি ছিল না। তবুও এঁরা স্মরণীয় কারণ বাংলা ছোটগল্পে বৈচিত্র্য সন্ধান ও সৃষ্টি করতে এঁরা উৎসাহী হয়েছিলেন। এঁদেরই বিষয়বস্তু নিয়ে পরবর্তী লেখকেরা উৎকৃষ্টতর লেখা লিখেছেন।

৩

শিশু ও শিশুমন

শিশুচরিত্র প্রাক্-রবীন্দ্র সাহিত্যে বিরল। বৈষ্ণবকাব্যে শিশুকৃষ্ণ ও চৈতন্য-জীবনীতে শিশু চৈতন্যের দু-একটি উজ্জ্বলছবি পাওয়া যায়। বঙ্কিমের উপন্যাসে কদাচিৎ শিশুর চরিত্র (যেমন বিষবৃক্ষে) নবীনচন্দ্রের কবিতায় দু'এক স্থানে শিশুর

প্রবেশের উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম শিশুচরিত্রকে সাহিত্যে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন। শিশুর আনন্দ, শিশুর বেদনা, শিশুর অভিমান রবীন্দ্রসাহিত্যেই সর্বপ্রথম সার্থকভাবে প্রকাশিত হল। তাঁর রতন, গিরিবালা, ফটিক—সকলেই শিশু ও বালকমনের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। পরবর্তী গল্পকারদের মধ্যে প্রভাতকুমারের কোন কোন গল্পে শিশুচরিত্রের মধুর বিকাশ দেখা গেছে। দীনেন্দ্রকুমার রায় শিশুদের জন্য গল্প লিখেছিলেন। তাঁর 'ঢেঁকির কীর্তি' বইটির মধ্যে শিশুচরিত্রের আনন্দ-উল্লাসময় চরিত্রটির প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু সেই চরিত্রগুলির মধ্যে শিশুর মনের গভীর ও রহস্যময় দিকটি ফোটেনি। শিশুমনের যে রহস্য তাকে খুব কম বাঙালী সাহিত্যিকই (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগে) সাহিত্যে প্রস্ফুটিত করেছেন। এইধরণের গল্প সংখ্যা খুবই কম।

ইন্দিরাদেবীর (১৮৯৯-১৯২২) কোন কোন গল্পে শিশুচরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। তাঁর 'ফুলের তোড়া' (১৩৩২) বইটিতে 'ফুলের তোড়া' গল্পটি ধরা যেতে পারে। এই গল্পের প্রধান চরিত্র একটি ছোট মেয়ে চারু তার বন্ধু চাকর সীতারামিয়া। চারুর বাবা ইউরোপীয় কায়দায় অভ্যস্ত। তিনি চান যে মেয়েও যথেষ্ট পরিমানে সাহেবী হোক। সে জন্য তিনি পছন্দ করেন না যে তাঁর মেয়ে একটি চাকরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে। কিন্তু সে সীতারামিয়াকে ভালবাসে। তার ভালবাসা স্বার্থাতীত। তার ভালবাসা মানুষকে তার অর্থ ও প্রতিষ্ঠা দিয়ে বিচার করে না। কিন্তু বিষয়-বুদ্ধিসম্পন্ন পিতা তা বোঝেন না। তিনি তাই কন্যাকে চড় মেরেছেন। তিনি মেয়েকে শেখালেন কী করে মেমসাহেবকে ফুলের তোড়া উপহার দিতে হয়। মেয়েটি ফুলের তোড়া উপহার দেবার পর মেমসাহেব খুব খুশি হয়েছেন। তখন চারু মেমসাহেবকে বলল যে ঐ ফুলের তোড়াটি তাকে দিলে সে খুব খুশি হবে। সেই ফুলের তোড়া সে দিয়েছে সীতারামিয়াকে। শিশুহৃদয়ের এই উদার ভালবাসা বুদ্ধিমান পিতা বুঝতে পারেনি।

ইন্দিরাদেবী তাঁর নারীসুলভ কোমলতা ও সহানুভূতিরদ্বারাই শিশুহৃদয়ের এই বেদনাকে মূর্ত করতে পেরেছেন। তাঁর 'নির্মাল্য' গ্রন্থটির 'মা' 'ছুটি' ইত্যাদি গল্পেও শিশুর হৃদয়কে তিনি প্রকাশিত করেছেন। কিন্তু শিশু হৃদয়কে শুধু বোঝাই তাকে সাহিত্যে রূপ দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তার থেকে একটি দূরত্ব রাখতে হয়। বেশীরভাগক্ষেত্রে তা না হলে গল্প ভাবালু হয়ে পড়ে। ইন্দিরাদেবীর এই গল্পগুলি ভাবালুতা দোষ যুক্ত।

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'করঙ্ক' শিশুমনের কাহিনী। অধিকাংশগল্পই শিশুচরিত্র সমন্বিত ও সেখানে শিশুর হৃদয় পূর্ণ বিকশিত। জমিদারের ছেলে সুবোধকুমার পথ হারিয়ে ফেলেছিল। পথে এক সাধারণ গ্রাম্য গৃহস্থের ছেলে সুবোধকুমারের সঙ্গে তার আলাপ হয়। তারা মিতালি পাতায়। কিন্তু জমিদারবাবুরা এই

ভালোবাসার মূল্য বোঝেন না। তাই তাঁরা অর্থ দিয়ে চট্ করে ঋণ শোধ করে ফেলতে চান। তারপর তাদের মধ্যে অনেকবার দেখা হয়েছে। "মাঠে ঘাটে...হাত ধরিয়া সমস্ত সন্ধ্যা সমস্ত সকাল বেড়াইয়া বেড়াইয়াছে! চাষাদের ক্ষেতে চাষাদের সঙ্গে আলু তুলিয়াছে, বাগানের ফুল তুলিয়াছে, নদীতে নৌকা ভাসাইয়াছে, পুকুরে মাছ ধরিয়াছে..." একদিন জমিদারপুত্রকে বাড়িতে রাখার অভিযোগে জমিদার-গিন্নী চাষীর বৌ সুবোধকুমারের মা-কে গালাগালি দিলেন। সাবধান করে দিলেন যে আর যদি কখনও এরকম করা হয় তাহলে ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করে দেবেন। তারপর ঘটনাচক্রে জমিদারপুত্রের অসুখ করল। চাষীবৌরই সেবায় যত্নে সে বেঁচে উঠল। তারপর জ্বরে পড়ল এই সাধারণ সুবোধকুমার। কাহিনীর শেষে দেখা গেল জমিদারপুত্র তার মিত্রের "মৃতদেহ বুকে করিয়া বসিয়া আছে।"

কাহিনীটি করুণ। গঠন সৌষ্ঠবও নেই। কিন্তু মূলত শিশুর বেদনা যে বয়স্করা বোঝেনা, শিশুর ভালবাসা যে যশ অর্থ প্রতিষ্ঠার উপরে নির্ভরশীল নয় এই কথাটিকে সুধীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন।

এই বেদনা যে কত গভীর হতে পারে তার প্রমাণ 'কাসিমের মুরগী' গল্পে। কাসিম পাখি ভালবাসত। সে ছিল নিরামিষাষী। সংসারে তার কাকা আর মা। বাপ অল্পবয়সেই মারা গেছে। ছেলে মায়ের আদরের ধন। তার জন্য মা অনেক সখের জিনিষ কিনে দিতেন। কাকা আবদুল্লা ছিলেন কড়া মেজাজের লোক। চামড়ার ব্যবসা ছিল। তাতেই মোটামুটি সুখে স্বচ্ছন্দে কেটে যেত। একদিন পথ দিয়ে এক সাঁওতাল দুধের মত ধবধবে শাদা তিনটি মুরগী নিয়ে যাচ্ছিল। কাসিম মাকে বলল, "কি সুন্দর মুরগী মা! কি সুন্দর! আমাকে কিনে দাও, আমি পুষব। আমার কাছে দু আনা পয়সা আছে, আর চার আনা দিলেই হবে। দাও মা কিনে।...মা তিনটি মুরগী কিনিয়া দিল। কাসিমের আর আনন্দ ধরে না।"

আবদুল্লা ঘর অপরিষ্কার হয় বলে মুরগী পুষতেন না। তিনি কাসিমকে তাই সাবধান করে দিলেন। কাসিম দিনরাত মুরগী নিয়েই থাকে। একদিন সে দেখল একটি মুরগী নেই। পাঁচিলের আশপাশ, ঝোপঝাড়, কুয়োরধার সব তন্নতন্ন করে খুঁজল, কোথাও নেই। সারারাত্রি ধরে কাসিম কাঁদল কারণ "হঠাৎ রান্নাঘরের দিকে দৃষ্টি পড়ায়" তার আর কিছুই বুঝতে দেরী হয়নি। কাকার প্রতি অভিমানে রাত্রিতে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। পরের দিন সকাল বেলা "কাসিম উঠিয়া দরজা খুলিয়া মুরগী দুইটিকে বাহির করিয়া দুই হাতে বুকে চাপিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে রাস্তা দিয়া ছুটিতে লাগিল। তখন ভয়াবহ দুর্যোগ, মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে, বাতাসে জলের ঝাপটায় গাছের মাথা নুইয়া পড়িতেছে; পথ জন শূন্য।" কাসিম তার এক বন্ধুর বাড়িতে মুরগী দুটি রেখে এল। কাকা মুরগী দুটিকে না দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "মুরগীগুলো কোথায়।" কাসিম বলল, জানিনে।

পরদিন সকালবেলা কাসিমের সেই বন্ধু মুরগী দুটি নিয়ে হাজির। তখন আবদুল্লা তামাকু সেবন করছিলেন। আবদুল্লা তখন জানতে পারলেন যে কাসিম মুরগীগুলো অন্য জায়গায় রেখে এসেছিল। কিন্তু সেই বাড়িতেও মুরগী রাখতে দিল না—তাই।

তারপর..."কাসিম চীৎকার করিতে লাগিল, মেরোনা কাকা, মেরোনা। আমার পোষা মুরগী! দুটি পায়ে ধরি! আমাকে মারো কাকা, আমি তোমার পায়ে ধরি..." কিন্তু মুহূর্তে পক্ষীর অর্ধছিন্ন কণ্ঠ ঝুলিয়া পড়িল...কাসিম ভূমিতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।" তারপর যখন জ্ঞান হল, "কাসিম বলিয়া উঠিল, "আমার মুরগী"। আর একটিমাত্র মুরগী ছিল। "কাসিম মুরগীকে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া সমস্ত রাত তাহাকে বুকের কাছে রাখিয়া শুইয়া রহিল"১

বালক মনের আর একটি সার্থক রচনা 'পাড়াগেঁয়ে'। রমানাথ রবীন্দ্রনাথের 'ফটিকের'ই সগোত্র। রমানাথ গ্রামকে ভালবাসত কিন্তু একদিন ভাগ্যচক্রে সে পেঁাছল সহরে। এখানে সবাই তাকে বোকা বলে, তাকে ঠাট্টা করে, সে সত্যকথা বলে ব'লে তাকে সবাই উপহাস করে। তারপর একদিন তাকে অন্যায়ভাবে চোর ব'লে অপমান ও প্রহার করা হল। রমানাথ উন্মত্তের মত আচরণ করতে করতে জ্বর নিয়ে গ্রামে ফিরে এল। গ্রামে তার সাধের সন্ধ্যামণি গাছটির কাছে সে শেষ শয্যা গ্রহণ করল।

বাংলা সাহিত্যে যে মুষ্টিমেয় লেখক শিশুকে নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিরস্মরণীয়। তাঁর লেখার উৎকর্ষ সর্বত্র সমান নয়। বহুক্ষেত্রেই করুণরসের প্রাবল্য আছে। কিন্তু যে সততা ও গভীরতা দিয়ে তিনি শিশুচরিত্র এঁকেছেন তা দুর্লভ।

শিশুচরিত্র ও শিশুমন নিয়ে আর কোন শক্তিমান সাহিত্যিক গল্প লেখেননি। তবে এই সময় থেকেই বাংলা শিশুসাহিত্য পূর্ণবিকশিত হতে থাকে। বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় শিশুদের জন্য গল্প প্রকাশিত হতে থাকে। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

১। এই গল্পটির সঙ্গে স্মরণীয় : বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পশুপ্রীতি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিন্নপত্রাবলী, পত্রসংখ্যা ১১৭
এবং পিয়ের লোতির গল্প (অনুবাদ)—
ভারতী ১২৯৯।শ্রাবণ।

শিশুদের জন্য সখা১ (১৮৮৩) নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এখানে তিনি স্বয়ং এবং হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ২, প্রমদাচরণ সেন, হেমলতা দেবী প্রভৃতি অনেকেই লেখেন। কিন্তু, বলাই বাহুল্য, তা হল শিশুদের জন্য লিখিত সাহিত্য। আমাদের আলোচনা সাহিত্যে শিশু। এই বিষয়টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের পর সুধীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউই এই পর্বে যথেষ্ট পরিমাণে অবহিত হন নি।

৪

বিদেশী চরিত্র ও বিদেশী পটভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে বিদেশী চরিত্র ও বিদেশী পটভূমিকা কোথাও নেই। যে কবিরা আরাকান রাজসভায় বসে কাব্য রচনা করেছিলেন তাঁরা কেউই আরাকানের পটভূমির পরিচয় দেননি বাঙালী পাঠককে। বৃন্দাবন আমাদের সাহিত্যে নিত্য উল্লিখিত হলেও সেই বৃন্দাবন আসলে বাঙালীর কল্পনার সৃষ্টি। মুকুন্দরামের কাব্যে 'হার্মাদে'র ইঙ্গিত পাওয়া যায় মাত্র। আর মঙ্গলকাব্যে সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা আধাকাল্পনিক আধা বিস্মৃত ইতিহাস। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই অ-বাঙালী চরিত্র ও অ-বাংলা পটভূমি বাংলা পটভূমি বাংলা সাহিত্যে দেখা গেল। বঙ্কিমের উপন্যাসে কিছু কিছু ইংরেজচরিত্রের আবির্ভাব হল, দুর্ভাগ্যক্রমে সেগুলি সবই মসীরেখায় চিহ্নিত। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে দু এক ক্ষেত্রে ইংরেজ চরিত্র আছে তারা অত্যন্ত স্বল্প স্থান অধিকার করেছে--কোন কোন চরিত্র উন্নত, কোন কোনটি অত্যাচারী ও উদ্ধত। রবীন্দ্রনাথের গল্পের পটভূমি কখনও কখনও বাংলাদেশের বাইরে--যেমন ক্ষুধিত পাষাণ। বলাই বাহুল্য, এই গল্পটির পটভূমিকা বাংলাদেশের বাইরে হওয়ার ফলে অধিক রহস্য ও বিস্ময় সঞ্চারিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অন্তত একটি উৎকৃষ্ট গল্পের নায়িকা অবাঙালী--বদ্রাওনকুমারী। তাঁর 'দালিয়া' গল্পটির পটভূমিকা আরাকান। কিন্তু এখানে আরাকানের কোন বিশেষ ছাপ পড়েছে বলে মনে হয় না। প্রভাত

১। সখা ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৮৮৩ খৃঃ
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, কালীকৃষ্ণ দত্ত, হেমলতা প্রভৃতি প্রধান লেখক। 'মুকুল' নামে আর একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৩০২ বঙ্গাব্দ (১৮৯৫ খৃঃ)।
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রধান লেখক।
২। আষাঢ়ে গল্প (১৩০৮/১৯০১ খৃঃ)

কুমার মুখোপাধ্যায় বাংলা গল্পের ভূগোলকে প্রসারিত করেছিলেন। তাঁর পটভূমি কখনও বিহার, কখনও কাশ্মীর, কখনও লণ্ডন। তাঁর চরিত্রগুলিও কখনও অবাঙালী ভারতীয় কখনও বা বিদেশী। অপেক্ষাকৃত ছোট লেখকদের কোন কোন গল্পে পটভূমিকা ও চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে বৈচিত্র্যসৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। এইপ্রসঙ্গে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'রাজার বিজয়' কাহিনীটি উল্লেখযোগ্য। গল্প হিসেবে কাহিনীটির মধ্যে কোন প্রশংসার কিছু নেই। কিন্তু মরুভূমিতে তৃষ্ণার একটি ভয়াবহ বর্ণনা আছে—যা বাংলা সাহিত্যে পূর্বে কখনও হয়নি। একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

> "কাতরকণ্ঠে বলিলাম, বাপু...সেই ময়লা জলের প্লাশ আমায় দাও, দশ টাকা দিতেছি। একোয়ান গাড়ি থামাইল। আমার একটু ভরসা হইতেছিল। জলের ব্যাগ বাহির করিয়া সে আপনার বদনা পূর্ণ করিয়াছিল —পুরিলনা। আমি পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ, আমি জল দেখিয়া উঠিয়া বসিলাম দেখিয়া নিষ্ঠুর একোয়ান তাড়াতাড়ি সেই এক বদনা জল গলাধঃকরণ করিল। পরে আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, টাকার লোভ বড় হুজুর। কি জানি আপনি বেশী টাকা দিতে চাহিলে যদি আমার মতলব বিগড়াইয়া যায়, তাই আগে ভাগে তৃষ্ণা নিবৃত্তি করিলাম। বাবু-সাহাব, আল্লার নাম করুন। যত শীঘ্র পারি, এই মরুভূমি পার হইয়া যাইতেছি।"

বাংলার প্রতিবেশী রাষ্ট্র বিহার ও উড়িষ্যার পটভূমিতে কিছু কিছু গল্প রচিত হয়েছিল। যতীন্দ্রমোহন সিংহ (১৮৫৮-১৯৩৭) 'উড়িষ্যার চিত্র' (১৯০৩) নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থটি সত্য ঘটনা নির্ভর। রবীন্দ্রনাথ বইটির প্রশংসা করেন। অবশ্য গল্প হিসেবে কাহিনীগুলি অত্যন্ত নীরস ও গতিহীন। অনুরূপ একটি গ্রন্থ লেখেন যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত।[১] তার নাম 'বেহার চিত্র' (১৯২১)[২]এর ভূমিকায় লিখেছেন, "আমি বন্ধুভাবে বেহারবাসীর চরিত্রের অপূর্ণতাগুলি হাস্য-রসের আবরণে উজ্জ্বল করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাঁহারা এই অপূর্ণতাগুলি পরিহার করিয়া পূর্ণ পরিণতি ও কল্যাণ লাভ করেন। ইহাই আমার ঐকান্তিক বাসনা," এইধরণের মনোভাব নিয়ে সাহিত্যসৃষ্টি করতে যাওয়ার বিপদ আছে। উপদেশ দান ও অন্যের চরিত্র সংশোধনের জন্য যদি গল্প লেখা হয় তাহলে, বলাই বাহুল্য, গল্পগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে তাই হয়েছে। এই গল্পগুলিতে প্রত্যেকটি নায়কই বিহারী। অনেক গল্পেই বিহারের আচার-ব্যবহার,

---

১। তাঁর 'বেহার চিত্র' ছাড়াও 'দূর্বাদল' নামে একটি গল্পগ্রন্থ আছে।

২। হুজুর, রায়সাহেব, গরিব পরবর, ভিখারী মন্তর, মান্যবর, ভরিয়ন সিংহ, সিদ্ধার্থ, সৃষ্টিধর, বেহার পরদীপ, রেলপথে—প্রভৃতি গল্প।

পূজাপার্বণের রীতির পরিচয় আছে। অনেকগুলি চরিত্রই উজ্জ্বল। কিন্তু কোন গল্পই উৎকৃষ্ট নয়। এইধরণের চিত্র শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 'বঙ্গদর্শনে' লিখেছিলেন। এগুলিকে সম্পূর্ণ গল্প বলা চলে না।

ইন্দিরাদেবীর ফুলের তোড়ায়' 'খেজুরওয়ালা গল্পের নায়ক। সে পথে পথে খেজুর বিক্রি করে বেড়ায়। তারই দুঃখময় জীবনের কাহিনী। এই কাহিনীর মধ্যে অবশ্য পটভূমিকা ও চরিত্রের পক্ষে অবাঙালী হওয়ার কোন অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা ছিল না। যেমন ছিল না রবীন্দ্রনাথের কাবুলীওয়ালার। আসলে অনেক ক্ষেত্রে বাঙালী লেখকেরা এই পরিবেশ ও চরিত্রের বৈচিত্র্যের দ্বারা যে স্থানীক বর্ণ (local colour) ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন—তার অন্তর্নিহিত সার্থকতা বুঝতে পারেন নি। তাঁরা প্রায়ই এমনভাবে একটি বিশেষ স্থানের বর্ণনা করেছেন যে মনে হয় যে তা আরোপিত। তা উৎসারিত নয়, স্বতস্ফূর্ত নয়' অথচ প্রভাতকুমারের গল্পে তা কাহিনীর সংগে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫২)র কোন কোন গল্পে বিদেশী চরিত্র ও পরিবেশ সার্থকভাবে ফুটেছে। তাঁর 'চিত্রদীপ' গ্রন্থে 'দান' গল্পের নায়িকা গ্রেস। সে একজন রোমান ক্যাথলিক মিশনারী। সে তার জীবনে যে দুঃখকাহিনী বলেছে তা করুণ ও মানবিক। সেই কাহিনীটিও সহানুভূতি ও সংযমের সংগে লেখক বলেছেন। 'ত্যাগের দিনে' গল্পটি আবার সেই পরিমাণেই কাঁচা। মিনামী' নামে একটি জাপানী মেয়ে এই গল্পের নায়িকা তার ভাই যুদ্ধে গেছে। সে যুদ্ধে মারা গেছে। কিন্তু দেশ জয়ী হয়েছে। দেশের আনন্দ-উৎসবে যোগ দিতে সবাই গেছে। মিনামীও গেছে। তখন লেখিকা ও তাঁর এক বন্ধু ভাবছেন এঁরা হৃদয়হীনা নারী। নিজের ভাইয়ের জন্যও দয়া নেই; মায়া নেই। কিন্তু হঠাৎ লেখিকা দেখতে পেলেন আনন্দ-উৎসবের রাত্রে একা একা মিনামী বসে কাঁদছে। সে বলল যে, দেশের আনন্দে সে যোগ দেবে সকালবেলা কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে সে তার ভাইর জন্য কাঁদছে। কাহিনীর বিষয়বস্তুর মধ্যে যে চারিত্রিক দ্বন্দ্ব আছে তা উৎকৃষ্ট গল্পে পরিণত হতে পারত কিন্তু লেখিকা গল্পের মধ্যে অনর্থক বাঙালী নারী ও জাপানী নারীর তুলনা এবং দীর্ঘ মন্তব্য দিয়ে গল্পটিকে নষ্ট করেছেন। 'স্বর্গচ্যুত'১ গল্পটিতে এই ধরনের দীর্ঘ ও অনর্থক মন্তব্য না

১। 'মধুমল্লী' গ্রন্থে মা, স্বর্গচ্যুত, প্রতিশোধ, অযাচিত, লঘুক্রিয়া, গৃহ প্রভৃতি গল্প আছে। 'চিত্রদীপ' গ্রন্থেও 'স্বর্গচ্যুত' অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অনুরূপা গ্রন্থাবলীর ৪র্থ খণ্ডে 'মা' গল্পটি 'মধুমল্লী' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

থাকায় নেপালী ভাইবোনের পবিত্র ভালবাসার কাহিনীটি উপভোগ্য হয়েছে। 'গৃহ' গল্পটিতে সমুদ্রের পটভূমিকা। 'প্রতিশোধ' গল্পটি অনুবাদ হওয়াই সম্ভব।-ফরাসী বিপ্লবের পটভূমিকায় কাহিনীটি লিখিত। এই সব গল্পের মধ্যে 'মা' গল্পটি বিশেষ স্মরণীয়।

মিসেস ম্যাকমোহনের পুত্র জেসুন। মিসেস ম্যাকমোহন মারা যাবার সময় তাঁর আয়ার কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন যে, সে তার নিজ পুত্রের চেয়েও জেসুনকে যেন বেশী ভালবাসে। মিসেস ম্যাকমোহনের মৃত্যুর পর মিঃ ম্যাকমোহন আবার বিবাহ করলেন। তাঁর নতুন স্ত্রী জেসুনকে দেখতে পারতেন না। তাই আয়া গুলজান জেসুনকে নিয়ে পালিয়ে গেল। তাকে আদরে মানুষ করল। কিন্তু সে যখন বড় হল তখন তার ভীষণ রাগ হল গুলজানের প্রতি। সে আসলে ইউরোপীয়—অথচ গুলজান তাকে সমাজ থেকে সরিয়ে রেখেছে। তাই রাগ করে আয়াকে ছেড়ে সে চলে গেল নিজের নবজীবন খুঁজতে। কিন্তু চারিদিকে সে পেল লাঞ্ছনা, তার পিতাও তাকে গ্রহণ করলেন না। তখন তার একমাত্র আশ্রয়—গুলজান—তার পালিত মাতা।

> "অন্ধকারে কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পাইতেছিল না। রাতের বাতাস কেবলি বিলাপের নিঃশ্বাসের মত ঘরে ও বাহিরে ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। দু-একটা নিশাচর প্রাণীর ক্ষীণ কণ্ঠশব্দ আর্তহৃদয়ের যন্ত্রণাধ্বনির মত শূন্যে চকিত হইয়া মিলাইয়া যাইতেছে। মৃদুস্বরে গুলজান ডাকিল—"ইয়াসিন—জেসুন বাবা।"
>
> জেসুন তাহার বুকের উপরে মাথা রাখিয়া বলিল, "মা"।

জলধর সেনের গল্পগুলিতে অনেকগুলি গল্প দেখা যায় যেগুলি হিমালয়ের পটভূমিকায় রচিত।১ কিন্তু গল্প হিসেবে সেগুলি অতি অকিঞ্চিৎকর। এই গল্প-গুলিতে ভ্রমণকাহিনী অধিক স্থান নিয়েছে—ফলে এগুলি এক দিক দিয়ে যেমন অপূর্ণ ছোটগল্প অন্যদিকে তেমনই কল্পনা ও সত্যমেশা ভ্রমণ কাহিনী। গল্পের মধ্যে স্থানীয় বর্ণের উৎকৃষ্ট উদাহরণ সত্যেন্দ্রকুমার বসুর 'ক্রীতদাসী' গল্পে। বাংলা দেশের বাইরে পার্বত্যদেশে এক মধুর রোমান্স সৃষ্টি করেছেন লেখক। নেপালী জীবনের নানা প্রথা, ক্রীতদাসী বিক্রয় ও পার্বত্য জীবনের নানা বিভীষিকার দ্বারা কাহিনীটি রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর হয়েছে। সেইসঙ্গে ক্রীতদাসী সাবিত্রীর জীবন—তার নীরব ভালবাসা, তার প্রাণদান—গল্পটিতে বিস্ময় সঞ্চার করেছে। একটি উদ্ধৃতির দ্বারা লেখকের স্থানীয় বর্ণ সৃষ্টির ক্ষমতা প্রমাণ করি:

১। 'পুরাতন পঞ্জিকা' গ্রন্থে 'তিহরীর পথে', 'শ্রীনগর', 'হিমালয় স্মৃতি'। 'নৈবেদ্য' গ্রন্থে 'সন্ন্যাসী'।

"আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া নদীগর্ভে অবতরণ করিলাম। জানু পর্যন্ত জলে মগ্ন হইল। কাল কিন্তু পায়ের পাতাটুকুমাত্র ডুবিয়াছিল। সামান্য জল, কিন্তু ভীষণ তাহার স্রোত।...নদীর জলে অবতরণ করিয়াছি—এমন সময়ে কোথা হইতে কি এক অভাবনীয় কান্ড ঘটিয়া গেল। যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, সেদিনের সেই ঘটনার স্মৃতি অনুক্ষণ স্মৃতিপটে জাগরূক থাকিবে।

অকস্মাৎ শতবজ্র-নির্ঘোষে দিগ্‌দিগন্ত ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করিয়া অগাধ অপরিমেয় জলরাশি পাহাড়ের উপর হইতে ছুটিয়া আসিল, বিধুনিত কার্পাসরাশির ন্যায় তাহার ফেনপুঞ্জ যেন টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল—আর সেই উদ্দাম আবিল উন্মত্ত জলরাশি সম্মুখে যাহা কিছু বাধা পাইল, হয় তাহা দলিত-মথিত করিয়া, না হয় ঘোর গর্জনে স্রোতোমুখে ভাসাইয়া লইয়া চলিল।"

আর একটি বর্ণনাঃ

"আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার দিনে ইংরাজ রাজত্বের সীমানায় মানুষ বেচা-কেনা হয়, ইহা কি আশ্চর্যের কথা নহে ?

"ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলাম, "সে কি রকম ? কারা বেচে ? কাদের বেচে ? কেনেই বা কারা ?"

"মহাদেব বলিল, দেখতেই পাবে বাবুজী, আমি আর কী বলবো ?"

......"মেলায় গৃহস্থালীর কিছু কিছু জিনিষ কিনিব, দুই-একখানা পাহাড়ী কম্বল ও নেপালী কুকুরী কিনিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু কিছুই ভাল লাগিল না।...একজন বয়স্ক পাহাড়ী এক এক নারী বা পুরুষকে কাছে আনিয়া দাঁড় করাইতেছে এবং পাহাড়ী ভাষায় উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে, কে খরিদ্দার আছ এই বালিকাকে কিনিবে।"

৫

রোমাঞ্চ ও ডিটেকটিভ গল্প

সাহিত্যিক সমাজে ডিটেকটিভ গল্প চিরকালই অবহেলিত ছিল। কিন্তু পাঠক-সাধারণের কাছে রোমাঞ্চ ও ডিটেকটিভ গল্পের তুল্য জনপ্রিয় কোন গ্রন্থই নেই। উপভোগ্যতা ও রহস্যাশিহরণ সৃষ্টিই এর একমাত্র লক্ষ্য। চুরি-ডাকাতি ও খুন এই তিনটি অবলম্বন করে দুর্বৃত্ত বা আততায়ীকে ধরার যে চেষ্টা সেখানেই ডিটেকটিভ গল্পের শুরু। এক ইংরেজ লেখক[১] বলেছেন যে *shocker* এবং *delective story*তে

১। Maugham, S., *The Decline and fall of the Detective story. The Vagrant Mood* P. 95.

পার্থক্য করতে হবে। *Shocker* বা রোমাঞ্চ কাহিনী আমাদের শৈশব কল্পনাকেই বেশী আলোড়িত করে, তার মধ্যে ঘটনার বাহুল্য ও আকস্মিকতা ও চমকপ্রদ ঘটনার উপস্থিতি থাকে। কিন্তু ডিটেকটিভ বইতে থাকবে দুর্বৃত্তকে ধরার কুশলতা। গোয়েন্দার চরিত্র, মন ও সর্বোপরি তার ব্যক্তিত্ব।

সাধারণত যে সমস্ত ডিটেকটিভ গল্প আমরা পড়ি তা আরম্ভ হয় একটি খুনে বা চুরিতে। সেই খুন বা চুরিকে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করে দোষীকে ধরা হয়। দ্বিতীয় স্তরের ডিটেকটিভ গল্পে দেখা যায় হত্যাকাণ্ড বা চুরির রহস্য অতি জটিল, সাধারণত পুলিশ এই ঘটনা তদন্ত করেও কোন হদিশ পাচ্ছে না, তখন কোন এক সখের গোয়েন্দা সেই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত করেন ও সূক্ষ্মভাবে একটি করে সূত্র আবিষ্কার করেন। যে জিনিষ আমাদের চোখের সামনে অর্থহীন সেই ভাঙা কাচের গ্লাস, এক টুকরো সিগারেট কিংবা একটা ট্রেনের টিকিট ডিটেকটিভকে দুর্লভ সূত্র ধরিয়ে দেয়।

আধুনিক কালে ডিটেকটিভ গল্পে হত্যাকারী মনস্তত্ত্ব ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করছে—সেই সঙ্গে আধুনিক ডিটেকটিভদের ব্যক্তিত্বও প্রধান হয়ে উঠছে পাঠকের কাছে। এখন আর ডিটেকটিভ একটি নৈর্ব্যক্তিক সত্তা নয়—তার মন, তার আবেগ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বলা চলে, যে এখন ডিটেকটিভগল্প—একই সঙ্গে গল্প এবং ডিটেকটিভ গল্প হয়ে ওঠার চেষ্টা করছে।

ডিটেকটিভ গল্পের জন্ম হল আমেরিকায় ১৮৪১ খৃঃ অব্দে এডগার অ্যালোন-পোর লেখা "The Murders in the Rue Morgue" -এ১ ডিটেকটিভ গল্পের ধারা বাংলায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এসে পৌঁছল। আর্থার কোনান ডয়েলের বিখ্যাত সৃষ্টি শার্লক হোমসের জন্ম হল ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে। তাঁর A study in scarlet (১৮৮৭), The sign of four (১৮৯০), The adventures of Sherlock Holmes (১৮৯২) ইত্যাদি গ্রন্থ উনিশ শতকের শেষেই প্রকাশিত হয়েছে। উইলকি কলিন্সের নাম তখন কোন কোন বাঙ্গালী লেখক জানতেন। তাঁর "The Moonstone" গ্রন্থের (১৮৮৬) পরিচয় হয়ত বাঙ্গালী পাঠক তখন পেয়েছিল।

প্রথম স্তরের বাংলা ডিটেকটিভ গল্পগুলি রোমাঞ্চপ্রধান। ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৪২-১৯১৬) বিলাতি চোর, রহস্যমুকুর প্রভৃতি গ্রন্থে এই ধরনের কাহিনীর সূত্রপাত করেন। তবে এ প্রসঙ্গে প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় সর্বাপেক্ষা স্মরণীয়। তিনি নিজে ছিলেন একজন দারোগা। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি কাহিনী

১। Hayeraft, H, *Murder for pleasure*…"It was the world's first detective story" P. 4.

শুরু করেন। ১৮৯২ খৃঃ অব্দ থেকে প্রতিমাসে তিনি 'দারোগার দপ্তর' নামে একটি মাসিক ডিটেকটিভ গল্প গ্রন্থের বই প্রকাশ করতে থাকেন। ১ম খণ্ডে 'বনমালী দাসের হত্যা', 'যমালয়ের ফেরতা মানুষ', 'জুয়াচোরের বাহাদুরি' ও 'জালিয়াৎ যদু'—এই চারিটি কাহিনী ছিল। 'দারোগার দপ্তর' পাঠকসাধারণের অকুণ্ঠ সমাদর লাভ করে। কারণ প্রিয়নাথের ভাষা ছিল সহজ ও সরল। তিনি রসিকতা করতে জানতেন। আত্মম্ভরিতা ও আত্মপ্রশংসা তিনি কখনও করেন নি। শেষদিকে এই গ্রন্থের এত চাহিদা বাড়ে যে তখন তিনি এর মধ্যে বিদেশী ডিটেক-টিভ গল্পের অনুবাদ দিতে থাকেন। সমকালীন বহু পত্রিকায় তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা হয়।[১] এই গল্পগুলিতে খুন ছাড়াও অন্য অন্য বিভিন্ন ধরনের চুরির কাহিনী পাওয়া যায়। অপরাধীর তালিকা বিচিত্র—কখনও দুর্দান্ত পাষণ্ড, কখনও নিরীহ বাবু, সাদাসিধে সাহিত্যিক, অতি নিপুণ জালিয়াৎ। অধিকাংশই তাঁর চোখে দেখা। দারোগার দপ্তর তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করলে দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রিয়-নাথের গ্রন্থ তথা ডিটেকটিভ গল্প সম্পর্কে একটি মন্তব্য করেন। এই মন্তব্যের মধ্যে তৎকালীন বাঙালী লেখকের ডিটেকটিভ গ্রন্থ সম্পর্কিত ধারণাটি জানা যায়।

"ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে Sensational story যথেষ্ট এবং তাদৃশ কাব্য লেখকও যথেষ্ট। উইলকি কলিন্স এবং মিস ব্রাউনের নাম ইংলণ্ডের এই শ্রেণীস্থ উপন্যাস লেখকগণের তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। Detective Story উল্লিখিত Sensational Storyর একতম...ভাগমাত্র। একদিকে পাপীর চাতুর্য অপর দিকে শাসনযন্ত্রের সুতীক্ষ্ম কৌশল ইহাতে বিবৃত।..... রাজশক্তির জয় এবং পাপীর পতন ইহাতে জ্বলন্তভাবে বিবৃত থাকে।

আমাদের দেশে...মৌলিক Sensational উপন্যাস নাই বলিলেই হয়। শ্রীযুক্ত

১। বঙ্গবাসী (১৩০০, ১৬ই পৌষ), ভারতসংবাদ (১৩০০, ১২ই পৌষ), সোমপ্রকাশ (১৩০০, ১৫ই ফাল্গুন), ঢাকা গেজেট (১৩০০, ২০শে ভাদ্র), সমাজ ও সাহিত্য (১৩০০, ২৯শে শ্রাবণ) প্রভৃতি পত্রিকা। ১৩শ, ১৪শ ও ১৫শ সংখ্যার সমালোচনা প্রসঙ্গে ভারতী (১৩০০ আষাঢ়, পৃঃ ১৮৮) বলেন, "ব্যাপারটি আমাদের দেশের পক্ষে নূতন। ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ ডিটেকটিভ অনুকরণে, প্রিয়বাবু স্বয়ং একজন ডিটেকটিভ, তাঁহার অভিজ্ঞতার ফল এইরূপে গল্পে লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া-ছেন। প্রিয়বাবুর লেখনী ধারণ বিফল নহে—তাঁহার ভাষার দখল আছে, অধিকন্তু গল্প জমাট করিবার শক্তি আছে—ভালো ডিটেকটিভ গল্পের তাহাই প্রধান উপাদান।"

বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত Detective Storyগুলি বঙ্গভাষায় মৌলিক Sensational novel-রূপে পরিগণিত হইবার উপযোগী।"

প্রিয়নাথের অনেকগুলি লেখাই উপভোগ্য কিন্তু সেগুলি সাহিত্যপর্যায়ভুক্ত নয়। তা সরস কৌতুকপূর্ণ বা নিখুঁত বর্ণনাপূর্ণ বিভীষিকাভরা কাহিনীমাত্র। মানব-চরিত্রের ঘাতপ্রতিঘাতে তা কোন সাহিত্যরূপ ধরে নি।

প্রিয়নাথের পর ডিটেকটিভ গল্পলেখক হিসেবে তিনজন লেখকের নাম করা চলে। পাঁচকড়ি দে, দীনেন্দ্রকুমার রায় ও সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য। পাঁচকড়ি দে প্রধানত ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখেই বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা-আসাম পর্যন্ত খ্যাত হয়েছিলেন। তিনি ছোটগল্প লেখার চেষ্টা করেন নি। কখনও কখনও ছোট আকারে ডিটেকটিভ কাহিনী লিখেছেন মাত্র। কিন্তু সেখানে গল্প যেমন ব্যর্থ, ডিটেকটিভ গল্পের রসও তমন অপরিণত। দীনেন্দ্রকুমার ছোটগল্প লেখক ছিলেন কাজেই তিনি ডিটেকটিভ গল্পেও অধিকতর সার্থকতা দেখিয়েছেন। তাঁর 'পট' গ্রন্থ (১৩০৮)টি ডিটেকটিভ গল্পগুচ্ছ।১ প্রথম পাতায় লেখা আছে, "A man can shine in the second rank who would be totally eclipsed in the first." অধিকাংশ গল্পই কাঁচা। 'জাল ডিটেকটিভ' গল্পটি শ্রেষ্ঠ রচনা এবং সম্ভবত এটি কোন বিদেশী গল্পের ছায়ায় লিখিত।

> একদিন লেখক ট্রেনে যাচ্ছেন। কামরায় মাত্র দু'জন লোক। একজন পাশে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। অন্যজন সামনের সীটে বসে আছেন—তিনি ভীষণদর্শন পুরুষ। হঠাৎ লেখক দেখলেন যে পাশের ভদ্রলোক তাঁর খবরের কাগজের কোণে লিখেছেন যে সামনের লোকটি একটি বিখ্যাত খুনী—সে পালিয়ে যাচ্ছে এবং তিনি একজন ডিটেকটিভ অতএব তাঁকে সাহায্য করুন। লেখক সাহায্য করতে রাজী হলেন। দুজনে মিলে অতর্কিত আক্রমণ করে লোকটিকে বেঁধে ফেললেন। পরের স্টেশনে ট্রেন থামতেই ডিটেকটিভ বললেন, আপনি বসুন, আমি এক্ষুনি পুলিশ নিয়ে আসি। কিন্তু সে আর ফিরল না। পরে জানা গেল সে-ই আসলে খুনী আর এই বাঁধা লোকটাই ডিটেকটিভ।

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য অনেক ডিটেকটিভ উপন্যাস লেখেন। মরা মেম (১৯০৫) বিখ্যাত উপন্যাস। নকল রানী (১৯১৫) কতকগুলি গল্প। কিন্তু অন্যান্য লেখক-দের মতই তাঁরও লেখায় কোন সাহিত্যগুণ নেই—রোমাঞ্চগুণ আছে। 'অপূর্ব চুরি' নামে একটি গল্প উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। মহারাণী সেজে এক দোকান থেকে একজন হীরক চুরি করে নিয়ে গেল। চুরি করার এই অভিনবত্বটুকুই লেখককে

১। শত্রুহস্তে, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে, চক্ষুদান, হত্যারহস্য, জাল ডিটেকটিভ, গল্প লেখার বিড়ম্বনা।

আকর্ষণ করেছে—কিন্তু চুরি ধরার কুশলতা নিয়ে তিনি চিন্তিত নন। তাই তাঁর কাহিনীতে পুলিশ হঠাৎ অপরাধীকে ধরে ফেলল।

'ভারতী' ও 'সাহিত্য' পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে ডিটেকটিভ গল্প বেরুত। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে:

১৯২৭ বৈশাখ ভারতী **হত্যাকারী কে**—হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

১২৯৯ কার্তিক ,, **গল্পলেখার বিড়ম্বনা**—দীনেন্দ্রকুমার রায়

১৩০৩ আষাঢ় ,, **হত্যা**—রমাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

১৩০৪ পৌষ ,, **রমণীদস্যু**—অনুবাদ

১৩০৬ জ্যৈষ্ঠ সাহিত্য **মহিলা ডিটেকটিভ**—Harmsworth Magazine থেকে অনূদিত।

এই গল্পগুলির মধ্যে হরিসাধনের 'হত্যাকারী কে' গল্পটি অপেক্ষাকৃত ভাল। কৃত্তিবাস চট্টোপাধ্যায় আলিগড়ে হোটেল চালান। তাঁর হোটেলে করালীচরণ নামে এক ভদ্রলোককে হোটেলের চাকর পরাণ খুন করে কিন্তু নির্দোষ কৃত্তিবাসকে পুলিশ ধরে। গল্পটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ লেখকের জবানীতে। দ্বিতীয়ভাগ দারোগাসাহেবের জবানীতে। শেষ পর্যন্ত কৃত্তিবাস মুক্তি পায়।

ডিটেকটিভ গল্পের এই ধারা ক্রমশই বেড়েছে। হেমেন্দ্রকুমার রায় অনেক ডিটেকটিভ গল্প লেখেন। কোনান ডয়েলের বইগুলি অনুবাদ আরম্ভ হয়েছে। সুরেন্দ্র রায় **গল্পকুঞ্জ** নামে একটি ডিটেকটিভ গল্পের বই লেখেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে। নুরুন্নেসা খাতুনও বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় অনেকগুলি ডিটেকটিভ গল্প লেখেন। কিন্তু প্রথম ডিটেকটিভ গল্পকে সাহিত্যের মর্যাদা দিলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। ইংরেজি সাহিত্যে E. C. Bentleyর Trents' last case (১৯১৩) প্রকাশ হবার পর ডিটেকটিভ গল্পের প্রতি সাহিত্যসমালোচকেরা দৃষ্টি দিলেন।[১] বাংলায় এখনও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া কোন উৎকৃষ্ট লেখক ডিটেকটিভ গল্পে হাত দেননি এবং সাহিত্যসমালোচকেরা এখনও তাই এই ধরনের লেখার প্রতি অবহেলা পোষণ করেন। বাংলাসাহিত্য এখন কোনানডয়েল কিংবা বেণ্টলির অপেক্ষা করছে।

১। Ward, A. C. *Twentieth Century Literature*, p. 83.

ভৌতিক গল্প

৬

ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে বাংলাসাহিত্যে ভূতের স্থান ছিল বিরল। অথচ ভারতীয় সাহিত্যে ভূতের কাহিনীর সন্ধান মিলছে বেদ থেকে।১ বাংলাসাহিত্যে ভারতচন্দ্রের 'মানসিংহে'র মধ্যে সর্বপ্রথম ভূতের কাহিনী বেশ স্পষ্টভাবে লিখিত হয়। তবে ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টির প্রথম গৌরব প্রাপ্য বিদ্যাসাগরের। নিখুঁত শ্মশানদৃশ্যের বর্ণনা, অমাবস্যার অন্ধকার, একা বিক্রমাদিত্য, ডাকিনীযোগিনী শঙ্খিনী হাসছে খলখলিয়ে। সন্ন্যাসী বসে আছেন মন্দিরে আর বিক্রমাদিত্য একটি শবদেহ নিয়ে চলেছেন। শিহরণে রোমাঞ্চে মন স্তব্ধ হয়ে আসে। বঙ্কিমের হাতে যদি একটি ভূতের গল্প পাওয়া যেত তাহলে হয়ত তা একটি অপূর্ব সম্পদ হতে পারত। আমাদের দুর্ভাগ্য যে বঙ্কিম একটি ভূতের গল্প লিখতে আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু শেষ করে যেতে পারেননি। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দশমহাবিদ্যায় ভূতের' কথোপ-এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

> জ্বলে কপাল ধঃ ধঃ ধঃ
> এটা কার মাথা হি হি হঃ
> ধাকিটি ধাকিটি ধিমিয়া।

যথার্থ ভূতের কাহিনী শুরু হল বাংলা ছোটগল্পের মধ্যে—নগেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথে। হয়ত রূপকথা বা নানা উপকথায় ভূতের গল্প আছে কিন্তু তা হল মৌখিক সাহিত্য। ঊনবিংশ শতাব্দীতে লিখিত সাহিত্যে ভূতের গল্প কম। ভূতের গল্পের দুটি স্পষ্ট ভাগ—একটিতে ভৌতিক সত্তার আবির্ভাব ঘটছে কাহিনীতে—অন্যটিতে ভৌতিক পরিবেশই বড়। দ্বিতীয়শ্রেণীর গল্পেই উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টির সম্ভাবনা। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের শ্মশানদৃশ্যগুলি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। সেখানে ভূত কখনও এসে উপস্থিত হয়নি কিন্তু একটা হিমশীতল শিহরণ, একটা রুদ্ধ-শ্বাস ভয় পাঠককে অভিভূত করে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে প্রথম শ্রেণীর গল্পগুলি উৎকৃষ্ট সাহিত্যস্রষ্টারা বাদ দিয়েছেন। উৎকৃষ্ট লেখকেরা দুটিকেই মিলিয়ে নিয়েছেন—তবে সূক্ষ্মভাবে, তার প্রমান রবীন্দ্রনাথের মণিহারা ও ক্ষুধিত-পাষাণ। দুটি গল্পেই ভৌতিক সত্তার উপস্থিতি। কিন্তু নিছক ভয়ে ও ভৌতিক সত্তার ভীতিপ্রদ বর্ণনায় কাহিনীগুলি গড়ে ওঠেনি।

বাংলাদেশে ভূতের অজস্র শ্রেণী বিভাগ আছে। তাদের কারো সাক্ষাৎ মেলে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর পরবর্তী লেখক রাজশেখর বসুর 'ভূষণ্ডির

১। সুকুমার সেন—ভূতের গল্প, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ

মাঠে'। কিন্তু তাঁদের গল্পে ভয় রোমাঞ্চের চেয়ে ব্যঙ্গ ও রঙ্গই প্রধান। নগেন্দ্রনাথ দু-একটি গল্পে ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। এই প্রসঙ্গে দীনেন্দ্রকুমারের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'বাসন্তী' গ্রন্থটির মধ্যে "সত্যঘটনা না ভৌতিক কান্ড" কাহিনীটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এক সন্দেহাতুর স্বামী স্ত্রীর চোখ অন্ধ করে দিয়েছিল—কিন্তু তার পরবর্তী জীবনে শুধুই অনুতাপ করে ঘুরে বেড়াত। এই কাহিনীটির মধ্যে ভূতের কোন স্থান নেই। কিন্তু এই অনুতপ্ত স্বামীকে এক প্রচন্ড ঝড়ের রাতে লেখক দেখে হঠাৎ যে ভয় পেয়েছিলেন সেই ভয় কাহিনীর সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছেন। "ক্রমে সেই ছায়া আমার অধিক নিকটে আসিলে আমি অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া দেখিলাম সত্যসত্যই রক্তমাংসের শরীরবিশিষ্ট একটি মনুষ্য। দীর্ঘদেহ, মুখে প্রচুর শ্মশ্রু ও গুম্ফ বর্তমান. মস্তক বেশ দীর্ঘ এবং রুক্ষ্ম. একখানি শুভ্র চাদরে সর্বশরীর আবৃত, বৃষ্টিতে উত্তরীয় ও পরিধান বস্ত্র সিক্ত, স্থানে স্থানে কর্দমাক্ত।"—এই বর্ণনা পড়ে লেখকের মতই পাঠকও স্বস্তি পায়।

ভৌতিক পরিবেশের সূক্ষ্মরূপই fantasy. আমরা পূর্বে তার ব্যাখ্যা করেছি। দীনেন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' গল্পটি এই ধরনের কাহিনী। সম্ভবত তখনকার Theosophical Societyর নানা কাহিনীই লোকে জেনেছিলেন। দীনেন্দ্রনাথের গল্প হয়ত তারই দ্বারা প্রভাবিত। একটি ছেলে স্বপ্নে একটি মেয়েকে দেখে ও তার জন্য পাগল হয়ে তাকে খুঁজতে শুরু করে। বহু জায়গায় ঘুরে ঘুরে সে বিফল হয়। শেষে সেই স্বপ্নে দেখা মেয়েটিকে সে দেখতে পায়। রূপকথার রাজপুত্র রাজকন্যার স্বপ্নেদেখা ও পরে মিলন খুবই প্রাচীন ঘটনা। কিন্তু আধুনিক গল্পে এই ঘটনার সম্ভাব্যতা ও তার ফলে গল্পের গঠনের ত্রুটি সম্পর্কে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। গল্পটি গঠনের দিক থেকে অত্যন্ত যান্ত্রিক কিন্তু একটি অ-লৌকিক আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন বলেই গল্পটি উপভোগ্য।

এই প্রসঙ্গে পাঁচকড়ি দের একটি কাহিনী উল্লেখযোগ্য। কাহিনীটি চিঠির আকারে লিখিত।

> এক বন্ধু সে পার্বত্যদেশ থেকে কলকাতার বন্ধুকে চিঠি লিখছে। এই বন্ধুটিও এসেছেন হাওয়া বদলাতে, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী। ধীরে ধীরে কাহিনীর সূত্র উন্মোচিত হচ্ছে। যে বাড়িতে তিনি আছেন সেখানে আগে থাকত সোহো নামে এক ভূটিয়া কবি। তার স্ত্রী ছিল। পাশের গাঁয়ের একটি ভূটিয়া যুবতীর সঙ্গে সোহোর প্রণয় ছিল। তাই সেই ভূটিয়া মেয়েটি রোজ রাত্রে আসত। সোহোর স্ত্রী স্বভাবতই এই ঘটনায় বিচলিত হল ও তার অন্তরে হিংসা জ্বলে উঠল। সে ঠিক করল মেয়েটিকে হত্যা করতে হবে। সোহো পাহাড়ের খাদের ওপরে একটি ছোট সাঁকো দিয়ে আসত। একদিন রাত্রে সোহোর বৌ সেই সাঁকোর একটা দিক আল্‌গা করে এল। সেই রাত্রেই

সোহো প্রণয়িণী খাদে পড়ে মারা গেল। সোহো জানতে পেরে নিজের স্ত্রীকে গলাটিপে হত্যা করল কিন্তু স্ত্রীও মৃত্যুর পূর্বে স্বামীকে নিয়ে দুজনেই খাদে পড়ল। সেই থেকে এই বাড়ি পরিত্যক্ত। কলকাতার বাবু এসব কিছু জানেন না, জানলেও বিশ্বাস করে না। কিন্তু সে রোজ রাত্রে হাওয়ার মর্মরে, পাতার খসখসে শোনে কে যেন আসে, কে যেন দরজায় টোকা দেয়। এইভাবে তার চৈতন্য, তার বোধ সম্মোহিত হয়ে এল। সে রাত্রে দরজা খুলে দেয় —একটি ভুটিয়া মেয়ে এসে ঢোকে, কথা বলে না, আবার চলে যায়। এদিকে ভদ্রলোকের স্ত্রী সন্দেহ করেন। দূরেই পাহাড়ের খাদে ছোট্ট একটি সাঁকো। একদিন ঝড়ের রাত্রে লোকটি সেই ভুটিয়া রমণীর প্রতীক্ষা করছে—কিন্তু হঠাৎ শুনতে পেল আকাশ-কাঁপানো চিৎকার—কে যেন পড়ে যাচ্ছে। খাদের গায়ে গায়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তার আর্ত অসহায় কান্না। ভদ্রলোকের সন্দেহ হল—তিনি ছুটলেন। দেখলেন সেই সাঁকোর ধারে তাঁর স্ত্রী—সাঁকোর একটি দিক খোলা। তারপর তিনি স্ত্রীর গলা টিপে ধরলেন, স্ত্রীও তাকে নিয়ে পড়ল খাদে।

এই হল সোহোর বাড়ির গল্প। কাহিনীর নাম 'সর্বনাশিনী'।১

কাঞ্চনমালা দেবী (১৮৯১-১৯৩১) তাঁর অনেকগুলি গল্পে ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর কোন একটি গল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে সমকালীন এক পত্রিকা২ বলেন যে "গল্পটি ভূতের সূক্ষ্ম মসলিনের ওড়নায় আবৃত..." এই সূক্ষ্ম মসলিনের ওড়নার মতই তার হালকা ভৌতিক পরিবেশ। তাঁর গ্রন্থ কয়েকটি—গুচ্ছ, স্তবক, রসির ডায়ারী ও শনির দশা। তার মধ্যে 'স্তবক'ই তাঁর প্রতিনিধি-মূলক রচনা। স্তবক (১৯১৫) গ্রন্থের অধিকাংশ গল্পই এই ভৌতিক সূক্ষ্ম মসলিনে ঢাকা। ক্ষুধিত পাষাণের ছাপ তাঁর গল্পগুলির মধ্যে বিকীর্ণ হয়ে গেছে। 'অভিসার' গল্পটি নেওয়া যাক। বৃদ্ধ নাদির হোসেন আজ দরিদ্র, শতছিন্ন তার বসন ভূষণ। প্রতি পূর্ণিমায় সে শাহজাদীর গোরস্তানে ফুল দেয়। আর মাসে একদিন সে "মেহেদি পাতায় তার দীর্ঘ শুভ্রকেশ রঞ্জিত করে. অন্যদিনের জীর্ণ মলিন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া সযত্নে বেশভূষা করে। সন্ধ্যার পূর্বে মিহি বুটিদার চাপকান। শতচ্ছিন্ন জরিদার জুতো ও বহু বর্ষের তৈলসিক্ত টুপি" পরে। সেই দিন সে মোগল বাদশাহদের বংশধর। পরিচিত লোকদের সঙ্গেও কথা বলে না। সে তখন প্রাচীন জগতের অধিবাসী। বর্তমান জগতের কেউ নয়। তার জীবনে তখন মনে পড়ে শুধু শাহাজাদী জাহানুবানুর মুখ। মৃত প্রেমের সুরভি তাকেও মৃতজগতের অধিবাসী করে।

১। 'উপন্যাস সংগ্রহ'—সম্পাদিত অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল।

২। সংকল্প ১৩২১ অগ্রহায়ণ।

কাঞ্চনমালার 'পদচিহ্ন' ও 'হাজী' গল্পের নায়কও বৃদ্ধ। দরিদ্র ও বেদনাহত। 'হাজী' গল্পে এক ফকিরের প্রেমের কাহিনী। সে দেখতে পায় জলের মধ্যে একটি সুন্দর মুখ। একটি উদাহরণ দিই:

> "অনেকক্ষণ পরে ঊর্ধ্বে চাহিলাম যবনিকা সরিয়া গিয়াছে; বাতায়নপথে একখানি হাস্যবিকশিত সুন্দর মুখ আমার দিকে চাহিয়া আছে। সে আসিয়া আমাকে লইয়া গেল। সেই গবাক্ষের পার্শ্বে বসিলাম। আজ তাহার বেশ-ভূষা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলাম। বহুমূল্য অলঙ্কারে তাহার আপাদ-মস্তক আবৃত। বেণীবদ্ধ কুঞ্চিত কেশরাশির মধ্যে উজ্জ্বল হীরাগুলি নক্ষত্রের মত জ্বলিতেছে; চূর্ণ কুন্তল যেখানে শুভ্র ললাটে ক্রীড়া করিতেছে সেখানে রাশি রাশি মুক্তা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পৃষ্ঠলম্বিত বেণী মুক্তার জালে আবদ্ধ। এই সূক্ষ্ম নীল রঙের পেশোয়াজ বহু কুঞ্চিত পায়জামায় আবদ্ধ হইয়া দুইখানি সুন্দর সুগোল চরণরেখা দেখা যাইতেছে। সে এখন তাহার নবযৌবন পুষ্পিত পূর্ণ দেহলতাখানি আবর্তিত করিতেছে। তখন অসংখ্য মণিমুক্তা জ্বলিয়া উঠিতেছে।"—এই হল হাজী সাহের কল্পিত প্রণয়িনী।

এই সূক্ষ্মায়িত ভৌতিক পরিবেশ চরম পর্যায়ে উঠেছে অবনীন্দ্রনাথের হাতে। 'পথে ও বিপথে' (১৯১১) গ্রন্থে কয়েকটি গল্প তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 'অস্থি' গল্পে হাঙরমুখো স্টীমারের সুদর্শন লোকটি এক ভয়াবহ ভৌতিক গল্প বলছে। তাদের বংশে কোন মানুষ কোন দিন স্বপ্ন দেখত না। বুকের মধ্যে একটা হাড় আছে সেই জন্যই মানুষ স্বপ্ন দেখে। সেই হাড় এদের বংশে কোন ছেলের আছে টের পেলে সঙ্গে সঙ্গে উপড়ে ফেলা হত। সবাই তাই কাজের লোক হত। এক দিন এই নায়কের মা বললেন একটা বাক্স নিয়ে আসতে। গল্প চরমে উঠেছে যখন নায়ক বাক্স খুলে দেখে সব শূন্য।

> "আমার সেই মরা মায়ের ডানহাত আস্তে আস্তে তাঁর নিজের বুকের ওপর থেকে উঠে ক্রমে আমার বুকের উপর এসে আস্তে আস্তে আপনার মুঠো খুললে। তার ভিতরে রয়েছে দেখলাম, 'আব্দ আল্লা' লেখা আমার অভিশপ্ত অতি-পুরাতন পূর্বপুরুষের বুকের হাড়।"

'মোহিনী' গল্পটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। একটি পুরোনো ছবির মায়াবী চৌম্বক আকর্ষণই এই গল্পের প্রাণ। "ওই ছবির অন্ধকার ঠেলে ওপারে গিয়ে পৌঁছবার জন্যে, ওই কালোর মাঝখানে যে সুন্দর চোখ, তারই আলোক শিখায় নিজেকে পতঙ্গের মতো পুড়িয়ে মারবার জন্যে আমার দেহ-মন আবেগে থরথর করে কাঁপত।"

৭

অতীতকাল : পৌরাণিক, কাল্পনিক ও ঐতিহাসিক গল্প

পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে অনেকেই গল্প লেখেন। কিন্তু সেইসব গল্পের মধ্যে কোন নিজস্ব বক্তব্য বা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নেই। তা রামায়ণ মহাভারত বা পৌরাণিক কাহিনীগুলির সংক্ষিপ্তসার মাত্র। দীনেশচন্দ্র সেন এই দিক থেকে পৌরাণিক গল্পের সম্ভাবনার দিকটি দেখিয়েছিলেন বলা যেতে পারে। তাঁর ভয়-ভাঙা (১৯২৩) একটি বৈষ্ণব কাহিনী। ঠিক গল্প বলা চলে না। জটিলা কুটিলার দর্পভঙ্গ অংশটি শুধু গল্পের বিষয় হলে হয়ত কাহিনীটি সার্থক হতে পারত। আচার সর্বস্বতার বিরুদ্ধে প্রেমের জয়—এই গল্পের প্রতিপাদ্য। দীনেশচন্দ্রের 'ধরাদ্রোন', 'কুশধ্বন' ও 'জড়ভরত' তিনটিই ভালো গল্প। তবে আধুনিক কালে ছোটগল্পের যে একমুখিতা ও বাহুল্যহীনতা বিশেষ গুণ তা এই গল্পগুলির মধ্যে নেই। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত নেই, চরিত্র সৃষ্টির চেষ্টা নেই। তবুও ইদানীং যে পৌরাণিক গল্প লেখার চেষ্টা দেখা গেছে সুবোধ ঘোষের 'ভারতপ্রেম কথা'য় সেই ধারার আদিতে দীনেশচন্দ্রের স্থান তা স্বীকার করতে হবে।

কাল্পনিক ঐতিহাসিক কাহিনী অনেক লেখকই লিখেছেন। সেখানে ঐতিহাসিক ঘটনাও নেই। কিন্তু ইতিহাসের ছদ্মবেশ আছে। কাঞ্চনমালা দেবীর অনেকগুলি কাহিনীই তাই। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'কুমার রাজার গড়', 'নর্তকীর কূপ' ইত্যাদি এই ছদ্মবেশী ইতিহাস। ঐতিহাসিক কাহিনী বাংলায় উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠদশক থেকেই পূর্ণ বিকশিত হয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সফল স্বপ্ন ও অঙ্গুরীয় বিনিময় দুটিই সার্থক রচনা। অতঃপর বঙ্কিমের হাতে ঐতিহাসিক উপন্যাস আরো ব্যাপকতা লাভ করে। তারপর থেকে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা বাংলাদেশে প্রায় ফ্যাসানে পরিণত হয়। সেই তুলনায় ঐতিহাসিক গল্পে কম লেখকই হস্তক্ষেপ করেছেন। শ্রীশ মজুমদার 'ভীম চুল্‌হা' নামে একটি গল্প সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় লিখেছেন। গল্পটি সার্থক নয়, তবে সিপাহী বিদ্রোহের সম্পর্কে যে ছোটগল্পধারা বাংলায় ইদানীং পুষ্টিলাভ করছে এই গল্পটি সেই ধারার পূর্বসূরী মাত্র। সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ম্যাথু আর্নোল্ডের অনুসরণে সোরাব ও রুস্তম কাহিনীটি লেখেন। তা কাহিনী বিবৃতি মাত্র। কিন্তু তিনি সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় 'চিত্ররেখা' নামে যে গল্পটি লেখেন তা উচ্চশক্তির পরিচয় বহন করে। এক ইংরেজ বালিকার মমত্ব ও হৃদয়ের গভীরতা জাতিবৈরতার ঊর্ধ্বে হিংসার ঊর্ধ্বে ধ্রুবতারার মত শান্ত জ্যোতি বিকীরণ করছে। যে মানবিক অনুভূতির প্রকাশ সাহিত্যিক সুন্দর ও মহৎ করে তা এই গল্পের মধ্যে প্রকাশিত। এই মানবিক অনুভূতির প্রকাশ তাঁর 'রাজপুত্তানি' গল্পে। একদিন অমরকুমারের

সংগে পান্নার ভালবাসা ছিল। বিবাহের কথাও ছিল। কিন্তু সেদিন অমরকুমার পান্নাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। অমরকুমার অন্ধ হয়ে গেল। পরে এক সন্ন্যাসীর ঔষধে সে চোখ ফিরে পেল। পান্নাকে সে বিবাহ করতে চাইল। কিন্তু আজ পান্না আর রাজী নয়। অমররকুমার ফিরে চলল।

> "জনহীন প্রান্তর। পাখীরা কলকণ্ঠে ভোরে সানাই বাজাইতেছে। মিলিত অথচ বিচ্ছেদ কাতর দুইজনে নিঃশব্দে চলিয়াছে কাহারও মুখে একটিও কথা নাই—মিলন সুধা সাগরের তীরে আসিয়া আবার শূন্যকক্ষে ফিরিতে হইবে—হায়।"

সুরেশ সমাজপতিও দুটি আধা-ঐতিহাসিক আধা-কাল্পনিক গল্প লেখেন। ১২৯৮ বঙ্গাব্দে সাহিত্যে 'শোকবিজয়' ও 'লালসা ও সংযম' নামে দুইটি গল্প প্রকাশিত হয়। 'লালসা ও সংযম' একটি বৌদ্ধ কাহিনী। এই মূল কাহিনী অবলম্বন করেই রবীন্দ্রনাথের 'অভিসার' কবিতার জন্ম। 'শোকবিজয়' কাহিনীটিও বৌদ্ধ। কিশা গৌতমী নিজের মৃতপুত্র নিয়ে বুদ্ধের চরণে এসে বললেন এর প্রাণ ফিরিয়ে দিতে হবে। বুদ্ধদেব বললেন, যে বাড়িতে কোন শোক, কোন মৃত্যু নেই এমন বাড়ি থেকে কয়েকটি সর্ষপ নিয়ে এস। কিশা গৌতমী দ্বারে দ্বারে ঘুরলেন—কিন্তু দেখলেন সব বাড়িতেই শোক, সব বাড়িতেই মৃত্যু হয়েছে। তখন তিনি বুদ্ধের চরণে এসে দীক্ষা নিলেন। সুরেশচন্দ্র সংযমের সংগে কাহিনী বর্ণনা করেছেন—

> "সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ভংগ করিয়া বুদ্ধদেব বলিলেন, ঐ দেখ। নগরের গৃহে গৃহে যে দীপগুলি এতক্ষণ জ্বলিতেছিল, তাহারাও নিভিয়া গেল। কল্যাণী, মানবজীবন ওই দীপশিখার মত ক্ষণস্থায়ী। তাহারা ক্ষণকালের জন্য জ্বলিয়া ওঠে, কিয়ৎকাল আলোক বিস্তার করিয়া অবশেষে ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়া যায়।"

ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় (১৮৬৫-১৯৩২) 'ইতিকথা' (১৯০৬) নামে একটি সুখপাঠ্য গল্পগ্রন্থ লেখেন।১ তাঁর রচনারীতি কিছুটা নীরস তবে কোন কোন ক্ষেত্রে দরদের দ্বারা তিনি ভাষার ত্রুটির ক্ষতিপূরণ করেছেন। 'বৌঠাকুরাণীর হাট', 'কল্যাণেশ্বরী', 'প্রেমের জয়' বিশেষভাবে উপভোগ্য গল্প তবে তাঁর লেখায় কল্পনার অভাব এত বেশী যে কিংবদন্তী বা লোককথাগুলি গল্পের রূপ ধারণ করতে পারেনি। তাই সত্যকার অতীতচারণ তাঁর লেখায় নেই। এইদিক থেকে সার্থক লেখক হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (১৮৬২-১৯৩৮)। অতীত জীবনকে তিনি ভালবাসতেন। ইতিহাসের বিরাট বিরাট ঘটনার অন্তরালে যে মানবরস পুঞ্জিত আছে তাকেই তিনি

১। ভূমিকায় বলেছেন "কালিদাসের পুরূরবা 'বেদভ্যাস জড়' ব্রহ্মাকে উর্বশীর স্রষ্টা বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। সেইরূপ সুললিত কথা কঠোর ঐতিহাসিকের লেখনী হইতে বিনির্গত হওয়া সম্ভবপর নহে।"

সাহিত্যে রূপ দিয়েছেন। বলাই বাহুল্য তিনিও এযুগের অনেকের মতই বঙ্কিমের কাছ থেকে তাঁর দীক্ষা নিয়েছিলেন।

তাঁর গল্প গ্রন্থ অনেক। তারমধ্যে 'রূপের মূল্য' (১৩২১), ছায়াচিত্র (১৩০৮) ও পঞ্চপুষ্প (১৩০৯) প্রধান। পঞ্চপুষ্পে পাঁচটি গল্প, রূপের মূল্য গ্রন্থে সাতটি গল্প আছে (সেই সাতটির তিনটি পঞ্চপুষ্প থেকে নেওয়া)।১ হরিসাধন ব্যক্তিগত-ভাবে ইতিহাস সম্পর্কে অত্যন্ত কৌতূহলী ছিলেন, 'ভারতীতে তিনি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখতেন। ঐতিহাসিক জ্ঞানের সঙ্গে কল্পনাবোধ যুক্ত হয়েছিল তাঁর—তাই তাঁর গল্পগুলি প্রাণবন্ত।

তাঁর 'আলেখ্য' গল্পটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এক শ্রেষ্ঠীর কন্যা তিলোত্তমা। তার সঙ্গে ভাগ্যহত রঞ্জনের ভালবাসা হয়। কাহিনীর পটভূমি দিল্লী। রঞ্জন প্রেমে ব্যর্থ হয়ে দিল্লীতে এক বন্ধুর আশ্রয় নেয়। রঞ্জন উৎকৃষ্ট ছবি আঁকতে পারত। সম্রাট আকবর দরিদ্রবেশে সেখানে এসেছিলেন তাঁর ছবি আঁকাতে। ধীরে ধীরে আকবরের সঙ্গে রঞ্জনের বন্ধুত্ব হল—কিন্তু রঞ্জন জানতে পারল না যে তিনি ভারত সম্রাট আকবর। সম্রাট আকবরের রাজপোষাকের তলায় যে মানুষ হৃদয় ছিল তাকে আবিষ্কার করেছেন হরিসাধন। রঞ্জন যেদিন আকবরকে দেখলে, "স্বর্ণ ও হীরক খচিত বাসে পরিভূষিত, শূন্য মস্তকে দীপ্তিমান উষ্ণীষ মলিন বস্ত্রাবৃত কটিদেশে মণিখচিত তরবারি, কর্ণে সুন্দর মুক্তাময় বীর কৌলি, মুখে তেজ, প্রতিভা, দীপ্তি, ঐশ্বর্য একাধারে বিরাজমান" সেদিন সে ভয় পেয়েছিল কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পেরেছিল সেই রাজপোষাকের অন্তরালে তার বন্ধু তারজন্য অপেক্ষা করছে।

'রুধিরোৎসব' কাহিনী শাহসুজার জীবনের একটি ঘটনা। নারীর প্রতিহিংসা-পরায়নতা কী সাধন পথে অগ্রসর হয়েছে রত্নময়ীর চরিত্রে তা দেখা যায়। চরিত্র বিশ্লেষণে হরিসাধন সার্থক। "লালবারদোয়ারী" গল্পে রাজপুত শৌর্য ও আত্মসম্মানের কাহিনী। সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিতে লেখা 'একটি স্মরণীয় ঘটনা' প্রমথনাথ বিশীর 'চাপাটি ও পদ্ম'কে স্মরণ করায়। এক বালিকা দুই সাহেবের হাত থেকে বলেছিল যে তারা ১৪ই মে মারা যাবে। শেষপর্যন্ত তারা সত্যই ১৪ই মে মারা গেল। মৃত্যুর অনাগত ছায়া গল্পের আকাশকে অব্যর্থ ও অনিবার্য ভয়ে ভরিয়ে রেখেছে। নিয়তির অলক্ষ্য বিধানের মত মৃত্যু ঠিক সময়ে এল। সেই বালিকা যেন জীবনের অধিষ্ঠাত্রী নিয়তির রঙ্গমঞ্চের পর্দা তুলে পলকের জন্য ভবিতব্যকে দেখতে পেয়েছিল—সেই ভয়াবহ শিহরণে গল্পটি ভরা। হরিসাধনকে

১। হজরতের মাণিক, আলেখ্য, রুধিরোৎসব, লালবারদোয়ারী, কল্যাণী, মন্দির, ভবিতব্য।

আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের সার্থক ঐতিহাসিক গল্প লেখকদের পূর্বসূরী বলা চলে।

এইপ্রসঙ্গে বিজয়চন্দ্র মজুমদারের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।১ তাঁর অনেকগুলি গল্পই প্রাচীনকালের পটভূমিতে। লেখক নিজে ছিলেন ইতিহাস-বেত্তা এবং প্রাচীন ইতিহাসের প্রতি ছিল বিশেষ কৌতূহল। ভারতীয় ইতিহাসের নানাতথ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে আবিষ্কৃত হতে থাকে। সেই সব নূতন তথ্য বহু ঐতিহাসিক রসিককে কল্পনার সুযোগ দিয়েছিল। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিই তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বিজয়চন্দ্রও সেই নব নব তথ্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। কানিংহাম আবিষ্কৃত একটি মুদ্রা অবলম্বন করে তিনি 'লজ্জাবতী' গল্পটি লেখেন। দেবপালের সময়ের বাংলাদেশ, আদ্রিদেবের সঙ্গে যুদ্ধ, বিগ্রহ পালের সঙ্গে রাজকন্যা লজ্জাবতীর বিবাহ—তাঁর কল্পনাকে বিস্তার লাভেই সুযোগ দিয়েছে। খৃীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে কেরল দেশে বহু ইহুদী আশ্রয় নিয়েছিল—এই ঘটনা অবলম্বন করে তিনি 'কল্যাণী' গল্পটি লেখেন। ক্ষত্রপবংশীয় রাজা রুদ্রদামনের প্রেমের কাহিনী। রুদ্রদামন সারা নামে একটি কেরল কন্যার প্রেমে পড়েন। প্রথম তাকে তিনি দেখেন এক ঝরণার ধারে। প্রথম দর্শনের ও রাজার বিহ্বলতার চিত্রটি কৌতুককর ঃ

> যুবরাজ ধীরে ধীরে সুন্দরীর কাছে ঘনাইয়া গিয়া দাঁড়াইলেন. এবং খুব নরমসুরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে সকলেই কি ঝরণার জল খায় ? সুন্দরী, প্রশ্নকর্তাকে বেশ করিয়া দেখিয়া লইলেন এবং হাসিয়া বলিলেন পিপাসা হয়েছে কি? পিপাসা অতিশয়; রূপের ঝরণায় লাবণ্যের জল তক্‌তক করিয়া খেলিতেছিল। যুবরাজ কহিলেন হাঁ। সুন্দরী তখন বস্ত্র মধ্য হইতে একটি ছোট পানপাত্র বাহির করিয়া একখানি ক্ষুদ্র বস্ত্রে জল ছাঁকিয়া দিলেন। যুবরাজ যদি জলটুকু না খাইয়া মাথায় দিতেন, ভাল হইত—

ইতিহাসের ঘনঘটার অন্তরালে মানুষের হৃদয়ের কাহিনীই যদি ঐতিহাসিক গল্পের প্রাণ হয়—তাহলে বিজয়চন্দ্র ঐতিহাসিক গল্প রচনা করেছেন সন্দেহ নেই। তবে গল্প হিসেবে তার ত্রুটি অনেক। বিশেষত চরিত্রগুলি অনেক সময় অত্যন্ত বেশী আদর্শায়িত, ঘটনাগুলি অতিরিক্ত নাটকীয় এবং কাহিনীগুলি অনেক সময়ে অকারণে পরিণাম রমনীয়। 'চপলা' গল্পটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। গুপ্তবংশের যুবরাজ চন্দ্রগুপ্তের জীবনের কাহিনী। তিনি চপলা নামে একটি মেয়েকে কুড়িয়ে

১। 'কথা ও বীথি' (১৮৯৩) এবং 'কথানিবন্ধ' (১৯০৫) দ্রষ্টব্য।

পান। সেই মেয়েটি তাঁর প্রিয়বয়স্য মন্ত্রীপুত্র বিশ্বকর্মাকে ভাল বাসে। কাহিনীর শেষ হয় বিশ্বকর্মা ও চপলার বিবাহে ও শেষদৃশ্যে চপলা ও তার সন্তানকে দেখিয়ে লেখক কাহিনী সমাপ্ত করেছেন। 'মণিমালা' গল্পেও লেখক অকারণে কাহিনীকে প্রলম্বিত করেছেন। কাহিনীর কাল সপ্তম শতাব্দী, কর্ণসুবর্ণের রাজা তখন শশাঙ্ক। রাজ্যবর্ধনের কন্যা মণিমালা এই কাহিনীর নায়িকা। সে বালবিধবা। সোমদত্ত তাকে ভালবাসে। আত্মসংবরণের জন্যই মণিমালা ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণ করল। তার অল্পদিন পরেই রাজ্যবর্ধন যুদ্ধে মারা গেলেন। সোমদত্ত ভিক্ষু হয়ে মণিমালার কাছে কাছে থাকতে চাইল—ও নানা জটিল অবস্থার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত মণিমালা সোমদত্তকে বিবাহ করল। এই কাহিনীটির গল্প হিসেবে সম্ভাবনা ছিল সবচেয়ে বেশী। ভিক্ষুণীর জীবন ও প্রেমের দুর্নিবার আকর্ষণ এই গল্পকে অন্তত কঠিন ঐক্য দিতে পারত। কিন্তু লেখক অকারণে ঐতিহাসিক পটভূমিকার ওপর জোর দিয়েছেন। রাজ্যবর্ধন ও শশাঙ্কের অস্তিত্বের কোন প্রয়োজন গল্পের দিক থেকে ছিল মনে হয় না। আবার মণিমালা ও সোমদত্তের পক্ষে রাজ্যবর্ধনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ারও কোন শিল্পগত প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ ইতিহাস এবং গল্প—আলাদা আলাদা স্তরে বিভক্ত হয়ে গেছে। 'অনঙ্গপ্রভা', 'কণ্ঠুকা' প্রভৃতি গল্পেরও ত্রুটি এই গঠনগত।

তবুও এই সমস্ত গল্প বাংলা ছোটগল্পের একটি ধারাকে সঞ্জীবিত থাকতে সাহায্য করেছে। অতীত জীবনাশ্রয়ী কাহিনী, ঐতিহাসিক কাহিনী বা পৌরাণিক কাহিনী আজও বাংলাদেশে রচিত হচ্ছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী এবং সুবোধ ঘোষ প্রভৃতি লেখকেরা এই ধারাকে পরিপুষ্ট করেছেন। এঁদের পূর্বসূরী আমাদের আলোচিত লেখকরা।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

॥ সংগ্রাম ও সমন্বয় ॥

আধুনিক যুগের গোড়া থেকেই দুটি স্পষ্ট ধারা দেখা গেছে একটি রক্ষণশীল ও অন্যটি আধুনিকতাবাদী প্রগতিশীল দল। বাংলা ছোট গল্পের মধ্যেও এই দুই দলের সংগ্রাম স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রক্ষণশীল দল যা কিছু প্রাচীন তাকেই শ্রদ্ধায় ও সংস্কারে রক্ষা করতে চেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ কোন ব্যাপারে আধুনিকতাকে মেনে নিয়েছেন আবার কোন কোন ব্যাপারে মানেন নি। রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে একদল নবীন লেখকের সৃষ্টি হয়েছিল তাঁদের সঙ্গে এই বিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে। এই দ্বন্দ্ব প্রথম স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে 'সাহিত্য' পত্রিকায়। তারপর 'ভারতী'কে আশ্রয় করে এক নতুন লেখকগোষ্ঠির জন্ম হয়—তখন এই দ্বন্দ্ব আরো তীব্র হল। অবশেষে 'সবুজপত্র' আধুনিকতার পতাকা উড়িয়ে দিলেন।

বাংলা সাহিত্যের এই চিন্তার আন্দোলনের ইতিহাসকে বুঝতে গেলে দুই পক্ষেরই মানসিকতাকে বুঝতে হবে। কারণ এই মানসিক পটভূমির মধ্যেই বাংলা ছোট গল্পের একটি বৃহৎ অংশের জন্ম। রক্ষণশীলতার অর্থ হল সামাজিক ও ব্যক্তিজীবনের সমস্যাগুলিকে প্রাচীন ও চিরাচরিত রীতিতেই সমাধান করার চেষ্টা ও নতুন কিছুর প্রতি উদাসীনতা ও অবজ্ঞা। রক্ষণশীলতার অর্থ হল প্রাচীনত্বের প্রতি অন্ধ শ্রদ্ধা ও নতুনত্বের প্রতি উপেক্ষা। রক্ষণশীলতার অর্থ হল সাহিত্যেও পুরোনো বিষয়, পুরোনো রীতি ও পুরোনো আঙ্গিককে চরম বলে মানা। এবার কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে এই রক্ষণশীলতাকে স্পষ্ট করা যেতে পারে। যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'সমাজচিত্র' গ্রন্থের গল্পগুলি এই রক্ষণশীলতার সর্বাঙ্গীন পরিচয়বহ। তাঁর কাহিনী গঠনের আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণেই তাঁর চরিত্র সৃষ্টি এবং হিন্দুধর্ম ও নীতি সম্পর্কিত চিন্তা গল্পকে আচ্ছন্ন করেছে। তিনি নায়িকা সূর্যমুখীকে বলছেন, "সূর্যমুখী, এখন তুমি সকলের নিকটেই কলঙ্কিনী। যে স্ত্রী-স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষকে মনে মনেও চিন্তা করে, সে কলঙ্কিণী।" সূর্যমুখীর প্রতি তাঁর এই বচন যে অন্যায় তা আমাদের বক্তব্য নয়, কিন্তু একথাও সত্য যে নারীর তথা মানুষের হৃদয় রহস্যের প্রতি কৌতূহল বা নারীর জীবনের দ্বন্দ্বের প্রতি সহানুভূতি বা মানুষের দোষেগুণে ভরা জীবনকে তিনি সহৃদয়তার সঙ্গে বিচার করতে চাননি। একেই বলছি রক্ষণশীলতা।

যোগেন্দ্রনাথের এই প্রতিক্রিয়ার ছবি স্পষ্ট তাঁর 'বালবিধবার সুখ' গল্পে।

সরলা অল্পবয়সে বিধবা হয়েছিল। তার প্রেমিক মন্মথ তাকে বিবাহ করতে চায়। কিন্তু সরলার বাবা এই বিবাহের বিরুদ্ধে কারণ তাঁর মতে বিধবা বিবাহ হিন্দুশাস্ত্র বিরুদ্ধ। বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রজ্ঞানও তাঁর শ্রদ্ধার বিষয় নয়। লেখক নিজে উত্তেজিত মন্মথকে ধিক্কার দিয়ে বলেছেন, "পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় আলোকিত মন্মথের ব্যথিত হৃদয়ে তখন হিতাহিত জ্ঞান ছিল না, আর ইংরাজী শিক্ষিত শাস্ত্রঅনভিজ্ঞ হিন্দুশাস্ত্রকারগণের যে মহান উদ্দেশ্য কি বুঝিবে।" এবং সেই "মহান উদ্দেশ্য" বোঝাবার জন্যই শেষ পর্যন্ত তিনি মন্মথকে কাশীবাসী করেছেন এবং সে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করল।

> "যদি পৃথিবীতে কোন ধর্ম থাকে তবে সে একমাত্র হিন্দুধর্ম। আর বালবিধবা সরলা যথার্থই বলিয়াছে যে হিন্দুর দেশে ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছে বলিয়া তাহার সেই অবস্থাতেও সে কত সুখী।"

এই ধর্ম গৌরব, শুধু যোগেন্দ্রনাথের নয়, একদল লেখকের প্রধান বিষয়। যদিও এই ধর্মের দম্ভই অন্য বহু লেখকের ব্যঙ্গ ও আঘাতের সামগ্রী। মানুষের আনন্দ-বেদনার চারিপাশে প্রাচীরের মত যে সংস্কার ও লোকাচার, অন্ধভাবে তার অধীনতা স্বীকারের মধ্যে যে চারিত্রিক দীনতা ও মানসিক ক্ষুদ্রতা আছে, সেই দীনতা ও ক্ষুদ্রতাই এই রচনাগুলির আয়ুঃকাল অতি সীমিত করে দিয়েছে। এই লেখকই তাঁর অন্য একটি গল্পে (হরগৌরী মিলন) হিন্দুধর্মের আটরকম বিবাহপ্রথা ব্যাখ্যা করেছেন ও "আমাদের বিবাহপদ্ধতির মতন এমন সুন্দর পদ্ধতি আর কোন দেশের কোন জাতির মধ্যে নাই"—এই ভেবে গর্ববোধ করেছেন। কূপমণ্ডুক মনোবৃত্তির এই পরিচয় এঁদের গল্পে।

এই চরমপন্থা অবশ্য সকলে গ্রহণ করেননি। সাধারণত বেশীর ভাগ লেখকের মধ্যেই প্রাচীন ও আধুনিক, ধর্ম ও হৃদয়, ভারতবর্ষ ও বিশ্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে। কেউ কেউ কোনরকমে নবীনের সঙ্গে সন্ধি করেছেন, কেউ কেউ পারেননি। কিন্তু নবীনকে সম্পূর্ণকে অস্বীকার করে, যুগ ও কালকে তুচ্ছ করে কেউই সেই অতিপ্রাচীন সনাতন ভারতীয় আদর্শের প্রতি সম্পূর্ণ দ্বিধাহীনভাবে আত্মসমর্পণ করেননি। ১৩০৩ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য' পত্রিকার নগেন্দ্রনাথ শর্মার 'অবরোধ' নামে একটি গল্প উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই গল্পের বিষয় বিধবার প্রেম। এখানে লেখকের সহানুভূতি গভীর। মানবিক বৃত্তিগুলির জন্য মমতা অনেক বেশী। কিন্তু সমাজশাসনের কাছে লেখক সত্তা সন্ধি করেছে। বিধবা গৌরী ও মুকুন্দমোহনের প্রেমের ছবি মধুর ও আবেগদীপ্ত। কিন্তু যে রাত্রে মুকুন্দ লুকিয়ে গৌরীর সঙ্গে দেখা করতে গেছে সে রাত্রেই দুজনের মৃত্যু হয়েছে। সেই রাত্রির বর্ণনায় লেখক চিত্ত উচ্ছ্বসিত কিন্তু অন্যদিক গৌরীর মৃত্যু হচ্ছে পিতার পদাঘাতে। অর্থাৎ মর্তলোকে এই প্রেমের কোন স্থান নেই। এই গল্পটি তখনকার

দিনের এক স্বল্পখ্যাত লেখকের হলেও সমকালীন সাহিত্যিক মানসিকদ্বন্দ্বের পরিচয়বহ। এই দ্বন্দ্বের আরেকটি উদাহরণ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের 'প্রণয়ের পরিণাম' (সাহিত্য ১৩০৬ বৈশাখ) গল্পটি। নগেন্দ্রনাথের গল্পের বিষয় ছিল বিধবার প্রেম—হেমেন্দ্রপ্রসাদের গল্পের বিষয় পূর্বরাগ। একটি বাঙালী ছাত্র সিংহগড়ে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানকার নির্জন পরিবেশে, মানসিক নিঃসঙ্গতার মধ্যে একটি মহারাষ্ট্রীয় কন্যার সঙ্গে তার আলাপ। সেই মেয়েটিকে সে ভালবেসেছে। কিন্তু এই ভালবাসার কোন রমণীয় পরিণাম নেই। পিতার আপত্তির ফলে ছেলেটি বিয়ে করতে পারল না। সামাজিক বাধার ফলে ব্যক্তির স্বাধীন প্রেম বাধাগ্রস্ত। লেখক কিন্তু এই সামাজিক বাধাকে ধিক্কার দিতে পারেননি। তিনি শুধু সেই সিংহগড়ের ঐতিহাসিক স্মৃতি পরিকীর্ণ এক ভাবজগতে বন্দিনী নারী হৃদয়ের নীরব প্রীতি স্মরণ করে বেদনার্দ্র হয়েছেন।

বিভিন্ন লেখকের মানসিকতা বিভিন্ন। তাই তাঁদের মানসিকদ্বন্দ্ব ভিন্ন ভিন্ন খাতে বয়েছে। একদিকে যোগেন্দ্রনাথ একরকম প্রতিক্রিয়া করেছেন—অন্যদিকে হেমেন্দ্রপ্রসাদের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন। সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সোনারপদ্মা' গল্পে চরমপন্থী রক্ষণশীলতাকে সমর্থন করেছেন। তিনি প্রাচীন হিন্দু সমাজ ব্যবস্থা ও আচার ব্যবহারের সঙ্গে আধুনিক ইংরেজি আচাব-ব্যবহার তুলনা করেছেন। মনোরমা হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে। তার বিয়ে হল আধুনিক শিক্ষিত সুরেশ্বরের সঙ্গে, যার বিশ্বাস

> "ঈশ্বর দেবদেবী ধর্ম ও সব কিছুই নহে। মানবজাতি প্রথম অবস্থায় যখন অজ্ঞানের গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন ছিল, সেই সময়েই তাহারা ঐ সকল কুসংস্কারের দাস হইয়া পড়িয়াছিল, পরে কতকগুলা স্বার্থপর লোক নানা কৌশলে তাহাদের সেই সকল কুসংস্কারকে বদ্ধমূল করিবার উদ্দেশ্যে জগতে কতকগুলা গাঁজাখুরী মতের সৃষ্টি করিয়াছে।"

ধীরে ধীরে মনোরমার সংস্পর্শে এসে তার চিন্তা বদলাল। মনোরমা হিন্দু আদর্শের প্রতীক। সে সংস্কৃত চর্চা করে, শিবপূজা করে, ধর্ম মানে, স্বামীকে শ্রদ্ধা করে। পরজন্মে বিশ্বাস করে। গল্পের শেষে দেখা গেল "সুরেশ্বর এখন আর বিবাহকে কেবল যৌন সম্মিলন চলে না; বিবাহের যে এক গভীর, মহান পবিত্র উদ্দেশ্য আছে, তাহা স্বীকার করে। পরজন্ম, পরকালেও তাহার যেন কতকটা বিশ্বাস হইয়াছে।" এই গল্প থেকে বোঝা যায় যে যোগেন্দ্রনাথ বা সরোজরঞ্জন উগ্র রক্ষণশীল। আর নগেন্দ্রনাথ হেমেন্দ্রপ্রসাদ তাঁদের তুলনায় আধুনিক। সরোজরঞ্জন রবীন্দ্রনাথকেও আক্রমন করেছেন 'প্রত্যাগমন' গল্পে এক প্রাচীন নারীচরিত্রের মুখ দিয়ে :

> "এবার কলকাতায় গিয়ে একখানা বই পড়লুম, তাতে আমাদের হিন্দু সমাজের স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ বিদ্রূপ করা হয়েছে, এমনকি, প্রকারান্তরে

সীতাদেবীর১ চরিত্রে পর্যন্ত কটাক্ষ করা হয়েছে...হিন্দুর বংশে জন্মে একথা লিখলে কি করে ?"

তাঁর "নিষ্করুণ বাঙ্গালী" গল্পে নারীর প্রতি পুরুষের অত্যাচারকেও তিনি অস্বীকার করেছেন। বলাই বাহুল্য এই নীতি বা আদর্শ প্রচার করতেই এই সব লেখক সব মন দিয়ে ছিলেন—সাহিত্যে রূপসৃষ্টি বা চরিত্র সৃষ্টিই যে সব চেয়ে বড় কথা সে কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন ফলে পরবর্তী পাঠকসমাজও এঁদেরও বিস্মৃত হয়েছে।

এই চরম রক্ষণশীলতার থেকে যে সব লেখা জন্ম নিয়েছিল তার অধিকাংশই আজ লুপ্ত। কিন্তু একথাও সত্য যে সামাজিক সংস্কার অনেকক্ষেত্রে লেখকে লেখকে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল আর তার ফলে সাহিত্যে একটা জীবন চাঞ্চল্য দেখা গেছে। প্রমথ চৌধুরী যখন প্রসপের মেরিমে'র ফুলদানী গল্পটি অনুবাদ হিসেবে প্রকাশ করলেন তখন সেকালের পক্ষে আধুনিক 'সাধনা' পত্রিকাতেই প্রতিবাদ উঠল, "গল্পটি যদিও সুন্দর কিন্তু বাঙ্গলা অনুবাদের যোগ্য নহে।"২ অবশ্য প্রমথ চৌধুরী এই আপত্তিকে স্বীকার করতে পারেননি। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে চরম রক্ষণশীলতা ও চরম আধুনিকতার দ্বন্দ্বের বিষয় এ নয়; আধুনিকে ও আরো-আধুনিকের দ্বন্দ্ব। বিরোধী শক্তিগুলির এই ঘাত প্রতিঘাত ছোটগল্পকে আশ্রয় করে অভিনবভাবে প্রকাশিত হয়েছে। চিত্তরঞ্জনদাশ ছিলেন রবীন্দ্র বিরোধী। অথচ তাঁর 'ডালিম' গল্প তখনকার দিনের পক্ষে অতি আধুনিক, এবং সেজন্য তিনি তিরস্কৃতও হয়েছেন সমালোচকদের কাছে। বিরোধ যখন আন্তরিক হয় তখন তার মধ্যে থাকে সৃষ্টির প্রেরণা।

অধিকাংশ লেখক অবশ্য কতকগুলি বাঁধা বিষয় ও বাঁধা আঙ্গিক নিয়েই গল্প রচনা করছিলেন। সরোজনাথ ঘোষ-এর নাম এই প্রসঙ্গে স্মরনীয়। বহু গল্পই তাঁর বিভিন্ন পত্রিকায় বেরিয়েছে। 'মস্তকের মূল্য' নামে একখানি গল্পগ্রন্থ ১৯০২ খৃঃ অব্দে বেরিয়েছে। তিনি কোনদিনই বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন মনে হয়না। সমকালীন সমালোচকেরা ভাষার জন্য তাঁকে তিরস্কারও করেছেন যথেষ্ট।৩

১। রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে"
২। সাধনা। ১২৯৮, অগ্রহায়ণ। পৃঃ ৮৮
৩। ১২০৭, আষাঢ় মাসে 'নির্মাল্য' পত্রিকায় তিনি 'শাস্তি' নামে যে গল্পটি লেখেন তার সম্পর্কে 'সাহিত্যে' সমালোচনা হয় "প্রশংসা করিতে পারিলাম না। সভীত-কম্পিত হৃদয়ে, সভীতকণ্ঠে প্রভৃতি ভাষা বর্জনীয়।"

তাঁর রচনা প্রধানত নীরস। তাঁর গদ্য আড়ষ্ট। তাঁর লেখা প্রধানত দুটি নীতি আশ্রিত। তাই তাঁর ঘটনা বর্ণনা থেকে আমরা যে পরিমাণ বিচলিত হই সে পরিণাম রসাপ্লুত হই না। তার 'কুলরক্ষা'১ গল্পটি তাঁর প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা। এই গল্পে ষষ্ঠীচরণ ও কমল এক গ্রাম্য প্রেমের নায়ক-নায়িকা। কিন্তু তাদের বিবাহ হল না। গ্রামের জমিদার ও দুষ্ট এক ব্রাহ্মণের প্ররোচনায় এক ভয়াবহ নারীমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হল—কমলের বিয়ে হল বা বিয়ে দেওয়া হল বয়স্ক দুষ্ট ব্রাহ্মণের সঙ্গে। এই ব্রাহ্মণটি আপাদমস্তক ভিলেন। এই ভিলেনের আবির্ভাব হয়েছে আবার তাঁর 'ঋণমুক্ত' গল্পে।২ এখানে হরিচরণ ও রামচরণ দুই জ্ঞাতি জমিদার ফলে স্বভাবতই তাদের মধ্যে প্রবল রেষারেষি। এই সব রেষারেষির যা অবশ্যম্ভাবী ফল তা হল। রামচরণ কৌশলে হরিচরণকে এক মিথ্যে খুনের মামলায় জড়িয়ে ফেলল। রামচরণ একটি সম্পূর্ণ হৃদয়হীন ভিলেন বিশেষ। এই রামচন্দ্রের বাড়িতেই পরে একদিন আগুন লাগল, সেদিন হরিচরণ তার স্ত্রীকে বাঁচাল। এই হল ঋণমুক্তি। পাপকে তীব্র করে, দুর্নীতিকে মূর্তিমান করে হয়ত দেখানোই উদ্দেশ্য ছিল সরোজনাথের কিন্তু মানুষের কোনও অনুভূতিই সম্পূর্ণ মৌলিক কিনা সন্দেহ তার মধ্যে অন্য অনুভূতির কিছু কিছু মিশ্রণ থাকে। পাপ সম্পূর্ণভাবেই কলঙ্কিত, সম্পূর্ণভাবেই ঘৃণ্য এইভাবে চিত্রিত করা একধরণের আতিশয্য। কারণ সাহিত্যের বিষয় পাপ বা পুণ্যে নয়, বিষয় মানুষ—যে মানুষ পাপ ও পুণ্য উভয়েই লীন, উভয়েরই সঙ্গেই লিপ্ত। অবিমিশ্র ভাল ও অবিমিশ্র মন্দ—এই যে মানুষ সম্পর্কে ধারণা এটাই প্রাচীন সংস্কারের প্রতি আনুগত্য।

'প্রতিক্রিয়া' গল্পটি আকর্ষণীয়। এক অসামান্য কৃতী অধ্যাপক হঠাৎ অলকাকে বিবাহ করল। এই বিবাহ-ই তার জীবনে রাহুর সংকেত। অলকা তার আগের স্বামীকে পরিত্যাগ করে সুব্রতকে বিবাহ করেছিল। এই বিবাহ হয়েছিল হিন্দুমতে। এই বিবাহের ফলে সুব্রতকে সবাই পরিত্যাগ করল। তার চাকরি গেল। কোন জায়গাতেই সে চাকরি পেলনা—কারণ সে চরিত্রভ্রষ্ট, সে ধর্মভ্রষ্ট। অবশেষে এই অলকাও তাকে পরিত্যাগ করে পালাল। অলকা অন্য একটি পুরুষের সঙ্গে চলে গেল। তখন সুব্রতর মনে এল অনুশোচনা। সে ধীরে ধীরে নিজের গত কর্মের জন্য অনুতাপে দগ্ধ হতে লাগল। অবশেষে সে সন্ন্যাস গ্রহণ করল।

গল্প হিসেবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কারণ চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে এমন এক আতিশয্য আছে যা অবিশ্বাস্য বা অমানবিক। অলকা চরিত্র অসম্ভব নয়, তার প্রতি লেখকের ধিক্কারও নিন্দার কথা না হতে পারে—কিন্তু সাহিত্যে চরিত্রগুলির কাজকর্মের পেছনে কারণ

১। সাহিত্য ১৩০৯, পৃঃ ৪২৮
২। সাহিত্য ১৩০৯, পৃঃ ৬৭০

থাকে। শুধু কতকগুলি accidents বা কতকগুলি ঘটনা নিয়ে গল্প হতে পারে না। ঘটনার সঙ্গে ঘটনার যোগ থাকা দরকার। পিরানদেল্লোর একটি নাটকে চরিত্র-গুলি নাট্যকারকে অভিযোগ করেছিল যে তুমি আমাদের যেমন খুশি চালাবার অধিকার কোথায় পেলে। নাট্যকার ব্যাখ্যা করেছেন যে কাহিনীর অন্তর্নিহিত নিয়মেই তারা চলে, লেখক তাদের খুশিমত চালায় না। তাই সুব্রতর সন্ন্যাসী হওয়া, অলকার হঠাৎ চলে যাওয়া অনেকটা accident-এর মত মনে হয়। লেখক অলকাকে পাশে রেখে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রেম ও কামের তুলনা করেছেন। শেষে এক বিদেশী মহিলার দ্বারা ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্র ও বিবাহ প্রথার গুণগান করিয়েছেন। মাঝে মাঝে ধিক্কার দিচ্ছেন ঃ

> "বিংশ শতাব্দীর প্রগতি যুগে মনের ধর্মই শ্রেষ্ঠ। আধুনিক মনীষীরা ঢক্কানিনাদসহ প্রতীচ্য দেশে তাহারই জয় ঘোষণা করিতেছেন। বন্যার প্রবাহ প্রাচ্য দেশের তটভূমিতে আঘাত না করিয়া পারেনা। প্রতীচ্য শিক্ষায় যে মন গড়িয়া উঠিতেছে, রুষিয়ার কম্যুনিজম তাহার কাছে লোভনীয় এবং শ্রেয়ঃ।"

কাহিনীর শেষে বিদেশী মহিলার উপদেশের মধ্যে সরোজনাথের বাণীই প্রকাশিত হয়েছে "তুমি হিন্দুর ছেলে, ভারতবর্ষের পুত্র। তুমি মানুষ হও।"

যেখানেই শিল্পীমন শুধু সমাজের তত্ত্ব নিয়ে অধিক কালক্ষেপন করেননি সেখানেই অপেক্ষাকৃত উন্নততর গল্প রচনা করেছেন। 'কুলগাছ' গল্পটিকে তার উদাহরণস্বরূপ পেশ করা যেতে পারে। এক বৃদ্ধার প্রচণ্ড মোহ ছিল একটি কুল-গাছের প্রতি। তার "সঞ্চিত পুত্রস্নেহ যেন প্রাচীরের মত কুলগাছের চারিপার্শ্বে ঘিরিয়া থাকিত।" গুচ্ছ গুচ্ছ ফল ডালগুলিকে ভারে নুইয়ে দিত কিন্তু বৃদ্ধার সতর্ক সদাজাগ্রত দৃষ্টির প্রহরার সামনে লোলুপ বালকেরা আসতে সাহস করত না। শুধু বিনয় নামে একটি ছোট ছেলেকে বৃদ্ধা বিশেষ স্নেহ করতেন। একদিন পাড়ার ছেলেরা সবাই মিলে কুল চুরি করতে এল। বৃদ্ধার যক্ষেরধন এই গাছ—সে একটি ইট ছুঁড়ে মারল ছেলেদের দিকে। সেই ইট লাগল বিনয়ের গায়ে। বিনয় অজ্ঞান হয়ে গেল। আর এই ঘটনাই বৃদ্ধার জীবনে আনল পরিবর্তন। তার এতদিনের কৃপণের মত ভালবাসা এবার টুকরো হয়ে ছড়িয়ে গেল। এই কুলগাছের জন্য সে শিশুদের অবহেলা করেছিল, ভালবাসেনি। তার বাধা ছিল কুলগাছ। আজ সে কুলগাছ কেটে ফেলল।

সরোজনাথের সঙ্গে সঙ্গে স্মরণীয় মাণিক ভট্টাচার্যের নাম। তাঁর অধিকাংশ গল্পের মধ্যেই নীতির একটি বিশেষ স্থান আছে। তিনি যে সমস্ত গল্প অনুবাদ করেছিলেন তার মধ্যেও নীতিমূলক গল্পের পরিচয় মেলে। তিনি টলস্টয়ের *Twenty-three Tales* নামক ইংরেজী গল্প সংকলনের থেকে কয়েকটি গল্প অনুবাদ করেন। একটি গল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দুটি ছোট ছেলে খেলা করতে

করতে মারামারি করে—সেই নিয়ে তাদের অভিভাবকদের মধ্যে বিরাট বচসা ও ঝগড়া হয়ে যায়, মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়, মারামারি হয় কিন্তু শেষকালে দেখা যায় যে যখন বড়রা মারামারির চরমে পেঁচেছে তখন ছেলে দুটি সকালবেলার মারামারি ভুলে গিয়ে আবার হাত ধরাধরি করে খেলছে। এই গল্পটি, বলাই বাহুল্য, নীতিমূলক। মাণিক ভট্টাচার্য যে বিশেষ করে একটি নীতিমূলক গল্প বেছে অনুবাদ করেন তা নিতান্তই অকারণে মনে হয় না।

মাণিক ভট্টাচার্যের অধিকাংশ গল্পই পাপপুণ্য, নিয়তিতে বিশ্বাস ইত্যাদি ভিত্তিক। তাঁর মার্জনা,১ ধনভাজাং ভীতি,২ নিয়তি৩ প্রভৃতি গল্প তার প্রমাণ। ধনভাজাং ভীতি গল্পটি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

> জনার্দন রায়ের একটি পুত্র সুধাংশু। আর একটি ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীর। সুধীরের বাবা অকালে মারা যাওয়ায় সে জ্যাঠামশাইর কাছেই মানুষ। এখন দুজনেই বেশ বড়। জনার্দন সম্প্রতি সুধীরের ওপর খুব রাগ করেছেন কারণ সুধীর মদ খায়। তিনি তাকে বারবার নিষেধ করেছেন তবুও সে শুনছে না। এদিকে পুত্র সুধাংশু আরো বড় মাতাল, কিন্তু সে বড় সুকৌশলী। সে লুকিয়ে লুকিয়ে মদ খায় এবং তার স্ত্রী এ বিষয়ে তার ডানহাত। তারা দুজনেই ভেবেছিল যে বাবা নিশ্চয়ই সুধীরের প্রতি বিরক্ত হয়েছেন এবং সেজন্যেই তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবেন। কিন্তু শোনা গেল যে তিনি শেষ পর্যন্ত উভয়কেই সমান সমান ভাগ দিয়েছেন। এই কথা শোনার পর সুধাংশু এবং তার স্ত্রী দুজনেই গেল চটে। সেদিন রাত্রে যখন জনার্দন মোহমুদ্গর পাঠ করছিলেন তখন ধনভাজাং ভীতি কথাটার ওপর চোখ আটকে গেল, ভাবলেন এ ঠিক নয়, এ সত্যিই নয়। একটা সন্দেহে তাঁর মন দুলছে। ঠিক সেইসময় তিনি দেখলেন তাঁর বড় ছেলে সামনে দাঁড়িয়ে—তার হাতে রিভলবার, মুখে মদের গন্ধ। তিনি অবাক হয়ে গেলেন। পুত্রের উদ্যত রিভলবারের সামনে তাঁকে উইল বদলাতে হল। শেষ পর্যন্ত জনার্দন সন্ন্যাসী হলে গেলেন।

এই হল গল্পাংশ। লেখক মোহমুদ্গরের একটি বচনের সার্থকতা প্রমাণ করার জন্যই যেন গল্পটি লিখেছেন। ঘটনাগুলি বিশৃঙ্খল ও অতর্কিত। চরিত্রগুলির মধ্যে কোন শিল্পচাতুর্য নেই। গল্পের বক্তব্য নীতিমূলক।

১। বঙ্গবাণী ১৩২৯-৩০, পৃঃ ৫৬২
২। ঐ ১৩৩০-৩১, পৃঃ ৩০৬
৩। বঙ্গবাণী ১৩৩২ জ্যৈষ্ঠ

'নিয়তি' গল্পটি উল্লেখযোগ্য।

রামটহল আওরঙ্গাবাদের ট্রেজারি গার্ড। সরকারী চাকুরী। এখন তার বয়স ৫২। স্ত্রীর সঙ্গেই চিরকাল থাকত। ইদানীং তার স্ত্রী থাকে দেশের বাড়িতে আর সে থাকে দূরে শহরে। বাড়িতে থাকতে তার ভয়। সে ভয়ের ইতিহাস আছে।

তার বিয়ে হয়েছিল ছেলেবেলায়। বহুদিন কেটেছে তারপর। তাদের কোন ছেলে নেই বলে তাই তাদের খুব দুঃখ ছিল। হঠাৎ একদিন জানা গেল তার সন্তান হবে। সে স্ত্রীর যত্নের জন্য অত্যন্ত সতর্ক হয়ে উঠল। সে তুলসীদাসী রামায়ণ শোনাত স্ত্রীকে—যাতে ছেলে ধার্মিক হয়। স্ত্রীকে কোন কাজ করতে দিত না, এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে তার ছোট ছোট ঝগড়া হতেও লাগল। শেষ পর্যন্ত ছেলে হল। তার নাম দেওয়া হল গদাধর। রামটহল তাকে আদরে মানুষ করতে লাগল। পাঠশালায় পাঠানোর সময় গুরুমশাইকে বলে দিলে যেন তাকে মারধর না দেওয়া হয়। এইসময় হঠাৎ রামটহলের এক পরিবর্তন এল। সে সবসময় উন্মনা হয়ে থাকে। প্রথমে তার স্ত্রী পার্বতীর সন্দেহ হল অন্য কোন মেয়ের দিকে টান পড়েনি ত! কিন্তু, তার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তবে কি সন্ন্যাসী হবে—তাও না। কিছুদিন উন্মনাভাবে কাটাবার পর হঠাৎ সে বলল যে আওরঙ্গাবাদে তাকে বদলি করেছে এবং সে সেখানে একাই যাবে। সবাইকে নিয়ে যাবেনা। আওরঙ্গাবাদে ভাল ইস্কুল নেই, গদাধরের পড়াশুনোর অসুবিধে হবে। পার্বতীর কথা, তর্ক ও অশ্রু কিছুই তাকে টলাতে পারল না। সে একা গেল।

দু-বছর সে এখানে আছে। বছরে দুবার করে বাড়ি যায়। বাড়িতে গিয়ে উন্মনা থাকে। গদাধরের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল তবুও রামটহল তাদের আওরঙ্গাবাদে নিয়ে এল না। একদিন গদাধর কোন খবর না দিয়ে রাত্রিবেলা আওরঙ্গাবাদ পৌঁছল। তখন রামটহল টহল দিচ্ছিল। হঠাৎ অপরিচিত আগন্তুকের পদশব্দে সে who comes there বলে চেঁচায় ও কোন সাড়া না পেয়ে গুলি করে। এইভাবে সে অজ্ঞাতসারে নিজের পুত্রকেই মারে। সরকার অবশ্য তার বীরত্বের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে।

অনেকদিন আগে এক সন্ন্যাসী নাকি রামটহলের হাত দেখে বলেছিল যে তার পুত্র তার হাতে মরবে। তাই সে এতদিন ছেলের কাছ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেছে। কিন্তু নিয়তি! লেখক গল্প শেষ করেছেন "নিয়তি এমনই কঠিন!"

এই গল্পের মধ্যে উৎকণ্ঠিত ও ভয়াতুর স্নেহশীল পিতার চরিত্রটি কিছুটা জীবন্ত। কিন্তু ঘটনাস্রোত যান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। যেন নিয়তির গতি ব্যাখ্যা করার জন্যই কাহিনীর দ্রুত পরিণাম ঘটছে।

মাণিক ভট্টাচার্য মনোভাবের দিক থেকে প্রাচীনপন্থী লেখক। তাঁর বিষয়বস্তুও তাই নতুন নয়। প্রথানুপ্রিয়তা ও আনুগত্যই তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাঁর দু-একটি উৎকৃষ্ট মধুর রসের গল্পের মধ্যে সেই প্রথানুগত্যের ছাপই বেশী। 'গাঁধারি' গল্পটি

উপভোগ্য।১ শাঁখারি সেজে নিজের স্ত্রীকে শাঁখা পরিয়ে কৌতুকসৃষ্টিই গল্পটিকে উপভোগ্য করেছে। এর মধ্যে প্রভাতকুমারের ছায়াপাত ঘটেছে। কাহিনীরচনায় প্রধানুগত্যের এই নির্দশন সবচেয়ে বেশী পরিস্ফুট হয়েছিল 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে। প্রভাতকুমার ছিলেন এই পত্রিকার একজন অন্যতম লেখক। তাঁরই গল্পধারা ও অনেকাংশে চিন্তাধারাকে অনুসরণ করে এইসমস্ত লেখক গল্প লিখেছেন। এই ধারার লেখকদের মধ্যে মনোমোহন চট্টোপাধ্যায়ের নাম স্মরণীয়। তাঁর প্রধান গ্রন্থ দুটি 'পূর্ণিমা' (১৯২০) ও 'পঞ্চক' (১৯২২)। তাঁর গল্পগুলির মধ্যে কোন নতুনত্ব নেই কিন্তু সবই সুখপাঠ্য। ধরা যাক তাঁর 'পূর্ণিমা' গল্পটি। পূর্ণিমা জমিদারের বিধবা পুত্রবধূ। তার বাল্যকালের সখা যোগেশ বিলেত থেকে ফিরে সেই জমিদারীর ম্যানেজারি গ্রহণ করল। প্রথমে পূর্ণিমা তাকে চিনতে পারেনি কিন্তু পরে তাকে চিনতে পারল ও শেষ পর্যন্ত তাদের বিয়ে হল। গল্পের মিলনান্তক পরিণাম প্রভাতকুমারের গল্পধারাকে স্মরণ করায়। লেখক বিধবাবিবাহ দিয়েছেন কিন্তু অন্যান্য লেখকদের মত বক্তৃতা বা উপদেশ দিয়ে তার দোষগুণ বিচার করেন নি। 'অন্নদা' গল্পটি অন্য ধরনের। অন্নদা পণ্ডিতমশাইর মেয়ে। তার উপেক্ষা ও উদাসীনতার ফলে তার স্বামী নিরুদ্দেশ হন। বহুদিন ধরে তার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। তখন পণ্ডিতমশাই ধরে নিলেন যে জামাই মারা গেছেন। তিনি আবার মেয়ের বিয়ের উদ্যোগ করলেন। শেষে, প্রায় রূপকথার সমাপ্তির মতই হঠাৎ স্বামী এসে উপস্থিত হলেন। বিবাহ বন্ধ হয়ে গেল। অন্নদা স্বামীর প্রতি কর্তব্য-বুদ্ধি এতদিনে অর্জন করেছিল। কাজেই তারা এবার সুখে ঘর করতে গেল। এই ধরনের গল্পই হল প্রধানুগত্যের নিদর্শন। তাঁর গল্পগুলিকে কোন সমস্যা বা কোন চরিত্র-জটিলতা নেই। দাম্পত্যজীবনের প্রতি মঙ্গলইঙ্গিত করাই তাঁর লক্ষ্য। এক সমকালীন সমালোচক যথার্থই বলেছেন যে, "তাঁহার গ্রন্থগুলিতে সমাজ-সমস্যা প্রকটন, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ, আর্টের নামে ক্রমাগত পাপ-চিত্রোদ্ঘাটন প্রভৃতি নাই। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি আদর্শ চরিত্র অঙ্কিত থাকাতে তাহারা পাঠক-পাঠিকাগণকে পুণ্যের পথপ্রদর্শন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নির্মল আনন্দ প্রদান করে। প্লট যাহাই হউক, রচনা সর্বত্র সরস ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট।"২

মানসী পত্রিকার আর একটি প্রধান লেখক ছিলেন বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর চিন্তার মধ্যে হিন্দুয়ানি প্রবল ছিল যদিও তাঁর গল্পগুলি তার দ্বারা ক্লিষ্ট নয়। চরিত্রগুলিকে তিনি কোন সংকীর্ণ ধর্মীয় পরিপ্রেক্ষিত থেকে বিচার করেননি।

১। ভারতবর্ষ (১৩২৫-২৬) জ্যৈষ্ঠ
২। যতীন্দ্রমোহন সিংহ : মানসী ও মর্মবাণী ১৩৩৬ মাঘ, পৃঃ ৬০৫

নীতি অপেক্ষা হৃদয়ানুভূতির দ্বারাই তিনি চালিত হয়েছেন। তাঁর মতবাদের মধ্যে ধর্মীয় উগ্রতা, যা তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে ছিল বলে মুসলমান সমাজের কোন কোন লেখকের সঙ্গে তাঁর তীব্র দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল, তাঁর গল্পে তা সম্পূর্ণভাবেই অনুপস্থিত। তাঁর গল্পগ্রন্থ যথেষ্ট। 'গল্পমাল্য', 'শাপমুক্তি', 'অবশেষ', 'পঙ্কজিনী' ইত্যাদি। কিন্তু তাঁর গল্পের মধ্যে কোন নিজস্ব মনোভঙ্গি ও রচনারীতি খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রভাতকুমারের রচনা তাঁকেও যথেষ্টভাবে প্রভাবিত করেছে। 'কবির সুবুদ্ধি' নামক কৌতুক গল্পটি স্পষ্টতই প্রভাতকুমারের অনুসরণ। 'বিপত্নীক' গল্পটি ব্যঙ্গ-প্রধান এবং সুরচিত। একদিকে বিপত্নীক ভদ্রলোকের স্বর্গগতা পত্নীর প্রতি ভালবাসা ও অন্যদিকে ধীরে ধীরে তাঁর একটি বারাঙ্গনার প্রতি আসক্তি—পত্নীবিরহী ছদ্ম আদর্শবাদী বিপত্নীকগোষ্ঠীর প্রতি তীক্ষ্ম বিদ্রূপ। বিদ্রূপই বসন্তকুমারের গল্পের বৈশিষ্ট্য। 'সত্যপীরের আবির্ভাব' স্পষ্টই 'বিরিঞ্চিবাবা' বা 'কেদারনাথের' কোন কোন গল্পের ভণ্ডসন্ন্যাসীর ছায়ায় রচিত বলেই মনে হয়। হেদোর জলে হঠাৎ সত্যপীরের আবির্ভাব নিয়ে লেখক যে ব্যঙ্গ ও আঘাত করেছেন তা তীক্ষ্ম ও উপভোগ্য। কিন্তু তাঁর কোন গল্পই উপভোগ্যতার স্তর ছাড়িয়ে আর কোন বৈশিষ্ট্যে পেঁছিতে পারে নি। বসন্তকুমারের মতই খগেন্দ্রনাথ মিত্রেরও প্রথানুগত্যই বৈশিষ্ট্য। তাঁর রচনাসংখ্যা অনেক। অধিকাংশ গল্পই তাঁর করুণ। কোন কোনটি ভক্তিরসাশ্রিত। 'নীলাম্বরী' গ্রন্থের অধিকাংশ গল্পই (নীলাম্বরী, প্রেমে প্রতিদ্বন্দ্বী, ঘুমের পাহাড়, হতভাগ্য ইত্যাদি) করুণ রসের। 'বাঁশীচোর' গল্পটি ভক্তিরসের। 'বিবি বৌ' গ্রন্থের গল্পগুলি পারিবারিক, প্রায়শই গতানুগতিক, নীরস ও দুর্বল। 'বিবি বৌ' গল্পটিই ধরা যাক।

> বরের বাবা ছেলেকে বিয়ের পিঁড়ি থেকে টেনে নিয়ে গেলেন। তিনি গোঁড়া ভদ্রলোক। মেয়ের বিলাতফেরত জ্যাঠামশাই বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন বলেই বাপ ক্ষেপে গেলেন। শেষে নিরুপায় হয়ে বাপ মেয়ের বিয়ে দিলেন, জ্যাঠামশাইকে নীরবে অপমান সহ্য করতে হল। কিন্তু মেয়ে নিয়ে গেলনা তারা। অপরাধ, মেয়ে ইংরেজি শিখেছে। মেয়ে বিবি। অবশেষে শ্বশুর মৃত্যুশয্যায় এই খবর পেয়ে সে নিজেই শ্বশুরবাড়িতে হাজির হল। শ্বশুর মারা গেলেন, সংসারের দায়িত্ব পড়ল তার স্বামীর ওপর। স্বামীর আয় অল্প, স্বামীর স্বাস্থ্যও ভাল নয়। সে একটি সংবাদপত্র অফিসে কাজ করে। একদিন স্বামী ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল। এদিকে সংবাদপত্র অফিসের কর্তৃপক্ষ তাকে বিনা কাজে বেতন দিতেই রাজী হলনা। তখন এই বিবি বৌ ভাবতে লাগল কী করা যেতে পারে। অফিসের কর্তৃপক্ষ সদয় হয়ে অনুমতি দিলেন যে যদি ভদ্রলোক ঘরে বসেও সংবাদপত্রের প্রবন্ধ লিখে দিতে পারেন—তাহলে তাঁরা টাকা দেবেন। স্বামীর অজ্ঞাতসারে বিবি বৌ এই ব্যবস্থা করল এবং সে নিজেই প্রবন্ধ লিখতে শুরু করলে। অবশেষে স্বামী সব জানতে পারল। সে তার এতদিনের ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইল।

বলা বাহুল্য এই ধরনের গল্পের মধ্যে কোন ঘটনা বা চরিত্রের কোন অভিনবত্ব নেই। ভাষাও গতিহীন। অকারণে কাহিনী দীর্ঘ। সব মিলিয়ে অত্যন্ত নীরস ও প্রাণহীন। অন্যান্য গল্পে যেখানে সামাজিক অবিচার ও অত্যাচারের প্রতি তিনি দৃষ্টি দিয়েছেন (যেমন 'কলঙ্কিনী' বা 'ঝি' গল্পে) সেখানেও তাঁর রচনায় মোহিনী শক্তি নেই—তা যেন সংবাদপত্রের খবর। প্রভাতকুমারের অনুসরণ তিনিও অনেকগুলি হাসির গল্পেই করেছেন (যেমন 'শুকতারা', 'পথি নারী বিবর্জিতা' বা 'মন্দের ভালো')। কিন্তু এগুলি সমকালীন পত্রিকার চাহিদা মিটিয়েছে মাত্র। এর বেশী কোন মূল্য এরা দাবী করতে পারে না। প্রভাতকুমারের প্রথানুসরণে নলিনীকান্ত ভট্টশালী 'হাসি ও অশ্রু' নামে একটি গল্পগ্রন্থ লেখেন। করুণ ও মধুর দুই রসেরই সমন্বয় হয়েছে তাঁর লেখায়। তবে মধুর রসেই তাঁর কৃতিত্ব বেশী। তাঁর 'পূর্বরাগ' গল্পটি তাঁর রচনারীতির স্বাভাবিক নৈপুণ্যের প্রমাণ।১ বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের বাঙালী যুবকের রোমান্সের মধুর কাহিনী হিসেবে এটি উপভোগ্য হয়ে থাকবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হল যে বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে স্পষ্টই দেখা গেছে যে একদল লেখক একটি রক্ষণশীল গোষ্ঠী তৈরী করেছেন। এই রক্ষণশীলতা শুধু মতবাদের নয়, কাহিনীগঠন ও চরিত্রসৃষ্টিতে। তাঁরা কোন নতুন আদর্শ, কোন নতুন ভাবকে বরণ করেননি। তাঁরা পুরোনো সঞ্চয় নিয়েই বারে বারে বেচাকেনা করেছেন। ফলে নতুনত্বহীন, প্রাণহীন, কলাকৌশলহীন একটি জীর্ণ গল্পধারা নিয়েই তাঁরা তৃপ্ত ছিলেন। কালের প্রভাবে আজ সেইসব গল্প বিস্মৃত। এর জন্য পাঠকের কোন দোষ নেই। এই সকল লেখকেরা কোন আবেগে, কোন প্রেরণার তাড়ায় রচনা করেন নি। এর পেছনে কোন সত্য শিল্পবোধ নেই। তাই তারা এত দ্রুত এত সহজে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই গল্পগুলি হয়ত সহজ, হয়ত আন্তরিক কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ ও বহু ক্ষেত্রে অসার, অচল, জড়পিণ্ডের মত। আজ এই রাশি রাশি গল্প পড়তে গিয়ে পাঠক উদ্দীপ্ত হয়না, আনন্দ পায়না, ক্ষণিক কৌতুক আনন্দে হয়ত দুলে ওঠে তারপরই একটানা, ক্লান্ত, চমকহীন, চাঞ্চল্যহীন, স্রোতহীন গল্পধারাকে শক্তির অপচয় বলে দূরে সরিয়ে রাখে। উদাহরণ হিসেবে বলি, জলধর সেনের 'এক পেয়ালা চা' গল্পে খৃষ্টান মেয়ের হাতে এক পেয়ালা চা খাওয়ার ভয়ে নিষ্ঠাবান হিন্দুছাত্র যখন

১। এই গল্পটি জার্মান পণ্ডিত ডঃ ভাগনার তাঁর বাংলা গল্পসংকলন *"Bengalische Texte in Urschrift und umschrift"* গ্রন্থে সংকলন করেছেন। বিদেশী পণ্ডিত সম্পাদিত বাংলা গল্প-সংকলন হিসেবে এটি স্মরণীয়। গ্রন্থটি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে উপহার দেওয়া হয়েছে।

বিব্রত, ধর্মভয়ে বিচলিত; লেখক ধার্মিক আদর্শবাদী ছাত্রটিকে গম্ভীরভাবে পাঠকের সামনে উপস্থিত করছেন; তখন পাঠক ভেবেই পায় না তার মধ্যে গাম্ভীর্যের অবকাশ কোথায়। তা কৌতুক ও করুণার বিষয় হয়ে বর্তমানে ধরা দেয়। এই গল্পগুচ্ছগুলি তাই জন্মের অনতিকাল পরেই মৃত্যু বরণ করেছে। তারা এখন ঐতিহাসিকের কৌতূহল মেটায় কিন্তু সাহিত্য হিসেবে ব্যর্থ ও মূল্যহীন।

২

রক্ষণশীলতা ও গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এল ভারতীগোষ্ঠির লেখকের কাছ থেকে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে এদের জন্ম। ভারতী পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এই লেখকগোষ্ঠির আবির্ভাব। প্রথম থেকেই ভারতী পত্রিকা (১২৮৩) বাংলার উৎকৃট লেখকদের লেখনীধন্য। এর সম্পাদকবর্গের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী, হিরন্ময়ী ও সরলাদেবী। ভারতীর শেষ বৎসরগুলিতে (১৩২২-২৯) মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন সম্পাদক। সুকিয়া স্ট্রীটে, কান্তিক প্রেসের তিনতলার ঘরে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের আসর বসত।

> "ঘরের ঠিক মাঝখানেই চমৎকার খোদাই-করা একটি মেহগ্নির টেবিল, তার দুপাশে দুখানা চেয়ার। উত্তর-পূর্ব কোণে আর একটি মার্বেলমণ্ডিত টেবিল ও একখানি চেয়ার। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি টেবিল, হার্মোনিয়াম ও একটি চেয়ার। দক্ষিণের দেয়ালের সামনে একটি টুলের উপরে প্রায়ই দেখা যেত বৈদ্যুতিক কেটলিতে চায়ের জল গরম হচ্ছে, সমস্ত ঘরখানির ভিতরে সর্বদাই একটি বাহুল্যহীন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শ্রী বিরাজ করত। বাইশ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটের উপরে এই ঘর এবং ঘরে বসে চৌদ্দ-পনেরো বৎসর আগে একদল নবীন সাহিত্যসেবক তরুণ কল্পনার নীড় রচনা করতেন এবং এইখান থেকেই তখন সবুজপত্র ও ভারতী প্রকাশিত হত।"১

গানে, গল্পে এই আসর ভরে উঠত। কোরাসে গান শুরু হত "বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিলে।" আসতেন দিনেন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম। মণিলাল, সৌরীন্দ্রমোহন, অজিতকুমার চক্রবর্তী, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, হেমেন্দ্রকুমার রায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আসরের প্রধান। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আসতেন। আসতেন প্রমথ চৌধুরী—সাহিত্য শিল্প নিয়ে অনর্গল আলোচনা চলত। খোশ-

১। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের অকালমৃত্যুর পর হেমেন্দ্রকুমার রায় **"মণিলালের আসর"** (মানসী ও মর্মবাণী, ১৩৩৬ বৈশাখ, পৃঃ ২৮৪) নামক যে প্রবন্ধ লেখেন তা থেকে উদ্ধৃত।

গল্পে আসর জমিয়ে তুলতেন শরৎচন্দ্র ও দীনেশচন্দ্র। আসতেন মোহিতলাল আর তাঁর গুরু দেবেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ এই গোষ্ঠিকে দিয়েছিলেন প্রেরণা, শরৎচন্দ্র ও প্রমথ চৌধুরী ছিলেন তাঁদের পেছনে। এই সময়ে বাংলা সাহিত্যের একটি বিচিত্র পর্ব। এতগুলি শক্তিশালী পত্রিকা এর আগে একসঙ্গে কখনও বেরয় নি। পরেও নয়।

ভারতী গোষ্ঠির লেখকেরা বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে বিশ্ব সাহিত্যের যোগ সুদৃঢ় করতে চাইলেন। তাঁরা অনুবাদে সচেষ্ট হলেন। সংঘবদ্ধভাবে এইরকম চেষ্টা বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় অনুবাদ করলেন উগোর 'বন্দী', আলফন্স দোদের 'মাতৃঋণ' ও 'নবাব'। মণিলাল করলেন ডাচ লেখক লুই কুপার্স-এর 'ভাগ্যচক্র' অনুবাদ। সত্যেন্দ্রনাথ করলেন নরোজীয়ান থেকে 'জন্মদুঃখী'। চারুচন্দ্র করলেন জর্মান থেকে 'আগুনের ফুলকি'। অবশ্য অধিকাংশ অনুবাদই ইংরেজি থেকে।

বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে বাংলার যোগ ঘনিষ্ঠ করার দায়িত্বই শুধু তাঁরা নেন নি-বাংলা সাহিত্যে নূতন সুর-সংযোজনের চেষ্টাও করেছেন। তাঁদের গোষ্ঠির একটি প্রিয় বিষয় হল পতিতা নারীর জীবন। তথাকথিত পতিতা নারীর প্রতি সহানুভূতি ও বেদনা রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই সর্বপ্রথম স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, জলধর সেন কিংবা বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের রচনাও আছে। ভারতী গোষ্ঠি বিশেষভাবে এই বিষয়টি গ্রহণ করলেন কারণ সমাজের অন্ধতা ও লালসা, উপেক্ষা ও হৃদয়হীনতার এত বড় প্রকাশ আর কী হতে পারে? ভারতীতে হেমেন্দ্রকুমারের "পোড়ারমুখী" গল্পটি আন্দোলন তুলেছিল। এই গল্প পড়ে বহু বিখ্যাত লোকই পত্রিকা কেনা বন্ধ করেন। তারপর "সোনার চুড়ি" নামক গল্পটি প্রকাশিত হল মর্মবাণীর প্রথম সংখ্যায়। "তারপর গল্পটি তো প্রকাশিত হল, সঙ্গে সঙ্গে ছোঁড়া হল যেন বোলতার চাকে ঢিল। কাগজে কাগজে প্রচারিত হতে লাগল গল্পের ভিতর দিয়ে আমি নাকি দুর্নীতি প্রচার ও হিন্দু নারীর পবিত্র সতীত্বকে অপমান করার চেষ্টা করেছি।"১ প্রকৃতপক্ষে গল্পটির মধ্যে কোথাও "সতীত্বকে অপমান করার চেষ্টা" হয়নি, বরং "সতীত্বের" প্রতি শ্রদ্ধাই সৃষ্টি করা হয়েছে।

> সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবন—স্বামী ও স্ত্রীর দুঃখপীড়িত সংসার। স্বামীর সাধ্য নেই যে সংসারকে বিন্দুমাত্র সুখময় করে। কঠিন পরিশ্রমের ফলে নিতান্ত বেঁচে থাকার অধিকারটুকুই সে পেয়েছে। তবু এরই মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা আছে। এই সময়ে এল প্রলোভন। পাশের বাড়িতে এল ধনী

১। হেমেন্দ্রকুমার রায়—**যাঁদের দেখেছি** (১ম খণ্ড), পৃঃ ৯২

> সন্তান। সে এই মেয়েটির প্রতি লুব্ধ হল। তাকে আকারে-ইঙ্গিতে আভাস দিল। তারপর বাড়ির ঝিকে দিয়ে খবর পাঠাল। সে দুঃখদৈন্যের মধ্যে পড়ে আছে। স্বামীর কাছে না পায় সুখ, না পায় স্বাচ্ছন্দ্য। তার মধ্যে এক ধনী-সন্তানের প্রস্তাব তার মনের মধ্যে ধাক্কা দিল। সে প্রতিবাদ করল, ঝি-কে ধমকে তাড়িয়ে দিল—কিন্তু তার মনের মধ্যে প্রলোভনের ছাপ পড়ল। সেই ধনী লোকটি রোজই নানাভাবে নানা ইঙ্গিতে নিজের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করতে লাগল। একদিন সে একটি গহনার বাক্স পাঠিয়ে দিল। সেদিন মেয়েটি ধীরে ধীরে, দ্বিধায়, সংকোচে সেই গহনাগুলি নিল। কিন্তু এই পর্যন্ত প্রলোভনের গতি। তারপর সন্ধ্যেবেলা তার স্বামী ফিরে এল। দরিদ্র, চিন্তাক্লিষ্ট। সংসারের তাড়নায় তার হাসি নেই। রুক্ষ আচরণ। তবুও তার বুকের ভেতরে স্ত্রীর জন্য গভীর ভালবাসা। সে ভালবাসা স্ত্রীও মাঝে মাঝে বোঝে। আজ আবার সেই মুহূর্ত এল। স্বামী তার জন্য একগাছা সোনার চুড়ি এনে দিল। বহু দারিদ্র্যের, বহু বেদনার থেকে তার আবির্ভাব। স্ত্রী স্বীকার করল তার মুহূর্তের অবনতি। তারপরেই সেই গহনার বাক্স সে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এই গল্পের বিরুদ্ধেই রক্ষণশীল সমাজ খড়্গহস্ত হল। যে রক্ষণশীল মন শরৎচন্দ্রকে সন্দেহ করেছে, রবীন্দ্রনাথ ঘরে-বাইরের মধ্যে সীতাকে অপমান করেছেন ভেবে আক্রমণ করেছে—তারাই আবার এই আক্রমণের পুরোভাগে। এই সময়ে অবশ্য শ্লীলতা ও অশ্লীলতা নিয়ে যে লড়াই চলছিল তা অত্যন্ত কৌতুককর। 'নারায়ণ' পত্রিকা 'কুসুম' গল্পটিকে অশ্লীল বলে ফেরৎ দেয়—আবার 'কল্লোল' পত্রিকা এই গল্পটিকে ছাপেনি, কারণ বোধহয় তাঁদের মতে গল্পটি নিতান্তই গতানুগতিক। 'নারায়ণ' পত্রিকা হেমেন্দ্রকুমারের 'কুসুম' ফিরিয়ে দিয়েছে কিন্তু চিত্তরঞ্জনের লেখা 'ডালিম' ছেপেছে। তা-ও পতিতা জীবনেরই কাহিনী এবং তার বিরুদ্ধে আবার 'ভারতবর্ষ' আক্রমণ করেছিল। সমকালে (১৯২১ খৃঃ) গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'মঞ্জরী' নামক গল্পগ্রন্থের ভূমিকায় পতিতা জীবন সম্পর্কে সহজ সত্য কথাটি বলেছেন এবং এই কথাটিই সব লেখকই (অন্তত যাঁরা কিছুমাত্র চিন্তাশীল) সমর্থন করেছেন নানাভাবে—যতই তাঁদের পত্রিকাগত মত-বিরোধিতা থাক। তিনি লিখেছেন,

> "সমাজ যাহাদিগকে কলঙ্কের ছাপ দিয়া আপনার গন্ডীর বহির্ভূত করিয়া দিয়াছে, তাহাদের অনেকেরই হয়ত মুহূর্তের উত্তেজনা অথবা ক্ষণিকের ভ্রান্তির বশে পদস্খলন হইয়াছে। তাহাদের অনেকেই হয়ত দারুণ অনুশোচনা করিয়াছে এবং এমন যদি কেহ উদারহৃদয় মহানুভব থাকেন, যাঁহারা তাহাদের অপরাধকে মার্জনা করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে সংসার তাহাদিগকে আবার সার্থক গৃহিণীরূপে, স্নেহময়ী সেবিকারূপে, প্রেমময়ী নায়িকারূপে ফিরিয়া পাইতে পারেন!"

তাঁর গল্পগুলিতে সেই সত্যকে দেখাবার চেষ্টা তিনি করেছেন। ভারতী গোষ্ঠীর লেখকদেরও এইটি মনের কথা। 'কুসুম' গল্পটির প্রাণ এখানেই।

"এক পতিতা নারী এক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোককে অচেতন অবস্থায় তুলে আনেন। তারপর তাঁর সেবা ও শুশ্রূষায় সেই ব্রাহ্মণ চৈতন্য পান ও সুস্থ হন। কয়েক-দিন সেই ব্রাহ্মণ সেই নারীর বাড়িতেই থাকেন। অবশেষে সুস্থ হয়ে ব্রাহ্মণ জানতে পারে যে সেই নারী পতিতা। তখন ব্রাহ্মণ নিজেকে ধিক্কার দেয়। ধর্ম নষ্ট হয়েছে বলে বিলাপ করে। সে কুসুমকে পতিতা বলে পদাঘাত করে ও তার স্নেহ-মমতার প্রতি চরম অসম্মান করে তার দিকে একটি দশ-টাকার নোট ছুঁড়ে দেয়। সেই লাঞ্ছিতা নারী "বধির হইয়া সে রৌদ্রদীপ্ত আকাশের অনন্ত নীলিমার দিকে চাহিল, হায়—তাহার অশ্রু-অন্ধ চোখে বিশ্ব আজ অন্ধকার—অন্ধকার।"

হেমেন্দ্রকুমারের 'সিঁদুর-চুপড়ি' গ্রন্থের 'শিউলি' গল্পটিও পতিতাজীবন বিষয়ক। এই গল্পে শিউলি বিলাসচন্দ্রের রক্ষিতা। বিলাসচন্দ্র কাশী এসেছে ফুর্তি করতে। রাস্তার লোককে সে দেখাতে চায় দেখ কেমন জিনিস আমার সঙ্গে। সেই অশ্লীল কুশ্রী আমোদে শিউলির হৃদয় মাতল না। গঙ্গাতীরে এসে তার নতুন অনুভূতি হল।

"গঙ্গাজলে ডুব দিয়া শিউলির মনে হইল তাহার সারা জীবনের ময়লা মাটি যেন একেবারে ধুইয়া-মুছিয়া গেল। সাদা জলে একটি গোলাপী পদ্মের মত শিউলি অনেকক্ষণ আনমনে বসিয়া রহিল। ছোট ছোট ঢেউ আসিয়া তাহার কটিতট চুম্বন করিয়া মধুর কলহাস্যে উছলিয়া উছলিয়া উঠিতে লাগিল। ওপারের ঐ ধবল বালুতটে, যেখানে দীপ্ত নীলিমার তলায় ভোরের রৌদ্র ঝিকমিকে সোনার ফুল ফুটাইতেছিল, শিউলির চোখ সেখান হইতে কিছুতেই ফিরিতেছিল না।"

হেমেন্দ্রকুমারের এই সব গল্পই পরবর্তীকালে কল্লোল যুগের লেখকদের বহু গল্পের অগ্রদূত তাতে সন্দেহের কারণ নেই। এই সময়ে নলিনীমোহন রায়চৌধুরী[১] "চামেলি" নামে একটি গ্রন্থ লেখে। এই গল্পের মূল বিষয় পতিতা জীবন। তাই ভারতী এই গ্রন্থটিকে সাদর-সম্বর্ধনা জানিয়ে বলেছিল,

"......তাহাদের সুখদুঃখ, আচার ব্যবহার, রেশমী শাড়ি, ও পরিপাটি সাজসজ্জার অন্তরালে......সময় সময় দীর্ঘ নিঃশ্বাস বুকের মধ্যে পুঞ্জিত হইয়া উঠে, তাহাদের ছলাকলায় একটা নিবিড় করুণ অর্থও এমনি পরিস্ফুট হয় যে সেগুলার জন্য রাগ হয় না, প্রাণে সমবেদনা জাগে।"

ভারতী গোষ্ঠির লেখকরা যখন বারনারীদের জীবনে সমবেদনা প্রকাশ করেছেন তখন আরো অনেক লেখকই, (যাঁরা ভারতী পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না তাঁরাও)

১। তিনি 'লালটুপী' নামে ছোটদের জন্য একটি উৎকৃষ্ট গল্পগ্রন্থ লেখেন।

এই বিষয়ে রচনা করেন। সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত "কমলের দুঃখ" নামে একটি উপন্যাস লিখেন। পত্রাকারে লিখিত উচ্ছল কাব্যিক ভাষায় পতিতা নারীর দুঃখ দুর্দশা ব্যক্ত করেছেন। যদিও 'নারায়ণ' নানাভাবে রবীন্দ্রবিরোধী ও অনেক পরিমাণে রক্ষণশীল হিন্দুত্বের ধারক তবুও চিত্তরঞ্জন এখানে 'ডালিম' গল্পটি লেখেন।[১] চিত্তরঞ্জন দাশ একদা 'বারবিলাসিনী' নামে একটি কবিতায় লিখেছিলেন,

আমি যেন চিরদিন ঋণী
অপার ঐশ্বর্য লয়ে
বিলাই ভিখারী হয়ে
বাসনাবিহীন উদাসিনী।

নাহি প্রাণ মধুদেহে মোর
নাহি সুখ নাহি লজ্জা
জীবন বিলাস সজ্জা
কাজল নয়নে, ঘুমঘোর—
চাও পান্থ আঁখিপাতে, লও ঘুমঘোর।
মোহভরা, মধুদেহ মোর।

তাঁর 'গল্পটি' এই কবিতার পাশে অত্যন্ত কঠিন ও বাস্তব বলে মনে হবে।

১। **'ডালিম'** গল্পটি প্রকাশিত হয় 'নারায়ণ'-এ (১৩২১, পৌষ, ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা)—পৃঃ ১৫৯-৭১।
শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন লিখেছেন যে "সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত 'ডালিম' গল্প লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্রে'র উত্তর হিসেবে ইনি 'মৃণালের দুঃখ' লিখিয়াছিলেন" (বা, সা, ই, ৪র্থ নবম পরিচ্ছেদ, পৃঃ ২২১)। এই তথ্যের সমর্থন পাওয়া যায় না।
'ডালিম' গল্প চিত্তরঞ্জন গ্রন্থাবলীতে সংকলিত। চিত্তরঞ্জনের জীবনীগুলিতেও এই গল্প যে তাঁর তা জানা যায়—(যথা সুধাকৃষ্ণ বাগচী—"দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন", ২য় সং, ১৩৪২, পৃঃ ১০৯)। অপরপক্ষে সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত যে এই গল্প লিখেছিলেন তার কোন প্রমাণ নেই। সমকালীন সাহিত্যিক ও সমালোচকরাও বিশ্বাস করতেন যে 'ডালিম' চিত্তরঞ্জনের লেখা। বিপিনবিহারী গুপ্ত (ভারতবর্ষ, ১৩২২, আশ্বিন)র সমালোচনা তার প্রমাণ।

হয়ত তাই বিপিনবিহারী গুপ্ত লিখেছিলেন যে,

> "এতকাল পরে তাঁহার (চিত্তরঞ্জনের) নারায়ণ পত্রে বারবিলাসিনীর নিজ-মূর্তি ধারণ দেখিয়া আমাদের মত মাঝারি ধরনের লোক কিঞ্চিৎ গোলে পড়িয়াছে। ডালিম, আঙুর, চন্দনা, কি সেই পূর্বপরিচিতা 'বারবিলাসিনী ?' এ কি সাহিত্যিক atavism,"

ডালিম সেই পূর্বপরিচিতা 'বারবিলাসিনী'ই—তবে বেদনার্ত, ক্লান্ত। তার জীবনের নিভৃত বেদনার অন্ধকার এই গল্পে। তার বাইরের জীবনে জৌলুষ, মোহ। ভেতরে অন্ধকার। সেই বহুবল্লভার জীবনে আজ হঠাৎ একটি মানুষ এসেছে যাকে সে ভালবাসে। জীবনে আজ সে সত্য প্রেমের স্পর্শ পেয়েছে। সে এখন রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা'র মতই বলতে পারে

> "কত মধুরাতে মুগ্ধ হৃদয় স্বর্গ মেনেছে এ দেহখানি
> তখন শুনেছি বহু চাটুকথা শুনিনি এমন সত্যবাণী।"

এই সত্যবাণীই ডালিমের জীবনে এনেছে বিপ্লব। আজ সে কী করে প্রেমিকের এই প্রেমের মূল্য দেবে। মুগ্ধ প্রেমিকের কাছ থেকে সে দূরে চলে গেল। লিখে গেল,

> "মনে করিও না আমি মরিয়া গিয়াছি। আমি মরি নাই—মরিতে পারিব না। তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ, আমি এ জীবনে কখনও পাই নাই। তাহারি গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাই। অনেক দুঃখ পাইয়াছি, সংসারে যাহাকে সুখ বলে, তাহাও পাইয়াছি, কিন্তু কাল রাত্রে যে সত্য প্রাণের পরশ পাইয়াছি, তাহা কখনও পাই নাই। তাহারি স্মৃতিটুকু প্রাণে প্রদীপের মত জ্বালাইয়া রাখিতে চাই। যাহা পাইয়াছি, তাহা আর হারাইতে চাই না। তুমি আমাকে খুঁজিও না, প্রাণসর্বস্ব, আমি বড় দুঃখী, তুমি কাঁদিয়া আমার দুঃখ বাড়াইও না। এ জন্মে হইল না, জন্মান্তরে যেন তোমার দেখা পাই।"

বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে বিভিন্ন লেখকের মনে মনুষ্যত্বেরও নৈতিক মানদণ্ডের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল। শরৎচন্দ্র এই নীতি ও হৃদয়ের সংগ্রামের কাহিনী রচনা করে বাংলা দেশের হৃদয় মন জয় করেছিলেন। তাঁর পূর্বসূরীও সমকালীন লেখকদের রচনাতেই সেই নীতি ও হৃদয়ের দ্বন্দ্ব। মানুষের মনই শিল্পীর উপাদান।

'মৃণালের দুঃখ' নামক কোন গল্প রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্রে'র উত্তর হিসেবে কোথাও প্রকাশ হয়েছে বলে চোখে পড়ে নি। নারায়ণে (১৩২১, অগ্রহায়ণ, ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা) **"মৃণালের কথা"** প্রকাশিত হয়েছিল। এই গল্প বিপিনচন্দ্র পালের লেখা। তাঁর **"সত্য ও মিথ্যা"** গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের "মৃণালের দুঃখ" নামক কোন গ্রন্থের সন্ধান এ যাবৎ পাই নি।

তা পাপপুণ্যে, ভাল মন্দে, দ্বিধাদ্বন্দ্বে মেশা। তাকে নীতির দণ্ডে বিচার না করে শিল্পী যখন তাকে হৃদয়ের মূল্যে বিচার করেন তখনই তা সাহিত্যের সম্পদ হয়। মনুষ্যত্ব বা হৃদয়ের শাশ্বত ভাবগুলিকে আবিষ্কার করতে পারলেই সাহিত্যিক চিরজীবী হন। সেই চিরন্তন ভাবকে খুঁজতে হয় ইদানীন্তনকে আশ্রয় করে। বর্তমান জীবনকে অবলম্বন করেই কালাতীত হবার চেষ্টা সকল সৎ সাহিত্যিকেরই। ভারতী গোষ্ঠির লেখকেরা তাই একটি জীবন্ত, জ্বলন্ত, বর্তমান সমস্যাকে অবলম্বন করে মানুষের চিরন্তন মনোবেদনার দিকে দৃকপাত করলেন। বর্তমানকে সাহিত্যের উপাদান হিসেবে মেনে নেওয়া, বাস্তবতার প্রথম সর্ত—তার সুখ দুঃখ, সমাজের অন্যায় অবিচার হল এই গোষ্ঠির সাহিত্যের মূল উপাদান। 'কল্লোল' পত্রিকার বীজ এই ভারতী।

বাস্তবতা পরিপোষক ছিলেন ভারতী গোষ্ঠির লেখকেরা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাঁদের বাস্তববোধ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবেগে আচ্ছন্ন, অভিজ্ঞতার স্বল্পতায় কল্পনাকীর্ণ। তাঁদের আসক্তি সৌন্দর্যের প্রতি। তাঁদের ভাষা কাব্যময়, সুন্দর। তাঁদের চরিত্রগুলি পাপে প্রলুব্ধ হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের নীতিবোধ তাদের প্রলোভনের ঊর্ধ্বে ওঠে। আদর্শবাদে তাঁদের বিশ্বাস। সাধারণভাবে ভারতী গোষ্ঠির রচনা সম্পর্কে একথা বলা চলে। তাঁদের প্রতিনিধিস্থানীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে (১৮৮৮-১৯২৯) ধরা যায়। তাঁর লেখা সুন্দর। রচনারীতিতে সংক্ষিপ্ততা আছে, শিল্পবোধ আছে। নেই অভিজ্ঞতা। তাঁর প্রথম দিকের অধিকাংশ রচনাই ছোটদের জন্য এবং তার মধ্যেও বেশীর ভাগ অনুবাদ। ছোটদের জন্য যে কাহিনী তিনি রচনা করেন তা প্রধানত রূপকথা শ্রেণীর। তাঁর অধিকাংশ ছোট গল্পের মধ্যে রূপকথার ভাষা বা আবহও অতি স্পষ্টভাবেই লক্ষণীয়। শরৎচন্দ্র তাঁর গল্প সম্পর্কে লিখেছিলেন "যথার্থই আপনার লেখার toneটা কবির মত। abstract ভাবের কবিতা যেসব লোকের ভাল লাগে না তাদেরই আপনার লেখা ভাল লাগে না"। তাঁর লেখায় বস্তুভার কম. কল্পনা বেশী এবং অভিজ্ঞতার অভাব অতি স্পষ্ট। তাঁর প্রধান গ্রন্থ ঝাঁপি, মহুয়া, জলছবি, পাপড়ি, আলপনা. কল্পকথা। 'আলপনা' গ্রন্থের 'জয়মাল্য' গল্পটির উদাহরণ দেওয়া যাক। এক কবি কোনদিন কারো কাছে সম্মান পায়নি। কারণ সে দেখতে অতি কুৎসিত ছিল। সবাই তার চেহারার জন্য তাকে ব্যঙ্গ করেছে, বিদ্রূপ করেছে। একদিন তার ডাক পড়ল রাজসভায়। তার কবিত্বে মুগ্ধ হলেন রাজা। রাজকন্যা স্বয়ং তার কণ্ঠে পরালেন মালা। এই রূপকথা জাতীয় গল্পেই মণিলালের সার্থকতা। তিনিও তাঁর সমকালীন লেখকদের মতই পতিতা জীবন নিয়ে গল্প লিখেছেন। 'মুক্তি' (ভারতী, ১৩২১) গল্পটি আলোচনা করলে তাঁর কল্পনাভঙ্গির পরিচয় স্পষ্ট হবে। একটি মেয়ের কাহিনী। তার স্বামী কোনদিন তার দিকে চায়নি। তাকে ফেলে

তার স্বামী এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। সেই নারী একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করল পুরুষের দৃষ্টি মোহ। সে হঠাৎ অনুভব করল তার নারীত্বের নিঃসঙ্গতা। অজস্র পথিকের লোলুপ দৃষ্টির বীভৎসতাকে সে বোঝেনি।

> "হঠাৎ একবার চোখ তুলিয়া দেখে দূরে একটি অনিমেষ দৃষ্টি তার মুখের উপরে পড়িয়া আছে। মুক্তি প্রথমে কোনো খেয়াল করিল না। সে চোখ নামাইয়া লইল। খানিকক্ষণ পরে তার চোখ যখন অন্যমনস্কভাবে আবার সেই দিকে গিয়া পড়িল তখনও দেখিল সেই দৃষ্টি সেই একভাবেই রহিয়াছে। তার মনে হইতে লাগিল যেন এই দৃষ্টিটি কতদূর হইতে কত-দিন ধরিয়া তারই উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া আজ এইমাত্র তার হৃদয়ের তীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।"

এই দৃষ্টিকে সে সেদিন মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করেছে। কিন্তু সে তখনও বোঝেনি সে এখন অন্ধকার জীবনের দিকে এগিয়ে চলেছে। সে তখন চলেছে এক রূপকথার 'রাজপুত্রে'র খোঁজে। কিন্তু ধীরে ধীরে সেই নারী একদিন জর্জরিত হয়ে উঠল এই দৃষ্টিরই বিষে। তখন 'তার চোখের উপরে পৃথিবীর আলো ম্লান হইয়া আসিতেছিল। রাজপুত্রের রূপ ধরিয়া এ কোন মায়াবী রাক্ষস তাহাকে ভুলাইয়া গেল। তার সমস্ত শরীর জ্বলিয়া যাইতেছিল।'

মণিলালের অধিকাংশ লেখাই সুখপাঠ্য। তিনি দু-একটি উৎকৃষ্ট হাসির গল্প লিখেছেন। তার মধ্যে 'ঘটনাচক্র' গল্পটি বিশেষ স্মরণীয়। জাতীয় আন্দোলনের সুযোগে মানুষের অসাধুতাকে ব্যঙ্গ করে তিনি একটি গল্প লিখেছিলেন। তার নাম 'পরশপাথর'।১ এই গল্পটি মণিলালের একটি উৎকৃষ্ট গল্প।

> পরেশ স্বদেশীর হুজুগে দেশের গ্রামে এসে জমিয়ে বসল। সে বললে, টাকা দাও—প্রচুর সুদ পাবে। দেশলক্ষ্মীর কাজে আত্মসমর্পণ কর। সবাই তার মিষ্টি কথায় ভুলল। সে ধীরে ধীরে অজস্র টাকা পেল। এইবার সে ঠিক করল টাকা নিয়ে পালাবে। হঠাৎ আবির্ভূতা হলেন তার পিসিমা। এই পিসিমা বৃদ্ধা। কিন্তু আজও সবাই তাঁকে নতুন পিসিমা বলে ডাকে। তিনি এক যথার্থ স্নেহপ্রতিমা। পরেশ এই পিসিমার কাছে ঋণী। তাঁর স্নেহ আজও তাঁর মনে আছে। সেই পিসিমাও তাঁর বহুসঞ্চিত পাঁচটি টাকা নিয়ে এসেছেন, দেশলক্ষ্মীকে দেবেন। পরেশ চুরি করে পালাতে পারল না। সে পরের দিন সকালে পালিয়ে গেল কিন্তু টাকাগুলি সবই রেখে গেল। আর পিসিমার টাকা একটি কাগজে মুড়ে লিখে গেল 'পিসিমার ঋণ'।

রচনারীতি, গল্পের বিষয় ও মনোভঙ্গির দিক দিয়ে মণিলালের সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ লেখক হলেন চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮)। তিনি প্রচুর গল্প রচনা

১। বঙ্গবাণী ১৩২৮,

করেছেন।।১ তাঁর অধিকাংশ গল্পই ভাবালুতা দুষ্ট। রবীন্দ্রপ্রভাবে তিনি যদিও সর্বাধিক প্রভাবিত হয়েছিলেন তথাপি রবীন্দ্রনাথের কল্পনাভঙ্গি বা জীবনের জটিল দ্বন্দ্বের মধ্যে কাহিনী গ্রন্থনের শক্তির প্রভাব গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর এক শ্রেণীর গল্পে, এবং এই শ্রেণীর গল্পেই তিনি অধিক কুশলী, রূপকথার প্রভাব দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'জয়পরাজয়' জাতীয় কাহিনী বা মণিলালের উপরে উল্লিখিত কবির গল্পই চারুচন্দ্রের হাতে 'একটি মেহেদির পাতায়' পরিণত হয়েছে।

> একটি 'মেহেদির পাতায়' গল্পটিতে শাহাজাদী কবির প্রেমে পড়লেন। কবি সেই প্রেম প্রত্যাখ্যান করে একটি গ্রাম্য মেয়েকে বিয়ে করলেন। শাহাজাদীর হৃদয় বেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠল। এতদিন কবি গান গাইতেন শাহাজাদীর জন্য। এবার তাঁর গান ভূষণরিক্তা একটি গ্রাম্য নারীর সহজ নিরাড়ম্বর জীবনের দিকে তাকিয়ে রচিত। শাহাজাদীর মনে সে গান ঢেউ তুলত। সে ভাবত কে সেই বিজয়িনী—যার উদ্দেশ্যে কবির গান। তার ভূষণ তাকে লজ্জা দিত। ভাবত যদি সে পল্লী কন্যার সঙ্গে তার ভাগ্য বিনিময় করতে পারত। এক-দিন এক বনভোজনে শাহাজাদীর সঙ্গে কবিপ্রিয়ার দেখা। সেদিন স্নান-শেষে বাদশাজাদী কবির প্রিয়ার পরিত্যক্ত পরিচ্ছদ পরতে লাগল। বিস্মিত কবিপ্রিয়াকে শাহজাদী বললে, "একদিন ছিল, তোমার কবি আমার জড়ি-জড়াওয়ের গুণগান করিতেন এখন শুনি তোমার এই সাদা পোষাকের স্তুতি। তাই বহিন, একবার পরিয়া দেখি।"

এই গীতিরসউচ্ছল কাহিনীটি চারুচন্দ্রের এক শ্রেণীর গল্পের প্রতিনিধি মাত্র। বাস্তবজীবনের গল্পে চারুচন্দ্র অধিকাংশক্ষেত্রেই করুণরসে সিদ্ধ। তাঁর 'চুড়িওয়ালা' গল্পটি এ প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয়। চুড়িওয়ালা চুড়ি বিক্রির ফাঁকে একটি মেয়েকে নিজের মেয়ের মতই ভালবেসেছিল। তারপর তার বিয়ের পর একদিন চুড়িওয়ালা তাকে দেখতে এল। সেদিন সে বিধবা। বৃদ্ধ চুড়িওয়ালার মর্মান্তিক আর্তনাদ গল্পটিকে অসাধারণ শোকগভীর করেছে। রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালার কথা অনিবার্যভাবে মনে পড়ে। কাবুলিওয়ালার যে বেদনা তা অদর্শনের দুঃখ। বিচ্ছেদের দুঃখ। তার দুঃখ নিতান্ত তার একার। মিনির বিবাহের আনন্দে চঞ্চল পরিবার তার দুঃখের সঙ্গী নয়। চুড়িওয়ালার দুঃখ সংসারের নির্মম আঘাতে। এ দুঃখ অনেক বেশী মর্মান্তিক। এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলিওয়ালা' সমকক্ষ না হলেও চারুচন্দ্রের শ্রেষ্ঠগল্পের অন্যতম, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

১। বরণডালা (১৯১০), পুষ্পপাত্র (১৯১১), সওগাত (১৯১১) ধূপছায়া (১৯১২), চাঁদমালা (১৯১৫) ইত্যাদি।

রবীন্দ্রভাব চারুচন্দ্রের ওপর এত বেশী ছিল যে, শুধু 'চুড়িওয়ালা' নয় অনেক গল্পেই রবীন্দ্রনাথের গল্পের ছায়াও লক্ষ্য করা কঠিন নয়। 'সতীন' এবং 'মা' দুটি গল্প পাঠকালে রবীন্দ্রনাথের মধ্যবর্তিনী' এবং 'সমস্যা পূরণের কথা মনে হওয়া নিতান্ত স্বাভাবিক। রবীন্দ্রপ্রভাব চারুচন্দ্রের গল্পগুলিকে, বলাই বাহুল্য, আড়ষ্ট করেছে। তাঁর কাহিনীগুলি প্রধানত ভাববিহ্বল, রোম্যাণ্টিক ও এক অর্থে গতানুগতিক। দুই একটি গল্পে এই রোমান্স বিদায় নিয়েছে। জীবনের নির্মম দুঃখ ও সমাজের কঠোর শাসনকে উপলক্ষ্য করেছেন। যেমন তাঁর 'নিষ্কৃতি' গল্পটি। কিন্তু প্রধানত তার দৃষ্টি আদর্শবাদীর। ভারতীগোষ্ঠির অন্যান্য লেখকদের মতই রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে তিনি মেনে নিয়েছিলেন—সহজ সরল জীবনের ছোট কাহিনীই রচনা করতে চেয়েছেন। কখনও হাসি, কখনও অশ্রু, কখনও ঈষৎ ব্যঙ্গ, কখনও অতীতের মায়া—এই তার গল্পের অবলম্বন। এইদিক থেকে বলা চলে যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যে ধারা সৃষ্টি করেছিলেন তিনি সেই ধারাকে অনুসরণ করেছেন। বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের নানা খুঁটিনাটি, তার আশা, তার স্বপ্ন, তার বেদনা—এই হল চারুচন্দ্রের উপজীব্য। তিনি এই উপাদানকেই কাব্যরসে জারিত করেছেন। এইখানেই তিনি প্রভাতকুমারের অনুসারীদের থেকে পৃথক। বায়ু বহে পুরবৈয়া' নামক গল্পে যে মুচির ছেলের ব্যর্থ প্রেম তা প্রভাতকুমারের হাতে কৌতুকে পরিণত হাতে পারত, রবীন্দ্রনাথের হাতে তাই একটি নিটোল অশ্রুবিন্দুতে পরিণত হতে পারত। চারুচন্দ্র এরই মাঝপথে। কৌতুক এখানে নিষ্ঠুর মনে হয়—আবার অশ্রু-সজলতা এখানে অবান্তর মনে হয়। চরিত্র ও ভাবে অসংলগ্নতার এই লক্ষণ 'বায়ু বহে পুরবৈয়া'র মধ্যে স্পষ্ট। এই ত্রুটি চারুচন্দ্রের একটি প্রধান ত্রুটি। মুচির ছেলে কাল্লুর চিন্তা, তার গান, তার আবেগ প্রকাশের ভাষা ও তার চরিত্রের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম অসংগতি আছে। এই অসংগতিতে গল্পটি দ্বিধাগ্রস্ত।

চারুচন্দ্রের বাস্তবমুখী গল্পগুলি মণিলালের তুলনায় সার্থক। মণিলাল অপেক্ষা চারুচন্দ্রের ভাষা বেশী গদ্যায়ত। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে সৌরীন্দ্রমোহনের ঐক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। চারুচন্দ্রের বাস্তব অভিজ্ঞতার স্বল্পতা তাঁর লেখায় অতি স্পষ্ট। বিশেষ করে আধুনিক যুগের যে বৈপ্লবিক মূল্যবোধের পরিবর্তন ও বাস্তবতার রূঢ়তা তা তিনি কখনই কল্পনা করতে পারেন নি। এক সমালোচক বলেছেন যে "চারুচন্দ্র...আমাদের এই দুঃস্বপ্ন-বিড়ম্বিত চিত্তে প্রাচীন আস্বাদের বাণী বহন করিয়া আনেন, চিরন্তন শান্তি ও স্নিগ্ধতার সুরটি পরিবেশন করেন।"[১] চারুচন্দ্র অন্যান্য রক্ষণশীল লেখকদের মত হিন্দুত্ব বা ভারতীয়ত্ব নিয়েই কাল ক্ষেপন

১। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ভূমিকা ঃ চারুচন্দ্রের শ্রেষ্ঠগল্প, পৃঃ ৸৵০

করেন নি, অন্যদিকে আধুনিক আন্দোলনের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাতেও তিনি বিশেষ কৌতুহলী হননি। তিনি চেয়েছেন সমন্বয় করতে। প্রভাতকুমারের মতই জীবনের জটিল রহস্যের মধ্যে প্রবেশ না করে—তার উপরে ভাসমান দুঃখ-সুখের চাঞ্চল্যকে লক্ষ্য করেছেন। পুরোনো কথাই নতুন করে পরিবেশন করেছেন। তাই কিছু কিছু গল্পে গতানুগতিকতা যেমন স্পষ্ট তেমনই কোন গল্পে কতকগুলি শ্বাশ্বত অনুভূতির প্রকাশ (যেমন, মমতার ক্ষুধা, খুনে) যা বারবার পড়া চলে। তবে তাঁর শক্তি যে পরিমাণ সৃষ্টি করেছে, সেই পরিমাণ উৎকৃষ্ট সৃষ্টি করেনি—ফলে তাঁর স্বল্পসংখ্যক উৎকৃষ্ট রচনা প্রচুর দুর্বল রচনার ভীড়ে হারিয়ে গেছে ও পাঠকস্মৃতি থেকে দ্রুত অপসৃয়মান। তিনি রবীন্দ্রানুসৃতির ধারাকে টেনে রেখেছিলেন তাতে ভারতী-গোষ্ঠির সামগ্রিক দানে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিশেষ থাকতে পারেনি।

ভারতীগোষ্ঠির প্রধান লেখকদের মধ্যে সৌরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪)-এর দৃষ্টি ছিল অনেক বেশী বাস্তবানুমুখী। তিনি নিজেই একদা ভারতী সম্পাদনা করেছেন। কুন্তলীন পুরস্কার পেয়েছেন একাধিকবার। ছোটগল্প রচনা করেছেন যথেষ্ট। 'শেফালি', 'নির্ঝর' 'পুষ্পক', 'মৃণাল' 'তরণী' ইত্যাদি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি গল্পের মধ্যে জোর দিয়েছেন 'কাহিনী'কে সবচেয়ে বেশী। গল্পের মধ্যে যে কাহিনীবিরলতা বর্তমান যুগের অনেক লেখকের গল্পের বৈশিষ্ট্য তাকে তিনি নিন্দাই করেছেন।[১] তিনিই ভারতী গোষ্ঠির লেখকদের মধ্যে কাহিনীর গঠন সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী প্রাচীনপন্থী। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এবং 'সাহিত্য' পত্রিকা গোষ্ঠির সঙ্গে তাঁর কাহিনীর গঠনের মিল তাই বেশী। কিন্তু তার সামগ্রিক আবেদনে তাঁর গল্পধারা আধুনিক গল্পধারার পূর্বসূরী।

'মৃণাল' গ্রন্থে "পাশের বাড়ি" গল্পটি খুবই সাধারণ কিন্তু সুলিখিত। মেসের পাশেই একটি বাড়ি। সেখানে এক অত্যাচারী শাশুড়ি আর অত্যাচারী স্বামী নন্দ। তাদের অত্যাচারে একটি নিরীহ বউর মৃত্যু হল। মেসের একটি লোকের চোখ দিয়ে কাহিনীটি দেখানো হয়েছে। কাহিনীটি আটপৌরে, অত্যন্ত বাস্তব এবং ভাবালুতায় আপ্লুত নয়। এই গ্রন্থেরই "বিপথে" গল্পটি সুন্দর। বিরজা একটি পতিতা নারী। একদিন সে তার সন্তানকে অন্যের হাতে তুলে দিয়েছিল। আজ এখন তার বুভুক্ষু মাতৃত্ব জেগে উঠেছে। কিন্তু আজ তার নিজের সন্তানের সঙ্গে দেখা করার উপায় নেই। এই মাতৃহৃদয়ের নিরুদ্ধ ব্যথা কাহিনীটিতে উচ্ছ্বসিত।

প্রেমের গল্পেও সৌরীন্দ্রমোহন কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। "অপরাধী" গল্পে নায়ক

১। "পুষ্পাঞ্জলির" ভূমিকায় লিখেছেন, "গল্পগুলিতে প্লট আছে; intellectualism-এর তীব্র জ্যোতিতে নয়ন-মন বাঁধাইবার প্রয়াস নাই।"

একটি খ্রীষ্টান মেয়েকে ভালবেসেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত সংকোচের জন্য বিয়ে করেনি। মেয়েটিকে ফেলে পালিয়ে যায়। তারপর ধীরে ধীরে সময় কাটে। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে লোকটির সর্বস্ব যায়। এই সময় তার হঠাৎ দেখা হল সেই মেয়েটির সঙ্গে। সে অন্য একজনকে বিয়ে করেছে। বিগত প্রেমের স্মৃতি জেগে উঠল। কিন্তু আজ তার কোন পথ নেই সেই অতীতে ফিরে যাবার। যে সহজ স্বচ্ছন্দ জীবন তার হতে পারত তা আজ তার থেকে বহু দূরে।

প্রেমের গল্পের চেয়েও সাধারণ দুঃখ সুখ ও পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কাহিনীতে তিনি অধিকতর সিদ্ধ। তাঁর 'ফেল জামিন' গল্পটি করুণ। একটি নিঃসহায় মানুষ কিছুতেই তার সুবিচার পেল না। 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'—এই বেদনা ওই গল্পটিকে প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু গল্পটি ভাবালুতাযুক্ত হয়েছে। তাঁর অধিকাংশ করুণ গল্পই এই দোষ দুষ্ট। তাঁর অজস্র গল্পের মধ্য থেকে দুটি গল্পের উদাহরণ তুলতে চাই। এখানেই তার শক্তির যথার্থ পরিচয় আছে। একটি "পাশাপাশি", অন্যটি "দিনের আলোয়।"

> দুটি পাশাপাশি বাড়ি। একটি বাড়িতে থাকে অনাদি আর পদ্ম। অন্যটিতে অক্ষয় আর অম্বুজা। অনাদি আর অক্ষয় রেলে কাজ করে। অনাদি রোজ বৌকে মারধোর করে। কিন্তু সে বৌকে ভালবাসে। অক্ষয় নিরীহ ভোলানাথ, দিনরাত দাবার চাল ভাবে। আর বৌর প্রতি তার কোন বিশেষ খেয়াল নেই। এক একদিন অনাদি রাত্রে বৌকে এমন মারধোর করে যে অম্বুজা আর স্থির থাকতে পারে না। সে স্বামীকে বলে, একটা কিছু ব্যবস্থা কর। তা না হলে পদ্ম যে মরে যাবে। অম্বুজা পদ্মকে ভালবাসত। তার জন্য তার খুব কষ্ট হত। কিন্তু ধীরে ধীরে জানতে পারল যে অনাদি রেগে গিয়ে খুব মারধোর করে, গালাগালি দেয় কিন্তু রাগ কমে গেলেই আবার বৌর পায়ে ধরে সাধাসাধি করে। তাকে খুশি করার জন্য শাড়ি দেয়, গহনা দেয়। আর অম্বুজা দেখতে পেল যে তার স্বামী নিরীহ, ভালমানুষ। সে বৌকে কখনও খারাপ কথাও বলে না। কিন্তু সে যে একটা মানুষ সে অনুভূতিই তার নেই। তার দুঃখ-সুখের ভাগ সে নিতে চায় না। সে শুধু দাবার চালই ভাবে। কে সুখী? এই সময় একদিন অফিসে একটা উৎসব হল। দুই বৌই সেজে গুজে উৎসবে গেল। রাত্রে তারা দুজনে একসঙ্গে ফিরে এল। স্বামীরা পরে ফিরবে। অম্বুজা বাড়ি ফিরে স্বামীর প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু অক্ষয় তখন অন্যজায়গায় বন্ধুর বাড়িতে দাবার আসরে জমে গেছে। এতক্ষণ ধরে যে নারী তার জন্য প্রতীক্ষা করছে তার অনুভূতির কোন মূল্যই নেই তার কাছে। অম্বুজা বহু দুঃখে অভিমানে তার সাজসজ্জা টেনে ফেলল, তার প্রসাধন মুছে ফেলল। পরের দিন সকালে হঠাৎ অম্বুজা শুনতে পেল পদ্ম কাঁদছে। অনাদি চিৎকার করছে। অক্ষয় বলল, অনাদি একটা অমানুষ। কিন্তু অম্বুজা আজ কোন কথা বলল না। কারণ সে ভাবছিল যে এই নির্যাতনের পরেই তার জন্য আবার ভালবাসা অপেক্ষা করে আছে।

> তার নিঃসঙ্গ জীবন হাহাকার করে উঠল। এই নিস্তরঙ্গ শান্তির চেয়ে অনেক ভাল এই নির্যাতন।

এই কাহিনীটির ঘটনা দ্রুত, সংক্ষিপ্ত এবং অত্যন্ত বাস্তবানুগ। চরিত্রগুলিও জীবন্ত। সর্বোপরি পদ্ম ও অম্বুজা দুজনেরই মন ঘটনার মধ্যে দিয়ে নিপুণভাবে প্রকাশ করেছেন লেখক। নারীর বিচিত্র মনের একটি বিচিত্র প্রকাশ গল্পটিকে উপভোগ্য ও অত্যন্ত স্মরণীয় গল্প করেছে।

'দিনের আলোয়' গল্পটিতে অদৃষ্ট পীড়িত, লাঞ্ছিত জীবনের একটি চমৎকার কাহিনী। প্রতিকারহীন, উপায়হীন অন্ধজীবনের মধ্যে যার জন্ম তার মৃত্যু এই অন্ধজীবনের মধ্যে হতেই হবে—এই রকম একটা অনিবার্যতা গল্পটিকে নির্মম সৌন্দর্য দান করেছে। একটি হতভাগ্য নারী আর হিংস্র মদ্যপ স্বামী। একদিন গভীর রাত্রে সেই মদ্যপ হিংস্র ক্রূর স্বামী এই নিরীহ নিঃসহায় মেয়েটিকে বার করে দিলে। সেই ভয়াবহ রাত্রিতে তাকে আশ্রয় দিল এক হৃদয়বান মাতাল। রাত্রে অসহ্য যন্ত্রণা ও পীড়নের পর এই স্নেহ তার জীবনে অপ্রত্যাশিত ছিল। এই রাত্রির অন্ধকারে সেই আশ্রয়ে সে বড় তৃপ্তি, বড় শান্তি পেয়েছিল। সেই মাতালটি তাকে মাতৃ সম্বোধন করেছিল। কিন্তু রাত্রি শেষ হল। আর উপায় নেই। সে আর সেখানে থাকতে পারে না। বাইরে কঠিন সমাজ। সবাই ভাববে সে সেই পুরুষের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত। তাই দিনের আলোয় সে আবার ফিরে যেতে চায় তার স্বামীর কাছে—তার অত্যাচার ও নিপীড়নের মধ্যে অনিবার্য মৃত্যুর মধ্যে। এই গল্পটি ভারতী গোষ্ঠির লেখকদের গল্পগুলির মধ্যে অন্যতম।

ভারতীগোষ্ঠির লেখকদের মধ্যে আর একজনের নাম উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গ শেষ হতে পারে। তিনি প্রেমাঙ্কুর আতর্থী (১৮৯০)। প্রেমাঙ্কুর আমাদের আলোচ্যকালে খুব বেশী গল্প লেখেননি। তাঁর বাজীকর (১৯২২) নামে একটি গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি ভারতী গোষ্ঠির লেখকদের মতই শিশু-সাহিত্যে কৌতুহলী ছিলেন। তাঁর রচনাভঙ্গি ভারতী গোষ্ঠির অন্যান্য সকলের থেকে স্বতন্ত্র। ব্যঙ্গ ও হাস্যরসসৃষ্টি তাঁর প্রতিভারই বৈশিষ্ট্য। তাঁর একটি গল্প উদাহরণস্বরূপ নেওয়া হল "পূর্বজন্মের প্রিয়া"। লক্ষ্য করা যাক তাঁর ভাষাভঙ্গি :

> "বহুকালের পুরাতন পোষমানা পত্নীটি অনেকদিন ধরে শাসিয়ে কোনরকম অবসর না দিয়ে দেহ-পিঞ্জর ছেড়ে পলায়ন করেছেন।" পঙ্কজের স্ত্রীর মৃত্যুর পর হরিদাসের হাত দেখার খ্যাতি বেড়ে গেল কারণ সে নাকি আগেই এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। ইতিমধ্যেই হরিদাসেরও গুরু জ্যোতিষার্ণব এসে হাজির। সে এসে বললে আপনি পূর্বজন্মে নব্বই বছর বয়সে বিয়ে করে মরেছিলেন। সেই স্ত্রী এখনও জীবিত। অনেক যাগযজ্ঞ করে জ্যোতিষার্ণব তার ঠিকানাও দিলেন। শহর থেকে বহুদূরে এক একশবছরের পুরানো বটগাছ ছাড়িয়ে মাইল পাঁচেক পশ্চিমে গিয়ে আবার মাইল দুয়েক উত্তরে।
>
> জ্যোতিষার্ণবকে নিয়ে নায়ক বেরিয়ে পড়লেন। গ্রামে সোরগোল পড়ল।

কেউ বলল ভণ্ড, কেউ জুয়াচোর। তবুও ভক্ত হল কিছু। কারো কারো অসুখও সারতে লাগল। এই সময় এলেন রাণীমা—তিনিই পূর্বজন্মের প্রিয়া। এক বৃদ্ধের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল—সে মারা গেছে। কাজেই রাণীমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা শুরু হল। গল্পের শেষে অবশ্য নায়ক এবং জ্যোতিষার্ণব "প্রহারেণ ধনঞ্জয়" হবার আগেই "যঃ পলায়তি সঃ জীবতি"র আশ্রয় নিলেন।

এই গল্পে প্রেমাঙ্কুরের ব্যঙ্গ, সমাজের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে কশাঘাতের শক্তি, স্পষ্ট। অন্যান্য গল্পের বহু জায়গায় তাঁর ভাষা সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমন

"সতীশ ছেলেবেলা থেকে কল্পনায় ভবিষ্যতের জন্য যে নন্দন কাননের সৃষ্টি করেছিল, বাপের এক তাড়ায় দেখতে পেলে সেখানে গুচ্ছে গুচ্ছে সরিষার ফুল সূর্যের আলোয় ঝকমক করছে।" (বাজে গল্প)

"পৃথিবীর অধিকাংশ চরিত্রবান লোকের মতন চরিত্র হারাবার সুযোগ সে বেচারীর আজও পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি।" (কালীপুজোর রাত্রি)

প্রেমাঙ্কুর প্রমথ চৌধুরীর মতই আমাদের অলস রোমান্টিক ভাবালুতাকে আক্রমণ করেছেন। তাঁর 'নিদ্-কা ইলাচী' গল্পটি সেই ধরনেরই। তবে মানুষের হৃদয়ানুভূতিকে তিনি কখনও ঠাট্টা করেন নি—তার প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস ও দরদ।

ভারতীগোষ্ঠির লেখকেরা বাংলা গল্প সাহিত্যে নতুন সুর সংযোজন করেছিলেন। তাঁদের সকলেরই ভাষা ছিল মার্জিত, রুচি ছিল পরিশীলিত, চিন্তা ছিল পরিচ্ছন্ন। একদিকে তাঁরা বাংলা গল্পের রোম্যান্টিকধারাকে পরিপুষ্ট করেছেন। মণীন্দ্রলাল বসুর মত উদ্দাম উধাও যৌবনের সৌন্দর্য সন্ধান ও রহস্যাভিসার যদিও দেখা যায়নি—তবুও দেখা গেছে জীবনকে মধুর করে, সুন্দর করে দেখার চেষ্টা। কল্পনা দিয়ে, আদর্শ দিয়ে বাস্তবের অপূর্ণতাকে পূর্ণ করে নেওয়া। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'কপোত-কপোতী' প্রায় কবিতা। তাঁর 'যশের মূল্য' গল্পে যেখানে এক শিল্পী প্রিয়পুত্রের প্রাণেব বিনিময়ে ছবি আঁকেন—আদর্শবাদের চরম। আবার অন্যদিকে ভারতীগোষ্ঠিই কল্লোলের অগ্রদূত। এখানকার লেখকগোষ্ঠির বহু প্রিয় বিষয়ই পরে কল্লোল গোষ্ঠির লেখায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের "কেরাণী" যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের "শুধু কেরাণী"র অগ্রদূত এতে কোন সন্দেহ নেই। ঐতিহাসিক দিক থেকে 'কল্লোল' 'ভারতীর' বিবর্তন। দুই দলই চেয়েছে বাংলা গল্পের গতানুগতিকতা থেকে মুক্তি। দুই দলই চেয়েছে বিশ্ব সাহিত্যের অনুবাদ। দুই দলই জীবনের অন্ধকার ও অবহেলিত দিকগুলির প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন। ভারতী গোষ্ঠি রবীন্দ্রনাথের ভক্ত। কল্লোল রবীন্দ্রবিদ্রোহী। কিন্তু বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের ভক্ত হয়েও যে রবীন্দ্রনাথের থেকে আলাদা থাকা যায় তার প্রমাণ সবুজপত্র। সবুজপত্রের অস্ত্র ছিল বুদ্ধি ও যুক্তি। কল্লোলের অস্ত্র ছিল প্রচণ্ড আবেগ। সেই

আবেগের প্রথম সূচনা ভারতীতে। আর সবুজপত্র উন্মুক্ত করল চিন্তা ও যুক্তির পথ।

১৩২১ বাংলা সালের বৈশাখ মাসে সবুজপত্র প্রকাশিত হল। রবীন্দ্রনাথ গোড়া থেকেই সবুজপত্র প্রকাশের পেছনে ছিলেন।১ তিনি চেয়েছিলেন নতুন কাগজ যেখানে সাহিত্য সমাজের দীর্ঘদিনের পাপের পঙ্কিলতাকে আক্রমণ করবে। সংগ্রামের উদ্দেশ্য নিয়েই তার জন্ম। সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী বললেন "নতুন কিছু করবার জন্য নয়, বাঙালীর জীবনে যে নূতনত্ব এসে পড়েছে তাই পরিষ্কার করে প্রকাশ করার জন্য" সবুজপত্রের প্রকাশ। এই নূতনত্বকে প্রকাশ করার উপায় হল আত্মচিন্তার।

> "দেশের অতীত ও বিদেশের বর্তমান এই দুটি প্রাণশক্তির বিরোধ নয়, মিলনের উপর আমাদের সাহিত্যের ও সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।"

অন্যত্র তিনি এই কথাকেই অলঙ্কারে সাজিয়ে বলেছেন, "বন্ধ ঘরে সবুজ দুঃখে পাণ্ডু হয়ে যায়। আমাদের নবমন্দিরের চারদিকের অবারিত দ্বার দিয়ে প্রাণবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের যত আলো অবাধে প্রবেশ করতে পারবে। শুধু তাই নয়, এ মন্দিরে সকল বর্ণের প্রবেশের সমান অধিকার থাকবে। ঊষার গোলাপি, আকাশের নীল, সন্ধ্যার লাল, মেঘের নীললোহিত, বিরোধালংকারস্বরূপে সবুজপত্রের গাত্রে সংলগ্ন হয়ে তার মরকতদ্যুতি কখনো উজ্জ্বল, কখনো কোমল করে তুলবে। সে মন্দিরে স্থান হবে না কেবল শুষ্কপত্রের।"২

নারায়ণ পত্রিকায় বিপিনচন্দ্র পাল এইসময় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছিল। ফলে তিনি সবুজপত্রের বিরুদ্ধেও লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাপারে প্রমথ চৌধুরীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন।৩ ১৩২১-এর শ্রাবণ মাসে রবীন্দ্রনাথ সবুজপত্রে "স্ত্রীর পত্র" নামে গল্প লেখেন। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর বিরুদ্ধে নারায়ণের প্রথম সংখ্যাতেই লিখলেন "মৃণালের কথা"। বিপিনচন্দ্র বললেন রবীন্দ্রনাথের মৃণালের ভাষা অস্বাভাবিক। তাঁর নায়িকা তাই অন্যকে আক্রমণ করে বলেঃ

> "লেখার খুব বাহাদুরি আছে ঠিক যেন রবিঠাকুরের মতন।"

কোথাও ঠাট্টা করেছেন

> "তোমার মেজবৌ আমায় গাছটা দেখিয়ে বল্লে দেখেছ নরেন, ঐ গাব গাছে কেমন লাল লাল পাতা বেরিয়েছে। আমি বললাম, গাবগাছ কৈ দিদি, এটা যে আমগাছ। দিদি বললেন, আমগাছ কখনই নয়। তুমিও এতবড় একটা মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত কচ্ছো।"

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিঠিপত্র (৫ম), ১৮নং, ১৯নং, ২১নং, ২২নং, ২৩নং
২। প্রমথ চৌধুরী ঃ প্রবন্ধসংগ্রহ, (১) সবুজপত্র। পৃঃ ৪২।
৩। রবীন্দ্রনাথ ঃ চিঠিপত্র (৫ম) ২৯নং চিঠি।

এই ধরনের আক্রমণ নিতান্ত নীচতা ছাড়া আর কিছু নয়। বিপিনচন্দ্রের মৃণাল, রবীন্দ্রনাথের মৃণালের বিরুদ্ধে ঠিক উল্টো কথা বলে :

> "বড় সাধ হয়েছে এবার যদি তুমি এ কলঙ্কিনীকে আবার চরণাশ্রয় দাও তবে তোমার মধ্যে ও তোমার পরিজনের মধ্যে একেবারে ডুবে গিয়ে এ নারী-জন্মটা সার্থক করি।...তুমি আমায় রাখ বা ছাড় যাই কর না কেন আমি তোমারই চিরদিনের চরণাশ্রিতা মৃণাল।"

এই হল রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল হিন্দুত্বের আক্রমণ। রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে বললেন এইখানে আক্রমণ করতে হবে :

> "মানুষের চিত্তকে একজন লোক বরাবর জাগিয়ে রাখতে পারে না—সেই জাগিয়ে রাখাটাই আসল কথা, কোনো কিছু দান করার মূল্য তেমন বেশী নয় নূতন শক্তির অভিঘাতে মানুষ জাগে—পুরাতনের বাণী অতি অভ্যাসে আর মনকে ঠেলা দেয় না।"১

প্রমথ চৌধুরী অবতীর্ণ হলেন এই মনোভাব নিয়ে। তখন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় কিংবা বিপিনচন্দ্র পাল—সকলকেই প্রয়োজনবোধে প্রমথ চৌধুরী আক্রমণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম সংখ্যাতেই লিখেছেন 'আধ মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা'। সবুজপত্র সেই ঘা দিল বাঙালীর চেতনায়। প্রমথ চৌধুরীর এক ভক্ত লিখেছিলেন, "সাহিত্য মানুষকে অন্ন দিতে পারে না কিন্তু চেতনা দিতে পারে। সেই চেতনা থেকে বঞ্চিত ছিল আমাদের দেশ...সবুজপত্র চেতনাসঞ্চারের ভার নিল।"২

সবুজপত্রের নিয়মিত লেখক রবীন্দ্রনাথ। প্রথম থেকেই তাঁকে গল্পের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। মাসের পর মাস তিনি গল্প লিখেছেন।৩ এই গল্পগুলি বিশিষ্ট ধরনের। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন "আমার এই লেখাগুলি গল্পপিপাসু পাঠকদের বেশ ঢক ঢক করে খাবার মত হচ্ছে না—এগুলো গল্প না বল্লেই হয়" (২৬নং চিঠি); কখনও বলেছেন "কোন মতে টুক্‌রো সময়গুলোকে জোড়া দিয়ে দিয়ে ফকিরের কাঁথার মত ক'রে আমার এবারকার গল্পটা সেরেছি" (৩৪নং)। কয়েকটি গল্প স্পষ্টই

১। ঐ. ৩৩নং চিঠি।

২। অন্নদাশঙ্কর রায়—আধুনিকতা (প্রমথ চৌধুরী, সবুজপত্র ও আমি) পৃঃ ৩৮

৩। প্রথম সংখ্যায় হালদারগোষ্ঠি, তারপর প্রতিমাসে একটি করে গল্প, হৈমন্তী, বোষ্টমী, স্ত্রীর পত্র ভাইফোঁটা, শেষের রাত্রি, অপরিচিতা। ১৩২৪-এর মাঘ-এ তোতাকাহিনী, ১৩২৫ ফাল্গুনে স্বর্গমর্ত্য, ১৩২৬ বৈশাখ মুক্তির ইতিহাস, আষাঢ়, কথিকা (পরে "প্রথম শোক" নাম), শ্রাবণ, কথিকা (পরে "অস্পষ্ট") কার্তিক বাঁশি, অগ্রহায়ণ কথিকা (পরে "গলি") ফাল্গুন, আমার কথা (পরে "প্রাণমন"), ১৩২৮ ভাদ্র 'পট', মাঘ 'সিন্ধি'।

যেন সমাজসংসারের ব্যবস্থার প্রতি চালিত—যেন রবীন্দ্রনাথ আক্রমণের পথ নিয়েছেন। 'হৈমন্তী' গল্পে প্রধান পুরুষের কাপুরুষতা আর 'নামাঞ্জুর গল্প' ও 'সংস্কার' দুটিতেই তৎকালীন স্বদেশীয়ানার বিরুদ্ধে কবির বিদ্রূপ। ঘরে যখন ভাই অসুস্থ ঠিক তখনই বোন বিশ্বজোড়া ভাইফোঁটা দেবার সংকল্প করছে। যারা দেশব্রত নিয়েছে তারাই যখন অমিয়ার জন্মবৃত্তান্ত শুনেছে তাদের উদারতা চরম সংকীর্ণতায় পরিণত হয়েছে। দেশে যখন চরখা খদ্দর সেবা চলেছে তখনই মেথর বলে একটি মানুষকে স্বদেশীরা অপমান করছে। রবীন্দ্রনাথ তাই ব্যঙ্গ করেছেন এই মনুষ্যত্বহীনতাকে, হৃদয়হীনতাকে। হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতাকে ব্যঙ্গ ও আঘাত করেছেন 'স্ত্রীর পত্রে' 'তপস্বিনী'তে। তপস্বিনী গল্পে বরদা বাপের শাসন থেকে মুক্তি পাবার জন্য সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করল। রইল তার ষোড়শী স্ত্রী। সে ঘরে বসে স্বামীর ধর্ম অনুসরণ করতে লাগল। ঘরে দিনে দিনে সন্ন্যাসীদের ভীড় লাগল। তারা বললে, বরদা এখন হিমালয়ের সুউচ্চ শিখরে বসে জপ করছে। এই মূঢ় ধর্মান্ধতা ও ভজন-পূজনের অসারতার ওপর তীব্র চাবুকের মত একটি ঘটনা ঘটল—একদিন "সাহেবি কাপড়পরা এক যুবা টপ করিয়া লাফাইয়া নামিয়া মাখনের ঘরে আসিয়া একটা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ভাবের নমস্কারের চেষ্টা করিয়া বলিল, 'চিনতে পারছেন না।' এই সেই বরদা। সে আমেরিকায় গিয়েছিল খালাসি হয়ে। এখন কাপড়কাচা সাবানের এজেন্ট হয়ে ফিরেছে।

'তোতাকাহিনী'ও উদ্দেশ্যমূলক লেখা। স্যাডলার কমিশনের শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রূপ করেছেন এই চমৎকার কাহিনীটিতে। এই সময়কার গল্পগুলির মধ্যে উদ্দেশ্যমূলকতা অতি স্পষ্ট। কয়েকটি গল্প তার ব্যতিক্রম। বোষ্টমী, শেষের রাত্রি বা পয়লা নম্বর। 'বোষ্টমী' গল্পটি যেন রবীন্দ্রনাথের এই কালের গল্পধারায় ব্যতিক্রম। হঠাৎ যেন তিনি আবার শিলাইদহে ফিরে গেছেন। পল্লীবাংলার আষাঢ় মাসের শ্যামলসজলশান্তি আকাশে প্রান্তরে ছড়ানো। তখন বৈষ্ণবীর সঙ্গে প্রথম দেখা। আবার দেখা মাঘের শেষে "দক্ষিণে বাগানের ঝাউগাছগুলার মাথার উপর দিয়া একেবারে দিক্‌সীমা পর্যন্ত মাঠ ধূ ধূ করিতেছে। পূর্বদিকে বাঁশবনে ঘেরা গ্রামের পাশে আখের খেতের প্রান্ত দিয়া প্রতিদিন আমার সামনে সূর্য ওঠে"—এমনই পরিবেশের কাহিনী। এর সঙ্গে যেন পূর্বকালীন গল্পের সঙ্গে যোগ বেশী। 'ভাই-ফোঁটা' ও 'শেষের রাত্রি' রবীন্দ্রনাথের উত্তরজীবনের শ্রেষ্ঠ দুটি গল্প। 'ভাইফোঁটা' গল্পের শেষে নায়কের মানসিক পরিবর্তনটি অত্যন্ত নিপুণ। বোনকে প্রতারণা করেছে ভাই। তার ছেলেকে ভাই স্নেহ দেয়নি, আশ্রয় দেয়নি—তাকে তিলে তিলে ক্ষয়ের দিকে নিয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ:

> "এ যে রক্ত! ক্রমে রক্ত ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে আমি যেখানে ছিলাম তার চারিদিক রক্তে ভিজিয়া উঠিল। আমার খোলা জানালার বাহির হইতে

সন্ধ্যাতারা দেখা যাইতেছিল; আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইলাম;
আমার হঠাৎ কেমন মনে হইল, সন্ধ্যাতারাটি ভাইফোঁটার সেই চন্দনের ফোঁটা।"
'শেষের রাত্রি' গল্পটি আরও উচ্চস্তরের। মৃত্যুপথযাত্রী স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসায়, কল্পনায় এক আশ্চর্য প্রতিমার মত সৃষ্টি করেছে। সে ভাবে তার স্ত্রী তাকে ভালবাসে। কিন্তু মণি স্বামীর প্রতি উদাসীন। মাসী স্বামীকে মিথ্যা কথা বলে শুধু সান্ত্বনা দেবার জন্য। স্বামী মৃত্যুর পদধ্বনি শোনে আর স্বপ্ন দেখে "এই ঘরের বধূ মণি, এই একটুখানি মণি, আজ বিশ্বরূপ ধরিল, জীবনমরণের সংগম-তীর্থে ঐ নক্ষত্রবেদীর উপরে সে বসিল, নিস্তব্ধ রাত্রি মঙ্গলঘটের মতো পুণ্যধারায় ভরিয়া উঠিল।" কিন্তু একদিন সে জানতে পারে যে মণির ভালবাসা মিথ্যা। তার কল্পনা মিথ্যাকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে। কী গভীর শূন্যতা, কী ভয়াবহ রিক্ততা নিয়ে স্বামী মৃত্যুকে বরণ করে। সম্রাট মৃত্যুর মুহূর্তে জেনে গেল, তার সাম্রাজ্য প্রহেলিকা, তার ঐশ্বর্য মরীচিকা, তার প্রাসাদ তাসের ঘর।

রবীন্দ্রনাথ এরপর ছোট ছোট গদ্যপদ্যময় রচনা প্রকাশ করতে আরম্ভ করলেন। তাই পরে লিপিকা গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এই ধরনের রচনাকে 'কথিকা' বলা যেতে পারে।[১] এই কথিকাগুলি পরবর্তী ও সমকালীন বহু লেখককেই প্রভাবিত করেছিল। সবুজপত্রের লেখকরাও কেউ কেউ সেই ধারায় গল্প রচনায় উৎসাহী হন। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর "নতুন রূপকথা ও একটি রূপক গল্প" (১৯২০) একটি সুখপাঠ্য কাহিনী। এই কাহিনীটি লিপিকার গদ্যভঙ্গীতে লেখা। অনুরূপ ভঙ্গীতেই লেখা দু-একটি গল্প পাওয়া যাবে কিরণশংকর রায়ের 'সপ্তপর্ণ'এ।[২] কিরণশংকরের লেখায় রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী দুজনেরই প্রভাব স্পষ্ট। তাঁর রচনা অত্যন্ত মার্জিত, ভাষা সুন্দর, রুচি অনুশীলিত। তাঁর অভিজ্ঞতা সম্ভবত বেশী ছিল না। তাঁর গল্পগুলি তাই আবেগপ্রধান, কবিত্বময় ও কল্পনা দিয়ে গড়া। কিন্তু ঘটনাসৃষ্টি, চরিত্র সৃষ্টি ও কাহিনী গ্রহণের ক্ষমতা তাঁর ছিল। 'শুকতারা' গল্পটি বিশ্লেষণ করলে তার সত্যতা ধরা পড়বে।

জমিদারের ছেলে অবিনাশের বাড়িতে বর্তমান নায়কদের আড্ডা বসত। অল্প বয়সে বাবা মারা যাওয়াতে অবিনাশই ছিল সেই বাড়ির কর্তা। তখনও সবাই ছাত্র, কেউ সংসারের সঙ্গে পরিচিত নয়। একদিন হঠাৎ অতি গম্ভীর আলোচনার ফাঁকে

১। রবীন্দ্রনাথ : চিঠিপত্র (৫ম) ৮০নং

২। 'সপ্তপর্ণে' শুকতারা, কাহিনী, ক্ষেমী, হেঁয়ালী, সাহিত্যসভা, কবির বিদায়, স্বপনদিশারী। শেষ দুটি গল্প 'কথিকা' শ্রেণীর। Richard Middleton-এর রচনা অবলম্বনে রচিত।

অমল তার প্রেমের কাহিনী শুরু করল। ক্ষণিকের জন্য একটি মেয়েকে সে দেখেছিল—তারপর হঠাৎ তার চলে যাওয়াই হল গল্পের শেষ। অমল বলছিল,

> "এক মুহূর্তের মধ্যে আমার ভিতর-বাহির বদলে গেল। মনে হল সে যেন একান্ত আমার আপনার। আমি দেখতে পেলাম সে বসে আছে বাসর ঘরের পাটির উপর লজ্জাবনত হয়ে আমার আগমনের প্রতীক্ষায়। সারাদিনের উপবাসে তার মুখটি শুকিয়ে গেছে। আমি যাচ্ছি আলো জ্বালিয়ে, বাজনা বাজিয়ে, আমার মাথায় মুকুট, গলায় ফুলের মালা। যুগে যুগে আমি তাকে পেয়েছি কখনও কালো ঘোড়ার উপর চড়ে মন্ত্রপূত বাঁকা তলোয়ার হাতে করে দৈত্যপুরী থেকে তাকে উদ্ধার করে। আসন্ন সন্ধ্যায় তেপান্তরের মাঠ ধু-ধু করছে—সে যেন আর ফুরোয় না—সমস্ত দীর্ঘ পথটা তার দুই ক্ষীণ বাহু দিয়ে আমাকে সে জড়িয়ে ধরেছে—"

শুধু ক্ষণিকের জন্য যে প্রেম তার অনুভবটুকু, প্রতিবেদনটুকু লেখক চমৎকারভাবে ফুটিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরীর মতই তিনিও আসরের মধ্যে প্রেমের কাহিনী শুরু করেছেন। কখনও প্রমথ চৌধুরীর মতই রসিকতা করেছেন "তারও আগে স্ত্রীবেশধারী একটি যাত্রাদলের ছোকরাকে বিয়ে করবার ইচ্ছে হয়েছিল, তবে সেটা বিশেষ গুরুতর হয়নি।" কাহিনীটির মধ্যে ভাব বা আবেগ প্রধান। আবার "কাহিনী" গল্পটি আবহপ্রধান। কাহিনী এখানে অতীত কালের। মহালক্ষ্মীপুরের ভগ্নস্তূপের মাঝখানে কাহিনী শুরু। এককালে মহালক্ষ্মীপুরের প্রাণ ছিল। তার শেষ রাজা সহদেব রায় আর রাণী মহামায়া। কোম্পানীর রাজত্ব আরম্ভ হবার সময় রাজারা ছিলেন দুভাই। সহদেব আর কীর্তি। তখন পুজোর সময়। দেবীপক্ষ। বোধন হয়ে গেছে। সহদেব আহ্নিকের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন এমন সময় রক্তঝরা দেহে, ধুলোমাখা পায়ে হরিহর পাঠক এলেন। বললেন তাঁর বিধবা কন্যা কাল দীঘিতে জল আনতে গিয়ে আর ফেরেনি। কী তার বিচার? রাজা বুঝলেন কিন্তু কিছুই করলেন না। রাণীও কিছু করলেন না। মহামায়ার দরবারে শেষ নালিশ জানিয়ে হরিহর দিঘিতে ডুবে মরলেন। সেদিন দেবীর বলি আটকে গেল। রক্তাক্ত মহিষ হাড়িকাঠ উঠিয়ে নিয়ে পাগলের মত ছুটতে লাগল।

মহাষ্টমীর রাত্রে হুমহুম করে এসে দাঁড়ালো হে সাহেবের পাল্কী। চলল নাচগান, মদের ফিনকি। বিদায় হলেন সাহেব। তারপর অন্ধকারে, যখন বেহারাদের গান আর ঝিল্লীর শব্দ ছাড়া কিছুই শোনা যায় না তখন হঠাৎ কারা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল পাল্কীর ওপর। শুধু খলখল করে হাসি শোনা গেল। অন্ধকারের মধ্যে জ্বলে উঠল কৃপাণ। ইছামতির কালো জলে ছড়িয়ে পড়ল তাদের মৃতদেহগুলি। ব্রাহ্মণের অভিশাপ নেবে এল। গল্পটির মধ্যে পুরোনো যুগের বাংলার জমিদারজীবন মোহের মত আকর্ষণ করে। প্রমথ চৌধুরীর "আহুতি" গল্পটি এই গল্পকে প্রেরণা দিয়েছে বলে মনে হয়।

'ক্ষেমি' ও 'হেঁয়ালী' দুটি গল্পই একসুরে বাঁধা। ক্ষেমী গল্পটি উল্লেখ করি। ক্ষেমী নায়িকার পিসতুত ননদ। যখন নায়িকার বারো বছর বয়স, তখন ক্ষেমীর বয়স পাঁচ। তার রূপ নেই, গুণও নেই। আছে তার নোংরা কাপড়, বড় বড় ময়লা নখ। আমজামের বাগানে তার দিন কাটে। সবাই তাকে মারে ধরে। সবাই খেতে পায়, পরতে পায়, কিন্তু ক্ষেমীর ভাগ্যে নেই। এই ক্ষেমীর জীবনে এল একদিন পরিবর্তন। সে ভালবাসল। ভালবাসার স্পর্শে তার দেহমন হল সজীব। কিন্তু দুর্ভাগ্য সে মারা গেল যক্ষ্মায়। আজ তার মৃত্যুর পরে তাকে ভালবাসত যে একটি দুটি লোক শুধু তাদের চোখেই জল—কিন্তু মিত্তির বাড়ির প্রকাণ্ড রথের তলায় সে চিরকালের জন্যই হারিয়ে গেল। গল্পটি কিঞ্চিৎ ভাবালুতাদুষ্ট। 'সাহিত্য-সভা' গল্পটি 'শুকতারা'র সমগোত্রীয়। ছোট মুহূর্তের ভালবাসা, ক্ষণিকের দুঃখ --এই নিয়েই কিরণশংকরের কাহিনী।

সবুজপত্র বাংলাদেশে একটি বিশেষ রুচি ও বিশেষ সাহিত্যিক আদর্শ রচনা করেছিল। প্রমথ চৌধুরী বিশ্বাস করতেন সাহিত্যের আদর্শ সুন্দরের রচনায়—নীতি-দুর্নীতির ঊর্ধ্বে যে সৌন্দর্য তাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তখনকার রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের সামনে, নীতিবাদীদের সামনে তিনি রাখলেন সেই সাহিত্যের আদর্শ। তাঁর নিজের ও তাঁর শিষ্য ও ভক্তদের রচনা সেই আদর্শের প্রকাশ মাত্র। এই আদর্শকে আক্রমণ করল কিছুকাল পরেই একদল তরুণ সাহিত্যিক। তারা রক্ষণশীল নয়। তারা 'আধুনিক।'

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

॥ প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্প ॥

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) বাংলা সাহিত্যের অতি বিশিষ্ট লেখক। রবীন্দ্রনাথের সমকালীন লেখকদের মধ্যে শরৎচন্দ্র ছাড়া এত বিশিষ্টতা কারো ছিল না। তিনি যে রুচি ও মেজাজের অধিকারী ছিলেন তা বাংলা সাহিত্যে বিরল। তিনি ছিলেন ফরাসী সাহিত্যের রসজ্ঞ। অন্যদিকে সংস্কৃত সাহিত্যের সংগে ছিল তাঁর পরিচয়। ফরাসী গদ্য ক্ষিপ্রতা ও লঘুতার জন্য বিখ্যাত। সেই ক্ষিপ্রতা ও লঘুতার শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেছিলেন ফরাসী সাহিত্যের কাছে। আবার ক্লাসিকাল সাহিত্যের বলিষ্ঠতা, দেহ সম্পর্কে শুচিবায়ুহীনতা ও সৌন্দর্যের প্রতি তীব্র আসক্তিও তাঁকে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করেছে। তাঁর রচনার লক্ষণীয় ভঙ্গি হল শাণিত। ব্যঙ্গ ও আঘাতে তিনি সুনিপুণ। তাই ভারতচন্দ্র তাঁর প্রিয় লেখক। বাঙালীর স্বভাব-কোমল গীতিবিলাসিতা, অশ্রুপ্রিয়তা ও আবেগের অতিরিক্ততার প্রতি ঝোঁককে তিনি কখনই ব্যঙ্গ করতে নিরস্ত হননি। একদা তিনি বার্নাডশ'র প্রতি একটি কবিতায় লিখেছিলেন, 'হাতে যদি পাই আমি তোমার চাবুক এ জাতে শিখাতে পারি জীবনের মর্ম।' এই চাবুকের আঘাত তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির বিশিষ্ট উপাদান। এই চাবুকের আঘাত শুরু হয় প্রথম ১২৯৭ সালে 'ভারতী'তে 'জয়দেব' প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে জয়দেব সম্পর্কে প্রচলিত মতবাদকে তিনি আঘাত করেন ও প্রমাণ করতে চান যে জয়দেবের কাব্যে আধ্যাত্মিকতাও নেই, কাব্যও নেই। তাঁর কাব্যের কারুকলা মিথ্যা ও প্রাণহীন।

যা কিছু প্রচলিত, যা কিছু চিরাচরিত তাকে বিনাবিচারে প্রমথ চৌধুরী মেনে নিতে চাননি। 'বীরবল' ছদ্মনাম নিয়ে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন— তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে অভিরুচি, সূক্ষ্মভাবে আঘাত করার ক্ষমতা, কথার মারপ্যাঁচ ও তর্কের প্রবৃত্তি নিয়ে। 'সবুজপত্র' প্রকাশের সংগে সংগে তাঁকে ঘিরে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠি গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই গোষ্ঠির পৃষ্ঠপোষক। একদিকে এই গোষ্ঠি বাংলা সাহিত্যে আনতে চাইলেন আবেগের চেয়ে যুক্তিবাহুল্য, উচ্ছ্বাসের চেয়ে সংযম। আর অন্যদিকে এই গোষ্ঠির মতবাদ হল যে সাহিত্য বা শিল্পের কোন সামাজিক বা নৈতিক উদ্দেশ্য নেই। সাহিত্য উদ্দেশ্যহীন। সাহিত্যে জীবনের খেলা বা লীলা। অর্থাৎ তার একমাত্র লক্ষ্য আনন্দ। নীতির চেয়ে সৌন্দর্য বড়, উদ্দেশ্যের চেয়ে আনন্দ বড় এই হল প্রমথ চৌধুরী ও তাঁর গোষ্ঠির সাহিত্য-মতবাদ।

প্রমথ চৌধুরীর প্রথম গল্প রচনা ফুলদানী (১২৯৮)। একটি ফরাসী গল্পের অনুবাদ। এই অনুবাদ পড়ে সমকালীন সমালোচকেরা (রবীন্দ্রনাথও ছিলেন) গল্পের বিরুদ্ধে নৈতিক অভিযোগ করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ মানেননি। কারণ তিনি মনে করতেন সাহিত্যে জীবনের বিচিত্রলীলাই প্রকাশিত হচ্ছে এবং সাহিত্যিক ইস্কুলের মাস্টারমশাই নন। এই অনুবাদ গল্পটির পর আরো দুটি গল্প প্রকাশিত হয়। 'প্রবাস স্মৃতি' গল্পে আবার এই নীতি ভঙ্গের প্রচেষ্টা দেখা যায়। যৌবনের উচ্ছলতা, নারীর প্রতি আসক্তি ও সামাজিক বিধিনিষেধকে লঙ্ঘন করে যৌবনের উদ্দাম শক্তির বিকাশকে এই গল্পে তিনি দেখেছেন। কিন্তু এই গল্পগুলির পর তিনি বহুকাল কোন গল্প লেখেননি। এই গল্পগুলিতে তাঁর মনের শক্তি প্রকাশিত কিন্তু রচনার শক্তি এখনও অপরিণত।

তাঁর পরিণত শক্তি ও চিন্তার প্রকাশ চারইয়ারী কথা (১৯১৬), নীললোহিত (১৯৩২), ঘোষালের ত্রিকথা (১৯৩৭)। তাঁর গল্পগুলি একত্রে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাসহ ১৩৪৮ সালে (১৯৪১ খৃঃ) 'গল্পসংকলন' নামে প্রকাশিত হয়। তাঁর অধিকাংশ গল্প পড়ার পর দেখা যায় সমকালীন অন্য সকল লেখকদের থেকে তাঁর পৃথক গঠনভঙ্গী। তাঁর অধিকাংশ গল্পের মধ্যে মজলিসিভাব। গল্প একজন বলছেন—পাঁচজন শুনছেন। সবাই যে তাঁরা নীরবে শোনেন তা নয়, কখনও প্রশ্ন করেন, কখনও তর্ক করেন এবং কখনও হল্লা করে গল্পের অপমৃত্যু ঘটান। কোন গল্পে মকদমপুরের জমিদার রায়মহাশয় মসনদের উপর তাকিয়া হেলান দিয়ে গুড়-গুড়ির নল মুখে বসে আছেন—চারপাশে পণ্ডিতমশায়, স্মৃতিরত্ন বা উজ্জ্বল নীল-মনির মত সদস্য—আর 'গৌরবর্ণ ছিপছিপে টেড়িকাটা যুবক' ঘোষাল। কোন গল্পে নীল লোহিত বক্তা আর একদল আবার শ্রোতা। কোন কোন গল্পে যেমন 'চারইয়ারী কথা'য় একজন বক্তা, তিনজন শ্রোতা। আর কোন কোন গল্পে লেখক একাই পাঠকদের সম্বোধন করে গল্প বলেছেন, যেমন মন্ত্রশক্তি। প্রমথ চৌধুরীর এই গল্পের গঠনভঙ্গি তাঁকে সমকালীন লেখকদের চেয়ে পৃথক করেছে।

কিন্তু এই পার্থক্য বা বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রমথ চৌধুরীর ঋণ প্রধানত ত্রৈলোক্য-নাথের কাছে। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পগুলি (যেমন, নয়নচাঁদ, ডমরুধর) আসরের গল্প। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পেও একজন বক্তা, কয়েকজন শ্রোতা। শ্রোতারা মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করে, গল্পের স্রোত অন্যদিকে ঘুরে যায়। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর আসর ও ত্রৈলোক্যনাথের আসরের মধ্যে একটি বিশেষ পার্থক্য আছে। ত্রৈলোক্যনাথের আসর গ্রামের পরিবেশে। প্রমথ চৌধুরীর আসর নাগরিক। এই 'নাগরিকতা' গুণ প্রমথ চৌধুরীর রচনাশৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'নাগরিকতা' ধর্মটির সঙ্গে অনেকগুলি গুণ জড়িত। মার্জিত ভাষা, মার্জিত রুচি, মার্জিত চিন্তার সমন্বয় নাগরিকতা। সরল চিন্তা, সহজ জীবন, অমার্জিত আচরণ, কলাহীন আচারের

সমন্বয় গ্রাম্যতা। নাগরিকতার লক্ষ্য সরলতা নয়, সহজতা নয়, কলাপটুত্ব ও চাতুর্য। গ্রাম্যতার লক্ষ্য চাতুর্য নয় মাধুর্য। প্রমথ চৌধুরীর রচনার গুণ তাই চাতুর্য। তাঁর গল্পের মূল আকর্ষণ ঐ চাতুর্যে ও কলাপটুত্বে। এই পটুত্ব ত্রৈলোক্যনাথের গল্পে নেই।

ত্রৈলোক্যনাথের ডমরু সম্ভব-অসম্ভব নানা গল্পই বলে। প্রমথনাথের নীল-লোহিতও সেই ধরনের অসামান্য গল্প কথক। কিন্তু ডমরুর ক্ষমতা হল অদ্ভূত রসসৃষ্টিতে। অদ্ভুদ ও উদ্ভট সৃষ্টি করে সে সহজেই। আর প্রমথনাথের নীল-লোহিত কিংবা ঘোষালের কল্পনা আরো তীব্র, আরো গভীর—তারা সৃষ্টি করে সৌন্দর্য, তারা সৃষ্টি করে অপরূপ। ত্রৈলোক্যনাথের ডমরু এবং নয়নচাঁদ বৈষয়িক লোক, নীতিহীন ও ক্ষুদ্র শয়তান বিশেষ। কিন্তু তারা অসামান্য গল্পকথক। প্রমথ চৌধুরীর ঘোষাল ও নীললোহিত অসামান্য গল্পস্রষ্টা কিন্তু তারা দুজনই কল্পনাপ্রবণ, সূক্ষ্মচেতা। তাই সাংসারিক নীচতা ও ক্রূরতার বর্ণনায় ডমরু বা নয়নচাঁদ অদ্বিতীয়। আর সৌন্দর্য ও রূপসৃষ্টিতে ঘোষালও নীললোহিত অসামান্য। একাদশীর দিনে জল খেতে না দেওয়ায় যে মেয়ে মেঝে চেটে মারা যায় —সেই মেয়ের বর্ণনাকে নিষ্ঠুরভাবে বর্ণনা করতে পারে ডমরু। আর নারী মূর্তির বর্ণনায় ঘোষাল-ই বলতে পারে 'মূর্তিমতী আনন্দলহরী' কিংবা সংস্কৃত কবির ভাষায় 'তড়িল্লেখা তন্বীং তপনশশি বৈশ্বানরময়ী'।

প্রমথ চৌধুরী তাঁর সাহিত্য বিষয়ক মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে পুনঃ পুনঃ বলেছেন যে আনন্দই সাহিত্যের প্রাণ। সাহিত্যের উপাদান সত্য নয়, সাহিত্যের উপাদান কল্পনা। এই কল্পনাকে সাধারণ লোক মিথ্যা বলে ভাবে। তাই তাঁর গল্পের দুটি প্রধান কথক ঘোষাল এবং নীললোহিত মিথ্যাবাদী। আসলে তারা বাস্তব সত্যের চেয়েও কল্পনার সত্যকে ভালবাসে। বস্তুর চেয়ে মায়ার প্রতি তাদের অনুরাগ। দুজনেই রসিক ও রূপানুরাগী। দুজনেই সংগীত বিলাসী। ঘোষাল রায় মশায়ের সভায় চাকরী করত। সে গল্প বলত। সে সভায় সত্যিকার গল্প-রসিক কেউ ছিল না। তারা চাইত সত্যি কথা শুনতে। তাদের লক্ষ্য ছিল ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ। কিন্তু সাহিত্যের লক্ষ্য একটিও নয়। তাই ঘোষালের গল্প তারা বুঝতে পারত না। নীতির বাঁধন, সমাজের বাঁধন সব কিছু মেনে ঘোষালকে গল্প বলতে হত। তার সঙ্গে উপস্থিত সদস্যদের তর্ক বাধত। ফলে ঘোষালের গল্পগুলি আধখানা প্রবন্ধ ও আধখানা গল্প। প্রমথ চৌধুরীর অধিকাংশ গল্পের এই হল গঠন।

নীললোহিতের বর্ণনায় লেখক বলেছেন,

> 'গল্প বলবার সময় তাঁর দৃষ্টি আকাশে নিবদ্ধ থাকত, যেন সেখানে একটি ছবি ঝোলানো আছে আর নীললোহিত সেই ছবি দেখে তার বর্ণনা

করে যাচ্ছেন। সে চোখের তারা ক্রমান্বয়ে ডান থেকে বাঁয়ে আর বাঁ থেকে ডাইনে যাতায়াত করত, যাতে করে ঐ আকাশ পটের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত তার সমগ্র রূপটা এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর চোখের আড়াল না হয়, এই উদ্দেশ্যে। তারপর তাঁর মনে যখন তীব্র, কোমল, প্রসন্ন, বিষণ্ণ, সতেজ, নিস্তেজ ভাব উদয় হত, তাঁর চক্ষুদ্বয়ও সেই ভাবের অনুরূপ কখনো বিস্ফারিত, কখনো সংকুচিত, কখনো ত্রস্ত, কখনো প্রকৃতিস্থ, কখনো উদ্দীপ্ত, কখনো স্তিমিত হয়ে পড়ত।'

এ হল উৎকৃষ্ট কথকের ছবি।

নীললোহিত প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য চিন্তার আর একটি প্রকাশমাত্র। সাহিত্য সত্য নয়, সাহিত্য মায়া। তিনি বলেছেন শেষদিকে নীললোহিত গল্প বলা পরিত্যাগ করলেন। "তিনি আমার অনুরোধে একটি গল্প লিখেছিলেন। কিন্তু সেটি পড়ে দেখলুম একেবারে অচল। সে গল্প প্রথম থেকে শেষ লাইন তক্ পড়ে দেখি যে, তার ভিতর আছে শুধু সত্য, একেবারে আঁককষা সত্য, কিন্তু গল্প মোটেই নেই।"

সত্য কি শুধু বাস্তব প্রয়োজনের! যে মন কল্পনার জগৎ সৃষ্টি করে সে কি সত্য নয়? সেই জগৎ কি মিথ্যা? প্রমথ চৌধুরী এই প্রশ্ন করেছিলেন। তাই তিনি লিখেছেন "নীললোহিত যা বলতেন সে সবই হচ্ছে কল্পলোকের সত্য কথা।" প্রমথ চৌধুরীর গল্পের সবচেয়ে বড় পরিচয়ই হল এইখানে যে তা হল কল্পলোকের সত্য কথা।

গল্পে বাস্তব সত্যের প্রতি যেমন তাঁর বিরাগ ছিল, তেমনই প্রমথ চৌধুরীর বিরাগ ছিল নিত্যপরিচিত উপাদানের প্রতি। তিনি এক জায়গায় বলেছেন, 'যা নিত্য ঘটে, তার কথা কেউ শুনতে চায় না; ঘরে যা নিত্য খাই, তাই খাবার লোভে আর কে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায়? যা নিত্য ঘটে না, কিন্তু ঘটতে পারে তাই হচ্ছে গল্পের উপাদান'। তাই নীললোহিতকে সৃষ্টি করেছেন প্রমথ চৌধুরী, কারণ "নীললোহিতের জীবনে যত অসংখ্য অপূর্ব ঘটনা ঘটেছিল, তার একটিও লাখের মধ্যে একের জীবনেও একবারও ঘটে না।"

২

প্রমথ চৌধুরীর বেশীর ভাগ গল্পেই লক্ষ্য করা যায় সৌন্দর্য সম্পর্কে তীব্র আসক্তি। 'প্রবাসস্মৃতি' তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যৌবনের দুর্নিবার রূপাসক্তি ও তার সঙ্গে একটি কৌতুককর সমাপ্তি এই গল্পের প্রাণ। এই রূপাসক্তি যেমন তাঁর বহু গল্পের প্রাণ তেমনই এই কৌতুককর সমাপ্তিও তার গল্পগুলির ব্যর্থতার কারণ। নারীর রূপ তাঁর গল্পে বারবার বন্দনা পেয়েছে। বিভিন্ন গল্পে লিখেছেন,

কোনও গবাক্ষ আর তাঁর নয়ন আকর্ষণ করতে পারল না—যদিচ প্রতি গবাক্ষেই একটি করে সন্ধ্যাতারা ফুটেছিল।

রমণীটি সুরাটের সকল সুন্দরীর সংক্ষিপ্তসার।

সে ছিল বিদ্যুৎ দিয়ে গড়া, তাই তাঁকে ছুঁতে ভয় করতুম।

নাকটি তিলফুলের মত, চোখ দুটি পদ্মফুলের মত, গাল দুটি গোলাপ ফুলের মত, ঠোঁট দুটি ডালিম ফুলের মত—

তার পরণে একখানি চাঁপা ফুলের রঙের তসরের শাড়ি, গায়ে নামাবলী, গলায় তুলসী কাঠের মালা, নাকে রসকলি, একরাশ ঢেউ-খেলানো চুল কপালের ডান ধারে চুড়ো করে বাঁধা।

তিনি স্বয়ং সরস্বতী, তন্বী-গৌরী, বিগত যৌবনা, শ্বেত বসনা।

তাঁর গল্পসাহিত্যে অসুন্দরী নারীর স্থান নেই। সৌন্দর্য পিপাসার নিবৃত্তি ঘটেছে তাঁর সেই কল্পলোকে। তাঁর কোন গল্পই তাই প্রচলিত অর্থে বাস্তব নয়, আবার নিছক অগভীর জীবনদৃষ্টিও নয়। জীবনের ওপরে এক ভাবজগৎ, কল্পনার জগৎ তৈরী করেছেন তিনি। তাই তাঁর গল্পগুলি সূক্ষ্মদেহী রামধনুর মত বর্ণোজ্জ্বল কিন্তু ক্ষণিক মুহূর্তের জন্যই তাদের জন্ম। তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যাপক ছিল না—যা প্রভাতকুমার বা শরৎচন্দ্র বা পরবর্তী কোন কোন লেখকের ছিল। কিন্তু তাঁর কল্পনার ছিল 'আশ্চর্য' সৃষ্টির ক্ষমতা। এই 'আশ্চর্য' বা 'অপরূপ'কে নিয়েই তিনি তৃপ্ত। তাঁর কোন লেখাতেই মধ্যবিত্ত জীবন বা দরিদ্র জীবনের কাহিনী নেই—কদাচিৎ কোন কোন গল্পে দু-একটি সাধারণ মানুষের মুখ উজ্জ্বল রেখায় চিত্রিত—যেমন ঈশ্বর লেঠেন কিংবা বীরবল। কিন্তু তারাও অসাধারণ, তারাও কোন কোন কারণে অসামান্য। রবীন্দ্রনাথ যে সাধারণ জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনী রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, প্রভাতকুমার যে মধ্যবিত্ত বাঙালীর আনন্দ-কৌতুকের কাহিনী পরিবেশন করছিলেন ও ভারতী গোষ্ঠিরা যে মালিন্য, পাপ ও বেদনার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলেন—প্রমথ চৌধুরী তার থেকে স্বতন্ত্র রয়ে গেলেন। তাঁর গল্পে প্রাধান্য লাভ করল আসর ও মজলিসি ভাব। ফলে, সৌন্দর্য আছে, সূক্ষ্মতা আছে, নেই শুধু ব্যাপকতা তথা গভীরতা। উপমা দিয়ে বলা চলে, রবীন্দ্রনাথ জীবনসমুদ্রের অতলে ডুব দিয়েছেন, আপাতসাধারণ জীবনের শুক্তি ভেঙে অসাধারণ মুহূর্তের মুক্তাটিকে আবিষ্কার করেছেন; প্রভাতকুমার তরঙ্গ-ভঙ্গিমা দেখেছেন, তার লীলাচাঞ্চল্য উপভোগ করছেন; শরৎচন্দ্র সেই সমুদ্রের তরঙ্গে ক্ষুব্ধ, চঞ্চল ও আন্দোলিত হয়েছেন—আর প্রমথ চৌধুরী সমুদ্র সারসের মত ঢেউর ওপরে বিশাল পাখা মেলে উড়ে বেরিয়েছেন রৌদ্রালোকিত দিনগুলিতে। ঝড়, বৃষ্টি, অন্ধকারকে তিনি পরিত্যাগ করেছেন।

তাঁর 'চারইয়ারী কথা' দিয়েই এই কথা প্রমাণ করা যেতে পারে।

কথার আরম্ভ মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে। চার বন্ধুর চারটি প্রেমের কাহিনী। নায়িকা চারজনই বিদেশিনী। প্রথমটির ঘটনাস্থল কলকাতা, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির ইংলন্ড ও চতুর্থটির লন্ডন ও কলকাতা। পটভূমির এই বৈচিত্র্য প্রমথ চৌধুরীর বৈশিষ্ট্য। ইতিপূর্বে ইংলন্ডের পটভূমিকায় গল্প লিখে সুনাম করেছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। কিন্তু প্রভাতকুমারের ইংলন্ড আর প্রমথ চৌধুরীর ইংলন্ড এক নয়। প্রভাতকুমার ইংলন্ডের সাধারণ মধ্যবিত্ত জীবনের সহজ স্নিগ্ধ ও রমণীয় রূপটিই দেখেছেন। বিদেশী ল্যান্ডলেডি, বিদেশিনী বন্ধু, ভারতীয় ছাত্রের প্রেম, নতুন সমাজের অভিনবত্ব—তাঁর গল্পের বিষয়। তিনি ইংলন্ডের মানুষের মধ্যে ভারতীয় হৃদয়কে সন্ধান করেছেন ও পেয়েছেন। তিনি ইংলন্ডের মধ্যে ইংরেজের হৃদয়ের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন বাঙালী জননীকে। মধ্যবিত্ত দরিদ্র ইংরাজের হৃদয় যে বাঙালীর হৃদয়ের মতই একই ব্যথায় ব্যথিত, একই আনন্দে আনন্দিত—এই বার্তা প্রভাতকুমার বাঙালীকে জানালেন। প্রমথ চৌধুরীব ইংলন্ড তা নয়—তা যৌবন-চঞ্চল বসন্তভূমি। তা স্বাস্থ্য সৌন্দর্য আনন্দের দেশ। তা প্রাচুর্য ঐশ্বর্য ও সংগ্রামের দেশ। প্রভাতকুমারের ইংলন্ড কোমল, আবেগসজল, যেন দ্বিতীয় বাংলা-দেশ। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর ইংলন্ড উজ্জ্বল উচ্ছল, তা যে বাংলাদেশ নয় এটাই তার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। সেই ইংলন্ড চারইয়ারী কথার চালচিত্র।

এক এক করে এক এক বন্ধু তাদের ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী বলে চলেছেন। প্রথম জন বলতে শুরু করেছেন যে তিনি কলকাতার পথে এক জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে এক নারীকে দেখেছিলেন। এই কাহিনীর বক্তা সেন। সেন বলছে,

> "আমার দেহ ছিল এ দেশে, আর মন ছিল ইউরোপে। সে মনের উপর ইউরোপের আলো পড়েছিল, এবং সে আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেতুম যে, এ দেশে প্রাণ নেই, আমাদের কাজ, আমাদের কথা, আমাদের চিন্তা, আমাদের ইচ্ছা—সবই তেজোহীন, শক্তিহীন, ক্ষীণ রুগ্ন, ম্রিয়মান এবং মৃতকল্প।"

সেন এই তেজোহীন জীবনের মধ্যে এক আদর্শ সৌন্দর্যের কল্পনা নিয়ে বাঁচত। একদিন সহসা এক জ্যোৎস্নারাত্রে যখন "যখন দিগ্‌দিগন্ত ফেনিল হয়ে উঠেছিল—সে ফেনা শ্যাম্পেনের ফেনার মত আপন হৃদয়ের আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, তারপর হাসির আকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল" তখন, সেন দেখতে পেল একটি পূর্ণযৌবনা ইংরেজ-রমণীকে—"সে যেন মূর্তিমতী পূর্ণিমা"। তার চোখ জ্বলজ্বল করছে—'সে আলো তারার নয়, চন্দ্রের নয়, সূর্যের নয়,—বিদ্যুতের। মন্ত্রমুগ্ধ সেন এতদিন পরে পেল তার আদর্শ নারীকে। তার জ্ঞান বুদ্ধি চৈতন্য হল লুপ্ত। সেই কুহকী জ্যোৎস্নায় তার মনে ভালবাসার জন্ম হল, তার জ্যোৎস্না-মাখা হাতখানি সেন নিজের কাছে টেনে নিল। কিন্তু—হঠাৎ সে নারী হাত সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল, চলতে আরম্ভ করল। দূরে থেকে এক ইংরেজ ভদ্রলোক আর তার চার-পাঁচজন চাকর দৌড়ে এল। মেয়েটি দৌড়তে আরম্ভ করল। তারপর

শোনা গেল এক অস্বাভাবিক, বিকট চিৎকার। জানা গেল মেয়েটি উন্মাদ। সেন বলল, 'এই আমার প্রথম ভালবাসা, আর এই আমার শেষ ভালবাসা। এর পরে ইউরোপে কত ফুলের মত কোমল, কত তারার মত উজ্জ্বল স্ত্রীলোক দেখেছি—ক্ষণিকের জন্য আকৃষ্ট হয়েছি—কিন্তু যে-মুহূর্তে আমার মন নরম হবার উপক্রম হয়েছে, সেই মুহূর্তে ঐ অট্টহাসি আমার কানে বেজেছে, অমনি আমার মন পাথর হয়ে গেছে।'

পূর্বেই বলেছি প্রমথ চৌধুরীর গল্পের প্রাণ সৌন্দর্যচেতনায়, যৌবনের আবেগে, কিন্তু তার সমাপ্তি অনেক সময়েই 'চমকে'। যার ফলে তাঁর অনেক গল্পই ক্ষতি-গ্রস্ত হয়েছে। দ্বিতীয় গল্পটির সমাপ্তিও এই 'চমকে'। লন্ডনের শীতের দিনে এক বৃষ্টির সময়ে সন্ধ্যেবেলায় সীতেশ দাঁড়িয়েছিল হোবর্ন সার্কাসের একটি পুরোনো বইর দোকানে। হঠাৎ 'কোথা থেকে একটি মিষ্টিগন্ধ, বর্ষার দিনে বসন্তের হাওয়ার মত ভেসে এল।...এ গন্ধ ফুলের নয়, রক্ত মাংসের দেহ থেকে এ গন্ধের উৎপত্তি।' তারপর তার সঙ্গে পরিচয় হল। "সে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে, আমার কাঁধের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে লাগল, আমি কি পড়চি। আমার কাঁধে তার চিবুক, আমার গালে তার চুল স্পর্শ করছিল, সে স্পর্শে ফুলের কোমলতা, ফুলের গন্ধ ছিল, কিন্তু এই স্পর্শে আমার শরীর মনে আগুন ধরিয়ে দিলে।" কাহিনীর শেষে দেখা গেল সীতেশের গিনিগুলি নিয়ে মেয়েটি চলে গেছে।

তৃতীয় গল্পটিতে নারী আরও বিচিত্ররূপিনী। ইংলন্ডের পশ্চিম সমুদ্র তীরে *Ilfracombe* এই কাহিনীর পটভূমি। একটি নারীর সঙ্গে সোমনাথের আলাপ হয়। ঘনিষ্ঠতা হয়। মেয়েটিকে সোমনাথ 'রিণী' বলে ডাকত। সোমনাথ বলেছে,

> "একটি ফরাসী কবি বলেছেন যে, রমণী হচ্ছে আমাদের দেহের ছায়া। তাকে ধরতে যাও সে পালিয়ে যাবে, আর তার কাছ থেকে পালাতে চেষ্টা কর, সে তোমার পিছু পিছু ছুটে আসবে। আমি বার মাস ধরে এই ছায়ার সঙ্গে অহর্নিশ লুকোচুরি খেলেছিলুম।...তার মনের স্বভাবটা অনেকটা এই আকাশের মতই ছিল, দিনে দিনে তার চেহারা বদলাত। আজ ঝড়, জল বজ্র বিদ্যুৎ, কাল আবার চাঁদের আলো, বসন্তের হাওয়া। একদিন গোধূলি আর একদিন কড়া রোদ্দুর। তা ছাড়া সে ছিল একাধারে শিশু, বালিকা, যুবতী আর বৃদ্ধা।"

এ কাহিনীর শেষে দেখা গেল 'রিণী' প্রবঞ্চক। সে সোমনাথকে 'বাঁদর নাচিয়েছে এবং ঠকিয়েছে।' অবশ্য সোমনাথের ধারণা খাঁটি ভালবাসায় প্রবঞ্চনা ও পাগলামি দুই-ই থাকে, ঐ টুকুই ত ওর রহস্য।

শেষ কাহিনীটি আরো বিচিত্র। গল্পটির নায়িকা মৃতা, এবং সে মৃত্যুর পর গল্পটি বলছে—অর্থাৎ ভূতের গল্প। লন্ডনে লেখক যখন ছাত্র তখন একটি

পরিচারিকা তাকে নীরবে ভালবেসেছিল। একটি ইংরেজি কবিতায় আছে, সেদিন যখন আমার পরিচারিকা ঘরদোর পরিষ্কার করছিল তখন দেখলাম আমার মর্মর-মূর্তির সারা গায়ে ধুলো শুধু তার ঠোঁটদুটি পরিষ্কার। এই কাহিনীর পরিচারিকাও সেই রকম এক নীরব প্রেমিকা। আজ লেখক কলকাতায়। লেখক কোনদিনই সেই অভাগিনী প্রেম সন্তপ্ত নারীর মনের কথা জানতেন না। একদিন কলকাতায় সেই ঘটনার বহুদিন পরে রাত্রি দুটোয় লেখকের টেলিফোন বেজে উঠল। টেলিফোনে এক নারীকণ্ঠ বলল—চিনতে পারছ না? লেখক চিনতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে সেই নারীকণ্ঠ বলল, গর্ডন স্কোয়ারে যে বাড়িতে তুমি একদা ছিলে সেই বাড়ির দাসী আমি। ধীরে ধীরে লেখকের সঙ্গে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে জানা গেল তার গভীর প্রেম ও তার প্রতি লেখকের উদাসীন ও বেদনাদায়ক ব্যবহার। লেখক তাকে শেষ প্রশ্ন করছেন,—তাহলে এখন তুমি? সে তার উত্তর দিচ্ছে পরলোকে।

চার ইয়ারী কথার একটিমাত্র সূত্র—তা হল প্রেম। সীতেশ বলেছে, "স্ত্রীজাতির দেহ এবং মনের ভিতর এমন একটি শক্তি আছে, যা আমার দেহমনকে নিত্য টানে।" সেই নিত্য টানার কাহিনী চারইয়ারী কথায় নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। চারটি প্রেমিকের হৃদয় হঠাৎ এখন ঝড়ের রাত্রে খুলে গিয়েছিল, হঠাৎ উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠেছিল চারটি মনের বেদনা—আবার চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল তাদের রুদ্ধ প্রেমার্ত অনুভূতি। যখন চারজনের কাহিনী শেষ আকাশের মেঘ কেটে গেছে। চাঁদের আলোয় চারদিক ঝলমল করছে। ভাবালুতার কুয়াশা নেই কোথাও। অনায়াসে অন্যান্য বাঙালী লেখকেরা এই কাহিনীকে দুঃখভারাতুর ও অশ্রুবাষ্পাকুল করতে পারতেন। প্রমথ চৌধুরী প্রেমের বর্ণনা করেছেন গভীরতার সঙ্গে। তার তারল্য ও চাঞ্চল্যকে অনুভব করেছেন—কিন্তু তাকে মুহূর্তের জন্যও বিষাদগ্রস্ত হতে দেননি। প্রমথ চৌধুরী তাঁর একটি চরিত্র সম্পর্কে বলেছেন, "তাঁর অল্পকথা তিনি বলতেন শানিয়ে, আর বেশী কথা সাজিয়ে।" একথা প্রমথ চৌধুরী সম্পর্কেও সত্য। তাঁর এই গ্রন্থটি তাঁর শব্দচয়ন, ভাষা নির্মাণ ও বর্ণনাভঙ্গির দিক থেকেও অসামান্য। চিন্তার স্বাচ্ছন্দ্য, বুদ্ধির দীপ্তি ও ভাষার বিদ্যুৎ চারইয়ারী কথাকে বাংলা সাহিত্যের একটি অপূর্ব সৃষ্টির মর্যাদা দিয়েছে।

৩

তর্কপ্রাধান্যের মতই সংগীত প্রসঙ্গ প্রমথ চৌধুরীর বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র গল্পগুচ্ছে সংগীতের প্রসঙ্গ কদাচিৎ। সুর, তাল বা লয় সম্পর্কে ক্বচিৎ বলেছেন। প্রমথ চৌধুরীর লেখায় সংগীতের প্রসঙ্গ নানাভাবে এসেছে। গানের পরিভাষা বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর গল্পে।

আমি চাপান দিলুম ১...
তুমি উতোর গাইলে ১...
আমার সঙ্গে সঙ্গত করবে কে ? ১...
খেয়ালের ভারি'ত তাল। আমি খঞ্জনীতে ঠেকা দেব এখন।১
আমি তাকে তাল শেখাইনি, পাছে তার গলার অপূর্ব টান নষ্ট হয়।১
আমি তম্বুরা নিয়ে নৈয়া-ঝাঁঝরি বলে একটি আশাবরীর গান গাইলুম।২
কি রাগ আলাপ করব ? তিনি উত্তর করলেন ঝিমন্ড পরজ।২
কেউ ধরেছে খেয়াল, কেউ ভজন, কেউ মোবারক বাদী, কেউবা আবার লাউনি।৩

আবার গল্পগুচ্ছে বস্তুপুঞ্জের প্রতি রবীন্দ্রনাথের যে দৃষ্টি তা প্রমথ চৌধুরীর মধ্যে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যেমন গল্পগুচ্ছে জীবনের সামগ্রিক রূপের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন, প্রমথ চৌধুরীর দৃষ্টি শুধু চারুকলায়, কারুকলায়। এজন্যই শরৎচন্দ্র বা প্রভাতকুমার বা রবীন্দ্রনাথের মত সার্বজনীন আবেদন তাঁর নেই। তাঁর গল্প সৌন্দর্য সৃষ্টিতে মগ্ন, নাগরিক চাতুর্য সৃষ্টিতে রত। আর সেইসঙ্গে বুদ্ধিদীপ্ত কয়েকটি লোকের আসরে বসে গল্প করা ও তর্ক করার যে প্রবৃত্তি সেটিও তাঁর গল্পের লক্ষণ। তাঁর 'ছোটগল্প' গল্পটি প্রকৃতপক্ষে তর্ক। প্রবন্ধ হতে হতে গল্প হয়ে গেছে। 'রাম ও শ্যাম' গল্পে আমাদের দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্তসারশূন্যতাকে প্রবল ব্যঙ্গ করা হয়েছে। 'অ্যাডভেঞ্চার জলে ও স্থলে'র মধ্যে চপল হাস্য। তাঁর এই সব গল্পগুলিকে পরিপূর্ণ গল্প বলা চলে না, গল্পের অপরিণত রূপ। কোন কোন গল্পে অবশ্য গল্প প্রাধান্য লাভ করেছে—যেমন সহযাত্রী, আহুতি বা দিদিমা। 'সহযাত্রী' গল্পটি বিচিত্র। সিতিকণ্ঠসিংহ নামক ভদ্রলোক এই গল্পের নায়ক। তাঁর পোষাক সন্ন্যাসীর মত কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী নন। তিনি বন্দুক চালাতে দক্ষ। তিনটি বিয়ে করেছেন। তৃতীয় পক্ষের তরুণী বৌ অন্যের সঙ্গে পলাতকা। সেইজন্য সিতিকণ্ঠ বন্দুক নিয়ে তাদের হত্যা করার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সিতিকণ্ঠের চরিত্রটি হাস্য ও ভীতি দুইই উদ্রেক করে—এবং চরিত্রটির আধা-উন্মাদ রূপটির জন্য গল্পটি আকর্ষণীয়।

'দিদিমা' ও 'আহুতি' অনেকটা একসুরে বাঁধা। অত্যাচার এবং প্রতিশোধ বৃত্তির এক রোমাঞ্চ কাহিনী দুটি বিভিন্ন পথে আত্মপ্রকাশ করেছে। গল্পের মধ্যে যে ভয়াবহ ঘটনাগুলি আছে তাতে লেখক বিন্দুমাত্র শিথিল হননি, ক্ষিপ্রগতিতে সংক্ষিপ্তভাবে ঘটনাগুলি বর্ণনা করেছেন। লুপ্ত জমিদার বাড়ির ছবি ফুটে উঠেছে তার ঐশ্বর্য ও পাপ নিয়ে। ধনঞ্জয় ও রঙ্গিনীর ভয়াবহ আচরণ, ও শেষ পর্যন্ত

১। ঘোষালের হেঁয়ালী।
২। বীণাবাই
৩। নীললোহিতের স্বয়ম্বর।

প্রতিহিংসা বৃত্তির চরম ছবি গল্পটিকে প্রমথ চৌধুরীর একটি শ্রেষ্ঠ গল্পের মর্যাদা দিয়েছে।

'দিদিমা' গল্পে দিদিমার কোন প্রয়োজন ছিল না। যে স্নেহার্দ্র সজল কণ্ঠ দিদিমা সম্পর্কটির সঙ্গে জড়িত তা এই গল্পে কোথাও নেই। বরং এর মধ্যে প্রমথ চৌধুরীর দীপ্ত বাক্‌ভঙ্গি ঝলসিত হয়ে উঠেছে। সেই প্রাচীন পরিবারের ধ্বংসের জন্য কোন ভাববাষ্প কোথাও সঞ্চিত হয়নি। ভৈরব নারায়ণ ও সর্বানন্দ মজুমদারের দ্বন্দ্ব কাহিনীর সমাপ্তি বয়ে এনেছে। প্রমথ চৌধুরীর খুব কম লেখাতেই এত সংযত ও এত সুন্দর বর্ণনাভঙ্গি আছে। কামার্ত্ত ভৈরব নারায়ণের একটি ছবি ও তাঁর সতী স্ত্রী মহালক্ষ্মীদেবীর নির্বোধ সতীত্বের পরিচয় দিয়েছেন একটি অনুচ্ছেদে ঃ

> অতসী পরদিন সকালে এসে অতি যত্ন করে অতি সুন্দর করে ভৈরব নারায়ণের পুজোর সব আয়োজন করলে। তারপর সেই মূর্তিমান পাপ এসে পুজোর ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দুয়োর বন্ধ করে দিলে। মহালক্ষ্মী দিদি বাইরে পাহারা বসে রইলেন। ভৈরব নারায়ণ যখন ঘণ্টাখানেক পরে পুজো শেষ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন; তখন দিদি ঘরে ঢুকে দেখে যে অতসী বাসী ফুলের মত একদম শুকিয়ে গিয়েছে...।

প্রমথ চৌধুরীর কয়েকটি অতিপ্রাকৃত বিষয়ক কাহিনী আছে। কিন্তু তিনি কোথাও অতিপ্রাকৃত অনুভূতিকে রূপ দিতে পারেন নি। 'যক্ষ' গল্পটির মধ্যে কিছুটা চেষ্টা করেছেন, কিন্তু অতিপ্রাকৃত অনুভূতির চেয়েও জ্যোৎস্না রাত্রি ও নদীর সৌন্দর্যই পাঠকমনকে বেশি নাড়া দেয়। 'ভূতের গল্প' গল্পটিতে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রাবন্ধিক মনোভাব উঁকি দিয়েছে। গল্পের শেষে আবার কয়েক লাইনে ভূতের অস্তিত্বকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন এবং নায়কের ভীরুতাকে ব্যঙ্গ করেছেন। ফলে ভৌতিক আবহাওয়া সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

তাঁর উপভোগ্য গল্প হল নীললোহিতের গল্পগুলি। নীললোহিতের জীবন অভিজ্ঞতাবহুল। নীললোহিতের আদি প্রেম, নীললোহিতের সৌরাষ্ট্রলীলা, নীললোহিতের স্বয়ংবর এই তিনটি উল্লেখযোগ্য গল্প। 'ঘোষালের ত্রিকথা'য় বীণাবাই ছাড়া অন্য গল্পগুলিতে গল্প কম। যদিও প্রথম গল্পটিতে ব্যঙ্গ অত্যন্ত উপভোগ্য। কিন্তু অন্যান্য গল্পগুলি তর্কজালে সমাচ্ছন্ন ও ফলে অসমাপ্ত গল্পমাত্র। নীল-লোহিতের অসম্ভব আচরণ, কৌতুককর ঘটনা লেখকের ক্ষমতাবহ। নীললোহিতের স্বয়ম্বরের থেকে একটু উদ্ধৃতি দেওয়া যাক ঃ

> "একধারে সাদা কাপড়ের উপর বড় বড় শালুর লাল অক্ষরে লেখা রয়েছে কর্মবীর, অন্যধারে একই ধাঁচে লেখা রয়েছে জ্ঞানবীর। ঘোর মূর্খের দলরা হচ্ছে সব কর্মবীর, ইংরেজিতে যাকে বলে Sportsman—তাদের কারও হাতে রয়েছে ক্রিকেট ব্যাট, কারও হাতে tennis racket কারও হাতে boxing gloves কারো হাতে hocky stick কারও হাতে foot-ball শুধু একজনের

হাতে রয়েছে দেখলুম এক হাত লম্বা একটি খাগড়ার কলম, শুনলুম, ইনি হচ্ছেন লিপিবীর। মধ্যে যেখানে চারধাপ সিঁড়ি দিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে উঠতে হয়, সেখানটা ফাঁক। তারপরে জ্ঞানবীরদের আসন। এরা সকলেই ডক্টর—শুধু কারও D-র পেছনে আছে L কারও L.T. কারও S. C, কে কোন দলের লোক তা তাদের মাথার উপরের placard না দেখলে বোঝা যায় না। দুদলেরই রূপ এক। ব্যাং আর ফড়িং এদলেও ছিল, ওদলেও ছিল। অথচ উভয় দলই পরস্পরকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখছিলেন।"

আর একটি বর্ণনা ঃ

"ইনি হচ্ছেন নেড়া দত্ত। এঁর তুল্য goal-keeper ভূ-ভারতে আর নেই। ইনি বল ঠেকান শুধু মাথা দিয়ে। তাই এঁর মাথায় একটি চুল নেই, সব বলের ধাক্কায় ঝরে পড়েছে। যখন গোরার পায়ের লাথি খেয়ে বল্ ঊর্ধ্বশ্বাসে মরি-বাঁচি করে ছোটে, তখন এঁর মাথার গুঁতোয় তা চৌচির হয়ে যায়—অন্যের হলে মাথা চৌচির হয়ে যেত।"

নীললোহিতের ডাকাতি করে পালাবার বর্ণনা ঃ

ঘরের দুয়ারে গিয়ে ধাক্কা মারলেন। তৎক্ষণাৎ দুয়ার খুলে গেল, আর ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটি পরমাসুন্দরী যুবতী। তার পরণে সাদা শাড়ী গলায় কণ্ঠী আর নাকে রসকলি।...সুন্দরীর পরামর্শে নীললোহিত পরণের ধুতি শাড়ি করে পরলেন। আর সেই যুবতী নিজ হাতে তাঁর গলায় কণ্ঠী পরালে, আর তার নাকে রসকলি ভঞ্জন করে দিলে।..সুতরাং তাঁর এ ছদ্মবেশ আর কেউ ধরতে পারলেনা। তারপর তারা দু-সখীতে দুটি খঞ্জনি নিয়ে জয় রাধে বলে বেরিয়ে পড়ল।"

প্রমথ চৌধুরীর উপভোগ্যতা তাঁর কৌতুক সৃষ্টির ক্ষমতায়। তাঁর শ্রেষ্ঠ লেখা-গুলি তাঁর কৌতুকে ভরা। কিন্তু ব্যঙ্গ করা তাঁর স্বভাব তাঁর গুণ এবং দোষ। অনেক লেখা ব্যঙ্গপ্রধান বলেই ভাল, আর কতকগুলি ভাল লেখাকে তিনি ব্যঙ্গের আঘাতে জর্জরিত করেছেন। জীবনের গভীর স্তরে তিনি যাননি, অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য তাঁর ছোটগল্পগুলিকে গভীর করেনি। তবু তিনি উজ্জ্বল ভাষায় ও শাণিত ভঙ্গিতে ছোটগল্প রচনা করেছেন। তাঁর সম্পর্কে একজন সমালোচক বলেছেন, তিনি একজন সেই শ্রেণীর লেখক, যাঁর প্রভাব লিখিত পুস্তককে অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়ে। একথা সত্য। তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষমতার চেয়েও তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব অনেক বেশী বাংলা সাহিত্যে। তাঁর বহুরচনাই ভাবে অগভীর ও কথার মারপ্যাঁচে ভরা। বক্তব্যের মৌলিকতার জন্য তিনি অতি উৎসাহী হয়েছেন মধ্যে মধ্যে। আর প্রায়ই বক্তব্যহীনতাকে কথার সাজে নাগরিক চাতুর্যের দ্বারা ঢেকে রাখতে চেয়েছেন। এই দোষ তাঁর গল্পগুলিকেও স্পর্শ করেছে। কিন্তু তিনি একটি বিশেষ দৃষ্টি ও গুণের অধিকারী। সে দৃষ্টি সৌন্দর্য দৃষ্টি, বুদ্ধির দৃষ্টি। তিনি শত্রু ভাবালুতার, তিনি শত্রু জড় ভারতবর্ষের, নির্বোধ কবিত্বের। তাঁর গল্পগুলি লঘু চপল। কখনও মেঘের মত গভীর, মনের ওপর ছায়া ফেলে কিন্তু বারিবর্ষন করে না। তাঁর গল্প হাসিতে ঝলমল করে, অশ্রু তাঁর সখা নয়।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

॥ শরৎচন্দ্রের ছোটগল্প ॥

শরৎপ্রতিভা মূলত ঔপন্যাসিকের। তিনি যেভাবে কাহিনী ভাবেন, ঘটনা তৈরী করেন পাত্রপাত্রীর কথাবার্তা রচনা করেন তা ঔপন্যাসিকের মত। ছোটগল্পের কাহিনী সমস্ত রকম বাহুল্য বর্জিত। কিন্তু শরৎপ্রতিভা বাহুল্যবর্জিত কাহিনী সৃষ্টিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। তিনি কাহিনী বুনতে ভালবাসেন এবং কাহিনীর পরিপূর্ণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর কাহিনী চলতে থাকে। ছোটগল্পের লক্ষ্য একটি বিন্দু, পরিপূর্ণ বৃত্তটি নয়। শরৎচন্দ্রের গল্প চরিত্র বা ঘটনার প্রতি আলোকপাত করেই নিভে যায় না, তা সেই সঙ্গে আরো অন্য চরিত্রকে আলোকিত করতে চায়, তা ঘটনা স্বল্পতায় সন্তুষ্ট হয় না, বহুলতাকে ভালবাসে।

শরৎসাহিত্যের আরেকটি প্রধান ধর্ম ভাবাতিরেক। বিশেষ করে করুণা বা বেদনার ভাব যেখানেই আছে সেখানেই তাঁর লেখকপ্রাণ আবেগে বিহ্বল হয়ে পড়ে। মানুষের প্রতি অসীম দরদ ও বহু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার তিক্ততা তাঁর জীবনে ছিল। করুণা বা বেদনার ক্ষেত্রেই লেখকের বড় কঠিন পরীক্ষা। যে কোন মুহূর্তেই পদস্খলনের সম্ভাবনা। তাঁর লেখায় প্রায়ই ভাবাতিরেক দেখা যায়, কাহিনী অশ্রুরসে পিচ্ছিল হয়। পাঠকের হৃদয় সহজে জয় করা যায় বটে কিন্তু লেখকের দুর্বলতাও ধরা পড়ে। প্রতিভাসত্ত্বেও শরৎপ্রতিভার একটি বিশেষ দুর্বলতা এইখানে। ফলে তাঁর লেখা গাঢ়বন্ধ হতে পারেনি। ঘটনা ও চরিত্র বিকাশে কুশলতা ও সংযম তাঁর লেখায় অপেক্ষাকৃত কম। শরৎপ্রতিভার গভীরতা ও সজীবতার প্রতি ঈষৎ অসম্মান না করেও বলা চলে যে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিতেও কখনও কখনও ভাবাতিশয্য রচনার গঠন সুষমা ও চরিত্রগুলিকে ব্যাহত করেছে।

শরৎসাহিত্যের উপাদানের বৈশিষ্ট্য এইখানে যে তিনি নিতান্ত পারিবারিক বা সামাজিক পরিচিত সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেই সমস্যার মধ্যে আবার তাঁর কেন্দ্রীয় উপাদান হল নারীমন। বাংলার পল্লীসমাজ, মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থার অবসিত শেষ প্রথা ও মধ্যবিত্ত জীবনের সুখদুঃখের কেন্দ্রে নারী। এই নারী ও সমাজকে শরৎচন্দ্র বাংলাদেশের অন্যান্য লেখকদের চেয়ে অনেক ভাল করে জানতেন। গভীর সমবেদনা ও ততোধিক অভিজ্ঞতায় এই জীবনকে তিনি দেখেছেন, ফলে যখনই তিনি লিখেছেন তখনই তাঁর মানবিক অনুভূতি তাঁর শিল্পীর নিস্পৃহতাকে ঢেকে দিয়েছে। আর সেই জীবনকে তার অজস্র খুঁটিনাটির মধ্যেই তিনি ফোটাতে চেয়েছেন, চারিত্রিক দ্বন্দ্ব ও নাটকীয়তা তাঁকে মুগ্ধ করেছে, কখনও

কখনও অতিনাটকীয়তাও তাঁকে লুব্ধ করেছে। এইখানেই তাঁর জনপ্রিয়তা, সার্থকতা ও দুর্বলতার বীজ। আর যে লেখকের এই তিনটি প্রবণতা স্পষ্ট তিনি ছোটগল্প রচনা করতে সমর্থ হবেন না এমন আশা করা যায়। তাঁর লক্ষ্য গল্প বলা, কিন্তু অতর্কিত শেষ ও খণ্ড-অখণ্ডের ব্যঞ্জনা দেওয়া তাঁর ধর্ম নয়। তাঁর ধর্ম ভাবাতিরেক তাই ছোটগল্পের ছোট পরিসরে বাক্‌স্বল্পতার ও মিতভাষণের মধ্যে তিনি অস্বস্তি বোধ করেন। আর তাঁর লক্ষ্য ঔপন্যাসিকসুলভ খুঁটিনাটির দিকে ও ঘটনাপ্রবাহের ধাক্কায় চরিত্রকে তরঙ্গিত করে তোলা। ছোটগল্পে চরিত্র বিকাশের ও ঘটনাস্রোতের অবাধ সঞ্চরণের সুযোগ নেই। তাই শরৎচন্দ্র ছোটগল্পে স্বভাবতই দুর্বল। এত জনপ্রিয় লেখক হওয়া সত্ত্বেও তিনি ছোটগল্প বেশী লেখেন নি। যা লিখেছেন তার মধ্যে বহুগুলি তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত ছাপ বহন করে না।

১

'মন্দির' গল্পটি লিখে তিনি সাহিত্যসমাজে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন: ১৩০৯ সালের কুন্তলীন পুরস্কারের জন্য এই গল্পটি তিনি ছদ্মনামে লেখেন। এই গল্পটি পরে 'কাশীনাথ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কাশীনাথ যদিও প্রকাশের কালের দিক থেকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক, তবুও এই গ্রন্থের গল্পগুলি শরৎচন্দ্রের প্রাথমিক রচনার নিদর্শন। তাঁর প্রতিভার পূর্বাভাস। এই গ্রন্থের গল্পসংখ্যা সাতটি। কাশীনাথ গল্পটিকে ইচ্ছে করলেই শরৎচন্দ্র পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসে রূপ দিতে পারতেন —কারণ এর লক্ষণ বহুমুখিতা; ঘটনা অনেক, প্লট ও উপপ্লটে জড়িয়ে কাহিনী জটিল, চরিত্রসংখ্যা নিতান্ত স্বল্পনয়।

কাশীনাথ শরৎচন্দ্রের বালক বয়সের রচনা, তাই তাতে অসংগতি ও অপূর্ণতা অত্যন্ত বেশী। তবে কাশীনাথ শরৎ-উপন্যাসের অধিকাংশ নায়কের সমস্ত সামান্য গুণের অধিকারী। তার উদাসী চরিত্র, প্রখর আত্মসম্মানবোধ, পরোপকারে উৎসাহ ও চারিত্রিক শক্তি সবই আছে। এই কাহিনীতে শরৎ-উপন্যাসের অধিকাংশ নারী-পুরুষের দ্বন্দ্বের প্রাথমিক রূপ পাওয়া যায়। বৈষয়িক প্রয়োজনে স্বামী-স্ত্রী বা প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে কলহ। শরৎচন্দ্রের বহুব্যবহৃত নায়কের অসুস্থতার কৌশল এখানেও অনুসৃত হয়েছে।

এই দীর্ঘ কাহিনীটি এক উদাসী আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন দরিদ্র অধীতী ছাত্র কাশীনাথের জীবনকথা। তার সঙ্গে জমিদার কন্যা কমলার বিবাহ হয়েছিল। কাশীনাথ মাতুলগৃহে পালিত। মাতুলকন্যা বিন্দুবাসিনীকে কাশীনাথ স্নেহ করত। কিন্তু কাশীনাথ বড়লোকের জামাই হওয়ায় তাদের স্নেহসম্পর্কে বাধা এল। কাশীনাথ আগে

ছিল স্বাধীন যুবক। জমিদারগৃহে বিবাহ হওয়ায় তার জীবনে এল বন্ধন। ধনীর আভিজাত্যের অভিমান তাকে প্রতিদিন আহত করতে লাগল। কাশীনাথ ও বিন্দুবাসিনীর এই সম্পর্কের দ্বন্দ্ব এই কাহিনীর একটি শাখা মাত্র।

দ্বিতীয় শাখা, কাশীনাথ ও নববিবাহিতা বধূ কমলার সম্পর্ক। বধূ কমলা ধনীকন্যা। ধনীর অভিমান তার আছে। কিন্তু কাশীনাথকে সে স্বামী হিসেবে অবজ্ঞা করে না বরং তার কাছে চায় ভালবাসা। কাশীনাথ উদাসীন। একটি উদাহরণ যথেষ্ট:

> "কাশীনাথ মুখ তুলিয়া দেখিল, কমলা। বিস্ময়ে বলিল, তুমি যে?
>
> "আমি এসেছি।
>
> "বস, বলিয়া কাশীনাথ আবার পুঁথিতে মনঃসংযোগ করিল। কমলা বহুক্ষণ ধরিয়া তাহার পুঁথি পাঠ দেখিল। তাহার পর হাত দিয়া পুঁথি বন্ধ করিয়া দিল। কাশীনাথ আশ্চর্য হইয়া মুখ তুলিয়া বলিল, বন্ধ করলে যে?
>
> "দুটো কথা কও। রোজ পড়—একটু না পড়লে ক্ষতি হবে না।"

স্বামীর এই উদাসীনতা স্ত্রীকে আহত করে ও ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে মানসিক ব্যবধান বাড়তে লাগল। কাশীনাথের চরিত্রের আত্মসম্মানবোধ খুবই সূক্ষ্মস্তরের, কমলার পক্ষে তার এই নীরব অভিমানী স্বামীর স্বরূপ বোঝা কঠিন। কাজেই তাদের বিরোধ অস্বস্তিকরভাবে তীব্র হয়ে উঠল।

এই সময় কাশীনাথ হঠাৎ কাউকে কোন খবর না দিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে চলে গেল। সে গেল তার স্নেহের বোন বিন্দুবাসিনীর কাছে। এখানে এসে অসুস্থ হল, এই অসুখের ফলে আবার স্বামী ও স্ত্রীর মিলন ঘটল। কাহিনীর দুর্বলতা মূলেই, কাশীনাথের চরিত্র অস্পষ্ট, ঘটনাও জটিল কাজেই এর সমাপ্তিও সবল হতে পারে না। তাই শেষের পরিণামে কোন চরিত্রের কোন বিশিষ্টতা ফুটে উঠল না, কোন মুহূর্তের দীপ্তি জ্বলে উঠল না, যাতে কোন অভাবনীয়ের পরিচয় আছে। আসলে কাশীনাথ শরৎচন্দ্রের একটি অপরিণত উপন্যাস।

শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পের প্রথম সার্থকতার চিহ্ন আছে মন্দির গল্পে। জমিদার রাজনারায়ণের কন্যা অপর্ণা। বাল্যকাল থেকেই বাড়ির দেবমন্দির তার প্রিয়। মন্দিরে বিগ্রহসেবায় তার অবিচল নিষ্ঠা। যথাসময়েই তার বিবাহ হয়ে গেল। মন্দির ছেড়ে যেতে হবে এই বেদনায় তার মন বিদীর্ণ হতে লাগল। তার সমস্ত শৈশব, কৈশোর, যৌবনের আনন্দ নিকেতন সেই মন্দির। শ্বশুরবাড়িতে তার মন্দিরের কথাই মনে হতে লাগল।

> "কোথায় কোন্ গ্রামান্তরে মন্দির হইতে যখন সন্ধ্যার শাঁখঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, তখন সেই আজন্মপরিচিত আরতির আহ্বান-শব্দ তাহার কাজের ভিতর দিয়া মর্মে নৈরাশ্যে হাহাকার বহন করিয়া আনিল...এবং ছায়ানিবিড় একটা উচ্চ দেবদারু শিখায় একটি পরিচিত মন্দিরের সমুন্নত চূড়া কল্পনা করিয়া সে উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া উঠিল।"

অপর্ণার মন্দিরের প্রতি ভালবাসা, কোন মানুষের প্রতি নয়, স্বামীর প্রতি নয়। তাই স্বামীর যখন মৃত্যু হল বৈধব্য তাকে দুঃখ দিল না। সে আবার ফিরে এল তার আরাধ্য মন্দিরে। এই মন্দিরে পূজো করত পূজারী মধু ভট্টাচার্য। তার ছেলে শক্তিনাথ। অপর্ণা যখন বালিকা ছিল তখন শক্তিনাথ পুতুল পূজো করত। শক্তিনাথ এখন যুবক। সে শিল্পী। দেবতার প্রতি ভক্তির চেয়েও রূপে তার আসক্তি। রূপের পূজারী সে।

শক্তিনাথ পূজার নিয়ম জানে না। এলোমেলোভাবে পূজো করল। আর অপর্ণার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল কে সে।

> "পূজাবসানে, কঠিন স্বরে অপর্ণা কহিল, তুমি বামুনের ছেলে, অথচ পূজো করতে জান না। শক্তিনাথ বলিল জানি।—ছাই জান। শক্তিনাথ বিহ্বলের মত একবার তাহার মুখ পানে চাহিল, তাহার পর চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। ..মন্দিরের বাহিরে আসিয়া শক্তিনাথ বারবার শিহরিয়া উঠিল।"

শিল্পীর চোখে অপর্ণা এক নূতন বিস্ময় নিয়ে এল। অপর্ণা মাঝে মাঝে স্নেহার্দ্র স্বরে তার সঙ্গে কথা বলত। শক্তিনাথের জীবনে নারীর নিভৃত স্পর্শ এল। অপর্ণার সর্বস্ব মন্দির। আর সেই মন্দিরের পূজারী শক্তিনাথ। শক্তিনাথ কলকাতা থেকে অপর্ণার জন্য দেলখোসের শিশি নিয়ে গেছে কিন্তু তাকে দিতে সাহস করছে না।

> "শক্তিনাথ মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে, পূজো শেষ হইয়াছে। চাদরে সেই শিশি দুইটি বাঁধা আছে—কিন্তু দিতে সাহস হইতেছে না...এইভাবে সাত-আটদিন কাটিল।"

তারপর কাহিনীর শেষ দৃশ্য ঃ

> "অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল ঠাকুর তুমি দুদিন হতে কিছু খাও নাই কেন ? শক্তিনাথ শুষ্ক মুখে কহিল, আমার রাত্রে রোজ জ্বর হয়।
>
> "জ্বর হয় ? তবে স্নান করে পূজো করতে এস কেন ? এ কথা বল নাই কেন ? শক্তিনাথের চোখে জল আসিল। মুহূর্তে সব কথা ভুলিয়া গিয়া সে চাদর খুলিয়া শিশি দুইটি বাহির করিয়া বলিল তোমার জন্য এনেছি।
>
> "আমার জন্য ?
>
> "হাঁ, তুমি গন্ধ ভালবাস না ? উষ্ণ দুধ যেমন একটুখানি আগুনের তাপ পাইবামাত্র টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠে, অপর্ণার সর্বাঙ্গের রক্ত তেমনই করিয়া ফুটিয়া উঠিল।
>
> গভীর স্বরে বলিল, দাও ! হাতে লইয়া অপর্ণা মন্দিরের বাহিরে যেখানে পূজো করা ফুল শুকাইয়া পড়িয়াছিল, সেইখানে শিশি দুইটি নিক্ষেপ করিল।"
>
> এর কয়েকদিন পরেই জ্বরে শক্তিনাথ মারা গেল। কাহিনীর শেষে অপর্ণা বলেছে, 'ঠাকুর আমি যা নিতে পারি নাই তা তুমি নাও। নিজের হাতে আমি কখন তোমার পূজো করি নাই, করছি—তুমি গ্রহণ কর, তৃপ্ত হও, আমার অন্য কামনা নাই।"

এই কাহিনীর মধ্যে ছোটগল্প রচনায় শরৎচন্দ্রের সাফল্য ও বৈফল্য দুইয়েরই ইঙ্গিত স্পষ্ট। শক্তিনাথ শরৎ-সাহিত্যের উজ্জ্বল চরিত্রসৃষ্টি। শিল্পীর রূপাসক্তি ও প্রথম যৌবনে নারীর নীরব স্পর্শানুভূতিতে নিবিড় হয়েছে তার চরিত্র। দ্বিধায় শঙ্কায় প্রতি মুহূর্তে সে কম্পিত। তার বিহ্বল পিপাসার্ত প্রাণের বেদনা অপ্রকাশিত। শরৎচন্দ্র এই চরিত্রসৃষ্টিতে যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন তা বিশেষ প্রশংসনীয়। বিশেষত অপর্ণার সঙ্গে তার শেষ দৃশ্যে সংযম ও মিতভাষণ চরমে উঠেছে। কিন্তু অতঃপর শরৎচন্দ্রের যা স্বভাবধর্ম সেই ভাবালুতা তাঁকে আচ্ছন্ন করেছে—তার ফলে শক্তিনাথের মৃত্যু হয়েছে। গল্পের পক্ষে তা অপরিহার্য ছিল না। গল্পের শেষ হয়ে গেছে। অপর্ণার চোখের সামনে প্রেমশিখা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে—তাকে গ্রহণ করার শক্তি তার নেই। এখানেই কাহিনীর চরমমুহূর্ত। কিন্তু শক্তিনাথের মৃত্যু পাঠককে বেদনার ওপর বেদনা দেয়—কিন্তু কাহিনীর উন্নতি ঘটায় না। মন্দির শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প হতে পারত যদি না পরিণামে অপ্রয়োজনীয় ঘটনার ভার থাকত।

২

শরৎচন্দ্র বলেছেন, "প্লট সম্বন্ধে আমাকে কোনদিন চিন্তা করিতে হয় নাই। কতকগুলি চরিত্র ঠিক করিয়া লই, তাহাদিগকে ফোটাবার জন্য যাহা দরকার আপনি আসিয়া পড়ে"১ শরৎচন্দ্রের এই উক্তির সঙ্গে জনপ্রিয় ইংরেজ লেখক সমারসেট মমের চিন্তার ঐক্য আছে। মম তাঁর The Painted Veil (১৯২৫) গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন যে, "একটি চরিত্রকে ত্রিশঙ্কু অবথায় ভাবা কষ্টকর। যে মুহূর্তেই তাকে ভাবা যায়, একটি কোন অবস্থার কথা মনে পড়বে; কিংবা সে কোন কাজ করছে মনে হবে; কাজেই যুগপৎ চরিত্র এবং অন্ততপক্ষে তার প্রধান প্রধান কাজগুলি কল্পনার দ্বারাই নির্ণীত হবে।"২ শরৎচন্দ্রও মূলত এই কথা বলেছেন। শরৎচন্দ্রের গল্পগুলি সম্পর্কে একথা বহুল পরিমাণে সত্য। তিনি আগে প্লট চিন্তা করেন নি। তিনি চরিত্র ভেবেছেন তারপর সেই চরিত্রকে পটভূমিতে দাঁড় করাবার জন্য পটভূমিকা রচনা করেছেন। আঁধারে আলো, ছবি বা দর্পচূর্ণ তিনটি কাহিনী ধরা যাক। 'আঁধারে আলো'য় বিজলী বাইজীর চরিত্রই প্রধান। 'ছবি'তে তিনটি চরিত্রের অব-

১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত **শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী**

২। **Maugham, W.S.** ***The Painted Veil.*** **Penguin Book 872, p. 9**

তারণা। 'দর্পচূর্ণে'ও ধনীকুলের কন্যা ও আত্মসম্মানসম্পন্ন সাহিত্যিক পুরুষ। কাহিনীগুলির মধ্যে স্পষ্টতই চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই পাঠককে আকর্ষণ করে, কাহিনীর বা ঘটনার আকর্ষণ তত নয়। তিনটি কাহিনীই অবশ্য ছোটগল্প হিসেবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। শরৎচন্দ্র ভুলে গেছেন যে ছোটগল্পের পরিসরে চরিত্রের বিবর্তন দেখানোর সময় নেই। 'আঁধারে আলো' গল্পে বাইজীর সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের প্রণয়। সত্যেন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত বাইজীকে ভুল বুঝল। তারপর বাইজী সর্বত্যাগী হল। চরিত্রের এই যে বিবর্তন তা ছোটগল্পের পরিসরে আকস্মিক ও অবিশ্বাস্য মনে হয়েছে। অনুরূপভাবেই ছবি গল্পেও মূলকেন্দ্র প্রেম; চিত্রকর বাথিন এবং রূপবতী ধনী-কন্যা মা-শোয় নায়ক-নায়িকা। তাদের মাঝখানে তৃতীয় ব্যক্তি এসেছে—পো-খিন। তিনটি হৃদয়ের দ্বন্দ্বের আত্মপ্রকাশ ছোট ক্ষেত্রে অপরিস্ফুট থেকে গেছে—কাজেই রচনা হিসেবে কোন কুশলতার পরিচয় নেই। দর্পচূর্ণের মধ্যেও সেই একই দ্বিধা —লেখক ছোটগল্পের পরিসরে এই মান-অভিমানের দীর্ঘ পালা লিখতে গিয়েই ভুল করেছেন। তাছাড়া শরৎচন্দ্রের ধনী-চরিত্রগুলি, বিশেষত ধনী মেয়েরা (হয়ত তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল না বলেই) অতিরঞ্জিত। অতিরঞ্জন শরৎচন্দ্র বহু ক্ষেত্রেই তাঁর নায়কদের করেছেন—তারা সর্বগুণসম্পন্ন—নায়িকাদেরও আদর্শায়িত করেছেন। কিন্তু যখন ধনী মেয়েদের তিনি খারাপ করে এঁকেছেন তখন তাদের চরিত্রগুলিকে হৃদয়হীন করে ফেলেছেন। তাঁর দর্পচূর্ণের নায়িকা তাই অবিশ্বাস্যরূপে অমানবিক।

চরিত্রপ্রধান গল্পের উদাহরণ হিসেবে 'একাদশী বৈরাগী' একটি ভাল গল্প। একাদশী বৈরাগী অত্যন্ত কৃপণ ও হৃদয়হীন। কিন্তু তার নিজের বিশ্বাসের প্রতি ছিল অবিচলিত। সেখানে সে কাউকে ভয় করত না। তার ভগিনী সমাজের চোখে পতিতা। কিন্তু তার চোখে নয়। তাই সে সমাজের সব নিয়ম, সব ভ্রূকুটি অস্বীকার করে নিজের বিশ্বাস ও কর্তব্যবোধে অবিচল থেকেছে। তার চরিত্রের দৃঢ়তাই এই গল্পের একমাত্র আকর্ষণ।

'মামলার ফল' বা 'পরেশ' দুটি গল্পেই বিষয়বস্তু বা চরিত্রসৃষ্টি গতানুগতিক। 'মামলার ফল' গল্পে গঙ্গামণির চরিত্রই সবচেয়ে আকর্ষণীয় এবং শরৎচন্দ্র সেই চরিত্র বিকাশেই প্রবৃত্ত হয়েছেন। 'পরেশ' গল্পের নায়ক পরেশ। সৎ ও বিবেকী মানুষের পতনের বেদনাই এই গল্পের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কোন গল্পেই কোন অপ্রত্যাশিত চমক নেই, কিংবা নেই ব্যঞ্জনাময় পরিণতি। পারিবারিক ও বৈষয়িক দ্বন্দ্বেই কাহিনীগুলি সমাপ্ত। 'বিন্দুর ছেলে' ও 'রামের সুমতি' এই বৈচিত্র্যহীন পারিবারিক দ্বন্দ্বের মধ্যে সামান্য অভিনব। এই অভিনবত্ব শরৎসাহিত্যের একটি বিশিষ্টতা। সাধারণত শরৎপূর্ববর্তী লেখকেরা বিমাতা ও পুত্রের সম্পর্ককে তিক্ত করে এঁকেছেন—কিন্তু শরৎসাহিত্যে সাধারণত দেখা যায় বিমাতারা স্নেহশীলা।

শুধু তাই নয় মাতৃস্নেহ শরৎসাহিত্যে অ-স্বাভাবিক পথবাহী। নিজের সন্তানের চেয়ে অন্য নিকট-আত্মীয়ার সন্তানের প্রতি স্নেহ অধিক। এই মাতৃস্নেহের তির্যক রূপ 'বিন্দুর ছেলে' ও 'রামের সুমতি'র উপজীব্য। অভিনবত্ব থাকা সত্ত্বেও ছোট-গল্পের বিচারে এগুলিকে সার্থক বলা চলে না। বিন্দুর ছেলের মধ্যে বিন্দু, অন্ন-পূর্ণার ঝগড়াঝাঁটি, এলোকেশী ও নরেনের আবির্ভাব, যাদব ও বিন্দুর সম্পর্ক, অমূল্যধনের নানা ঘটনা ছোটগল্পের একমুখিতায় সাহায্য করেনি-- তাকে বহুমুখী করে তার ছোটত্বে যেমন বাধা দিয়েছে তেমনই তার গঠনকে শিথিল করেছে। রামের সুমতি গল্পেও রাম ও নারায়ণীর সম্পর্ক প্রকাশিত করতে লেখককে অকারণে ঘটনা-বাহুল্যের সাহায্য নিতে হয়েছে। দাক্ষায়ণীর আগমনের ফলে নারায়ণী-চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই কিন্তু চরিত্রের বিকাশের চেয়েও চরিত্রের কোন একটি অদৃষ্ট-পূর্ব দিকে আলোকপাত করাতেই ছোটগল্পের সিদ্ধি।

দুর্ভাগ্যবশত শরৎচন্দ্র সেই কুশলতা আয়ত্ত করতে পারেন নি। তিনি যখন ছোটগল্প লিখেছেন তখনও তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তাই তাঁর কলমকে চালিত করেছে। তাঁর সতী গল্পটি তাঁর বহু রচনার মধ্যে একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন "সতী গল্প শরৎপ্রতিভার একটি শ্রেষ্ঠ দান; ইহা সর্বদেশের ও সর্বকালের শ্রেষ্ঠ গল্পের সঙ্গে সমশ্রেণীতে পরিগণিত হইতে পারে।"১ এই মন্তব্যের সঙ্গে এক মত না হয়েও বলা চলে 'সতী' শরৎচন্দ্রের একটি ভাল রচনা। প্রথমত এই একমাত্র গল্প যেখানে শরৎচন্দ্র ঘটনা-বিরল। যেখানে তিনি ক্ষিপ্রভাবে এগিয়ে চলেছেন, এবং যেখানে চরিত্রগুলি উজ্জ্বল। তার চেয়েও বড় কথা এর বিষয়-অভিনবত্ব। নির্মলা সাধ্বী সতী এবং স্বামী হরিশের প্রতি তার গভীর সন্দেহ। একদা হরিশ একটি ব্রাহ্ম তরুণীর প্রতি কিঞ্চিৎ আকৃষ্ট হয়েছিল সেইজন্য তার পিতা অবিলম্বে নির্মলার সঙ্গে হরিশের বিবাহ দেন। সেই থেকে হরিশের জীবনে কোন স্বস্তি নেই। চরমে উঠল যখন হরিশের সঙ্গে তার পূর্বপরিচিতা সেই মেয়েটির সাক্ষাৎ হল। আজ সে বিধবা, তার একটি সন্তান। নির্মলার অস্বাভাবিক হিংসা ও হৃদয়হীনতা হরিশের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলল। যখন বাইরে হরিশের বন্ধুবর্গ তার স্ত্রীর সতীত্বের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ঠিক তখনই হরিশের জীবন সন্দেহ ও ঈর্ষায় দগ্ধ। কাহিনীর ঘটনাসংস্থান প্রথমে পাঠককে হাসায়, কিন্তু ক্রমশই শরৎচন্দ্রের ব্যঙ্গ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সতীত্বের আদর্শকে শরৎচন্দ্রের ব্যঙ্গ গল্পটিকে অভিনবত্ব দিয়েছে।

১। সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত : শরৎচন্দ্র, পৃঃ ১২০

শরৎচন্দ্রের অন্যান্য গল্পগুলির মধ্যে 'বোঝা', 'অনুপমার প্রেম' তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভার দ্বারা আক্রান্ত। 'অনুপমার প্রেম' গল্পে অনুপমা চরিত্রটি উৎকৃষ্ট সৃষ্টি হতে পারত কিন্তু সহসা লেখক দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন। প্রথমে মনে হয় অনুপমা উপন্যাস-পড়া একটি অদ্ভুত মেয়ে, সে উপন্যাসের জগতেই বাস করে। কিন্তু পরে দেখা যায়, সে ঠিক তার উল্টো। কিন্তু তার এই চারিত্রিক বৈপরীত্যের কোন কারণ লেখক দেননি। 'বোঝা' আরো কাঁচা গল্প, চরিত্র ও ঘটনা দুইই শিথিল। 'বিলাসী' গল্পটিতে বক্তব্য বা বক্তৃতা বেশী। ন্যাড়া, মৃত্যুঞ্জয় ও বিলাসীর জীবনের কথা ডায়েরীর আকারে প্রকাশ পেয়েছে। ন্যাড়া আবেগে আপ্লুত হয়ে এত কথা বলেছে যা প্রবন্ধাকৃতি ধারণ করেছে এবং গল্পের কোন উন্নতি হয় নি। মৃত্যুঞ্জয় শরৎচন্দ্রের নায়কদের মতই উদাসী ও জীবন সম্পর্কে বেপরোয়া। আর বিলাসী চিরন্তন নারী। দুজনে যেন ভোলামহেশ্বর আর পার্বতীর প্রতীক। বিলাসী চায় ঘর বাঁধতে, স্বল্পসুখের মধ্যেই আনন্দিত। আর মৃত্যুঞ্জয় উদাসী, জীবন মৃত্যু দুইই তার কাছে সমান। শেষ পর্যন্ত মৃত্যুঞ্জয় সাপ ধরতে গিয়ে প্রাণ হারাল। আর বিলাসী আত্মহত্যা করল। গল্পটি করুণ। ন্যাড়ার বক্তৃতা গল্পটিকে দীর্ঘ ও গতিহীন করেছে।

অন্যান্য গল্পের মধ্যে হরিলক্ষ্মী ও মেজদিদি উল্লেখযোগ্য। হরিলক্ষ্মী গল্পটিতে লেখক মিতভাষী। অন্যকে অপমান করা, অন্যকে আঘাত করার মধ্য দিয়েই হরিলক্ষ্মীর নিজের অপমানবোধ ও নিজের বেদনাবোধ সৃষ্টি এই গল্পের অভিনবত্ব। শুধু দৈনন্দিন জীবনের কাহিনী নয়, তার সঙ্গে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের যোগ কাহিনীটিকে বিশিষ্ট করেছে। মেজদিদি সেই তুলনায়, সুখপাঠ্য হওয়া সত্ত্বেও, শিথিলবন্ধ ও অকারণে প্রলম্বিত। অন্যান্য অনেক কাহিনীর মতই এখানেও শরৎচন্দ্র কেষ্টর বেদনা ও মেজদিদির চরিত্র দুটি আখ্যানবস্তুর প্রতি সমান জোর দিয়েছেন ও মেজদিদির চরিত্র বিকাশে অনর্থক কাহিনীকে দীর্ঘ করেছেন।

এই আলোচনা থেকে বলা চলে যে শরৎচন্দ্র ছোটগল্পের কলাকৌশল সম্পর্কে বিশেষ অবহিত ছিলেন না এবং কোন সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনধর্মী লেখায় তিনি হাত দেননি। তাঁর ছোটগল্পগুলির বিষয় বৈচিত্র্য খুবই কম—পারিবারিক দ্বন্দ্ব বা সামাজিক দ্বন্দ্বই তাঁর কাহিনীর প্রধান বিষয়। পুরুষ চরিত্রের চেয়েও নারী চরিত্রের ঔজ্জ্বল্য তাঁর লেখায় বেশী। তাঁর লেখার হাস্য, ব্যঙ্গ বা নিষ্ঠুর বেদনার চিহ্ন নেই। হয় তাঁর লেখায় কারুণ্য, নয় পরিণামী মিলন। আঙ্গিকগত অভিনবত্বও বেশী নেই। সবই বিবৃতিমূলক লেখা। শুধু বিলাসী গল্পটি ডায়েরী আকারে লেখা। তাঁর ছোটগল্পে প্রকৃতি বর্ণনার কোন স্থান নেই, ঘটনার বাহুল্য আছে, চরিত্রের বাহুল্য আছে। মন্দির, সতী একাদশী বৈরাগী ইত্যাদি কয়েকটি গল্প ছাড়া আর কোন গল্পই কোন ঔজ্জ্বল্য বা কোন প্রতিভার স্পর্শবাহী নয়।

৩

ছোটগল্পকার হিসেবে শরৎচন্দ্রের খ্যাতি প্রকৃতপক্ষে মুষ্টিমেয় গল্পের উপরে নির্ভরশীল। তার মধ্যে 'অভাগীর স্বর্গ' ও 'মহেশ' সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পটি বিশেষভাবে অভিনবত্বের দাবী করে। এক নিম্নশ্রেণীর হিন্দু নারীর সংস্কার এই গল্পের কেন্দ্র। তার বিশ্বাস যে সতীলক্ষ্মী ও পুণ্যাত্মারা স্বর্গে যান। স্বর্গ ও নরকের প্রতি এই বিশ্বাস তার রক্তে, অস্থিতে, মজ্জায়—এক কথায় সে পাপপুণ্য স্বর্গনরক তার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে বিশ্বাস করে। তার শিক্ষা নেই, তার জগত অতি ক্ষুদ্র, তার বিশ্বাস অতি দৃঢ়। সে মুখুজ্জে গিন্নীর শবদাহের সময় স্বচক্ষে দেখেছে যে শ্মশানে স্বর্গের রথ নেমে এসেছে, সেই রথ লতাপাতায় চিত্রিত। সেই রথে বসে পুণ্যাত্মা সতীলক্ষ্মী স্বর্গে গেছেন। বলাই বাহুল্য, লেখক এই ঘটনাটিকে ভৌতিক বলে ব্যাখ্যা করেননি, অসম্ভব বলে ইঙ্গিত করেননি। অভাগীর চেতনায় ও বিশ্বাসে এর চেয়ে সত্য আর কি হতে পারে। যুগ যুগ ধরে হিন্দুনারীর যে সংস্কার সেই সংস্কার প্রচণ্ড-ভাবে তারই মধ্যে জাগ্রত হয়ে আছে। তার স্বর্গলোলুপ মন চারিদিকের বাস্তব, অবিশ্বাসী জগতের মধ্যে বসেই সেই চিরআকাঙ্ক্ষিত স্বর্গের সত্যকে আবিষ্কার করেছে। এই স্বর্গের আশা নিয়ে সে মারা গেছে। তার বিশ্বাস ছেলের হাতের আগুন পেলে স্বর্গরথ অবশ্যই নেমে আসবে।

অভাগীর সন্তান কাঙালী। সে মায়ের শেষ আশা পূর্ণ করতে চেয়েছে। কিন্তু মা-কে কাঠ দিয়ে পোড়াবার ক্ষমতা তার নেই। তবু চেষ্টা করেছে, ভিক্ষা করেছে, অপমানিত হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। মায়ের বিশ্বাসকে সে সংশয়ের মধ্যে মেনেছে। তাই কাহিনীর শেষ হয়েছে আরেক শ্মশানে, যেখানে কাঙালী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধোঁয়ার মধ্যে সেই অবিশ্বাস্য স্বর্গরথের আগমন দেখার চেষ্টা করছে। এই দৃশ্যটিই গল্পটিকে অপরিসীম গাঢ়ত্ব দিয়েছে। এক শ্মশানে কাহিনী শুরু হয়েছিল যেখানে অভাগী দেখেছিল স্বর্গরথ, আরেক শ্মশানে কাহিনী শেষ হল, সেখানে স্বর্গরথের প্রতীক্ষা করছে কাঙালী। এই দুটি দৃশ্য যেন কাহিনীর দুটি বন্ধনী, সমস্ত ঘটনাপুঞ্জকে যেন এই দুটি বন্ধনী কিছুতেই কাহিনীর মূল লক্ষ্যের বাইরে যেতে দেয়নি। শরৎচন্দ্র যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই চরিত্র বর্ণনার সুযোগ ছাড়েন নি—নাপতে বৌ, রসিক বাঘ, বিন্দী পিসী, জমিদারের গোমস্তা, জমিদারের ছেলে, মুখুজ্জে মশায়, হিন্দুস্থানী দারোয়ান প্রত্যেকটি মুখই স্পষ্ট। কিন্তু কাহিনীর কঠিনবন্ধ রূপটি গল্পকে অসামান্যতা দিয়েছে। শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পের ভাণ্ডারে এরকম গল্প আর মাত্র একটি আছে। তার নাম 'মহেশ'।

'মহেশ' শরৎচন্দ্রের অতি বিখ্যাত রচনা। বিখ্যাত রচনামাত্রেই উৎকৃষ্ট রচনা নাও হতে পারে। 'মহেশ' সম্পর্কে খ্যাতি ও কুখ্যাতি দুইই শরৎচন্দ্রের ভাগ্যে জুটেছে—যার সবটা সাহিত্যিক কারণে নয়। কেউ কেউ গল্পটিকে বলেছেন অতি ভাবালুতা যুক্ত, কেউ বলেছেন অতিরঞ্জিত।১ এককালে এই গল্পে গো-হত্যা আছে এই কারণে গল্পটির বিরুদ্ধেও আপত্তি উঠেছিল। যাইহোক সাহিত্যিক কারণ ছাড়া অন্য কারণ আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। যাঁরা গল্পটি সাহিত্যিক দৃষ্টি-ভঙ্গির দিক থেকে ব্যর্থ বলেন, তাঁরা বলেন ঘটনা অসম্ভব, এবং গল্পে আতিশয্য চরম।

কাহিনীটি নিষ্ঠুর সন্দেহ নেই—কিন্তু নিষ্ঠুর বলেই অসম্ভব নয়, দরিদ্র কৃষক, জরাজীর্ণ ষাঁড় আর গ্রীষ্মের বাংলাদেশ। এই তিনটি ছবি এই গল্পকে এক বিস্তৃতি দিয়েছে। কৃষক গফুর তাঁর ষাঁড়টিকে সন্তানের মত ভালবাসে, তার নাম দিয়েছে সে মহেশ। গ্রামের সমাজব্যবস্থা ব্রাহ্মণশাসিত ও জমিদারপীড়িত। তারা গোরুকে পূজো করে। তাদের যোগ শাস্ত্রের। গফুরের যোগ মর্মের। দরিদ্র, ক্ষুধার্ত, সর্বস্বান্ত, অত্যাচারিত গফুর রাগে আত্মহারা হয়ে একদিন মহেশকে মেরে ফেলে। তারজন্য সে কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করে। জমিদার তাকে সর্বস্বান্ত করে। সে তার শেষ সম্বল ঘটিবাটি রেখে চেনা ভিটে ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ে একমাত্র কন্যা আমিনাকে সঙ্গে নিয়ে। তার বহুদিনের সংস্কার ত্যাগ করে সে এগিয়ে যায় চটকলের দিকে।

কাহিনীটি নিষ্ঠুর, আবার বলছি, কিন্তু সত্য। এই নির্মম কাহিনীর প্রতি বলা চলে 'সত্য যে কঠিন, কঠিনেরে ভালোবাসিলাম'—। যখন গরু ক্ষুধার জ্বালায় অন্যলোকের শস্য খায় তাকে জমিদার খোঁয়াড়ে পোরেন—কিন্তু নিরুপায় কৃষক যখন সেই গরু বিক্রি করতে চায়—তখন তাকে সাজা পেতে হয়। এর মধ্যে মনুষ্যত্বের কোন পরিচয় নেই। তাই সব ছেড়ে যাবার রাত্রে, তারাভরা আকাশের তলায় গফুরের আর্তবাণী শুধু ছিল এইটুকু যে যারা ভগবানের দেওয়া ঘাস ও জল থেকে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত প্রাণীকে বঞ্চিত করে ভগবান যেন তাদের ক্ষমা না করেন। এর চেয়ে সত্য কথা গফুর আর কী বলতে পারে। এ রাজনীতিকদের শেখানো বুলি নয়, শ্রেণীদ্বন্দ্বের বক্তৃতা নয়, সাধারণ মানুষের বধির ঈশ্বরের কাছে মানুষের সর্বশেষ প্রার্থনা।

এই কাহিনীর মধ্যে ছোটগল্পের লক্ষণ সর্বাধিক স্পষ্ট। কাহিনীর মধ্যে

১। প্রমথনাথ বিশী: রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প পৃঃ ৭৯-৮০

একটিও অনর্থক চরিত্র বা ঘটনা নেই। গ্রীষ্মের বর্ণনায় রাঢ় বাংলায় রুক্ষ তৃষার্ত রূপ ভয়াবহভাবে পরিস্ফুট কিন্তু তার জন্য শরৎচন্দ্র অধিক স্থান দেননি। সর্বোপরি এক তৃষিত ও ক্ষুধিত, পূজিত কিন্তু বাঁচার অধিকার বিবর্জিত অসহায় পশুর ভাষাহীন বেদনা কাহিনীকে এক মহিমা দিয়েছে। ঘটনাবিরলতা, কাহিনীর একমুখিনতা ও চরিত্র সৃষ্টির কুশলতা তিনদিকেই মহেশ শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ছোট-গল্প। এই একটিমাত্র গল্পে শরৎচন্দ্র বাংলা ছোটগল্পের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

॥ পত্রিকা-পরিচয় ॥

বাংলা ছোটগল্পের বিকাশে পত্রিকাগুলির দান বিশেষভাবে স্মরণীয়। তেমনই স্মরণীয় কুন্তলীন পুরস্কার প্রতিযোগিতার প্রভাব। ১৩০০ বঙ্গাব্দ থেকে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়। স্বদেশী গন্ধ তৈল কুন্তলীন প্রস্তুতকারী এইচ বসু বিজ্ঞাপনের জন্য গল্প প্রতিযোগিতা আহ্বান করেন। "..গল্পের সৌন্দর্য কিছু-মাত্র নষ্ট না করিয়া কৌশলে কুন্তলীন এবং এসেন্স দেলখোসের অবতারণা করিতে হইবে, অথচ কোন প্রকারে ইহাদের বিজ্ঞাপন বিবেচিত না হয়।"—এই ছিল প্রতি-যোগিতার সর্ত। এই পুরস্কার অনেক খ্যাতনামা লেখকই পেয়েছিলেন। রবীন্দ্র-নাথ, যদিও এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেননি, 'কর্মফল' গল্পটির জন্য পুরস্কার লাভ করেছিলেন। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জগদানন্দ রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, অনুরূপা দেবী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্পগুলি একসঙ্গে সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হত। এগুলিকে সমকালীন গল্পসংকলন বলা চলে।

প্রতি বৎসর এক একজন বিচারক থাকতেন।১ তাঁরা মধ্যে মধ্যে গল্পগুলির পরিবর্তন বা পরিবর্জন করতেন। খ্যাত অখ্যাত বহু লেখকই লিখতেন। অনেকেই আজ পরিচিত।২

১। ১৩০৯ সালের কুন্তলীন পুরস্কারে বিচারক ছিলেন জলধর সেন। ১৩১০ সালে দীনেন্দ্রনাথ রায়। ১৩০৯ সালেই শরৎচন্দ্রের মন্দির গল্পটি প্রথম হয়। এই গল্পটি সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (বাঙ্গালীটোলা, ভাগলপুর) নামে প্রকাশিত হয়।

২। ১৩০৯ সালের দ্বিতীয় পুরস্কার পায় সরলাবালা দাসীর 'স্মৃতিচিহ্ন' নামে একটি করুণরসাশ্রিত গল্প। বারীন্দ্রনাথ ঘোষের 'সার্থক' নামে একটি হাসির গল্প ছিল। একটু উদাহরণ দিইঃ

> "পাঠক, আমার স্ত্রীটি কেমন জান? কি করিয়াই বা বুঝাইব। এই —ঝিঙে বিচি দেখিয়াছ? রংটুকু অমনি। কিন্তু তাহা ছাড়া আর সব ঠিক আছে—ঠোঁট পাতলা, চোখ বড় ভাসা ভাসা, হাত পা ছোট গোলগাল, গড়নখানি দুগ্‌গো ঠাকরুণটির মত, আঙুলে দশটি চাঁপার কলি, পিঠ ঢাকা কোঁকড়া চুল। ঐ যে বলিলাম সব ঠিক শুধু রংটুকু, বাপ্‌। যেন অমাবস্যার ঘোর ঘটা।"

এই সংখ্যাতেই লিখেছিলেন, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, ইন্দিরা দেবী, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

১৩০১ অব্দে সৌরীন্দ্রমোহন, ইন্দিরা দেবী, জগদানন্দ রায়, চারুশীলা দেবী, প্রভৃতি লেখক লেখিকার নাম উল্লেখযোগ্য।

এই পুরস্কার প্রতিযোগিতার লেখক তালিকা থেকে বোঝা যায় যে দেশে ছোটগল্প রচনার আগ্রহ ও উৎসাহ এই সময়ে যথেষ্ট বেড়েছিল। ১৩১০ অব্দে নারী-লেখকদের সংখ্যা বেশী হওয়ায় প্রকাশক নিবেদন করেছিলেন যে, 'গল্প রচনার আর্ট লেখিকাগণের যতটা আছে, পুরুষ লেখকগণের গল্পে ততটা নাই।'

এই পুরস্কার যেমন ছোটগল্পের বিকাশে সাহায্য করেছিল, তেমনি সমকালীন পত্রিকাগুলি লেখক ও পাঠক উভয়েরই ছোটগল্পের প্রতি আগ্রহকে দানা বাঁধতে সাহায্য করছিল। হিতবাদী ভারতী সাধনা সাহিত্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পত্রিকায় মাঝে মাঝে গল্প সম্পর্কে কৌতুহলোদ্দীপক প্রশ্ন থাকত।১ কখনও কখনও গল্পের সমালোচনা হত।২ এরই মধ্য দিয়ে বাংলা ছোটগল্প বিকশিত হচ্ছিল।

১। কৃষ্ণনগর থেকে শরৎকুমারী দেবী প্রশ্ন করছেন (সাধনা, ১৩০০, পৌষ)ঃ "গত মাসের সাধনায় শ্রদ্ধাস্পদ বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' উপন্যাস পাঠ করিয়া রাইচরণের সংসার ত্যাগের কারণ স্থির করিতে পারিলাম না। রাইচরণ কি ফেলনার ও অনুকূলবাবুর ব্যবহারে ভগ্ন হৃদয় হইয়াছিল?"

এর উত্তরে সম্পাদক বলছেন,

"তাহাই বটে। পাঠিকা ভাবিয়া দেখিবেন, অনুকূলবাবু ফেলনাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া রাইচরণকে দূর করিয়া দিলে পর পৃথিবীতে তাহার আর কোন বন্ধন রহিল না। এতদিন একান্ত মনে যে উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া রাইচরণ জীবন যাপন করিতেছিল ফেলনাকে পর-হস্তে সমর্পণ করিয়া রাইচরণ তাহা হইতেও বিচ্যুত হইল। অতঃপর তাহার জীবনের কোন বন্ধন অথবা উদ্দেশ্য রহিল না। বৃদ্ধবয়সে পৃথিবীতে নূতন সম্বন্ধ, জীবনের নূতন উদ্দেশ্য গ্রহণ করাও সহসা সম্ভব নহে।"

২। সাধনা (১৩০০, মাঘ), পৃঃ৮৮—নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'সংগ্রহ' নামক ছোটগল্প গ্রন্থের সমালোচনা আছে। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে আঘাত করে সম্পাদক ঠিকই করেছেন। বলেছেন 'যিনি শ্যামার কাহিনী লিখিতে পারেন তাঁহার নিকট হইতে কেবলমাত্র কৌতুহল অথবা বিস্ময়জনক গল্প আমরা প্রত্যাশা করি না।"

সাহিত্য পত্রিকা রবীন্দ্রবিরোধী ছিল। তাঁদের সমালোচনা, নিরপেক্ষ ছিল না। প্রভাতকুমারের প্রায় গল্পকেই আক্রমণ করতেন। প্রভাতকুমারও এ'দের দলকে আক্রমণ করতেন। এই নিয়ে প্রভাতকুমার 'একটি কুক্কুরের প্রতি' সনেট রচনা করেন।

এই পর্বেই কয়েকটি 'মুসলমান' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।১ বঙ্গীয় মুসলমান পত্রিকা (১৩২৫) ও মোসলেম ভারত (১৩২৭) দুটি প্রধান। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের দানের স্বল্পতা ও মুসলমান জীবনের পরিচয়হীনতা—এই দুটি অভাবের থেকেই এদের জন্ম। বঙ্গীয় মুসলমান পত্রিকা ছিল ত্রৈমাসিক। মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক ছিলেন সম্পাদক। মুসলমান জীবন নিয়ে নানা কাহিনী এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। গল্পলেখক নজরুল ইসলামের আবির্ভাব এই পত্রিকাতে। প্রথম বর্ষ প্রথম খণ্ডে দুটি প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন গল্প ছিল। তাসেবউদ্দীন আহমদ-এর 'যক্ষের ধন' এবং কাজী আবদুল ওদুদ-এর 'ভুল'। হিন্দু লেখকদের পক্ষে এই ধরনের মুসলমান সমাজের আবহাওয়া সৃষ্টি করা সেদিন সম্ভব ছিল না। প্রথম দিকে শুধু মুসলমান লেখকেরাই এই পত্রিকাগুলিতে লিখতেন। ক্রমশঃ হিন্দু লেখকরাও যোগ দেন।২ মুসলমান সমাজ ও জীবনের বিশ্বস্ত ও আন্তরিক চিত্র অঙ্কনের কাজ বিশেষ সাফল্য লাভ করেনি। কিন্তু মুসলিম সাহিত্যিক প্রচেষ্টা উৎসাহ পেয়েছিল। বঙ্গীয় মুসলমান পত্রিকায় ১৩২৬-এর মাঘ মাসে 'ছোটগল্পের ধারা" নামে একটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল। লেখক তাতে বাংলা সাহিত্যের দুটি ধারার সন্ধান করেছেন—একটি হিন্দু ধারা ও অন্যটি মুসলমান ধারা। কতকগুলি লেখক এই মুসলমান ধারাকে স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ

১। কোন সম্প্রদায় বা ধর্ম নির্ভর করে সাহিত্যের পরিচয় দিতে স্বভাবতই সংকোচ বোধ করছি। তবে এগুলি বিশেষভাবে 'মুসলমান' চিহ্নিত—তাই মুসলমান-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত।

২। ১৩২৫ বঙ্গাব্দ: **শ্রাবণ** খাজা (লক্ষ্মীছাড়া), **কার্তিক**; (১) সৈয়দ এমদাদ আলী (প্রতীক্ষা),(২) একরামুদ্দীন (চাঁদমিঞার খাতা) গোলাম হোসেন (সুন্দর')

১৩২৬ বঙ্গাব্দ: **বৈশাখ**(১) জীবেন্দ্র দত্ত (কুড়ান চিঠি),(২) খাজা (নূতন বাড়ি), আবুল মনসুর আহমদ আলী (প্রতিদান) **শ্রাবণ**, আবদুল মুসিত চৌধুরী (কালুডাকাত), **কার্তিক**,(১) নজরুল ইসলাম (হেনা)(২) কাজী আবদুল ওদুদ (মা), **মাঘ** (১) নজরুল ইসলাম (ব্যথার দান), (২) আবদুল হোসেন (রুদ্ধ ব্যথা)।

১৩২৭ বঙ্গাব্দ: নজরুল (অতৃপ্ত কামনা, কাজী ইমদাদুল হক (অদ্ভুদ চা-খোর), পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় (ব্যর্থ)

১৩২৮ বঙ্গাব্দ: শৈলবালা ঘোষজায়া (আয়েসা, লোকশানের সন্ধ্যায়), খুকুমণি দেবী (খানকতক চিঠি), যোগেন্দ্রনাথ সরকার (গোলাপকুঁড়ি), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (জোহরা, লুৎফর রহমান (পলায়ন), মণীন্দ্র দত্ত (বাথিত), মিসেস আর, এফ, হোসেন (মুক্তিফল)।

রাখতে চেয়েছিলেন। সৈয়দ এমদাদ আলী তাই কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' কাব্যকে অনৈস্‌লামিক ও অশ্লীল ভাবের জন্য আক্রমণ করেছেন এবং গঙ্গার স্তব, কালী-ভক্তি ইত্যাদি হিন্দুভাব প্রকাশ হওয়ায় ফলে নিন্দা করেছেন। এই পত্রিকাতেই তিনি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-এর মধ্যে দীনেশচন্দ্র মুসলমান সমাজের প্রতি কটাক্ষ করেছেন বলে অভিযোগ করেন। অর্থাৎ ধীরে ধীরে এই পত্রিকা শুধু সাহিত্য নয় মুসলমান সমাজের সর্বাঙ্গীন আশা আকাঙ্ক্ষা, ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক মত-বাদকেই রূপ দিতে থাকে। নারীর আত্মা প্রসঙ্গে কোরানের মত নিয়ে এই সময় এক প্রবল বিতর্ক হয়। এই বিতর্ক আন্দোলনে শ্রীযুক্ত সুধাকান্ত রায় চৌধুরী অবতীর্ণ হন এবং শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটি প্রবল ধর্মীয় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত মোজাফ্‌ফর আহমদ এই বিতর্কের একটি উত্তর দিয়ে তর্কের অবসান ঘটান। এই ধরনের তর্ক হয়ত ধর্মীয় আন্দোলনের ভিত্তি দৃঢ় করেছিল কিন্তু সাহিত্যিক আন্দোলন তাতে দৃঢ় হয়নি। দুঃখের বিষয়, এই সব [মুসলমান] লেখকগণ কেউই বাংলা গল্প সাহিত্যে কোন স্থায়ী বা বিশিষ্ট দান রেখে যেতে পারেননি। কেউ কেউ উৎকৃষ্ট কাহিনী রচনা করেছেন মাত্র কিন্তু বারবার পড়ার মত, পড়ে বিস্মিত ও চমৎকৃত হবার মত গল্প কেউ লেখেননি।

'মোসলেম ভারত' (১৩২৭) মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এখানেও অনুরূপভাবে সাহিত্য-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-আন্দোলন চলছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সাহিত্যে তার কোন ছাপ পড়ে নি। এই সময় 'বঙ্কিম দুহিতা' নামে একটি বঙ্কিমবিরোধী পুস্তক প্রকাশিত হয়।১ মুসলমান সমাজ বঙ্কিমচন্দ্রকে কখনই সম্পূর্ণ ভাল মনে গ্রহণ করতে পারে নি। তাঁর লেখায় মুসলিম বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে বলে মুসলমান সমাজ স্বভাবতই তাঁকে হিন্দু-সমাজের সামাজিক আন্দোলনের নেতা বলে ভয় পেয়েছে। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এই সময় এই ধর্মীয় দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হন।২ বাংলা পঠন-পাঠনের প্রকৃতির বিরুদ্ধে একজন শিক্ষিত মুসলমান এই সময় আপত্তি করেন—কারণ বাংলা সংকলনে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা বা সীতার বনবাসে হিন্দুর আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে। শিবনাথ শাস্ত্রী

১৩২৯ বঙ্গাব্দ : মৌঃ ওয়াজেদ্দুন আহম্মদ (কেরামত শাহ), খাজা (ছাই), শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (ডাকাত), শৈলবালা ঘোষজায়া (বিদায় গ্রহণ), ফণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস (ক্ষণিকা)।

১। "বঙ্কিমদুহিতা"—ব'লে একখানা বই—অনেক নোংরা কথা তাতে আছে, ...রবীন্দ্রনাথ বল্লেন, আমার উপরে এদের অনেকগুলো চিঠি এসেছে। আমায় চিঠি দিয়েছে ঔরঙ্গজেব সম্বন্ধে কি কতকগুলি তুলে দিতে হবে।" শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী [মুসলমান সাহিত্য]

২। সাহিত্য-কথা (২য়),পৃঃ ১-১৮ [বাংলা ভাষা ও হিন্দু-মুসলমান]

প্রণীত বঙ্কিমজীবনী নিকৃষ্ট রচনা—কারণ বঙ্কিমজীবন থেকে শিক্ষার কিছু নেই। অর্থাৎ মুসলিম আন্দোলন সাহিত্যিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল।

বিশুদ্ধ সাহিত্য আন্দোলনে অবশ্য হিন্দুদের যোগও ছিল। সুধাকান্ত রায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, হেমলতা দেবী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, সুকুমার ভাদুড়ী, শক্তিপদ ভট্টাচার্য প্রভৃতি লেখকেরা প্রায়ই লিখতেন। শৈলবালা ঘোষজায়া মুসলমান জীবন নিয়ে কয়েকটি ভাল গল্প ও বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী রচনা করেছিলেন। তাঁর 'শেখ আবদুল' সমকালীন মুসলমান পত্রিকাগুলির প্রশংসা পেয়েছিল। তাঁর 'আয়েসা' গল্পটি ভাল। 'সরবৎ' ও 'অবাক' গল্প দুটিও আকর্ষণীয়।

একদিকে যেমন মুসলমান রক্ষণশীলতা পত্রিকাগুলির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছিল, হিন্দু রক্ষণশীলতাও তেমনই ক্রমশই বিভিন্ন পত্রিকায় দল বাঁধার চেষ্টা করছিল। 'নারায়ণ' পত্রিকায় (১৩২১) হিন্দু রক্ষণশীলতাকে আরেকবার উগ্রভাবে দেখা গেল। হরিদাস ভারতী 'কল্যাণী' নামে একটি গল্প লেখেন। গল্পের শেষটি এই রকমঃ

> "আনন্দস্বামী বলিলেন, বিশ্বের পরমতত্ত্ব স্বরূপতঃ এক, রূপতঃ দুই। এক দুই-এর এক পুরুষ আর এক প্রকৃতি। এই প্রকৃতির আবার দুই রূপ—এক রূপ জগদম্বা আর এক রূপ শ্রীরাধিকা। এক রূপের আশ্রয়ে সৃষ্টির আর এক রূপের আশ্রয়ে লীলার প্রকাশ হয়। এই তিনেতে পুরুষ আপনি আপনার পূর্ণতা সাধন করেন। ...আনন্দস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ঠাকুর, এ রূপ প্রকট কোথায়? তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, শ্রীবৃন্দাবনো"।১

এই লেখাটি প্রকৃতপক্ষে বিপিনচন্দ্র পালের।২ তিনি হিন্দুত্ব রক্ষার জন্য একসময়ে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন। 'নারায়ণ' পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য এখান থেকেই প্রকট হবে। এই ধারারই আর একটি গল্প 'মোহিনী'।৩ বালবিধবা মোহিনীর জীবনে একদিন প্রেম এল। কিন্তু সেই অচরিতার্থ প্রেমের অবসান ঘটল বৈরাগ্যে—"মোহিনী আর ঘরে গেল না, বাহির হইতে শিকল টানিয়া দরজা বন্ধ করিল। সামান্য কিছু বেলা থাকিতে মোহিনী সহস্র স্মৃতিবিজড়িত মায়াজালের মত আপন বসতবাটি ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।"

কিন্তু রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও ভাবী যুগের লেখকেরা এইসব পত্রিকাতেই আত্মপ্রকাশ করেছেন। শৈলজানন্দ, নজরুল ইসলাম, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এখানেই তৈরী হয়েছেন। অন্যান্য লেখকদের গল্পগুলিও বলাই বাহুল্য, সর্বদা এই রক্ষণশীল মনোবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নি। তা স্বাভাবিকভাবেই বিকশিত হয়েছে। বিপিন

১। 'নারায়ণ' ১৩২১ মাঘ, পৃঃ ২৫৯-৮২
২। 'সত্য ও মিথ্যা' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।
৩। 'নারায়ণ' ১৩২২, মাঘ, পৃঃ ২০২-২৩। লেখকঃ ক্ষেত্রলাল সাহা।

চন্দ্রের লেখাই তার প্রমাণ। যদিও তাঁর 'কল্যাণী' হিন্দুত্বেরই প্রকাশ, 'মৃণাল' রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্রে'র বিরুদ্ধে হিন্দু নারীত্বের আদর্শের প্রচার, তবুও তাঁরই লেখা "লাবণ্য" ভিন্ন ধরনের। অবশ্য এর মধ্যেও হিন্দুত্ব ও কৃষ্ণপ্রেম প্রকাশ পেয়েছে। এক সন্ন্যাসী পতিতাদের ঘৃণা করত—সেই পতিতাদের মুখেই সে শুনল কৃষ্ণোপদেশ। "তুমি সন্ন্যাস লইয়া স্বভাবকে শুদ্ধ করার চাইতে রুদ্ধ করার দিকেই বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলে। তাই তোমার প্রকৃতি এই প্রতিশোধ তুলিয়াছে।"

'লণ্ডনে নন্দনলাল' মজার গল্প। নন্দনলাল বিলেতে এসে লুসির প্রেমে পড়ে ও তাদের একটি সন্তান হয়। কিন্তু তারপর থেকে দুজনের বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এক দুষ্ট প্রকৃতির ইংরেজ নন্দনলালকে ব্ল্যাকমেল করত। বলত সে, লুসি টাকা চেয়েছে। টাকা না দিলে সব ফাঁস করে দেবে। শেষ পর্যন্ত নন্দনলালের সঙ্গে লুসির দেখা হল ও সে জানতে পারল যে লুসির সঙ্গে সেই লোকটির কোন যোগাযোগ নেই।

'বাৎসল্যের আতিশয্য' বিপিনচন্দ্রের একটিমাত্র উল্লেখযোগ্য রচনা। নলিনীর চরিত্রে বৈশিষ্ট্য হল উদাসীনতা। নিজের সম্বন্ধেও, স্বামীর সম্বন্ধেও। ইতিমধ্যে তাদের একটি ছেলে হল। নলিনীর সমস্ত স্নেহ ও ভালবাসা গিয়ে পড়ল সন্তানের প্রতি। স্বামীর প্রতি সামান্যতম ভালবাসাও থাকল না। সেই উপেক্ষা ও উদাসীনতায় স্বামী ঘর ছাড়ল। বাইরে গিয়ে অসহায়ভাবে মারা গেল। তবুও সে স্বামীর দিকে উদাসীন রইল। গল্পটির মধ্যে এতটা আতিশয্য না থাকলে ও মনোবিশ্লেষণের উপযুক্ত ক্ষমতা থাকলে ভাল গল্প হতে পারত।

পত্র-পত্রিকায় তরুণ লেখকের সংখ্যা ক্রমশই যেমন বাড়ছিল তেমনই লক্ষ্য করা চলে যে, লেখিকার আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যে এই সময় থেকেই সর্বাধিক বেশী হতে আরম্ভ করে। এই প্রসঙ্গে লেখিকাদের সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্যন্ত বাংলায় লেখিকার সংখ্যা অধিক ছিল না। পুরুষ লেখকদের মনোভঙ্গি ও লেখিকাদের মনোভঙ্গির স্পষ্ট পার্থক্য ঊনবিংশ শতাব্দীর দুই-একটি লেখিকার লেখার মধ্যে ধরা পড়েনি। পুরুষের সৃষ্ট সাহিত্যে নারীসৌন্দর্য বন্দিত, তার মনোবেদনা বিশ্লেষিত। কিন্তু নারীমনের রহস্য বিশ্লেষণে নারীরচিত সাহিত্যে আরো অন্তরঙ্গতা ও বাস্তবতার পরিচয় স্বাভাবিক। সর্বোপরি নারীর চোখে জগৎ ও পুরুষের সংসারের পরিচয় নারীর সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে একমাত্র শক্তিমান লেখিকা স্বর্ণকুমারী। তাঁর রুচি, শক্তি ও কল্পনাভঙ্গি বিশেষ প্রশংসনীয়। তারপরে বাংলা সাহিত্যে নিরুপমা দেবী ও অনুরূপা দেবী বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন। নিরুপমার প্রায় সমস্ত লেখারই মূল বিষয় দুঃখপীড়িত নারীজীবন। সহজ ও সরলভাবে লেখা কিন্তু প্রায়ই ভাবালুতায় আচ্ছন্ন। অনুরূপার লেখায়

প্রাচীন হিন্দু আদর্শের জয়গান। পাশ্চাত্য আদর্শের সঙ্গে সংঘাতের ফলে সনাতন হিন্দুত্বের প্রতিক্রিয়া বলা যেতে পারে। নিরুপমা তাই গ্রাম্য ও পারিবারিক জীবনের সহজ সরল ও দৈনন্দিন সমস্যাগুলি নিয়েই সমস্যাহীন কাহিনী রচনা করেছেন—অনুরূপা সেই জীবনের অন্তর্নিহিত দার্শনিক আদর্শকে ব্যাখ্যা করেছেন। নারী ও আধুনিকতার দ্বন্দ্বের চিত্র সীতাদেবী ও শান্তাদেবীর রচনায় পরিস্ফুট। তাঁদের উপন্যাস ও গ্রন্থে স্পষ্টই আধুনিক বাংলাদেশের নারীজীবনের পরিবর্তনের কয়েকটি স্তর স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আধুনিক আন্দোলনের ঢেউ কীভাবে বাঙালী পারিবারিক জীবনের মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে—কীভাবে নারী তাকে তার চিরন্তন রক্ষণশীল মনোবৃত্তির দ্বারা প্রতিহত করতে চেয়েছে, ক্রমে ক্রমে তাকে গ্রহণ করেছে, কেউ বা সেই উদ্দাম বন্যাস্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছে—নারীর মনের দ্বন্দ্বেও তার বিচিত্র রূপের সেই পরিচয় সীতা ও শান্তার লেখায় স্পষ্ট।

শান্তাদেবীর ছোটগল্প অনেকগুলি। একগুচ্ছ গল্প প্রধানত নারীজীবনের সমস্যামূলক। কখনও পতিতার সন্তান বলে নারীর বেদনা, কখনও বা স্বামীর কামাসক্তি ও উপপত্নীর প্রতি বন্ধন স্ত্রীর জীবনকে করুণ ও বেদনাময় করেছে। 'আঁধারের যাত্রী' গল্পে এক অন্ধ নারীকে বঞ্চনা ও তার বেদনা। নারীজীবনের বঞ্চনা ও অসহায়তার কাহিনী লিখতে গিয়ে তিনি প্রায়ই শরৎচন্দ্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁর কোন কোন গল্পে (পৌষপার্বণে) তাই বিধবা নারীর শিশু দেবরের প্রতি গভীর মমতা ও সন্তানবাৎসল্য, কোন গল্পে (পিতৃদায়) নারীর আত্মসম্মান ও কঠিন প্রতিজ্ঞা। তাঁর দুটি গল্প নারীর মনের বেদনা ও রহস্যের বিশ্লেষণের দিক থেকে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য—'পথহারা' ও 'পরাজয়'। কুম্ভমেলায় পুণ্যলোভাতুর জনসমুদ্রে হতভাগ্য মন্দা পথ হারিয়ে ফেলল। তার আশ্রয় নেই কোথাও। অন্যান্য সবাই তাকে সন্দেহ করে। নারী নারীর দুঃখ বোঝে না। সোমনাথ তাকে আশ্রয় দিল, ভালবাসল। হাসপাতালের মধ্যে তাদের বাসর রচনা, অনিবার্যভাবে এ যুগের অন্যতম কথাশিল্পী সমারসেট মমের Sanatorium গল্পটির কথা মনে করিয়ে দেয়। এ জন্মের ভালবাসা অপূর্ণ রইল—হয়ত পরজন্মে তার পূর্ণতা। পরজন্মের জন্য আকুল আগ্রহে তারা আলোচনা করে। এই কারুণ্য ও মাধুর্যে গল্পটি মুখর।

'পরাজয়' গল্পটি মনোবিশ্লেষণে ও বাস্তবতার দিক থেকে চমৎকার। দুই সখী—মহালক্ষ্মী ও রজনী। রজনী দরিদ্র, মহালক্ষ্মীদের আশ্রিত। মহালক্ষ্মীর মনে রজনীর ওপর এক গোপন ঈর্ষা ছিল। মহালক্ষ্মী তার প্রণয়প্রার্থী শিবসুন্দরকে প্রত্যাখ্যান করল। সেই প্রত্যাখ্যাত শিবসুন্দর রজনীকে বিবাহ করল। মহালক্ষ্মীর অহংকার ও দর্প চরিতার্থ হল। কিন্তু মহালক্ষ্মী বিবাহের অল্প দিনের মধ্যেই বিধবা হল। তখন তার দরিদ্র বাল্যসখীর সুখী দাম্পত্যজীবন তার বুকে আগুনের মত জ্বলতে লাগল—সে ঈর্ষায়, যন্ত্রণায় বার বার অভিশাপ দিল যেন রজনী

বিধবা হয়। তার অভিশাপও ফলল। কিন্তু এই বৈধব্যের যন্ত্রণা মহালক্ষ্মীকে আরও তীব্র আঘাত করল। শিবসুন্দর যে তারই প্রণয়ী। একদিন ঔদ্ধত্যে; অহংকারে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল কিন্তু সে যে তার সমস্ত হৃদয়-মন জুড়ে বিরাজ করছে।

১৩২২ বঙ্গাব্দ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার কার্তিক সংখ্যাটি মহিলা সংখ্যারূপে প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যায় সুশীলা সেন (দিবাস্বপ্ন), কাঞ্চনমালা (ওস্তাদজী), সুনীতি দেবী (ভাই ভাই), হেমনলিনী দেবী (গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নে) জ্যোতির্ময়ী দেবী (মরুর মায়া), অমলা দেবী (সে কোথায়), ঊর্মিলা দেবী (জ্যোতির্ময়ী), মৃণালিনী সেন (পরাজয়), প্রমীলা মিত্র (ফেল-পাশ) প্রভৃতি লেখিকার লেখা ছিল। এঁদের মধ্যে কাঞ্চনমালা গল্পরচনায় সুদক্ষ ছিলেন। সুনীতি দেবী ও জ্যোতির্ময়ী দেবী আধুনিক বাংলা গল্পধারার পূর্বাভাস বহন করছিলেন। যদিও তাঁদের গল্পরচনার প্রতিভা উৎকৃষ্ট ছিল না, তবুও সাহসিকতা ও নূতনত্বের সন্ধানে তাঁরা স্মরণীয়। ঊর্মিলা দেবী বিভিন্ন পত্রিকায় লিখতেন। নারায়ণ, মানসী ও ভারতবর্ষেই তাঁর গল্পগুলি প্রকাশিত হয়। তাঁর গল্পে একটি গভীর আন্তরিকতা ও নারীসুলভ স্পর্শকাতরতা লক্ষ্য করা যায়। 'দুঃখী দাদা' নামে একটি গল্প নারায়ণে প্রকাশিত হয়েছিল গল্পটি অত্যন্ত স্নিগ্ধ। একটি ছোট মেয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলে। তার 'দুঃখী দাদা' তাকে খুঁজে খুঁজে প্রাণপাত করে ও শেষে সেই হারানো বোনকে খুঁজে পায়। গল্পটির মধ্যে কোন কৌশল নেই। জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখায় যেমন বৈদগ্ধ্যের ছাপ বেশী, ঊর্মিলার লেখা তেমনই সারল্যপ্রধান। এই সারল্যের সঙ্গে মাধুর্য যোগ হয়েছিল রানী নিরুপমা দেবীর লেখায়। তিনি কুচবিহার থেকে পরিচারিকা নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) এই পত্রিকায় রানী নিরুপমার গল্পগুলি অত্যন্ত মধুর। তাঁর ভাষা ছিল রবীন্দ্রানুসারী কিন্তু তার মধ্যে মেয়েলি ব্রতকথা জাতীয় ধাঁচ ছিল। এই ভাষা ও বর্ণনাগুণে তুচ্ছ বিষয়গুলি অপূর্ব হয়ে উঠত। তাঁর 'মালাকর' গল্পটি একটি উৎকৃষ্ট রচনা। অনুশীলন করলে তিনি একজন উৎকৃষ্ট লেখিকা হতে পারতেন সন্দেহ নেই। তাঁর লেখা থেকে একটু উদাহরণ দিই: এই রীতিই পরে হেমলতা দেবীর হাতে পূর্ণতা পেয়েছিল।

> "সে প্রতিদিন একটি রাস্তার বাঁকে বসে একাগ্রমনে ফুলের মালা গাঁথত, আর যতরাজ্যের খোদ্দের এসে পয়সায় দুটি করে মালা কিনে নিয়ে যেত।.. তার নিপুণ আঙুলগুলি সূর্যের উপর দিয়ে ভেল্কিবাজীর মত খেলে যেত আর ফুলের পর ফুল গ্রথিত হয়ে এক-একখানি শীতলস্নিগ্ধ গন্ধমধুর মালা প্রস্তুত হয়ে উঠত।"

এই রাবীন্দ্রিক ভঙ্গির শ্রেষ্ঠ অনুসরণ দেখা যায় হেমলতা দেবীর গল্পে। তাঁর 'দুনিয়ার দেনা' (১৯১০) গল্পগ্রন্থ একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। 'ভারতবর্ষ' প্রশংসা করে লিখেছিলেন যেন হেমলতা দেবী এই একটি গ্রন্থেই দুনিয়ার দেনা শোধ না করেন।

নারায়ণ বলে ছিলেন, হেমলতার লেখায় ঋষির সাধনা ও দৃষ্টিখানি নারীর শুচিতায় কি যে অপূর্ব বস্তু হয়ে উঠেছে তা বলে বোঝাবার নয়।

সবুজপত্রের লেখকগোষ্ঠির সঙ্গে, বিশেষত 'লিপিকা' গ্রন্থের সঙ্গে হেমলতার যোগ অতি ঘনিষ্ঠ ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। প্রথম গল্প "বোঝা-বওয়া" থেকে একটি উদাহরণ নেওয়া যাক।

"বাড়িটি আমার পথের ধারেই। রাত্রিদিন পথ দিয়ে পথিকেরা যাতায়াত করে আর আমি ব'সে ব'সে দেখি। ভাবি এরা কোথায় যায়, কেন যায়, কেন আসে।...আমি বেকার, দিনরাত্রির মধ্যে কোন কাজ নেই। পাড়ার লোকে বলে, ওহে বিবাহ কর, সংসারী হও, এমন করে ক'দিন যাবে? আমি বলি সংসার আমাকে ডাকল কই? আমি ত' তার পথের ধারে দিনরাত্রি বসেই আছি, সে তো আমাকে একটিবারও ডাকে নি"

গল্পগুলিতে মাধুর্য আছে। কিন্তু সব গল্পই রূপকথার মত। কখনও রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকগুলির ভাষায় নায়ক-নায়িকা কথা বলে। 'পথের মানুষ' থেকে উদাহরণ দেওয়া যাকঃ

লোকটা বললে, "আমি মানুষ।"

স্ত্রী। এখানে কেন শুয়ে, তোমার কি ঘর নেই?

লো। এই ত আমার ঘর, এই পৃথিবী আর এই মাটি। মাটি দিয়েই তো লোকে ঘর গড়ে।

স্ত্রী। এমন খোলা জায়গায় পড়ে আছ, বাছা?

লো। কেন এই তো এত বড় আকাশ আমাকে ঢেকে রয়েছে।

স্ত্রী। তোমার কোনই কাজ নেই।

লো। আছে, ঘুরে বেড়ান।

স্ত্রী। তাতে হয় কি?

লো। খুশী হই।

এই ভঙ্গি চরমে উঠেছে 'দুনিযার দেনা' গল্পে। এই গল্পে সনাতন নামে একটি মুদী আছে। সে সর্বত্র পাগল বলে পরিচিত। সে সর্বদাই বলে সবার কাছে তার দেনা। সবার কাছেই তার দেনা, তার ভাষায়

"মায়ের কাছে, গাঁয়ের কাছে, দাইয়ের কাছে, গাইয়ের কাছে, মাটির কাছে, জলের কাছে, ছেলের কাছে, বুড়োর কাছে, হাওয়ার কাছে, চাওয়ার কাছে. গাঁ-শুদ্ধ লোকের কাছে সবার কাছে, মশায় সবার কাছে।"

বেশী বক্তৃতাধর্মী হওয়া সত্ত্বেও গল্পটি ভাল। 'দেবদূতের কথা' বা 'দশের দোসর' গল্প সৃষ্টিও রবীন্দ্রপ্রভাবান্বিত ও 'লিপিকা'র ভাষা ও ভঙ্গির প্রত্যক্ষ অনুসরণ।

২

বাংলা গল্প আন্দোলন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাকেই আশ্রয় করে বিকশিত হচ্ছিল। পত্রিকাগুলিতে গল্পের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছিল। শেষে এক সময় এল যখন শুধু

গল্পের পত্রিকা প্রকাশের তাগিদ এল। 'কল্লোল' (১৯২৩) পত্রিকা নিজেদের সর্ব-প্রথম গল্প-মাসিক বলে ঘোষণা করেছিল।১ কিন্তু তাদের এই দাবী ভিত্তিহীন। 'পুষ্পোদ্যান' নামে একটি পত্রিকাও এই দাবী করেছিল। বাংলাদেশে শুধু গল্প নিয়ে পত্রিকা প্রকাশ করার গৌরব 'গল্প লহরী'র (১৩১৯)। কলেজ স্ট্রীটের শিশির পাবলিশিং হাউস থেকে মাসিক উপন্যাস ও গল্প প্রকাশিত হচ্ছিল। কিন্তু পত্রিকা হিসেবে গল্প লহরী প্রথম। এই বিষয়ে ইংলণ্ডের Argosy নামক জনপ্রিয় গল্প পত্রিকাটির কথা স্মরণীয়। তবে Argosy যেমন গল্প আন্দোলনে অনেক প্রেরণা জুগিয়েছিল 'গল্পলহরী' কোন উল্লেখযোগ্য দান করতে সমর্থ হয়নি। কারণ পত্রিকাটির মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসায়িক। জনচিত্ততোষণেই সে নিযুক্ত ছিল। কাজেই আমরা যাকে সাহিত্যিক রক্ষণশীলতা বলেছি 'গল্পলহরী' তার পোষক। দুঃসাহসিকতা ও পরীক্ষামূলক গল্পের দ্বারা ব্যবসার সূত্রপাত করা কঠিন। কাজেই গল্পলহরী 'গৃহলক্ষ্মীগণের আদরের সামগ্রী' হতে চেয়েছে।২। এখানে কোন উৎকৃষ্ট গল্পকার কোন উৎকৃষ্ট গল্প লেখেন নি। অধিকাংশ লেখাই গতানুগতিক।৩ লেখকগোষ্ঠির মধ্যে প্রধান ছিলেন সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, পাঁচকড়ি দে। জলধর সেন, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মাঝে মাঝে লিখতেন। কিন্তু 'গল্পলহরী' বাংলা গল্পের প্রাচীন, বহু ব্যবহৃত, গল্পবিষয় ও গঠনকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাই নিতান্ত ঐতিহাসিক কারণে এর অস্তিত্ব কৌতুহলজনক হওয়া সত্ত্বেও ঐতিহাসিক তাৎপর্যে গভীর নয়। নূতনের আহ্বান শোনা গেল 'কল্লোলে'। এখানকার লেখক-গোষ্ঠির সকলেই তখন অমিত রায়ের মত বলতে চেয়েছিল ঃ

> আনিলাম
> অপরিচিতের নাম
> ধরণীতে।

১। বঙ্গবাণী (১৩৩০, চৈত্র)—দ্রষ্টব্য : 'কল্লোল' পত্রিকার বিজ্ঞাপন।

২। দ্রষ্টব্য ঃ 'গল্পলহরী'র বিজ্ঞাপন—ভারতবর্ষ, ১৩২২, ভাদ্র
"ইহাতে কেবল চিত্তবিমোহন উপদেশ পরিপূর্ণ ছোট ছোট গল্প মনোহর শিক্ষাপ্রদ উপন্যাস হাসির গল্প ও ছবিতে পরিপূর্ণ। ইহাতে বাজে নীরস প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় না। ইহা গৃহলক্ষ্মীগণের আদরের সামগ্রী।"

৩। প্রথম বৎসরের লেখকগোষ্ঠি ঃ
উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, অমলানন্দ বসু, সুরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, মনোজমোহন বসু, সুরেশচন্দ্র মজুমদার, বিজয়রত্ন মজুমদার, স্নেহশীলা চৌধুরী, কনকবালা মজুমদার, কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, মণীন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু, গুরুদাস আদক, শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়, কেশবলাল বসু, কৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায় এবং সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

'বন্দরের কাল হল শেষ'

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের অপ্রতিহত প্রভাবের ছায়ায় বাংলার সাহিত্যিককুল আচ্ছন্ন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা মানতে চাননি তাঁরা সামাজিক ও ধর্মীয় পাদপীঠ থেকে তাঁকে আক্রমণ করতে চাইছিলেন। প্রমথ চৌধুরী তাঁদের দ্বন্দ্বে পরাস্ত করলেন। সাধারণ বাঙালীর মনে তাঁদের কথা ধীরে ধীরে মূল্যহীন হয়ে গেল। সেইসব হীনজ্যোতি রবীন্দ্রবিরোধীরা সাময়িক পত্রিকার স্তূপের মধ্যে অবলুপ্ত হলেন। অন্যদিকে যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলে, বাংলাসাহিত্যের সর্বোত্তম প্রতিভা বলে মেনে নিয়েছিলেন তাঁরা রবীন্দ্রপাদপের ছায়ায় নিশ্চিন্তমনে বিশ্রামে রত ছিলেন। নতুন জীবন, নতুন বাণী, নতুন প্রচেষ্টার আহ্বান তাঁরা শোনেন নি। প্রচলিত ও পুরোনো সঞ্চয়কে নিয়েই নানা সাজে, নানা মাধুরীতে ভরিয়ে বারবার বেচাকেনা করছিলেন। বাংলা গল্পের পরিধি যেন স্থির হয়ে গেল। চরিত্রগুলি যেন বহু পরিচয়ের ফলে ঔজ্জ্বল্য হারাল। আবেগ ও আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি তেমন করে আর মনকে নাড়া দিতে পারল না। আর গঠনরীতি ব্যবহারে ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে এল। এরই মাঝখানে মধ্যে মধ্যে এক-একজন শিল্পী এসে এই সুখী, তৃপ্ত, সাহিত্যিকগোষ্ঠি ও পাঠকসংঘকে জানাতে লাগল 'বন্দরের কাল হল শেষ'।

ধীরে ধীরে এই তরঙ্গোচ্ছ্বাস এসে লাগল বাংলা গল্পের গায়ে। গতানুগতিক, ক্লান্ত বাঙালী জীবনের বাঁধা জীবনের থেকে উদ্দাম উধাও বেগে ছুটে বেরিয়ে মুক্তির সন্ধান দেখা গেল। তাকে বলা যেতে পারে রোম্যান্টিকতার ঢেউ। প্রথম মহাযুদ্ধ হয়ে গেছে। বাঙালীর জীবনে সেই যুদ্ধের ছাপ বেশী লাগেনি। তার জীবন নিস্তরঙ্গ। সেই নিস্তরঙ্গ জীবনে হঠাৎ নজরুল ইসলাম কবিতার মধ্য দিয়ে যেমন একটা প্রচন্ড ধাক্কা দিয়েছিলেন, কিছুকালের জন্য মাতোয়ারা করে রেখেছিলেন—তেমনভাবে মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় গল্প লিখে এক বিস্ময় সৃষ্টি করলেন নজরুল ইসলাম। সৈনিক জীবনের কাহিনী। নজরুলের প্রথম রচনাই হল গল্প। "বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী"১ এই ধরনের এক বাঁধন-ছেঁড়া জীবনের সংকেত নিয়ে এল। তাঁর

১। সওগাত, ১৩২৬, জ্যৈষ্ঠ

দ্‌্টি গল্পগ্রন্থই 'ব্যথার দান' (১৯২২) ও 'রিক্তের বেদন' (১৯২৫) এক অপরিচিত 'বোহেমিয়ান' জীবনদ্‌্ষ্টির পরিচায়ক। তাঁর গল্পের নায়করা রিক্ত, হতভাগ্য। নিয়তি তাদের শ্‌্ধ্‌্ শোক দেয়, দ্‌্ঃখ দেয়। মৃত্যু ও বৈফল্য তাদের সঙ্গী। তখন সামনে থাকে য্‌্দ্ধের হাতছানি। "বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী"র গল্পের ভাষাপ্রবাহ তীব্র বেগে, উন্মত্তের মত বয়ে চলেছে। কাহিনীর গঠনের দিকে লেখকের খেয়াল নেই। শ্‌্ধ্‌্ দ্‌্র্বার স্রোতে এক ভবঘ্‌্রের জীবনঘটনা ঘটছে। বারে বারে সে সংসারে শান্তি খ্‌্ঁজছে। শান্তি নেই। অবশেষে য্‌্দ্ধই তাকে ডেকে নিল।

গতান্‌্গতিকতার থেকে নজর্‌্ল গল্পকে পরিপ্‌্র্ণ ম্‌্ক্ত করতে চাইলেন। তাঁর 'রিক্তের বেদন' গল্পটির পটভূমি ভারতবর্ষের বাইরে। বাংলাদেশে বহ্‌্দিন পরে গল্পে ন্‌্তন পটভূমি ও চরিত্রের স্বাদ পাওয়া গেল। স্‌্ন্দরী বেদ্‌্ইন মেয়ে গ্‌্ল এই গল্পের নায়িকা। আর সৈনিক মাতাল, মাতোয়ারা তার নায়ক। 'মেহের নেগার' গল্পের নায়ক য়্‌্সোফ খাঁ ওয়াজিরিস্তানের। খ্‌্রশেদজান বাঈজীর মেয়ে গ্‌্লশানের সঙ্গে তার ভালবাসা হল। কিন্তু য্‌্দ্ধ ডেকে নিল য়্‌্সোফকে। 'ব্যথার দানে'র 'হেনা' গল্পের পটভূমি বেল্‌্চিস্থান ও আফগানীস্থান। 'ঘ্‌্মের ঘোরে' গল্পেও য্‌্দ্ধ। উন্দাম আবেগ, উচ্ছল ভাষাপ্রবাহ ও যৌবনের দ্‌্রন্ত শক্তির বন্দনা এই তিনটি উপকরণ দিয়ে নজর্‌্লের গল্প তৈরী। রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা' বা 'সব্‌্জপত্রে'র কিরণশঙ্কর রায়ের ভাষার মতই তাঁর ভাষা সঙ্গীতময়, তবে তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্রের বন্ধনহীন আন্তরিকতায় তা আরো চঞ্চল। তাঁর নায়ক কথা বলে গানের ভাষায় ঃ "গোলেস্তান। জন্মভূমি আমার। আবার কতদিন পরে তোমার ব্‌্কে ফিরে এসেছি। কত ঠান্ডা তোমার কোল। কত স্‌্ন্দর তোমার ফ্‌্ল। কত মিষ্ট তোমার ফল। কত শীতল তোমার জল।"

মাতোয়ারা সৈনিক-জীবনের পাশে পাশেই নজর্‌্লের রোম্যান্টিক মন বাংলা-দেশের নারী ও প্রকৃতিকে নিয়েও স্বপ্ন রচনা করেছেন। "শিউলিমালা" গ্রন্থে ভাষার উন্দামতা কমেছে কিন্তু মাধ্‌্রী বেড়েছে। "পদ্ম গোখরা"য় অতিপ্রাকৃত আবহাওয়া, 'জিনের বাদশাহ'-এ হাসিঅশ্র্‌্র মিশ্রণ ও 'অগ্নিগিরি'তে প্রেমের বিদ্‌্যতের মায়াবী-স্পর্শে শান্ত পৌর্‌্ষের চকিত অভ্যুদয় আর 'শিউলিমালা'য় কবিতার মত ভাবময়, কাহিনীহীনতা—সংক্ষেপে নজর্‌্লের উল্লেখযোগ্য গল্পগ্‌্লির এই পরিচয়। নজর্‌্লের চরম রোম্যান্টিকতার ম্‌্ল শক্তি ছিল বিদ্রোহের। তাঁর কবিতায় যেমন একদিকে প্রবল নির্ঘোষ ও অগ্নিস্রাবী ভাষাস্রোত—অন্যদিকে কোমল, সঙ্কুচিত, নিভৃত সংগীত গ্‌্ঞ্জরণ, তেমনই তাঁর গল্পেরও দ্‌্ইটি ধারা। কিন্তু দ্‌্টি আপাতঃ বিরোধী ধারা একই রোম্যান্টিকপ্রবাহের দ্বিধাবিভক্ত র্‌্প মাত্র।১ তাঁর কবিতা ও

১। শিশিরকুমার দাশ ঃ বাংলা কাব্যসাহিত্যে নজর্‌্লের ভূমিকা, পরিচয়, ১৩৬৪, জ্যৈষ্ঠ।

গল্পের মূল উপকরণ যৌবন ঃ যৌবনের অমিতবীর্য ও যৌবনের ভীরুমন্থরতা। বাংলা গল্পে নজরুলের আবির্ভাব এই যৌবনের জয়গান গেয়ে। তাঁর কবিতার মতই তাঁর গল্পগুলিও নিটোল নিখুঁত রূপ ধরতে পারেনি--যেন তার ভাবের মদিরা গঠনের পাণপাত্রে ধরে না, তার উচ্ছ্বেল ফেনরাশি পাত্রকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। নজরুলের গল্পগুলি তাই সাহিত্যিক বিচারে উৎকর্ষ লাভ করেনি কিন্তু ঐতিহাসিক অর্থে মূল্যবান—কারণ রবীন্দ্রলালিত ও বাংলা গল্পের অন্যান্য ঐতিহ্যপুষ্ট লেখক-গোষ্ঠির থেকে তা পৃথক ও বিশিষ্ট।

যৌবনের বিদ্রোহের রূপ নজরুল ইসলামে উদ্দাম, তা পাঠককে অভিভূত করে, বিমূঢ় করে—সেই যৌবনের আরেকটি রূপ বহন করে আনলেন মণীন্দ্রলাল বসু। এই রোম্যাণ্টিকতা প্রায় রূপকথা স্তরের। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর যৌবনযন্ত্রণা ও নিঃসঙ্গ মানবহৃদয়ের আর্তনাদ তার সঙ্গে মিশে তাকে বর্তমান জীবনেরই বস্তু-বিহীন ভাবকাহিনীতে পরিণত করেছে। তাঁর নায়কেরা নিঃসঙ্গ। সমাজের মধ্যে থেকেও তারা সমাজ থেকে বাইরে। তারা সংগ্রাম করে না। তাদের জীবনে সংঘাত নেই। তারা ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরে। পটভূমিকা কখনও শান্ত নির্জন দুপুর, কখনও বর্ষা-ভেজা সবুজ মাঠ। কখনও ইংলিশ চ্যানেলের নীল রেখায়। কখন প্যারিসের পথে। চরিত্রগুলি হয় কবি, নয় শিল্পী। প্রত্যেকেই যেন বীণার তার। সামান্যতম অনুভূতিও তাদের মনে অনুরণন তোলে। নায়িকারা সুন্দরী, তারা বিটোফেনের সুর বাজায়, হেলিওট্রোপ শাড়ি পরে। নায়কেরা কবিতা লেখে, ফরাসী কবিতা পড়ে। তারা বিষণ্ণ, তারা নিঃসঙ্গ, তারা মৃত্যুর ছায়ায় শায়িত। তাঁর গল্পের ভাষা কবিতার মত। ঘটনা ঘটে না, ঘটনা এগোয় না, কিন্তু আবেগ প্রসারিত হয়, অগ্রসর হয়, পরিণত হয়। যক্ষ্মারোগের পটভূমিকায় নায়ক-নায়িকা ক্লিষ্ট, যুদ্ধের মধ্যে পিষ্ট, মৃত্যুভয়ের করুণ গোধূলিতে তাদের বিচরণ।

মণীন্দ্রলাল বসু তাঁর প্রথম গল্পসংকলন "মায়াপুরী" (১৯২৩)র বিভিন্ন গল্পে এই অবাধ রোম্যাণ্টিকতা ও অসুস্থ যুবকদের অবক্ষয়ের কাহিনী তুলে ধরেন। যৌবনোন্মেষের রহস্যই যেন তাঁর প্রধান বিষয়। এ প্রাচীনকালের বয়োসন্ধি বর্ণনা নয়, নাগরিক মনের নিঃসঙ্গ ভাববিলাসের বর্ণনা। 'অরুণ', 'সুকান্ত' বা 'জন্ম-জন্মান্তর' কাহিনীগুলি সেই যৌবনের মৃত্যুভয়ের নিঃসঙ্গ বিরহী রূপ। কোন কোন গল্পে অবশ্যই এই রোম্যান্টিকতা সম্পূর্ণ বস্তুহীন আকৃতিহীন রঙিন স্বপ্নের ফানুসে পরিণত হয়েছে (যেমন 'ব্লাউজ', 'ফুলের ব্যথা')। কখনও বা রবীন্দ্র-নাথের অনুসরণে 'সব পেয়েছির দেশে'র মত রূপকথাও লিখেছেন। কিন্তু একথা সত্য যে নিঃসঙ্গ যৌবনের স্মৃতিচারণা পরবর্তী কোন কোন লেখকে দেখা গেছে, যেমন বুদ্ধদেব বসুতে, তার সূচনা যে মণীন্দ্রলালের রচনাতেই হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই।

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছিল যে বাংলাসাহিত্যের নবীন সাহিত্যিকগোষ্ঠি সাহিত্য-প্রচেষ্টার প্রাচীন ধারায় অস্বস্তি বোধ করছিলেন, তাঁরা চাইছিলেন নতুন কিছু। যাঁরাই এই নতুন সৃষ্টির প্রেরণা বোধ করছিলেন, সে ভাবে বা আঙ্গিকে যাতেই হোক, তিনিই আধুনিক। 'কল্লোল' (১৯২৩) পত্রিকা সেই নূতনের আগমনী ধ্বনিত করেছিল। "উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা, সমস্ত বাধাবন্ধনের বিরুদ্ধে নির্ধারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আন্দোলন"।১ কিন্তু তাঁদের মধ্যে রোম্যাটিক আন্দোলনের ঢেউই প্রবল। এই প্রাবল্যেই তাঁরা তখন অনেক সময়ই বিষয়বস্তুর সন্ধান করেছেন কখনও নতুন পরিবেশে, নতুন ধরনের চরিত্রে।২ তারাশঙ্করের "রসকলি" এই সংকীর্ণ পরিবারাশ্রিত বাঙালীজীবনের মধ্যে এক বিচিত্র রোমান্সের ঢেউ আনল, অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে' আরো আধাপরিচয়ের রহস্যে আবৃত হয়ে অবরুদ্ধ ও উদ্দাম যৌবনের শক্তিকে বহন করে আনল। শুধু কল্লোল নয়, আরও অনেক সাময়িক পত্রিকাই। কিন্তু 'কল্লোল' পত্রিকা মূলত এই রোম্যান্টিকতাকেই লালন করেছে। সেইসঙ্গে বাংলা গল্পে আর একটি ধারা ক্রমশই সূচিত হচ্ছিল যাকে বলা যেতো বাস্তবতার ধারা। বিভিন্ন পত্রিকায় নানা লেখকদের মধ্যে তার সূচনা হচ্ছিল৩—'কল্লোল' তাদেরই শক্তির বৃহৎ প্রকাশমাত্র। 'কল্লোল'কে আশ্রয় করে ও সমকালেই অন্যান্য শক্তিশালী লেখক (যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়) কল্লোলের বাইরে থেকেও সাহিত্যে এক নতুন ধরনের চরিত্রকে আহ্বান করে আনলেন।

১। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঃ কল্লোলযুগ, পৃঃ ৩০।

২। ১৩৩১-৩২ ফাল্গুন সংখ্যার বঙ্গবাণীতে কল্লোল পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয় "এই পত্রিকার আপনার যে একটি সাধনা আছে তাহা প্রত্যেক সংখ্যায় পরিস্ফুট।"

৩। দু-একটি পত্রিকা থেকে উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে।

বঙ্গবাণী ঃ **সুনীতি দেবী** (১৩২৯ পাষাণী, পরোপকার স্পৃহা, ১৩৩০-৩১, নিমেষের ভুল), **পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়** (১৩২৯, হরিশখুড়ো, মানুষ ও পশু), **দীনেশরঞ্জন দাশ** (১৩২৯, জয়লক্ষ্মী, তারপর) **শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়** (১৩৩০-৩২, ভূতের কাহিনী, মৃতের ডাইরী, টোটা) **অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত** (দুই সরাই, ১৩৩১-৩২) নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (সাগরিক ও নাগরিক, ১৩৩২) **গোকুলনাগ** (নির্মলের ডাইরী)।

ভারতবর্ষ ঃ **হেমেন্দ্রকুমার রায়** (১৩২২-২৩ শিউলী) গোকুল নাগ (১৩২৭, কি অপরাধ আমার, পরিচয়) **নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত** (১৩২৬-২৭, অগ্নি-সংস্কার, পাগল)।

প্রবাসী ঃ **বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়** (উপেক্ষিতা, ১৩২৮, পুঁইমাচা, ১৩৩১, মৌরীফুল, ১৩৩০) **প্রেমেন্দ্র মিত্র** (শুধু কেরানী, ১৩৩০)।

প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর পরবর্তীকালের এক কবিতায় যে মানুষের কথা বলেছিলেন, সেই মানুষই হল এই নূতন গল্পধারার নায়ক।

নাম তার জানিনাকো;
শুধু জানি ধরণীর ধূলিম্লান আশার প্রতীক
আছে এক করুণ পথিক যুগে যুগে সব যুদ্ধে হেরে ফিরে আসা
ক্লান্ত পদাতিক।

এই নামহীন মানুষের আবির্ভাব হল বাংলাসাহিত্যে। তার সূচনা দেখা দিল শৈলজানন্দের মধ্যে। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০০) প্রাচীন প্রথায় উপন্যাস এবং 'সতীন কাঁটা' জাতীয় গল্প লিখলেও বাংলা গল্পে এক আঞ্চলিক বৈচিত্র্য নিয়ে তিনি আবির্ভূত হলেন। তাঁর আঞ্চলিক বৈচিত্র্য সর্বাপেক্ষা বেশী প্রকট 'কয়লাকুঠি' গল্পে। এই কাহিনীগুলিতে রানীগঞ্জ ধানবাদের কয়লাখাদের বিস্তৃত পটভূমি। সাঁওতালি ও কুলিজীবনের রুক্ষজীবনের বিরোধ, অপমান, ভালবাসা; সাঁওতাল পুরুষের মাতোয়ারা মন, দীপ্ত স্বাস্থ্য, সাঁওতালি নারীর চঞ্চল হাসি তাঁর গল্পে এক বিচিত্র মাধুর্য দিয়েছে। 'কয়লাকুঠি' গল্পটি বাংলা গল্পে একটি দিক্‌পরিবর্তনের সূচনা। নায়ক কুলি নান্‌কু ও নায়িকা সাঁওতালি মেয়ে বিলাসী। বিলাসী নান্‌কুকে বিয়ে করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক রথের মেলায় বিলাসীকে ফেলে দিয়ে মুনিয়ার সঙ্গে পালিয়ে যায়। প্রবঞ্চিত বিলাসীর রুদ্ধ অভিমান ও তার গোপন ভালবাসা গল্পটিতে আশ্চর্য কুশলতায় বর্ণনা করা হয়েছে। কুলিজীবনের চিন্তাহীন, সংস্কৃতিহীন উদ্দাম আনন্দ, মদে মাতোয়ারা মাদলে, গানে ও নাচে-ভরা সন্ধ্যা, কয়লাখাদের নীচে গভীর অন্ধকারে কুলির মৃতদেহ—সব মিলিয়ে এক নূতন জীবনের স্পর্শ বয়ে এনেছে। শৈলজানন্দ অতি দ্রুতই উপেক্ষিত ও পীড়িত মানুষের শিল্পী বলে পরিচিত হয়েছিলেন। সমকালীন একটি পত্রিকা তাঁর সম্বন্ধে বলেছিল যে "যখন একদিকে সাহেবদের দোতলায় ইলেকট্রিক পাখাটা বিনা কারণেই বোঁ বোঁ করিয়া ঘুরিতেছে" আর বৃদ্ধ কেরানী হাঁপাচ্ছে, কিংবা যখন হাসপাতালে ক্লান্ত রোগী চিৎকার করছে আর কম্পাউন্ডার শুয়ে শুয়ে বলছে "এইবার টেরটা পাও চাঁদ, হাসপাতালে বিনা পয়সায় ঘা ধোয়াতে এসেছ, দেখ, কেমন মজা", তখনই বোঝা যায় এ লেখা শৈলজানন্দের। সাধারণ জীবনের এই ব্যথা বেদনা, সামাজিক বৈষম্য ও সাধারণ শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি সহানুভূতির সূচনা তাঁরই গল্পে। "ধ্বংস পথের যাত্রী এরা" এই সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক অব্যবস্থা, বেকার যুবক, প্রবঞ্চক হোটেলের ম্যানেজার, মিথ্যাবাদী মানুষ, ক্ষুধার্ত দরিদ্র ভিখারী ও মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়ের ছবি। এই ধারাকেই পরিস্ফুট করলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। তার সূচনা হল অতি স্মরণীয় "শুধু কেরানী" গল্পে।

নবীন গল্পধারার আর একটি লক্ষণের সূচনা হল জগদীশচন্দ্র গুপ্তের (১৮৮৬-

১৯৫৭) লেখায়। বাংলাসাহিত্যে ইনি অবচেতন মনের গতির প্রথম শক্তিমান শিল্পী ও সেই হিসেবে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্রসূরী। তাঁর লেখায় প্রধান গুণ নির্মম নিরাসক্তি। কাহিনীর নায়কেরা সাধারণ। কখনও ভিক্ষুক; কখনও অতি নিম্নশ্রেণীর লোক। কখনও সাধারণ মধ্যবিত্ত। সমস্ত কাহিনীর মধ্যে একটি প্রধান সুর- তা হল এক দুর্বার, অনিবার্য নিয়তিবাদ। এক অন্ধশক্তি মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলা করে। মানুষ যেন অন্ধশক্তির খেলার পুতুল। ১৩৩২ বঙ্গাব্দে (চৈত্র) প্রবাসী পত্রিকায় "দিবসের শেষে" নামক একটি গল্পে এই অন্ধ নিয়তির রূপ প্রথম চরম নির্মম রূপে দেখা দেয়।

গরীব রতি নাপিতের সুখের সংসার। বৌ নারাণী আর পাঁচ বছরের ছেলে পাঁচু নিয়ে তার পরিবার। পাঁচু হঠাৎ স্বপ্ন দেখল যে তাকে নাকি কুমীরে ধরেছে। মাকে সে সেই স্বপ্নের কথা বললে। মা সেই শুনে ভয় পেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। কোল-ছাড়া করতে চায় না ছেলেকে। যাই হোক কোনরকমে সেদিন কাটল। ছেলে খেলা-ধুলো করে কাদা মেখে সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরেছে। রতি পাঁচুকে নিয়ে নদীতে স্নান করতে গেল। নারাণী তখন প্রদীপ জ্বালছে ঘরে। সাঁজবাতি দিচ্ছে তুলসীতলায়। নদীতে কিসের ভয় ? আজ পর্যন্ত এই নদীতে কেউ কোনদিন কোন কুমীর দেখেনি। ছেলেকে ধুইয়ে মুছিয়ে বাপবেটায় ফিরবে—ভয়ের কী আছে। কিন্তু—হঠাৎ সেই অসম্ভব সম্ভব হল, অঘটন ঘটল। পাঁচুকে কুমীরে নিল। রতি আর্তনাদ করে উঠল। সেই কুমীর একবার ভেসে উঠল; আকাশের দিকে একবার পাঁচুকে তুলে ধরল। তারপর ডুব দিল।

কাহিনীর বর্ণনাভঙ্গি নিরাসক্ত। নির্মম। ঘটনা ধীরে ধীরে এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে কিন্তু কোথাও চমক নেই। পাঠক যেন সেই আসন্ন, অনিবার্য, ভবিতব্যকে দেখতে পাচ্ছিল। এই তীব্র অনাসক্তি ও নিয়তিতে বিশ্বাস নিয়ে জগদীশচন্দ্র অবচেতনার গল্প লিখেছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন, "দুর্দান্ত সাহসে অনেক উদ্দীপ্ত গল্প লিখেছেন, অনেকের কাছেই তিনি অদেখা, হয়তো বা অনুপস্থিত। নদী বেগস্বারাই বৃদ্ধি পায়। আধুনিক সাহিত্যের নদীতে তিনি একটা বড়রকমের বেগ।"১

এই আধুনিক সাহিত্যের নদী'র পরিচয় কি ? লক্ষণ কি ? এর পরিচয়ে বলা চলে এর তরঙ্গ বহু। একটি তরঙ্গ হতভাগ্যের গান গেয়েছে। "রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল 'কল্লোল'। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়।

১। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত: পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫৯-৬০

নিম্নগত মধ্যবিত্তের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে, প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।"১ অচিন্ত্যকুমার স্বীকার করেছেন "প্রমথ চৌধুরী প্রথম এই সুরে আসা মানুষ। বিষয়ের দিক থেকে না হোক, মনোভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে। আর দ্বিতীয় মানুষ নজরুল।"২ এই আধুনিকতার দ্বিতীয় তরঙ্গ "জিজ্ঞাসা ও নৈরাশ্য, সংগ্রাম ও অপূর্ণতা"।..."এই দুই যতির মধ্যে দুলছে তখন কল্লোলের ছন্দ", অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন, এই কথাকেই বিস্তার করে বলা চলে "আধুনিকতার ছন্দ।" এই জিজ্ঞাসা ও নৈরাশ্য, সংগ্রাম ও অপূর্ণতা যেমন একদিকে সমাজ ও ব্যক্তি সম্পর্কের মধ্যে, যেমন ব্যক্তি ও ব্যক্তি সম্পর্কের মধ্যে, তেমনই ধীরে ধীরে সংগ্রাম জাগছিল মানুষের প্রবৃত্তিগুলির আবিষ্কারে। রবীন্দ্রনাথ অচিন্ত্যকুমারকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তাঁর লেখায় মৈথুনপ্রবৃত্তির আসক্তি আছে। শুধু তাঁর লেখাতে নয়, আধুনিক শিল্পীদের অনেকেরই সেই দিকে আকর্ষণ এসেছিল। এই আকর্ষণও আধুনিকতার কেন্দ্রীয় রোম্যান্টিকতায়। যা কিছু অজানা, যা কিছু অন্ধকার তার দিকে আকর্ষণ। হোক সে বীভৎস, হোক সে ভয়াবহ, তবু তার পরিচয় চাই। প্রেমেন্দ্র মিত্র পরবর্তীকালে "গোটা মানুষের মানে" জানতে চেয়েছিলেন, যে মানুষ প্রবৃত্তি দিয়ে গড়া, যে মানুষ কামনা দিয়ে গাঁথা—সেই মানুষের পরিচয়। প্রাক্ আধুনিক সাহিত্য যেখানে এসে বলেছে আর নয়, আধুনিক সাহিত্য বলেছে সেই নিষিদ্ধ পথেই আমাদের যাত্রা। কল্লোলের সঙ্গে যুক্ত থাকুন বা না-থাকুন, রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করুন বা না-করুন সেদিন সকল সৃষ্টিধর্মী, সকল নূতন-পিয়াসী, সকল নবীন সাহিত্যিকেরই মনের কথা ছিলঃ

মোর পথ আরো দূর!
গভীর আত্মোপলব্ধি—এ আমার দুর্দান্ত সাহস,
উচ্চকণ্ঠে ঘোষিতেছে নব নব জন্মসম্ভাবনা:
অক্ষর তুলিকা মোর হস্তে যেন রহে অনলস,
ভবিষ্যৎ বৎসরের শঙ্খ আমি নবীন প্রেরণা।

১। ঐ পৃঃ ৮৩
২। ঐ পৃঃ ১১১

গ্রন্থপঞ্জী

আকরগ্রন্থ

অনুরূপা দেবী :

মধুমল্লী, কলিকাতা, ১৯১৭
গ্রন্থাবলী (১-৪), কলিকাতা (বসুমতী সাহিত্য মন্দির) ১৯২৩-২৫

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর :

পথে বিপথে, কলিকাতা ১৯১৯

ইন্দিরা দেবী :

কেতকী; কলিকাতা, ১৯১৫
ফুলের তোড়া, কলিকাতা, ১৯২৬ (আট আনা সংস্করণ গ্রন্থমালা—২৬)
নির্মাল্য, কলিকাতা, ১৯১২

কাজী আবদুল ওদুদ :

মীর পরিবার, ১৯১৮

কাজী নজরুল ইসলাম :

ব্যথার দান, কলিকাতা, ১৯২২
রিক্তের বেদন, কলিকাতা, ১৯২৫

কাঞ্চনমালা দেবী :

স্তবক, কলিকাতা, ১৯১৫

কিরণশঙ্কর রায় :

সপ্তপর্ণ, কলিকাতা, ১৯৫৬

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় :

আমরা কি ও কেন, কাশী/কলিকাতা, ১৯২৭

খগেন্দ্রনাথ মিত্র :

নীলাম্বরী, কলিকাতা, ১৯২২
বিবি বৌ, কলিকাতা, ১৯২৬

গিরিশচন্দ্র ঘোষ :

গ্রন্থাবলী (১-৩), কলিকাতা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির

গিরীন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় :

মঞ্জরী, কলিকাতা, ১৯২২

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ

কনকচূর, কলিকাতা, ১৯১৮
চাঁদমালা, কলিকাতা, ১৯১৫
পুষ্পপাত্র, কলিকাতা, ১৯২২
মণিমঞ্জীর, কলিকাতা, ১৯২৭
শ্রেষ্ঠগল্প (শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত) কলিকাতা ১৯৬১

জগদীশচন্দ্র গুপ্ত ঃ

বিনোদিনী, কলিকাতা, ১৯২৭

জলধর সেন ঃ

আমার বর ও অন্যান্য গল্প, কলিকাতা, ১৯১২
আশীর্বাদ, কলিকাতা, ১৯১৪
একপেয়ালা চা, কলিকাতা, ১৯২০
নৈবেদ্য, কলিকাতা ১৯১৪
পুরাতন পঞ্জিকা, কলিকাতা, ১৯০৯

াথ মুখোপাধ্যায় ঃ

গ্রন্থাবলী (১-২) বসুমতী সাহিত্যমন্দির, কলিকাতা, ১৯২৯
শ্রেষ্ঠগল্প (প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত) কলিকাতা ১৯৫৬

দীনেশচন্দ্র সেন ঃ

দেশমঙ্গল, কলিকাতা ১৯২৪
ভয়ভাঙা, কলিকাতা ১৯২৩
সতী, কলিকাতা ১৯১৫

দীনেন্দ্রনাথ রায় ঃ

ঢেঁকীর কীর্তি, কলিকাতা, ১৯২৫
পট, কলিকাতা, ১৯০১
পল্লীকথা, কলিকাতা, ১৯১৭
পল্লীচিত্র, মেহেরপুর, ১৯০৪
পল্লী-বৈচিত্র্য, মেহেরপুর, ১৯০৫
বাসন্তী, বোয়ালিয়া, ১৮৯৮

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ঃ

গ্রন্থাবলী (১-২) বসুমতী সাহিত্যমন্দির, কলিকাতা ১৯২৫

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য :

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত :

গ্রামের কথা, কলিকাতা ১৯২৪

নিখিলনাথ রায় :

ইতিকথা, কলিকাতা, ১৯০৬

নিরুপমা দেবী :

গ্রন্থাবলী (১-২) বসুমতী সাহিত্যমন্দির, কলিকাতা ১৯২১-২

পাঁচকড়ি দে :

রূপলহরী, কলিকাতা ১৯০২

[প্রভাত]কুমার মুখোপাধ্যায় :

গহনার বাক্স, কলিকাতা ১৯২১
গল্পবীথি, কলিকাতা ১৯১৬
গল্পাঞ্জলি, কলিকাতা ১৯১৩
জামাতাবাবাজী, কলিকাতা ১৯৩১
দেশী ও বিলাতী, কলিকাতা ১৯১০
নবকথা, কলিকাতা ১৯০০
পত্রপুষ্প, কলিকাতা ১৯১৭
বিলাসিনী, কলিকাতা ১৯২৭
যুবকের প্রেম, কলিকাতা ১৯২৮
ষোড়শী, কলিকাতা ১৯১৬
হতাশপ্রেমিক, কলিকাতা ১৯২৩

প্রমথ চৌধুরী :

গল্পসংকলন, কলিকাতা ১৯৪১
ঘোষালের ত্রিকথা, কলিকাতা ১৯৩৭
চার ইয়ারী কথা, কলিকাতা, ১৯১৬
নীললোহিত, কলিকাতা, ১৯৩২

প্রিয়গোবিন্দ দত্ত :

গায়ে হলুদ, ঢাকা, ১৯১৫
[দুইটি গল্প, প্রভাতকুমার ও ললিতকুমার। ভূমিকায় লেখক লিখেছেন যে হিন্দুধর্ম ও জীবন বিশেষভাবে সাক্ষ্য দেয় জীবনটা কেবলি দুঃখময়। সুখ যাহা আছে তাহা দুঃখেরই নামান্তর মাত্র। যতই কেন বেশী হউক না তাহা গায়ে হলুদের রঙের মত বাহিরটা রঙাইয়া ক্ষান্ত হয়। এই কথাটি প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্তেই এই দুইটি গল্পের অবতারণা]

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় ঃ

দারোগার দপ্তর (১-১০০), কলিকাতা ১৮৯২-১৯০০

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ঃ

বাজীকর, কলিকাতা, ১৯২২

ফকির চট্টোপাধ্যায় ঃ

ঘরের কথা, কলিকাতা ১৯১০
নবান্ন, কলিকাতা ১৯২২
পরিকথা, কলিকাতা ১৯১১

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ

গল্পমাল্য, কলিকাতা
পঙ্কজিনী, কলিকাতা ১৯৩৫

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ

ইন্দিরা [ক্ষুদ্রাকারে প্রকাশ ১৮৭২, ১৮৯৩তে বর্তমান রূপ]
রাধারাণী [ক্ষুদ্রাকারে ১৮৭৫, ১৯৮৩তে বর্তমান রূপ]
যুগলাঙ্গরীয় [ক্ষুদ্রাকারে, ১৮৭৩, ১৮৯৩ বর্তমান রূপ]

বিজয়চন্দ্র মজুমদার ঃ

কথা ও বীথি, কলিকাতা ১৮৯৩
কথানিবন্ধ, কলিকাতা ১৯০৫

বিপিনচন্দ্র পাল ঃ

সত্য ও মিথ্যা, কলিকাতা ১৯১৭

মনিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ঃ

আলপনা, কলিকাতা ১৯১০
ঝাঁপি, কলিকাতা ১৯১২

মণীন্দ্রলাল বসু ঃ

মায়াপুরী, কলিকাতা ১৯২৩
রক্তকমল, কলিকাতা ১৯২৪
সোনার হরিণ, কলিকাতা ১৯২৪

মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় ঃ

পঞ্চক, কলিকাতা ১৯২২

যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত ঃ

দূর্বাদল, কলিকাতা ১৯১৬
বেহার চিত্র, কলিকাতা ১৯১১

যতীন্দ্রমোহন সিংহ ঃ

উড়িষ্যার চিত্র, কলিকাতা ১৯০৩

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

গ্রন্থাবলী, কলিকাতা, বসুমতী সাহিত্যমন্দির ১৯১৪

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ

গল্পগুচ্ছ (১-৩), কলিকাতা ১৯২৬
[চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য সজ্জিত]
লিপিকা, এলাহাবাদ, ১৯২২

রাজশেখর বসু ঃ

গড্ডলিকা, কলিকাতা ১৯২৪

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ

অনুরাধা, সতী পরেশ
অরক্ষণীয়া, কলিকাতা ১৯২০
কাশীনাথ ১৯১৩
বিন্দুরছেলে ১৯১৩
[এ ছাড়া অন্যান্য গল্পের জন্য বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ১-৭] ১৯১৯-৩৫

শান্তা দেবী ঃ

ঊষসী, কলিকাতা ১৯১৮
বধুবরণ, এলাহাবাদ ১৯৩১

শৈলেশচন্দ্র মজুমদার ঃ

ইন্দু, কলিকাতা, ১৯০২

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থাবলী (১-২), কলিকাতা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির ১৯৫৪

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ঃ

গ্রন্থাবলী, কলিকাতা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯১৯

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ

রচনাসংগ্রহ, কলিকাতা ১৯৫৭
[দেবব্রত ভৌমিক সম্পাদিত]

সরলা দেবী ঃ

নববর্ষের স্বপ্ন, কলিকাতা ১৯১৮
[কয়েকটি গল্পের সমষ্টি। কোন গল্পই উল্লেখযোগ্য নয়]

সরোজকুমারী দেবী ঃ

অদৃষ্টলিপি, কলিকাতা ১৯১৫
কাহিনী বা ক্ষুদ্র গল্প, কলিকাতা ১৯১৮
ফুলদানী, কলিকাতা

সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ
সোনার পদ্মা, শিবপুর, হাওড়া ১৯১৭

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ
[মঞ্জুষা, কলিকাতা ১৯০৩] পরিবর্ধিত সংস্করণ
চিত্রালী, ১৯১৬
করঙ্ক, কলিকাতা ১৯১২
চিত্ররেখা, কলিকাতা ১৯১০

সুবোধচন্দ্র মজুমদার ঃ
আমাদের গ্রাম, শান্তিনিকেতন, ১৯২২

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ঃ
কর্মযোগের টীকা, কলিকাতা, ১৯১৬
ছোট ছোট গল্প, কলিকাতা, ১৯১৫

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ঃ
সাজি, কলিকাতা

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ঃ
রত্নঝাঁপি, কলিকাতা, ১৯১৫

সুরেশচন্দ্র সিংহ ঃ
মঞ্জুলা, ঢাকা ১৯১৯
[৭টি গল্পের সমষ্টি। গল্পের মধ্যে কোন অভিনবত্ব নেই। ভূমিকায় বাংলা ছোটগল্পের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে দু-একটি মন্তব্য আছে।]

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ঃ
নির্ঝর, কলিকাতা ১৯১১
পুষ্পক, কলিকাতা ১৯১৩
বৈকালী, কলিকাতা ১৯১৭
মৃণাল, কলিকাতা ১৯২২

স্বর্ণকুমারী দেবী
নবকাহিনী, কলিকাতা ১৮৯২
গ্রন্থাবলী (১-৬), কলিকাতা, বসুমতী সাহিত্য মন্দির ১৯১৬-১৭

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়
ছায়াচিত্র, কলিকাতা ১৯১৫
পঞ্চপুষ্প, কলিকাতা ১৮৯২
রূপের মূল্য, কলিকাতা ১৯১৪

হেমেন্দ্রকুমার রায় ঃ
পসরা, ১৯১৫

মধুপর্ক, কলিকাতা ১৯১৭
মালাচন্দন, কলিকাতা ১৯২২
সিঁদুর, কলিকাতা ১৯২১

হেমলতা দেবী :

দুনিয়ার দেনা, শান্তিনিকেতন ১৯২০

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ :

গ্রন্থাবলী (১-২), কলিকাতা,
বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৯২৩
মুক্তারমালা, কলিকাতা, ১৯১৬

গল্পসংকলন

এইচ বসু পরিচালিত :

'কুন্তলীন' প্রতিযোগিতার গল্পগুচ্ছ। ১৮৯৬ খৃঃ অব্দ থেকে পাওয়া যায়।

অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল
সম্পাদিত :

উপন্যাস সংগ্রহ, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা, ১৯১৬
['বঙ্গ সাহিত্যে ইহা এক নূতন উদ্যম'—সম্পাদক এই কথা বলে এই গ্রন্থকে ছোটগল্পের প্রথম সংকলন দাবী করেছেন]

পরিমল গোস্বামী
সম্পাদিত :

ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী, কলিকাতা ১৯৫১
[হাসি ও ব্যঙ্গের গল্প সংকলন]

বিশু মুখোপাধ্যায়
সম্পাদিত :

প্রেমের গল্প, কলিকাতা, ১৯৫৬
[২৩টি প্রেমের গল্পের সংকলন]

সুধীরচন্দ্র সরকার
সম্পাদিত :

কথাগুচ্ছ (১ম সংস্করণ ১৯৩০)
[বর্তমান সংস্করণে (১৯৫২) ৪১টি বিভিন্ন ধরনের গল্প] প্রমথ চৌধুরীর ভূমিকা সহ।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদিত ঃ

পুষ্পাঞ্জলি, কলিকাতা ১৯৩৩
[১৬টি গল্প সংগ্রহ]

আকর পত্রিকা

উপদেশক পত্রিকা [খ্রীষ্টান মিশনারীদের পরিচালিত, ১৮৪৭, পাদরি জে, ওয়েঙ্গার সম্পাদিত]
কল্পনা [হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২৮৭ আশ্বিন]
গল্পলহরী [জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, ১৯১২]
জন্মভূমি [পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন, পৌষ ১২৯৭]
দিগদর্শন [মার্শম্যান সম্পাদিত, ১৮১৮]
নব্যভারত [দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, জ্যৈষ্ঠ ১২৯০]
নারায়ণ [চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত ১৯১৪]
নবজীবন [অক্ষয়চন্দ্র সরকার, শ্রাবণ ১২৯১]
পরিচারিকা [রানী নিরুপমা দেবী, কুচবিহার, ১৯১৬]
পঞ্চানন্দ [ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাদ্র, ১২৮৫]
প্রদীপ [রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পৌষ ১৩০৪]
প্রবাহ [দামোদর মুখোপাধ্যায়, বৈশাখ ১২৮৯]
প্রবাসী [রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বৈশাখ, ১৩০৮, এলাহাবাদ]
বংগদর্শন [বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বৈশাখ ১২৭৯]
বঙ্গবাণী [দীনেশচন্দ্র সেন ও বিজয়চন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত]
বঙ্গমিহির [চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈশাখ ১২৮০]
বঙ্গীয় মুসলমান পত্রিকা [মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক হক সম্পাদিত। ১৯১৮]
বামাবোধিনী পত্রিকা [উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত, ১২৭০ সাল থেকে প্রকাশিত]
বিবিধার্থসংগ্রহ [রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কলিকাতা, ১৮৫১]
ভারতবর্ষ [জলধর সেন, আষাঢ়, ১৩২০]
ভারতী [দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৮৪-১২৯০, স্বর্ণকুমারী ১২৯১-১৩০১, হিরণ্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী ১৩০২-০৪, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩০৫, সরলা দেবী ১৩০৬-১৩১৪, স্বর্ণকুমারী ১৩১৫-২১, মণিলাল গংগোপাধ্যায় ১৩২২-৩০, সরলা দেবী ১৩৩১-৩৩]
ভ্রমর [সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বৈশাখ, ১২৮১]
মাসিক সমালোচক [চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, বৈশাখ, ১২৮৬]
মোসলেম ভারত [মোজাম্মেল হক, ১৯২০]

রহস্যসন্দর্ভ [স্কুল বুক সোসাইটি ও ভার্নাকিউলার লিটারেচার সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত। ১৮৬৩ ফেব্রুয়ারি প্রথম প্রকাশ। প্রথম সম্পাদক রাজেন্দ্রলাল মিত্র]
সখা [সখা প্রমদাচরণ সেন, জানুয়ারি ১৮৮৩]
সমাচার চন্দ্রিকা [ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮২৩]
সমাচার দর্পণ [মার্শম্যান, ১৮১৮]
সংবাদ প্রভাকর [ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, কলিকাতা, ১৮৩০]
সবুজপত্র [প্রমথ চৌধুরী, কলিকাতা, ১৯১৪]
সাধনা [সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অগ্রহায়ণ ১২৯৮]
সাহিত্য [সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, ১২৯৭ বৈশাখ]
হুতোম [রাধামাধব হালদার, বৈশাখ ১২৮২]

গৌণ আকর গ্রন্থ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : কল্লোল যুগ, ১৯৫০, ৩য় সংস্করণ ১৯৫৩
অন্নদাশঙ্কর রায় : আধুনিকতা, ১৯৫২
যার যেথা দেশ, ১৯৩২
কালীপ্রসন্ন সিংহ : হুতোম প্যাঁচার নক্সা (১৮৬০) সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ
দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১৮৯৫)
নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : বাংলা ছোটগল্প, ১৯৫০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : বাংলা গল্পবিচিত্রা, ১৯৫৭
সাহিত্যে ছোটগল্প, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬২
পুলিনবিহারী সেন : দ্রঃ পরিশিষ্ট—রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প—প্রমথনাথ বিশী প্রণীত
প্রমথ চৌধুরী : প্রবন্ধ সংগ্রহ (১ম), বিশ্বভারতী ১৯৫২
দ্রঃ সুধীরচন্দ্র সরকার : কথাগুচ্ছ
প্রমথনাথ বিশী : রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, ১৯৫৪
[পরিশিষ্ট—রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প গ্রন্থপঞ্জী—পুলিনবিহারী সেন]
প্রেমেন্দ্র মিত্র : জগদীশ গুপ্ত (বিশ্বভারতী ১৩৬৪, বৈশাখ-আষাঢ়)
চট্টোপাধ্যায় : সাহিত্য কথা (২য় ভাগ) ১৯৪৩
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, ১৯২০
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : কৃষ্ণচরিত্র, ১৮৮৬, সাহিত্যপরিষদ সংস্করণ
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর : গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১-২), ১৯৪৯
সাহিত্যসাধক চরিতমালা (১-৮), ১৯৪২-১৯৫১
শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী, ১৯৫৪

ভূদেব চৌধুরী ঃ বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, ১৯৬২
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার ঃ প্রবোধচন্দ্রিকা, শ্রীরামপুর, ১৮২৫
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কাহিনী, কলিকাতা, ১৯১২
চিঠিপত্র (৫ম), কলিকাতা, ১৯৪৫
ছিন্নপত্র (১৯২৭-এর সংস্করণ)
ছিন্নপত্রাবলী, শতবর্ষপূর্তি সংস্করণ ১৯৬১
মানসী, কলিকাতা, ১৮৯০
শেষকথা (দেশ ১৩৪৬, ৩০শে অগ্রহায়ণ)
রামচন্দ্র শুক্ল ঃ হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস, প্রয়াগ, ১৯৯০ সম্বৎ
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ অপ্রকাশিত রচনাবলী, ১৯৫১
(ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত)
শিশিরকুমার দাশ ঃ একটি প্রাচীন গল্প (আন্তর্জাতিক, ১৯৫৭, নভেম্বর)
বাঙলা কাব্যসাহিত্যে নজরুলের ভূমিকা (পরিচয় ১৩৬৪, জৈষ্ঠ)
সৌরীন্দ্রনাথ ঘোষ ও
পরেশ সাহা ঃ কথাশিল্প, ১৩৬৪
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ১৩৫৩
বাংলা সাহিত্যের কথা, প্রথম সংস্করণ ১৯৩৮, দ্বিতীয় ১৯৪৮
সুকুমার সেন ঃ
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য়) বর্ধমান সাহিত্যসভা ৩য় সং, ১৯৫৫ খৃঃ
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৩য়) কলিকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৯৫২ খৃঃ
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (৪র্থ) বর্ধমান সাহিত্যসভা, ১৯৫৮ খৃঃ
বাংলা সাহিত্যে গদ্য, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৪৯ খৃঃ
ভূতের গল্প (বিশ্বভারতী ১৩৫৪)
সুখময় মুখোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্রনাথ ও এডগ্যার অ্যালানপো
[রবীন্দ্র সাহিত্যের নবরাগ, ১৯৬১]
সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ঃ বঙ্কিমচন্দ্র (২য় সং) কলিকাতা, ১৯৩৮ খৃঃ
শরৎচন্দ্র, ১ম সংস্করণ ১৯৩০, ৬ষ্ঠ সংস্করণ
সুধাকৃষ্ণ বাগচী ঃ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন (২য় সং) ১৯৩৫ খৃঃ
হরপ্রসাদ মিত্র ঃ গল্পগুচ্ছের রবীন্দ্রনাথ
[সাহিত্য পরিক্রমা, ১৯৪৬]
হারানচন্দ্র রক্ষিত ঃ ভিক্টোরিয়া যুগে বাংলা সাহিত্য, মজিলপুর, ১৯৩৮
হেমেন্দ্রকুমার রায় ঃ যাঁদের দেখেছি (১ম) ১৩৫৮/দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৩৬১
যাঁদের দেখেছি (২য়) ১৩৫৯

Albright, Evelyn May : The Short Story, Macmillan & Co., New York, 1931

Bates, H. E. : The Modern Short Story, London, 1941.

Bhate, Govindo Chimnaji : History of Modern Marathi Literature, 1939

Bowen, Elizabeth : The Faber Book of Modern Stories, Faber and Faber, London, 1942

Carey, W. : Dialogues, Serampore, Bengal, 1801

Cournes, John (ed) : American Stories of the 19th Century, London, 1960 (first published in 1930)

Dasgupta S. N. and

De, S. K. : A History of Sanskrit Literature, Calcutta University, 1947

Doyle, Sir Arthur Conan : The memoirs of Sherlock Holms, Penguin, London, 1961

Forster, E. M. : Aspects of Novel, Edward Arnold and Co., London, 1927

Hammerton, J. A. (edited) :

The World's Best Short Stories in 20 volumes. The Education Book Company, London..?

Haycraft, Howard : Murder for pleasure, London, 1942

Hudson, W. H. : Introduction to the study of literature, 1927 Second edition enlarged.

Macdonell, A. A. : A History of Sanskrit literature, London, 1899

Matthews, B : The Philosophy of the Short Story, Longmans Green & Co., New York, 1901

Maugham, W. S. : The Vagrant Mood, London, 1953

The Painted Veil, Penguin Books, 872
The Points of View, London, 1958
[The Short Story, pp. 142-88]

Maupassant, Guy de : Short Stories (edited by Gerald Gould) Everyman's Library, 1951
Miss Harriet and other stories, (tr. H. N. P. Sloma) Penguin, London, 1955

O' Faolin, Sean : The Short Story, Collins, London, 1948

Patridge, Eric : Origins. A short Etymological Dictionary of Modern English, Routledge and Kegan Paul, London, 1958

Philips, W. L. : Short Story, Encyclopeadia Britannica, Vol. 20 London, 1961

Poe, Edgar Allan : The Works of Edgar Allan Poe (ed. E. C. Stedman and G. E. Woodbery), Vol. VII. Chicago, 1895

Ray, L. : The Short Story and its development in Bengali Literature (Preface to 'Broken Bread') Calcutta, 1957 Challenging decades, Calcutta, 1953.

Speare', M. E. (ed.) : The Pocket Book of Short Stories, Book INC., Rockefeller Centre, New York, 1951.

Thomson, E. : Rabindranath Tagore, (1926) Oxford University Press, Second edition, 1948.

Wagner, R. : Bengalische Texte in Urshcrift und umschrift Berlin und Leipzig, 1930

Ward, A. C. : Twentieth Century Literature (1901-1950) London, reprinted in 1959.

Wright, A. M. : The American Short Story in the twenties, University of Chicago Press, 1961.

নির্ঘণ্ট

INDEX